ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৯, মে ২০২৫

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
Vol. 12th Issue 29th, May, 2025
DOI : 10.5281/zenodo.15812553

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)]
DOI : 10.5281/zenodo.15812553
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 12th Issue 29th, 12th May, 2025, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১২ তম বর্ষ ও ২৯ তম সংখ্যা

১২ মে, ২০২৫

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিস্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২

সৌরভ বর্মন

ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনন্যা

বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০

ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. রূপকুমার পন্ডা (অধ্যক্ষ, মধ্যমগ্রাম বি. এড. কলেজ)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০ - ২৫০০ এর মধ্যে।

২. বাংলা হরফে লিখলে অভ্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে|

৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল - ebongprantik@gmail.com

৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।

৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২
ফোন : ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address
Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 8250595647
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস
ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

'নিমগাছ' ও 'সে এল না' নামের দুটি গল্প : কবিতার দৃশ্যরূপে
অতনু শাশমল ১১
ঔপনিবেশিক পর্বে ঢাকাই মসলিন ও পূর্ব বঙ্গের কাতান : বাণিজ্যিক পর্যালোচনা
সুদীপ্ত সেন ১৬
বিশেষ স্বীকৃতির বিপক্ষে যুক্তি এবং এর সমাধান
প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্ত্তী ২৩
বেদান্তসার ও মহাভারতে পঞ্চ মহাভূতের কার্যকারিতা : সাদৃশ্যমূলক আলোচনা
জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯
প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব ও সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি
দীপঙ্কর কৈবর্ত্ত্য ৩৩
আজীবকদের দার্শনিকতা : একটি ইতিবৃত্ত
পায়েল চট্টোপাধ্যায় ৩৯
কোভিড ১৯ ; সাহিত্যের আলোকে ইতিহাস, প্রান্তিক সমাজ ও মহামারী
কানু হালদার ৪৭
প্লেটোর ন্যায়তত্ত্বে সামাজিক স্তরবিন্যাস : একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা
লিথা ভট্টাচার্য ৫৫
পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসমাজ, পশ্চাৎপদতা ও সংরক্ষণ : একটি পর্যালোচনা
রকিবুল সেখ ৬০
ইন্দিরা পার্থসারথি-র 'কুতুবমিনার ও একটি শিশুর হাসি : একাধারে শূন্যতা ও পূর্ণতা নিয়ে পথচলা মানবমনের কাহিনি
প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য ৬৬
ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে ফটোগ্রাফি ও ওয়াল্টার বেঞ্জামিন : সত্ত্বা/আভা/জ্যোতির একটি সমালোচনামূলক আলোচনা
অচিন্ত্য দেবনাথ ৭১
গোষ্ঠীসাহিত্যে ব্যক্তিচেতনা : মধ্যযুগের কবিদের আত্মবিবরণী
হুমায়ুন কবির ৭৮
কালুয়াষাঁড় ও কুঁয়োর সাহেব : নয়াগ্রামের দুই লোকদেবতা
অনিমেষ কুণ্ডু ৮৫
নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংকট-সম্প্রীতি
মৌসুমী পাত্র ৯০
অস্তিবাদী দর্শনের আলোকে কার্তিক লাহিড়ীর উপন্যাস
অমিত মুর্মু ৯৮
ঋগ্বেদে সরস্বতী : নদীরূপা তথা দেবীরূপা
অর্জুন কুমার ১০৪
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নৌকা : প্রতীক, প্রেক্ষাপট ও চরিত্র
ইয়াসমিন প্রামানিক ১১৩

উদ্ভব ও বিবর্তনের পথে সুন্দরবনের সমবায় ও ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন (১৯০৪-৪২)
ইন্দ্রজিৎ দাস ১২১
বাংলার আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার চিহ্ন : প্রেক্ষিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য
গণেশ যোদ্দার ১২৯
জীবন ও শিল্পের দর্পণে প্রতিবিম্বিত নির্মল অধিকারীর 'দুটি কুঁড়ি' : পাঠকের অনুভবে
জীবনকৃষ্ণ পাত্র ১৩৯
প্রান্তজনের ধারায় মতুয়া সঙ্গীত : শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন
টৌটন বিশ্বাস ১৪৪
কবি মণীন্দ্র গুপ্তের অক্ষয় মালবেরি : কবির সৃজন প্রেক্ষিত ও দেশকাল
তাপস ব্যানার্জী ১৫১
একুশ শতকের বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গ সমাজচিত্র : আমি 'ওরা' ও বেলপাহাড়ি
প্রিয়াংকা মণ্ডল ১৫৬
মৃৎশিল্পে কৃষ্ণনগর : কয়েকটি সূত্র
সমীর মণ্ডল ১৬০
রাজা রামমোহন রায় : ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত বিচার
স্বস্তিকা বিশ্বাস ১৬৬
মধ্যযুগে ইউরোপের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে 'ঈশ্বর প্রবঞ্চক' ('God as a deceiver') -রূপ সংশয়বাদী প্রকল্প
সায়ন্তনী ভট্টাচার্য্য ১৭১
কৃষিক্ষেত্রে অবহেলিত নারী শ্রমিক : একটি পর্যালোচনা
সুকান্ত নস্কর ১৭৬
গল্পকার প্রচেত গুপ্তের 'বাইশে শ্রাবণের গল্প' : ফিরে দেখা রবি ঠাকুর
শুভময় কোনার ১৮৩
ছবির কবিতা : ইমপ্রেশনিস্ট চিত্র শিল্পের আলোকে কবি জীবনানন্দ
অজয় কুমার দাস ১৮৯
অগ্নিপুরাণে যোগপ্রসঙ্গ : একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা
রূপম সরকার ২০২
জেলখানার নাটক রক্তকরবী
মহুয়া খাতুন ২০৮
স্বদেশী ও বয়কট : গোখলের ভাবনা
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক হোসেন সেখ ২১৪
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পশ্চিমের ডায়েরি' : সমাজ-গবেষকের ইউরোপ-দর্শন
মো: রাজা মেহেদী আলি সরদার ২২১
কথাসাহিত্যিক ওয়াহিদা খন্দকারের 'ময়নাবিবির নাও' উপন্যাসে বর্ণিত পিতৃহৃদয়ের আর্তনাদ : একটি পর্যালোচনা
মাসুদ আলী দেওয়ান ২২৭

দন্ত্য-ন, মূর্ধন্য পাড়ায় ৪৭-এর ফ এবং ৬৯-এর ঙ : রবীন্দ্র প্রতিবাদ
(মানব সম্পদ ও একবিংশ শতাব্দী)
বুদ্ধদেব সাহা ২৩৪
নজরুলের 'দুর্দিনের যাত্রী' : নিষেধের পটভূমিকায়
বিজন বিশ্বাস ২৪০
শ্রীচৈতন্যকেন্দ্রিক উপন্যাসে সামাজিক প্রেক্ষাপট : প্রসঙ্গ রূপক সাহার
'ক্ষমা করো, হে প্রভু'
পর্ণা বিশ্বাস ২৪৮
রবিশংকর বলের ছোটগল্পে ফ্রয়েডিয় তত্ত্ব
পায়েল বাগচী ২৫৪
নবনীতা দেব সেনের 'ইহজন্ম' উপন্যাসে : নারীসত্তার পাঠকৃতি
রিবা দত্ত ২৫৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার ও সমসাময়িক দর্শন : একটি আলোচনা
মীনাক্ষী ভট্টাচার্য ২৬৪
'মহিষকুড়ার উপকথা' : দিন বদলের ছবি
অজয় শীল শর্মা ২৭২
পরিবেশচেতনা প্রসারে তপন বাগচীর ছড়াসাহিত্য
নীলাদ্রিশেখর সরকার ২৭৭
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আধুনিকতা
তুহিনা মণ্ডল (মল্লিক) ২৮৩
শ্রমিক আন্দোলনে নারীনেত্রী : ঔপনিবেশিক বাংলা ও স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবাংলার
বিগত পাঁচ দশকের প্রেক্ষিতে একটি ঐতিহাসিক বীক্ষণ (১৯২০-১৯৭০)
শিল্পা দেবনাথ
বিরাজলক্ষী ঘোষ ২৯০
বিচ্ছিন্নতাবাদ বিষয়ে উৎপল দত্তের ভাবনা : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা
অলোক বিশ্বাস ২৯৭
খেরওয়াড় আন্দোলন : ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ
প্রসেনজিৎ হেম্ব্রম ৩০৩
কাজী নজরুলের সাহিত্যে নবজাগরণের প্রভাব
মানস জানা ৩১২
বুদ্ধদেব বসুর 'অনাম্নী অঙ্গনা' : নারীর অস্তিত্ব ও প্রতিবাদের কাব্যনাট্যচিত্র
বঙ্কিম বর্মন ৩১৯
শঙ্খশিল্পের মোটিফ নান্দনিকতা ও সমাজতত্ত্ব
সৌগত চট্টোপাধ্যায় ৩২৫
The Role of Information and Communication
Technology for Empowering Women in India
Monika Sardar
Dilip Kumar Mondal ৩২৯

Concept of ‘Wage Theft’ in India : Analyses of Internal Labour Migrations and Legal-Institutional Frameworks
Navas M. Khadar
Mirnisar Ali ৩৩৯
Baul Community and Various Folk Music of Rarh Region
Hriday Das ৩৪৬
The Theory of Description as a Paradigm of Analytic Philosophy
Pranab Ghosh ৩৫০
History in Literature : Representation of ‘Partitioned Woman’ in Bengali Short Story
Smarita Datta ৩৬১
Environmental Ethics among the College Students in West Bengal
Tarak Nath Bhunia
Susanta Kumar Giri ৩৬৮
A study of John Galtung idea of Positive Peace in respect to the Birhor Tribe of Jharkhand
Upasana Roy Barman ৩৭৪
From Connection to Disconnection : Social Media and the Mental Health Paradox
Ratan Sarkar ৩৮০
Gendered Impacts of Climate Change in India : Analysis of NGO-led Adaptation Strategies
Akansha Khaiba ৩৯২
A Study on Fertility Cult of the Indus Period : A Criterion to Evaluate the Role of Women in Ancient Society
Bhaswati Basu ৪০১
Secularism and Indian Constitution
Bhumidhar Roy ৪০৯
The Great Trigonometrical Survey and Colonel William Lambton : Foundations of India’s Topographical Development
Indrajit Mahanta
Santigopal Jana ৪১৬
Tradition in Transition : The Role of Male Guise in the Folk Performance Arts of Balasore
Jeenapriyanka Jethi
Sikhasree Ray ৪২২
India-Russia Relations in The Post-Ukraine War Era
Md Moniruddin ৪৩৩
The Notion of Masculinity in Colonial India : Studies in 19th and 20th Century Society
Deedhiti Singharoy ৪৪০

সম্পাদকীয়

সময়টা ক্ষয় হয়ে গেলেও চিহ্নটা থেকে যায়। চিহ্নকে সঠিকভাবে চিনতে গেলেই সঠিক চেতনার প্রয়োজন। গভীর চেতনা থেকেই চিন্তনের রসদ তৈরি হয়। রসদ সব সময় অনুসন্ধানের আগ্রহ তৈরি করে। আগ্রহই কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করে। ত্বরান্বিত কাজই আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তবে লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েই থেমে থাকা উচিত নয়। থামার আগে আপনার বিচার করা প্রয়োজন। আপনার চেতনার গভীরতা অন্যদেরকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। আপনার উপলব্ধি অন্যদের কতটা বুঝতে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি আপনার অনুসন্ধান যেন অন্যদেরকে আপনার কাজের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এবারের ‘এবং প্রান্তিক’ সেই অনুসন্ধানের দিকেই দৃষ্টি রেখেছে।

‘নিমগাছ’ ও ‘সে এল না’ নামের দুটি গল্প : কবিতার দৃশ্যরূপে

অতনু শাশমল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ: কবিতা ও ছোটগল্পের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এবিষয়ে সমালোচকেরা ইতিপূর্বে নানা কথা বলে গেছেন। সূচনালগ্ন থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বিশেষভাবেই ছোটগল্প, কবিতার আত্মিক ও বাহ্যিক স্বভাব ও রূপের ভেদ লুপ্ত হয়ে যেতে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। উভয়ত অনুভবময় পরিণাম, ব্যঞ্জনাধর্মিতা, বিরল-কাহিনিত্ব বা কাহিনি-রিক্ততা, প্রতীতিগত ঐক্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেকেরই গল্পে এটা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানে আমরা সেই সমস্ত লেখার কথা বলতে চাইছি, যেসমস্ত বিরল প্রজাতির লেখায় শরীরী রূপে গদ্যের ছোট বড় ছত্রবিন্যাস কবিতার কথা মনে করায় যেমন, সেরকমই আবার সেখানকার সজ্জিত কথাসমূহতে আখ্যানের সামান্য কিংবা অসামান্য স্পর্শ ও অনুরণনও লেখাকে কাব্যের জলাভূমি থেকে নিয়ে চলে যায় গল্পের স্থলভূমির কূলে। যেমন কথাসাহিত্যিক বনফুলের *নিমগাছ* এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *সে এল না*। দুটি লেখাতেই ঘটনা সমগ্রের নির্বাচিত মুহূর্তনির্ভর প্রসঙ্গ বা পুঞ্জগুলো পরিণাম-অভিমুখী; অথবা বলা যায়, পরিণামী-চেতনার দিকে তাকিয়েই উভয়ের মুহূর্তগুলো নির্বাচিত। উভয় ক্ষেত্রেই সেই মৌহূর্তিক সংকট (Crisis)গুলো চরম সংকট (Climax)-এর দিকে ধাবিত হয়েছে ঐক্যবদ্ধভাবে। চরম সংকট বা সংকট শীর্ষ উভয় ক্ষেত্রেই বিন্যস্ত হয়েছে অন্তিমে। দুটি লেখায় সংকট ভাবনার পৌনঃপুনিক আবর্তন শেষ পর্যন্ত তীব্রতম সংকট এবং তখনই উদ্ভাসিত হয়েছে চেতনা-প্রতীতি, আর তখনই রচনার সমাপ্তি। প্রথমটির প্রতীতি অপচয় থেকে, দ্বিতীয়টির প্রতীতি অপঘাত থেকে সঞ্জাত।

সূচক শব্দ: কবিতা, ছোটগল্প, বিরল-কাহিনিত্ব বা কাহিনি-রিক্ততা, মৌহূর্তিক সংকট (Crisis), চরম সংকট বা সংকট শীর্ষ (Climax), চেতনা-প্রতীতি (Impression)।

মূল আলোচনা:

যেন একটি কবিতা। অন্ততপক্ষে বনফুলের *নিমগাছ*-এর দৃশ্যরূপ দেখে তাই মনে হয়। গদ্যে লেখা বেশ কয়েকটি ছোট-বড় ছত্রে সজ্জিত। মানে বা অর্থের নিরিখে ছত্রগুলিকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম তেরোটি ছত্র হল এর প্রথম অংশ। ছত্র বা লাইনগুলিতে *নিমগাছ*-এর উপকারের দিকগুলো বিন্যস্ত। সেখানে *নিমগাছ*-এর ছাল ছাড়িয়ে সিদ্ধ করার কথা রয়েছে। রয়েছে ওই গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে শিলে পেষা কিংবা গরম তেলে ভেজে নেওয়ার কথা। নানাবিধ চর্মরোগের মহৌষধ এসব। আবার কচি নিমপাতা খায়ও অনেকে— এমনি কাঁচা অবস্থায় কিংবা ভেজে বেগুন সহযোগে। নিমপাতা যকৃৎ বা লিভারের (liver) পক্ষে উপকারী। নিমডাল ভেঙে দাঁতে চিবোয় মানুষ, এতে দাঁত ভালো থাকে। আরোগ্যকারী কবিরাজরা এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, বাড়ির পাশে এমন গাছের অবস্থানে বিজ্ঞজনেরা খুশি হয়ে নিমের হাওয়ার কার্যকারিতার কথা বলেন। একে কেটে না ফেলে সংরক্ষণের কথা বলেন তাঁরা।

এর অব্যবহিত পরবর্তী দ্বিতীয় অংশ তিনটি লাইনে দেখা যায়, *নিমগাছ* উপকারী, কিন্তু অবহেলিত। এই গাছকে কেটে ফেলা না হলেও, যত্ন করে না কেউ। গাছের চতুর্দিকে আবর্জনা জমতে থাকে। আবার কেউ *নিমগাছ*-এর চারপাশটা শান দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে, সেই শান বাঁধানো অবস্থাও আর একরকমের 'আবর্জনা'রই নামান্তর। এই অংশে লক্ষ করা যায়, হিতকারী হওয়া সত্ত্বেও *নিমগাছ* কেবল অবহেলিতই নয়, যোগ্যের প্রাপ্য মর্যাদা পায় না বলেও সে নিষ্ফল।

এবার তৃতীয় অংশের সাত/আটটি[১] লাইনে ঘটে এক অপূর্ব অবস্থান্তর। *নিমগাছ*-এর সামনে এক নতুন মানুষ এসে দাঁড়ায়। তার চোখে মুগ্ধতা। সে *নিমগাছ*-এর ছাল তুলল না, পাতা ছিঁড়ল না, ডাল ভাঙল না। কেবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে *নিমগাছ*-এর দিকে তাকিয়ে থাকল। *নিমগাছ*-এর পাতার রূপে, থোকা থোকা ফুলের বাহার-সৌন্দর্যে তার মুগ্ধতা যেন নিঃশেষিত হওয়ার নয়। পাতা আর ফুলে পূর্ণ *নিমগাছ*-কে দেখে তার মনে হয়, নীল আকাশ থেকে যেন এক ঝাঁক নক্ষত্র সবুজ সায়রে এসে মিশেছে। এভাবে যে দেখে, সে আরোগ্যকারী কবিরাজ নয়, আসলে সে কবি। তার অবলোকনে ছাল-পাতা-ডাল-ফুল-হাওয়া কিছুই বাদ পড়ে না। *নিমগাছ*-এর বাইরের রূপ ও ভেতরের স্বরূপ তার কল্পদৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে দেয়। ক্ষণমুহূর্তে বাইরে ও ভেতর থেকে সে *নিমগাছ*-কে সম্পূর্ণ করে দেখে, প্রশংসা উচ্চারণ করে চলে যায়।

এরই পরে এসেছে চতুর্থ অংশ অর্থাৎ দুটি অথবা তিনটি লাইন।[২] *নিমগাছ*-এর নিজের কথা এসেছে: তার ইচ্ছে সেই নতুন ধরনের লোকটার সঙ্গে সে চলে যায়। কিন্তু ইচ্ছে হলেও সে নিরুপায়। তার শিকড় মাটির ভেতরে অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে। তাই তাকে বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

আর সব শেষে রয়েছে অমোঘ অব্যর্থ শেষের লাইনটি: ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

এবার বলি, *নিমগাছ*-এর ছত্রগুলিকে দৃশ্যত কবিতার মতো করে সাজানো হলেও *নিমগাছ* ছোটগল্প। ইতিপূর্বে মূল লেখাটিকে ধরে পরপর পাঁচটি অংশে *নিমগাছ*-এর বিষয়ের কথা বলেছি। দেখেছি, প্রথম অংশে *নিমগাছ* উপকারী, দ্বিতীয় অংশে *নিমগাছ* উপকারী হলেও অবহেলিত। সেখানে যোগ্যের অমর্যাদা তথা নিষ্ফলতা। তৃতীয় অংশে কবিদৃষ্টিতে *নিমগাছ*-এর বাইরের নয় কেবল, অন্তঃস্বভাবকে ধরে কল্পসৌন্দর্যের যে মর্যাদার রূপ নির্মাণ, যে সমগ্রত্ব, চতুর্থ অংশে মর্যাদামণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তার অসমর্থ-অসহায়তা, ব্যর্থতা, নিরুপায়ত্ব অর্থাৎ এক্ষেত্রেও সে-ই পূর্বের নিষ্ফলতা। প্রথম অংশে তার সদর্থক (Positive) প্রসঙ্গ বা পুঞ্জগুলো (যেমন ছাল-পাতা-ডাল-ফুল-হাওয়া)-র মতো দ্বিতীয় অংশের নঞর্থক (Negative)-বোধক অ'যত্ন' ও 'আবর্জনা'র মধ্যে দণ্ডায়মান *নিমগাছ*-এর যে অবহেলিত রূপ তা পরিণাম-অভিমুখী, অথবা বলা যায় পরিণামী-চেতনার (দুর্দশাগ্রস্ত গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউ) দিকে তাকিয়ে সদর্থক ও নঞর্থক পুঞ্জ বা প্রসঙ্গগুলি উভয় অংশেই হয়েছে নির্বাচিত। আরো বলতে পারি, পূর্ববর্তী ভাবনার (যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ) এভাবে চরম রূপ (Climax) পাবে পঞ্চম অংশে সমাপ্তি বাক্যে এসে। চরমেই সমাপ্তি[৩] এবং দেখা যাবে এই সমাপ্তিতে করুণ অপচয়ের বোধ থেকে *নিমগাছ* ও উদ্দিষ্ট *বউটার* সাদৃশ্যের ধারণায় এগল্পের প্রতীতি (Impression) উদ্ভাসিত হয়েছে।

লক্ষণীয় গল্পের পঞ্চম অংশ বা শেষ বাক্যের *বউ* হল উপমেয় বা বাচ্য বা লক্ষ্য, আর তার আগের অংশ হল উপমান বা উপায় বা উপলক্ষ্য। এখানে রূপকের মাধ্যমে তাৎপর্যময় ব্যঞ্জনা হল জীবনের (বধূজীবনের) করুণ অপচয়। লক্ষ করা যাবে, উপমানের (*নিমগাছ*)

পরিমাণ এলেখায় বেশি, উপমেয় *(বউ)* একেবারেই কম। সংক্ষিপ্ত উপমেয় বিস্তৃত উপমানের (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে দ্র.) মাধ্যমে পরিস্ফুট, উপমেয়ের প্রকাশ তাই শুধু রূপক নয় (উপমান-উপমেয়তে অভেদ আরোপ), উপমেয় (বধূ) তাই সাংকেতিক (কারণ সংক্ষেপে ব্যঞ্জিত বিরাট)। এভাবে শুধু কবিতার মতো ছত্রের বিন্যাসগত দৃশ্যরূপই নয়, গল্পের শরীরী রূপের ভেতরেও কবিতার লক্ষণ প্রকটিত হয়ে উঠেছে যেন। অর্থের দিক থেকে *নিমগাছ*-এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে অভিধা-লক্ষণার চেয়ে ভাষা হয়ে উঠেছে ইঙ্গিতময় অর্থাৎ ব্যঞ্জনানির্ভর। আবার গল্প যখন Suggestive হয়ে ওঠে তখন সে নির্ভর করে Suggestion বা ব্যঙ্গে বা ব্যঞ্জনার ওপর। রূপক-সাংকেতিক গল্পও প্রতীতিতে তার বাস্তব অভিধাকে দান করে বিশাল তাৎপর্য। *নিমগাছ*-এ তাই হয়েছে।

এভাবে কোনো লেখায় গল্প ও কবিতার ভেদাভেদ প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সেই সমস্ত লেখায় শরীরী রূপে গদ্যের ছোট বড় ছত্রবিন্যাস কবিতার কথা মনে করায় যেমন, সেরকমই আবার সেখানকার সজ্জিত কথাসমূহতে আখ্যানের সামান্য কিংবা অসামান্য স্পর্শ ও অনুরণনও লেখাকে কাব্যের জলাভূমি থেকে নিয়ে চলে যায় গল্পের স্থলভূমির কূলে। বনফুল *নিমগাছ*-এর মতো ছত্র সাজিয়ে আরো একাধিক লেখা লিখেছেন। যেমন 'মানুষ', 'পাঠকের মৃত্যু', 'সংক্ষেপে উপন্যাস'[৪] আমরা এগুলির কোনোটিকেই *নিমগাছ*-এর সমগোত্রীয় বলছি না। বলতে চাইছি, দৃশ্যত কবিতার মতো বিন্যস্ত গদ্য-শরীরে কবিতার তরঙ্গভঙ্গ পরিণাম-স্বভাবী কাহিনি বা আখ্যানের তটভূমির স্পর্শ পেয়ে প্রতীতি ব্যঞ্জনার সমন্বয়ে শেষে হয়ে ওঠে বিরল প্রজাতির ছোটগল্প। এরকম আর একটি উদাহরণ উপস্থাপন করে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করতে চাই।

বনফুল কবিতা লিখলেও[৫] তাঁর প্রতিষ্ঠা কথাসাহিত্যিক হিসেবে, বিশেষত ছোটগল্প সৃষ্টিতে তিনি অনবদ্য। অন্যদিকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্যনির্ভর কথাসাহিত্য[৬] রচনা করে থাকলেও তাঁর স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা কবিতা রচয়িতা হিসেবেই। তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একটি বই হল *যত দূরেই যাই* (১৯৬২)। এই কাব্যের অন্তর্গত কবিতা বলে পরিচিত *কেন এল না* নামে একটি লেখাকে আমরা *নিমগাছ*-এর মতোই ছোটগল্প বলতে চাইছি।

কেন এল না -তে মোট বাহান্নটি ছত্র। ছেলে-মা সেইসঙ্গে বাবার কথা রয়েছে লেখায়। ঘরের মধ্যে সারাদিনের নেচে নেচে বেড়ানো ছেলেটাও লক্ষ করেছে রাস্তার আলো জ্বলেছে অনেকক্ষণ, অথচ তখনও পর্যন্ত তার বাবা ঘরে ফেরেনি, কেন, সামান্য কৌতূহল ও মৃদু উদ্বেগ নিয়ে সে কথা জিজ্ঞেস করে ছেলে তার মাকে। মাইনে নিয়ে সকাল সকাল ফিরবে বলে গিয়েছিল যে মানুষ, আসন্ন পুজোর কেনাকাটা এইবেলা সেরে ফেলতে হবে বলেছিল যে মানুষ, সে-ই মানুষ (বাবা) না ফেরায় মায়ের মধ্যেও প্রথমে সামান্য অনুযোগ যেন, এরপর মা-ও বেশ উদ্বিগ্ন। ঈষৎ অস্থিরতা-অন্যমনস্কতায় রান্নার কড়াইর গায়ে মায়ের খুন্তির বেশি নড়াচড়া— এটা অন্যমনস্কতা ও উদ্বেগকে বুঝিয়ে দেয় যেমন, সেরকমই ফ্যান গালতে গিয়ে পায়ে উত্তপ্ত ফ্যান পড়ে যাওয়া (পা পুড়ে যাওয়া) যেন কোনো কিছুর পূর্বাভাস।

এর মধ্যে ছেলেটা বাবার ফেরার পথ চেয়ে জানালার দিকে মুখ করে বই নিয়ে বসে। ঘড়ির টিকটিক শব্দ, কল থেকে জল পড়ার বিবরণ প্রসঙ্গের মধ্যেও বাড়ির পাঁচিল থেকে একটা গোঁফঅলা বেড়ালের লাফ দিয়ে নামাটাও কোনো কিছুকে আগাম সংকেত করছে যেন। বইয়ের পৃষ্ঠায় অনড় অক্ষরগুলোও কেবলই হিজিবিজি, অনেকটা এই বাবার আদুরে একগুঁয়ে অবাধ্য ছেলের মতো। যতক্ষণ পর্যন্ত তার পুজোর জামা না কেনা হচ্ছে, ততক্ষণ পড়ার জায়গা না ছেড়ে

কোত্থাও সে নড়বে না। কিন্তু দীর্ঘকালীন প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়। *বাবা কেন এল না, মা*— এই জিজ্ঞাসায় সে মা-কে আরো উদ্বিগ্ন আকুল করে তোলে।

কখন, কোন কালে রান্না শেষ করে, স্নান সেরে মা তখন (উল) বুনতে বসে কেবলই ঘর ভুল করছে। এবারে খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ। মায়ের জিজ্ঞাসা, *কে?* ছেলের উত্তর, *মা, আমি খোকা।* এই কথোপকথনের পর মা-ছেলের আর কোনো কথা নেই। এবার ক্রমাগত কেবল কাজ বা ক্রিয়ার (action) উল্লেখ। গলির দরজায় ছেলেটা গিয়ে দাঁড়ায়, রেডিও-তে তখন খবর হচ্ছে। সেই মানুষ (বাবা) তখনও কেন ফিরে আসে না। একটু এগিয়ে দেখবে বলে গলি ছেড়ে ছেলেটা রাস্তায় পা দিল। রাস্তার মোড়ে ভিড়, পুলিসের কালো গাড়ি, আর বাজি ফাটার মতো শব্দ ভেসে আসছে। 'কিসের পুজো আজ ?'— কৌতূহলবশত ছেলেটা দেখে আসতে গেল। তারপর অনেক রাত্তিরে, বারুদের গন্ধে-ভরা রাস্তা, অনেক অলিগলি ঘুরে ঘরে ফিরে আসে বাবা। কিন্তু 'ছেলে এল না॥' মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে জীবনে ফিরে আসা বাবার বিপরীতে জীবনের পাশ কাটিয়ে মৃত্যুর দিকে যাত্রা ছেলের। শেষপর্যন্ত তাই বাবার ফিরে আসার স্বস্তিটুকু বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত এখানে স্বস্তির বিপ্রতীপে দণ্ডায়মান যেন মূর্তিমান ভয়ংকরত্ব। এই ভয়ংকরত্বকে প্রকাশ করা হচ্ছে অস্থিরতা-উদ্বেগ-আততি (Tension)-অন্যমনস্কতা-প্রতীক্ষার ক্লান্তি-বিষণ্ণতা ইত্যাদি mood দিয়ে। মা এবং ছেলের বাবাকে নিয়ে অস্থিরতা-উদ্বেগ-আততি এগুলি ক্রমবর্ধমান ও ক্রমোচ্চ হতে থাকে। লক্ষণীয় আবার, ক্রমাগত ঐকান্তিক উদ্বেগ যা শুভ নয় কখনোই, এই অশুভময়তার বেশ কয়েকটি মুহূর্ত সংকেতে ইঙ্গিতবাহী। অশুভময় সংকেতময়তার নমুনা এরকম: পা পোড়া, গোঁফঅলা বিড়াল, কালো গাড়ি, বাজি। এরকম প্রসঙ্গসহ ঘটনা-চিত্রকল্প-বস্তু আপাতত যাইহোক, শেষপর্যন্ত ভয়ংকর। উচ্চারিত দু-একটি সংলাপে (ক. এখনও বাবা কেন এল না, মা? খ. বলে গেল মাইনে নিয়ে সকাল-সকাল ফিরবে। পুজোয় যা কেনাকাটা এইবেলা সেরে ফেলতে হবে। ইত্যাদি। গ. বাবা কেন এল না, মা? ঘ. কে? ঙ. মা, আমি খোকা)-স্বগত ভাবনায় (মানুষটা এখনও কেন এল না) সবসময় 'না' এই নঞর্থক দ্যোতনা; সবশেষে যখন সদর্থক বক্তব্য আসে ('বাবা এল') তখন তা বস্তুত নঞর্থক হয়ে গেছে। লক্ষণীয়, লেখায় প্রসঙ্গগুলির দ্রুত পরিবর্তন বা অস্থির বিন্যাস [কখনো ছেলে ও মার বিবরণ, মা বা ছেলের কথা (সংলাপ) বা ভাবনা, পরিপার্শ্ব (ঘড়ির টিকটিক শব্দ, কলে জল পড়ার শব্দ কিংবা খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ, রাস্তার মোড়ে ভিড়, কালো গাড়ি, বাজি ফাটার মতো শব্দ, বারুদের গন্ধ-ভরা রাস্তা ও অলিগলির ঘুরপথ) নিয়ে বিবরণ] সমস্ত শান্তি শৃঙ্খলাকে যেন বারবার বিপর্যস্ত করে দেয়। মোটকথা একটা ভয়ংকর নঞর্থক বোধকে প্রথম থেকে নানা উপায়ে বিন্যাস করতে করতে শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়েছে।

একদিকে এরকম লেখা একধরনের আখ্যানধর্মী Narrative Poetry, অন্যদিকে Poetry of statement বা বিবৃতিধর্মী কবিতা। আবার mere narration (নিছক বর্ণনা) and mere statement of facts (নিছক বাস্তবতার বিবৃতি) কবিতা হয়ে ওঠে কীসের জোরে, এটার প্রমাণ হতে পারে এই লেখা। তাহলেও একদিকে ঘটনাপ্রবাহে ব্যাপক ঘাত সৃষ্টিতে তাতে নাটকীয়তা সৃজন, অন্যদিকে Poetic Diction বা কাব্যিক উচ্চারণে একটি নির্দিষ্ট স্থানের ও অতিনির্দিষ্ট সময়ের আবেষ্টনীতে বদ্ধ সংকটপূর্ণ জীবনভাবনার একতম সত্যকে নানা বিবৃতি-দৃশ্যের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটন। কৌতূহল-অসন্তোষ-অস্থিরতা-উদ্বেগ-আততি-অন্যমনস্কতা ক্রমোচ্চ মা এবং ছেলের বাবাকে নিয়ে; বারংবার এরই ঐকান্তিক প্রাধান্য, যা শুভ নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বর্ণনা-বিবৃতিগুলি এক একটি ভাবনার ছবি— এদেরই সমবায়ে পরিণামে মূল ভাবনা উদ্রিক্ত।

এভাবে লক্ষ করা যাবে অশুভময়তার ক্রমিক প্রাধান্য, তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে বাবা ফিরে এলেও তা অশুভবোধে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

উল্লেখপঞ্জি:

১. বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, সন্ধ্যা প্রকাশনী-র দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৮৭-তে এই অংশটি আট লাইনের। আবার চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৬-এ এই অংশ সাত লাইনের।

২. চতুর্থ অংশেও আগের মতো গরমিল রয়েছে।

৩. Once the impression is delivered the story is all over. That is why the desired effect is nearly always produced in the climax at the end. - J. Maichael, SHORT STORY WRITING for PROFIT, HUTCHINSON & CO. PATERNOSTER ROW, E.C., London, Sixth edition published: September, 1925, p. 9.

৪. বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প দ্রষ্টব্য।

৫. কবিতা, কথিকার রচয়িতা হিসেবে সম্ভবত প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় বনফুলের আত্মপ্রকাশ ১৯২৯-এ। পরে শনিবারের চিঠি-র দলে ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারোডি রচয়িতা হিসেবেও তাঁর ক্রমপ্রকাশ।

৬. হাংরাস, অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ প্রভৃতি।

ঔপনিবেশিক পর্বে ঢাকাই মসলিন ও পূর্ব বঙ্গের কাতান : বাণিজ্যিক পর্যালোচনা

সুদীপ্ত সেন
গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: ঢাকা বাংলার প্রাচীন জনপদ। মুঘলদের হাত ধরে ঢাকার গরিমা বৃদ্ধি হয়েছিল। যেহেতু ঢাকা ছিল ঔপনিবেশিক পর্বের বাণিজ্যকুঠি, তাই ঢাকাকে কেন্দ্র করে রপ্তানি ও আমদানি বানিজ্য তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিলো। ঢাকা নাম এলেই মসলিনের নাম চলে আসে। দরবারী চাহিদায় একটা সময় মসলিনের কদর ছিল দারুন। ইউরোপের মহিলারা অনেক সময় সৌন্দর্য প্রদর্শনের পোশাক হিসাবে মসলিন বস্ত্র পরিহিতা হত। বাংলার মসলিন নস্যির কৌটোর মধ্যে সমাহিত হয়ে যেত। সারারাত সবুজ ঘাসে মসলিন ফেলে রাখলে সকালে খালি চোখে মসলিন ও ঘাস পৃথক করা মুশকিল হতো। মসলিনের প্রকারভেদ অনুযায়ী মসলিনের চাহিদা ছিল। মধ্যযুগের পর্যটক থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বহু বিদেশী তাদের লেখায় মসলিনের কথা ও গুণ বর্ণনা করেছেন। বহু বিদেশী সংস্থা মসলিনকে কেন্দ্র করে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করেছে। এর সাথে ছিল বাংলার কাতান শাড়ি। এর চাহিদা ও বুনন পদ্ধতি মসলিনের থেকে কম ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্যে এর ভুমিকাও বেশী ছিল। ইংরেজ আগমনের পর থেকে পূর্ব বাংলার মসলিন ও অন্যান্য তাঁত বস্ত্রগুলির নির্যাস ইংরেজরাই ভোগ করতে থাকে। মসলিনের কদর কমানোর পশ্চাতে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র কম ছিল না। দেশ ভাগ থেকে নতুন পর্ব, এতো কিছুর মধ্যেও মসলিন ও অন্যান্য বস্ত্র সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।
সূচক শব্দ: মসলিন, গুটি, মাকু, কাতান, চরকা, নলি, সানা।

মূল আলোচনা:
তখন ভারত বিভাজিত হয়নি, মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল। সমগ্র বাংলা ছিল ভারতের প্রাণকেন্দ্র। বাংলার অন্যতম প্রাচীন নগর ছিল ঢাকা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল এই ঢাকা। মুঘল সেনাপতি ইসলাম খান, মুঘল-ই- আজম জাহাঙ্গীরের নামানুসারে এই ঢাকার নাম পরিবর্তন করেছিলেন, রেখেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর।[১] পরবর্তী সময় ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে কিছু চিঠিপত্রে জাহাঙ্গীরনগর নামটি পাওয়া যায়। তবে একটা বিষয় পরিস্কার করে দেওয়া ভাল, বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর প্রধান ঢাকা শহরের একটি পার্শ্ববর্তী স্থান। ঢাকা শহর থেকে ৩০ মিনিট দূরত্বের একটি সাজানো গোছানো পরিবেশ। সেই যুগের জাহাঙ্গীরনগর আর আজকের ঢাকা পার্শ্ববর্তী জাহাঙ্গীরনগরের মধ্যে অবশ্যই একটা সংযোগ বিরাজমান।[২]

ঢাকা শহরের নাম এলে তার সাথে চলে আসে মসলিনের নাম। ঢাকা মানেই মসলিনের শহর। অনেকে বলেন যে, মসলিন শব্দটির উৎপত্তি পার্সি ভাষা থেকে। এবিষয়ে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল করিম। তাঁর মতে পুরানো দিনে ইরাকে 'মুসল' নামে একটি বিখ্যাত বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। এখানে বহির্বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বস্ত্র আসতো এবং ক্রয় বিক্রয় চলত। এখানে যে অতি সুক্ষ বস্ত্র পাওয়া যেত, ব্রিটিশরা সেগুলিকে মসলিন বলত। তাঁর মতে এটি ব্রিটিশদের দেওয়া শব্দ। যাহাই মসলিন তাহাই সুক্ষ বস্ত্র। অর্থাৎ দেশের

যে প্রান্তে যে সুক্ষ বস্ত্র পাওয়া যায় তাহাই মসলিন। পরবর্তী সময় মসলিন বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট প্রকারের বস্ত্রের জন্য নামাঙ্কিত হল। প্রাচীন যুগে ইবন বতুতাও পূর্ব বঙ্গের সোনারগাঁও ভ্রমণের সময় সুক্ষ ও সুন্দর সুতি বস্ত্রের উল্লেখ করেছিলেন। পূর্ব- বঙ্গের সিল্ক বস্ত্রেরও তিনি নান্দনিক প্রশংসা করেছেন। ঢাকার পার্শ্ববর্তী সুবর্ণগ্রাম (বর্তমান সোনারগাঁও), টিটবাদী, ধামরাই জঙ্গলবাড়ি প্রভৃতি জায়গাগুলি মসলিনের জন্য বিখ্যাত।[৩]

ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নানা ধরনের উৎকৃষ্ট মসলিনের নাম পাওয়া যায়। আমরা নানা বই থেকে বহু ধরনের মসলিন বস্ত্রের নাম পাই। নাম গুলো একবার সংক্ষিপ্তভাবে শুনে নেওয়া যাক। **মলবুল খাস** – সর্বাপেক্ষা সুক্ষ মসলিন ছিল এটি। মুঘল দরবারী মসলিন হিসাবেই এর খ্যাতি ছিল বেশী। **মলমল খাস** – বাহাদুর শাহের পরবর্তী পর্বে দরবারী চাহিদা ক্রমশ কমে যায়, তখন মলবুল খাসের বিকল্প হিসাবে মলমল খাস বুনন শুরু হয়। **শবনম খাস** – এটি এত পাতলা ছিল এবং এতো শুভ্র ছিল ঘাসে বিছিয়ে দিলে খালি চোখে মসলিনের পৃথকীকরণ অসম্ভব ছিল। **নয়ন সুখ** – এটি শুভ্র বস্ত্র, কিন্তু গলায় পরিধান করা হতো।[৪] **আব-ই- রওয়ান** - এটি নকশা বিহীন সাধারণ মসলিন। **বদন খাস** – পার্সি শব্দ থেকে এমন নাম এসেছে। এটি দিয়ে সুক্ষ জামা তৈরি করা হতো। **শির বন্ধ** - মাথার পাগড়ী পড়ার জন্য এই মসলিনের তৈরি হত। **সরবতি** নামে আর একটি মসলিনের তৈরি হত একি উদ্যেশ্যে। **চারকোনা** – ছক আকারে নক্সা কাটার জন্য এই মসলিনের এমন নাম। **কাশিদা খাস** – এই মসলিন মুলত তৈরি হত তসরের সুতো দিয়ে।[৫] **ঝুনা** – মার্কস টেলরের মতে একদম সুক্ষ ভাবে এটির বুনন হত। মাকড়সার জালের মতো দেখতে ছিল এই মসলিন। **জামদানী** – বর্তমানেও এই ধরনের মসলিন সব থেকে বেশী বিক্রিত হয়। জামদানী প্রকৃত অর্থে এক উন্নত মসলিন। যার বুনন পদ্ধতি এবং নকশা অনেকটাই মৌলিক। যদিও এই মসলিনের প্রকারভেদ এবং সেই সংক্রান্ত সুত্র নিয়ে একটি সমগ্র অধ্যায় আলোচনা করা যেতে পারে, তবে এখানে সেটি অপ্রাসঙ্গিক। সংক্ষিপ্ত ধারণা বাঞ্ছনীয়।[৬]

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লন্ডনে কিংবা ইউরোপের নানা প্রদর্শনীতে বাংলার মসলিন এবং জামদানী শাড়ি পরিহিতা নারী শোভিত হত। জামদানী শাড়ি মানেই অত্যধিক নকশাযুক্ত শাড়ি। আমি কিছুদিন আগে ঢাকা কলেজের সম্মুখের মার্কেটে বড়ো বড়ো বস্ত্রের দোকানে ঢাকার তৈরি জামদানীর অনেক সংগ্রহ লক্ষ্য করেছিলাম, যেগুলির সাধারণ মূল্যই বাংলাদেশের মুদ্রায় ১০০০০ টাকার অনেক বেশী। যে বস্ত্র যত নকশায় অলঙ্কৃত তার মুল্য ধরাছোঁয়ার বাইরে। একটা বিষয় কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে, মসলিন সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। মসলিন ছিল এবং এখনো আছে শুধুমাত্র বনেদী পরিবারের জন্য। উদাহরণ দেওয়ার উদ্যেশ্য একটাই, মসলিন সাধারণ তাঁতিরাই বুনন করে, কিন্তু তাদের বাড়ীর মহিলারা এই শাড়ীতে কায়া আবৃত করতে অপারগ। শুধু বুনন কর্ম তাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা।

এবার আসা যাক, মসলিন উৎপাদনে কারা কিভাবে কর্ম সম্পন্ন করতো। মসলিন মানেই সুক্ষ সুতো, যেগুলি কাটার জন্য মূলত মেয়েরা কাজ করতো।[৭] যেহেতু বয়স্কা মহিলাদের দ্বারা এই সুক্ষ কাজ সম্পন্ন অসম্ভব ছিল, এই এই সুতা কাটুনির দায়িত্বে থাকতো তরুণীরা। যেহেতু হাত ও খালি চোখে এই সুক্ষতার অনুভূতির প্রয়োজন ছিল, তাই এই কাজে তরুণীরা পারদর্শী ছিল। আবার মধ্যযুগে এমনও শোনা যায় যে, পুরুষ মানুষরা বস্ত্রের জন্য সুতা কাটার কাজকে পেশাগত পুরুষত্বে আঘাত বলে মনে করতো। মসলিন বস্ত্রের জন্য ব্যবহিত সুতো ছিল উন্নত মানের কার্পাস তুলো। আমরা জানি নদীবহুল এলাকা মানেই সেখানে কার্পাস তুলো ভালো

মাত্রায় উৎপাদিত হবে। পূর্ববঙ্গের মেঘনা ও পদ্মার তীরবর্তী এলাকায় উন্নত মানের কার্পাস চাষ হতো। ঢাকা শহরের কিছুটা দূর দিয়ে বয়ে গেছে বুড়ি গঙ্গা নদী। এই নদীর তীরবর্তী জমিগুলিতে ভালো মানের কার্পাস চাষ হতো। এই উন্নত কার্পাস উৎপাদন হতো বলেই মসলিন ছিল উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানের। কাপাসিয়া, নউপারা, সোনারগাঁও, ডেমরা প্রভৃতি স্থান উন্নত কার্পাস চাষের এলাকা নামে পরিচিত ছিল। ধামরাই, নবীগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় ভালো মানের মসলিন তৈরি হতো।

ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে মসলিন উৎপাদিত হতো তার একটা বাণিজ্যিক চিত্র ছিল, যা কিছুটা তুলে ধরা দরকার। তা থেকেই বোঝা যাবে মসলিনের বহির্বিশ্বে কদর কতটা। মসলিনের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদের প্রাধান্য অনেক বেশী ছিল। একটা সময় ওলন্দাজ, ফরাসীরা ঢাকায় তাদের বাণিজ্যকুঠি তৈরি করেছিলো। তাদের সাথে ইংরেজরাও ছিল। তবে পর্তুগিজরাই প্রথম বাংলার মাটিতে বাণিজ্যের স্বার্থে পা রেখেছিল। ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ কোম্পানি গুলির সাথে পরবর্তী ক্ষেত্রে পর্তুগিজরা পেরে ওঠেনি। তাই মসলিনে ব্যবসায় তাদের ভুমিকা ক্রমশ শেষ হয়ে যায়। জেমস টেলর বলেছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ওলন্দাজ বনিকরা দেশীয় গোমস্তা বা পাইকারদের কাছ থেকে মসলিন কিনে বৈদেশিক বাণিজ্য করতো। তবে মনে রাখতে হবে শুধু ইউরোপীয় বনিক সম্প্রদায় নয় অন্যান্য বিদেশী বনিকরাও মসলিনের লভে ঢাকায় তাদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ ও বাণিজ্য শুরু করেছিলো। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিল আরমেনিয় ও ইরানী ব্যবসায়ীরা। যদিও এদের ব্যবসা ছিল অনেকটাই ক্ষুদ্র প্রকৃতির। ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির মতো বৃহত্তর ব্যবসা তাদের ছিল না।

বাংলার জগত শেঠ পরিবারও এই মসলিনের ব্যবসায় নিজেদের নিয়োগ করেছিলো। তারও লভ্যাংশ কম ছিলনা। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে প্রচুর পরিমানে সুতো আমদানি করা হয়েছিল, তেমনই আবার প্রচুর পরিমাণে সুতো রপ্তানি করাও হয়েছিল। টেলর সাহেব তথ্য দিয়ে বলেছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দু ব্যবসায়ীরাই মূলত সুতি বস্ত্রের ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল। তার তথ্য অনুসারে ওই সময় বছরে ২৬ থেকে ২৭ লক্ষ টাকা উপার্জন হতো শুধুমাত্র সুতো বস্ত্র রপ্তানি করে। এথেকে বোঝা যায় ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মসলিন উৎপাদনের প্রভাব কতখানি ছিল। বহু ছোট ব্যবসায়ী ও দালালরাও মসলিনের ব্যবসায় নিজেদের নিয়োগ করতো। যেহেতু মসলিন ছিল অন্যতম লাভজনক ব্যবসায়িক বস্তু।

ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব হলে সব থেকে বেশী প্রভাব পড়েছিল তাঁত বস্ত্রের উপর। বাংলার সর্বত্র বিলেতি কলের তৈরি বস্ত্র বাজার দখল করে নিয়েছিল। এই তথ্য আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয়, ব্রিটেনের কারখানার তৈরি বস্ত্র মসলিনের সন্মান সেভাবে নষ্ট করতে পারেনি। মসলিনের চাহিদা বহির্বিশ্বেও যথেষ্ট পরিমানে ছিল। ইংরেজ আগমনের পরেও বাহারিন, রোম, ইরাক এমনকি ইউরোপেও মসলিনের রপ্তানি হতো। এই বস্ত্রের গুণগত মান কারখানার তৈরি বস্ত্রের থেকে অনেক উন্নত ছিল। ওয়াটসন বলেছিলেন – "with all our machines and wonderful intentions we have neither to be unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the woven air of Dacca..."[৮] যেহেতু মসলিনের খ্যাতি সর্বত্র ছিল, তা ইংরেজদের কাছে ঈর্ষার অন্যতম কারণ ছিল। "দোকানদারের জাতেরা" ঠিক করে কিভাবে মসলিনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা যায়। এর পর শুরু হয় ব্রিটিশ কর্তৃক ঘোষিত নানা আইনি জটিলটা। মিশর, সিরিয়া কিংবা আফ্রিকার মতো দেশে মসলিনের রপ্তানির ক্ষেত্রে নানা নিষেধাজ্ঞা এবং বিধিনিষেধ জারি হয়। মসলিন

উৎপাদনে যাতে সমস্যা দেখা দেয়, তার জন্য বাজিতপুর, ধামরাই, জঙ্গলবাড়ি প্রভৃতি এলাকায় তাঁতিদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হত, অত্যাচারের সাথে প্রাণনাশের হুমকি এলো। তাঁতিদের জীবনে নেমে এলো আঁধার। বিভিন্ন দেশীয় বাজারে মসলিনের বিক্রয় বন্ধ করে দিল ব্রিটিশরা। উৎপাদন প্রক্রিয়াকেও তারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করলো। কার্পাস উৎপাদিত জমিগুলিতে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হল, যাতে চাষিরা বাধ্য হয় বিকল্প কৃষিকাজের জন্য। এর ফলে উন্নত মানের কার্পাস তুলো উৎপাদনেও ভাটা পরে।

পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে মসলিন উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। আসলে ঢাকা শহরটি যেমন ঐতিহ্যপূর্ণ ছিল তেমনই তার মসলিন ছিল ততটাই উন্নত। চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী এলাকা আরাকান প্রদেশ ছিল মসলিন রপ্তানির অন্যতম কেন্দ্র। ঢাকার সাথে আরাকান এলাকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুদিনের। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু পরে এই সকল এলাকায় বাণিজ্যিক পরিবর্তন আসে। মসলিনের পরিবর্তে বাজার ছেয়ে গেল বিলাতি বস্ত্রে। মসলিনের চাহিদার উত্থান ও পতনের পশ্চাতে ব্রিটিশদের কুনজর অনেকটাই প্রভাব ফেলেছিল। মধ্য যুগে যে উন্নত মানের ও সুক্ষ মসলিন বুনুন হত আজ একবিংশ শতকে এসে মসলিনে নকশার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেই সুক্ষতা মসলিন বস্ত্র হারিয়ে ফেলেছে। এখন অনেক উন্নত মাধ্যম এলেও সেই পরিমাণ দক্ষ তাঁতির অভাবও এখন লক্ষ করা যাচ্ছে। ইংরেজরা এসেছে আবার চলে গেছে তার সাথে মসলিনের মাধুর্য নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

ঐতিহাসিকরা বলছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে জামদানী শাড়ির যে পৃথক চাহিদা ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায় এদের জন্য – “In the 19th century, however, the crafts of making Jamdani began to collapse. This was mainly because of the use of machinery in the English textile industry during the industrial revolution of England. Increase in demand for Jamdani weavers caused a rise in their wages and consequently, in the price of Jamdani.”[৯]

১৯২১ এর তৎকালীন ভারত সরকারের একটা রিপোর্ট দেখলে বোঝা যাবে বাংলাদেশে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা। যেহেতু মসলিন ও কাতান সিল্ক সম্পূর্ণভাবে হস্তচালিত তাঁতে বুনন হতো তাই পূর্ববঙ্গের তাঁতের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

জেলার নাম	হস্তচালিত তাঁত	জেলার নাম	হস্তচালিত তাঁত
বগুরা	১৮৬৬	নদীয়া	৪৯২৫
পাবনা	৮৬২২	যশহর	৬৯৩২
রংপুর	৪০৫	ঢাকা	১১৭৯৮
সংযুক্ত কোচবিহার	২০৮৩	ময়মনসিংহ	১১৬২৯
খুলনা	৩৭৬২	বাখেরগঞ্জ	৬৯২৯
রাজশাহী	৪৯৭	ত্রিপুরা	৩১৪৮৫
দিনাজপুর	৩৯২৯	চট্টগ্রাম	৬৮১৮
ফরিদপুর	৭৯৬২	চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা	২৯১৯০

Gov. of India, census of India 1921, Bengal census report page; 400

কাতান: মসলিন ছাড়াও ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কাতান শাড়ীর কদর ছিল যথেষ্ট বেশী। জামদানী মসলিনের থেকে কাতান শাড়ীর জন্য যে তাঁত প্রস্তুত করতে হয়, তার ব্যয় বহুলতা অনেক বেশী। 'পালা গর্তে' পা রেখে যেভাবে আমাদের এখানে হস্ত চালিত তাঁত প্রস্তুত হয়, সেভাবেই কাতান তাঁত শুরু হয়। বস্ত্র বুননের জন্য যে পাটিতে সুতো গোটানো থাকে সেটির নকশা অনেক সময় জাপান থেকেও আমদানি করা হয়ে থাকে। এথেকেই বোঝা যায় কাতান শাড়ি কতটা উন্নত মানের ছিল। তাঁতে যে সানাটি ব্যবহিত হয় সেটিও জাপান থেকে আমদানি করা হয়। পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এই 'সানা' তৈরি হলেও তার দাম এতো বেশী যে কাতান শাড়ি বুননকারি তাঁতিরা বাইরে থেকেই এই সরঞ্জাম কিনে নিত। মূলত বেনারসি সিল্ক শাড়ি পাকানো সুতো দিয়ে তৈরি হয় বলে পূর্ব বঙ্গে এটি কাতান সিল্ক নামে পরিচিত। দামি শাড়ীগুলিতে দামি সিল্কের ব্যবহার দেখা যেত। আবার যে কাতান সিল্ক কম দামের তাতে বিকল্প হিসাবে পাতলা নাইলন ব্যবহার হতো। রেশমের সিল্ক বা সুতো আমদানি করা হত জাপান, চিন কিংবা কোরিয়া থেকে। রাজশাহীর বাজারেও এই ধরনের সুতো বিক্রি হত, তবে তার দাম একটু বেশী। ঢাকার অনতিদূরে তাঁতিরা এই কাতান শাড়ি বুননে পারদর্শী ছিল। তারা আবার বিদেশী সুতো আমদানিতেই সিদ্ধহস্ত ছিল। একটা কথা মনে রাখতে হবে নতুন বাংলাদেশ গরে ওঠার পর থেকে মিরপুরের বাজারে ভারতীয় সুতো সেভাবে প্রবেশ করতো না।

তাঁতের ক্ষেত্রে মহাজন সম্প্রদায় স্থানীয় পাইকার নামে পরিচিত ছিল। তারা অনেক সময় অসচ্ছল তাঁতিদের কাতান বুননের পূর্বে সুতো ক্রয় করার জন্য অগ্রিম অর্থ ধার দিত।[১০] এই অগ্রিম অর্থ বা দাদনের সুদ এতো বেশী পরিমাণ ছিল যে, বস্ত্র বুননের পর যে লভ্যাংশ তাঁতিদের থাকতো তার অনেকটাই চলে যেত পাইকারের ঋণ পরিশোধ করতে। জামদানীতে যেমন বুটির নকশা তোলা হয় ঠিক তেমনই কাতান সিল্কেও নকশা তোলা হয়, যা অনেকটাই সময় সাপেক্ষ। একটা কথা মনে রাখা ভালো যে, উনবিংশ শতাব্দীর পর দেখা যায় কাতান সিল্কের বেশির ভাগ রেশম গুলি মেশিনে পাকানো হতো। ভারত বিভাজিত হবার পর পূর্ববঙ্গের বস্ত্র শিল্পে ভারতীয় প্রভাব কমে গিয়েছিল। কাতানের ক্ষেত্রে দেখা যায় নানা সরঞ্জাম মেশিনেই হত। শুধু শাড়িটা বুনন হত হস্তচালিত তাঁতে। রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে সুতো মাখানোর আঠা তৈরি করা হতো। সুতো ভিজিয়ে রাখার জন্য যে রঞ্জক ব্যবহিত হতো তাও তৈরি হতো মেশিনে। মসলিনের সাথে কাতান সিল্কের তৈরির পার্থক্যটা ঠিক এখানেই। মাকুতে যে নলিটি পরানো হত তাতে চরকার সাহায্যে সুতো পাকানো হত। এই কাজটি মুলত বাড়ীর মহিলারাই করত। এতা মসলিনের সুতো তৈরির মতো এতো কঠিন ছিল না। এগুলো তাঁতি বাড়ীর মহিলারা সম্পন্ন করতো। বয়স্কা মহিলারও একাজে পারদর্শী ছিল।[১১]

যেহেতু বেনারসি বা কাতান সিল্কের কদর মূলত নকশার উপর নির্ভর করতো। উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যেত বহু তাঁতিকে নকশা তোলার জন্য কাজ শেখানো হতো। ১৯৪৭ এর পর দেখা যায় মিরপুর কিংবা ঢাকার আশেপাশে কাতানের নকশা তোলার প্রশিক্ষণ দিত এই বিষয়ে পারদর্শী মাস্টাররা। পরবর্তী সময় দেশ স্বাধীন হবার পর পাইকারদের ঋণের বেড়াজাল থেকে তাঁতিদের মুক্ত করার জন্য কাতান শিল্পীদের অগ্রিম সরকারি ঋণ বা অনেক সময় অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতে তাঁতিদের সাময়িক স্বস্তি আসে। ঢাকার পাশে নবাবগঞ্জ। শিবগঞ্জ এবং মিরপুরে কাতান সিল্ক বেশী মাত্রায় বুনন হত।[১২]

এই বস্ত্রের বাণিজ্যিক চিত্রটা কিছুটা এইরকমের – খুচরো বিক্রেতা কিংবা মহাজনরা সরাসরি তাঁতির বাড়ি থেকে এই কাতান সংগ্রহ করতো। পাইকাররা পাইকারি হারে বস্ত্র আহরণ

করত। এগুলি পাইকার বা মহাজনদের কাছে সঞ্চিত হত। তাঁতের পাইকাররা সবাই তাঁত বস্ত্রের ব্যবসা করতো। এই চিত্র প্রায় সর্বত্র একই। আপনি ফুলিয়া, ধাত্রীগ্রাম, বেগম্পুর, রাজবল হাট ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের তাঁত প্রধান এলাকায় যদি জান, চিত্র একই। পাইকার বা মহাজনদের বাড়িই তাদের বস্ত্রের বিপণন কেন্দ্র। পূর্ব বঙ্গেও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। যারা ধনী পাইকার, তাদের সাপ্তাহিক কাতান সংগ্রহের সংখ্যা ছিল ২০০ এর কাছাকাছি। বেশিরভাগই তারা বিক্রয়ে সক্ষম হতো। তাঁতির বাড়ি থেকে ৩/৪ হাত অদলবদল হয়ে একটি শাড়ীর দাম পৌঁছাত আকাশ ছোঁয়া স্তরে। পশ্চিম বাংলায় ঠিক একই উদাহরণ, যে শাড়ি সরাসরি তাঁতির বাড়িতে কিনলে ৮০০ টাকা ভারতীয় মুদ্রা খরচ হয়, একই শাড়ি কোন মল বা তন্তুজের মতো আধা প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র গুলি থেকে ক্রয় করলে দাম দাঁড়ায় ১২০০ মুদ্রার থেকেও বেশী। এ সব কিছুই হাতবদলের ফলশ্রুতি। দুই বঙ্গের চিত্র প্রায় এক। একটি শাড়ীর মোট দামের ২০ শতাংশ বা ততোধিক মুনাফা মধ্যস্বত্ব ভোগীরাই গ্রাস করে নেয়। বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পরেও ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কাতান যুক্ত রাষ্ট্র ও জার্মানিতে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হত। তবে এর বাজার এলাকা ছিল সীমিত।[১৩]

বাংলাদেশী কাতান শিল্পীদের কাছে একটা সময় সব থেকে বড়ো প্রতিযোগিতা হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের বেনারসি শাড়ি। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ভারত থেকে দামি ও সুক্ষ বেনারসির প্রবেশ ঘটাত ঢাকা, মিরপুরের বাজারে। অনেক সময় ভারতীয় বস্ত্রের থেকে গুনমান কমে যাওয়ার কারনে এপার বাংলার ব্যবসায়ীরা পূর্ব বঙ্গের কাতানকে ভারতীয় বেনারসি বলে বিক্রি করতো। বিভিন্ন অসম প্রতিযোগিতার মধ্যেও পূর্ব বঙ্গের কাতান শাড়ি তার মাধুর্য হারায়নি, কখন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে তো কখন নিজের গরিমায় মাথা উঁচু করেছে।

তথ্যসূত্র:

১। মামুন মুন্তাসির, ঢাকার মসলিন, সুবর্ণ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা. ৯

২। গবেষণা সুত্রে নিজ ভ্রমণ কালীন অভিজ্ঞতা।

৩। মামুন মুন্তাসির, ঢাকার মসলিন, সুবর্ণ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা. ১১-১২

৪। করিম আবদুল, ঢাকাই মসলিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা. ৪৬-৫০,

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৫২

৬। দাস সুজিত, বাংলার তাঁতি ও তান্তশিল্প, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৪, পৃষ্ঠা. ১০৬-১০৭,

৭। মামুন মুন্তাসির, ঢাকার মসলিন, সুবর্ণ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা. ২১-২২,

৮। হক সৈয়দ লুতফুল, হাজার বছজরের ঢাকাই চিত্রকলা ও ঢাকাই মসলিন, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা. ৭৭

৯। মজুমদার সমর, সম্পাদনা, জামদানী নকশা, খান ব্রাদারস এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা. ৮-৯

১০। হক মোহম্মদ মজাম্মেল, বাংলার তাঁত শিল্প ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০২০, পৃষ্ঠা. ৪৬

১১। আহমেদ তফায়েল, ঢাকার বাণিজ্য চারুকলা; চামড়া; কাতান, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯১ পৃষ্ঠা. ৬

১২। প্রাগুক্ত – পৃষ্ঠা. ৪০

১৩। প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা. ৫০

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা:

১। কোম্পানি আমলে ঢাকা, জেমস টেলর, অনুবাদিত গ্রন্থ, মোহম্মদ আসাদুজ্জামান, অবসর প্রকাশনী ঢাকা।

২। বাংলা দেশের তান্তশিল্প, শাওন আকন্দ, দেশাল প্রকাশ, ঢাকা।
৩। বাংলার তাঁত, আদিত্য মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা কলকাতা।
৪। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, আনন্দ কলকাতা।
৫। তাঁত ও জাহাজ শিল্পে বাঙালি, আর এম দেবনাথ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

বিশেষ স্বীকৃতির বিপক্ষে যুক্তি এবং এর সমাধান

প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্ত্তী
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ

সারসংক্ষেপ: বিশেষ পদার্থটি একটি অভিনব পদার্থ। কেবলমাত্র বৈশেষিক দর্শনে (পরবর্তীকালে নব্য ন্যায়ে) এই পদার্থটি স্বীকৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য বৈশেষিক দর্শনে বিশেষের গুরুত্ব এতটাই যে বৈশেষিক নামকরণের মূলেও রয়েছে বিশেষ পদার্থ। এখন, দেখা দরকার, কী এই বিশেষ এবং কী তার ভূমিকা? বিশেষ বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত পঞ্চম পদার্থ যার মূল কাজ ব্যাবৃত্তি করা। বিশেষ নামক পদার্থটি নিত্য দ্রব্যে থেকে দুটি নিত্যদ্রব্যকে একে অপরের থেকে ব্যাবৃত্ত করে। এবং নিজেকেও অন্য নিত্য দ্রব্যে স্থিত বিশেষ হতে ব্যাবৃত্ত করে। এই আলোচনাটি মূলত একটি গবেষনাধর্মী আলোচনা, যেখানে বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত বিশেষ পদার্থটি খন্ডনের উপলক্ষে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় উল্লিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হবে। এবং ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় এই সকল পূর্বপক্ষকে কিভাবে নিরস্ত্র করেছেন তা দেখানোর চেষ্টা করা হবে।
সূচক শব্দ: বিশেষ, ন্যায়, বৈশেষিক, ব্যাবর্তক, পরমাণু।

মূল আলোচনা:

কোন বস্তুর ব্যবহারের জন্য সেই বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। বস্তুটির যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্য বস্তুটিকে যেমন সজাতীয় বস্তুগুলির সঙ্গে অনুগতভাবে বুঝে নিতে হয়, তেমনই আবার বিজাতীয় বস্তুগুলি থেকে ভিন্ন করে বা পৃথক করেও বুঝতে হয়। বস্তুগুলির পরস্পর ভেদক সাধারণত বস্তুগুলির অবয়ব বা তাদের সংস্থান, গুণ, জাতি, কর্ম প্রভৃতি হয়ে থাকে, যেমন - দুটি টেবিলকে পৃথক করতে পারি তাদের অবয়বের দ্বারা, একটি লালফুলকে নীলফুলের থেকে পৃথক করতে পারি গুণের দ্বারা, আবার মনুষ্যত্ব দিয়ে মানুষকে পশু থেকে পৃথক করতে পারি। বৈশেষিক বলেন, এমন কিছু স্থল আছে যেখানে দুটি বস্তুর মধ্যে উপরোক্ত ভেদগুলি উপলব্ধ নয়, অথচ বস্তুগুলির ভেদসিদ্ধির প্রয়োজন আছে, যেমন দুটি সজাতীয় পরমাণু, দুটি মুক্ত আত্মা, বা দুটি মুক্ত মন প্রভৃতি স্থলে ভেদক স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে। এই সকল স্থলে ভেদক রূপে বৈশেষিক বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেছেন। অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য বিশেষ পদার্থকে স্বতোব্যাবর্তক বা চরম ব্যাবর্তক বলা হয়েছে।

সুতরাং, 'বিশেষ' নিত্যদ্রব্যসমূহে অবস্থান করে নিত্য দ্রব্যগুলিকে একে অপরের থেকে পৃথক করে। তাই বলা যায়, ব্যাবৃত্তিই বিশেষের কাজ। কেউ বলতে পারেন, শুধুমাত্র ব্যাবৃত্তির জন্য পৃথক একটি পদার্থ স্বীকারের কী প্রয়োজন, ভেদ বা ব্যাবৃত্তি তো অন্য কোনভাবেও সম্ভব হতে পারে। ব্যাবৃত্তির জন্য অতিরিক্ত 'বিশেষ' রূপ পদার্থ স্বীকার তো গৌরবের, অথচ ন্যায় বা বৈশেষিক তো গৌরবকে দোষাবহ বলে থাকেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়, এক্ষেত্রে ব্যাবৃত্তির জন্য অতিরিক্ত একটি পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যেহেতু ব্যাবৃত্তির জন্য অন্য ভেদকগুলি কার্য্যকরী নয়। উপরিউক্ত স্থলে বিশেষই ব্যাবর্তকরূপে নিত্যদ্রব্যসমূহকে একে অপরের থেকে পৃথক করে, অন্যথা নিত্যদ্রব্যসমূহ অব্যাবর্তিত থেকে যেত।

সুতরাং বৈশেষিকগণের মতে, বিশেষ স্বীকৃতির মূল যুক্তিই হল প্রত্যেকটি পরমাণুর পারস্পরিক ভেদসিদ্ধি, কেননা জাতি, গুণ, ক্রিয়া, অবয়ব প্রভৃতি ভেদকের দ্বারা অনিত্যদ্রব্যদ্বয়ের ভেদ আমরা করতে সক্ষম হই, কিন্তু তুল্যজাতি, তুল্যগুণ, তুল্যক্রিয়াবিশিষ্ট পরমাণুদ্বয়ের বিলক্ষণ প্রতীতি সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষের অনুমান ব্যতীত সম্ভব নয়। আবার যোগীগণেরও প্রত্যেকটি পরমাণুতে 'অয়মস্মাদ্ বিলক্ষণঃ', 'অয়মস্মাদ বিলক্ষণঃ' - এইরূপ বিলক্ষণ প্রতীতি বিশেষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

আর বিশেষ যেহেতু স্বতোব্যবৃত্ত সেহেতু বিশেষ নিজেই অপর পরমাণুতে বা অপর নিত্যদ্রব্যে স্থিত বিশেষ হতে নিজেকে ব্যাবৃত্ত করতে সমর্থ, তাই বিশেষে অপর কোন বিশেষ স্বীকারেরও প্রয়োজন হয় না।

এখন, কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন, সর্বত্রই একটি পদার্থ অপর একটি সজাতীয় পদার্থ হতে ভেদসিদ্ধি অতিরিক্ত কোন একটি ভেদকের দ্বারাই হয়ে থাকে। দুটি সজাতীয় পরমাণুর পারস্পরিক ভেদসিদ্ধি হয় অতিরিক্ত একটি ভেদক ধর্ম বিশেষের দ্বারা, তাহলে দুটি পরমাণুতে স্থিত দুটি বিশেষের ভেদ স্বতঃই হবে কেন? তাতে অতিরিক্ত ভেদক ধর্মের অপেক্ষা থাকবে না কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য প্রশস্তপাদ বলেছেন- বিশেষ পদার্থের ব্যাবৃত্তির জন্য অন্য ব্যাবর্তক স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ হয় আর তাছাড়া, নিত্যদ্রব্যগুলি স্বতোব্যাবৃত্তস্বভাব নয় বলে তার ব্যাবৃত্তি জন্য বিশেষের অপেক্ষা করতে হবে; যেমন - ঘটাদি পদার্থ অপ্রকাশ স্বভাব বলে প্রকাশের জন্য প্রদীপকে অপেক্ষা করে কিন্তু প্রদীপ প্রকাশাত্মক হওয়ায় প্রদীপান্তরের অপেক্ষা করে না[১]। সেইরূপ বিশেষ পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্ত বলে সে তার নিজের ব্যাবৃত্তির জন্য অন্য ব্যাবর্তককে অপেক্ষা করে না। সুতরাং পরমাণুসমূহে নিত্যবিশেষের সম্বন্ধ হেতু ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এইভাবে বিশেষ প্রত্যেকটি নিত্যদ্রব্যকে যেমন পরস্পরের থেকে ব্যাবৃত্ত করে তেমন স্বস্বভাববশতঃ নিজেকেও অপর নিত্যদ্রব্যে স্থিত বিশেষ হতে ব্যাবৃত্ত করে, এইরূপে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' নামক অতিরিক্ত একটি পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে।

তবে ভারতীয় দর্শনে বিশেষ – প্রসঙ্গে কয়েকটি বিপক্ষ যুক্তি আছে, তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উত্থাপিত হল –

যোগীগণ প্রত্যেকটি সজাতীয় পরমাণুকে পৃথক পৃথক রূপে প্রত্যক্ষ করতে পারেন অতিরিক্ত একটি ভেদক ধর্ম বিশেষের দ্বারা, আবার, যোগীগণের বিভিন্ন সময় বা বিভিন্ন দেশে বর্তমান পরমাণুসমূহের মধ্যে 'এটি সেটিই' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও উৎপন্ন হয় একমাত্র বিশেষের দ্বারা। সুতরাং বিশেষরূপ অতিরিক্ত একটি পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য। এখন, আপত্তি করা যেতে পারে যোগসাধনাজাত বিশেষ সামর্থ্যবশতঃ যেরূপ যোগীগণ পরমাণু ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ করতে পারেন সেইরূপ উক্ত বিশেষ সামর্থ্যের দ্বারাই যোগীগণের সজাতীয় পরমাণুসমূহে ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি এবং উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা উভয়েই হতে পারে, তার জন্য 'বিশেষ' রূপ অতিরিক্ত একটি পদার্থের কল্পনার প্রয়োজন নেই।

উক্ত আপত্তিটি পূর্বপক্ষীরূপে স্বয়ং প্রশস্তপাদাচার্য তাঁর পদার্থধর্মসংগ্রহে করেছেন, আবার সমাধানে তিনিই বলেছেন, যোগীগণের যোগজধর্মের দ্বারাও অশুক্ল দ্রব্যে শুক্লের প্রতীতি কখনোই সম্ভব নয়, একইভাবে পূর্বে অনভিজ্ঞাত বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞাও যোগীদের হতে পারে না। যদি তা হয় অর্থাৎ যোগীদের শুক্ল দ্রব্যে অশুক্লের প্রতীতি এবং অত্যন্ত অজ্ঞাত বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা হয় তবে তা

মিথ্যা বা ভ্রান্ত হবে[২]। সুতরাং বিশেষ ব্যতিরেকে যোগজ ধর্ম থেকে ব্যাবৃত্তবুদ্ধির উৎপত্তি স্বীকার্য্য নয়।

দ্বিতীয়ত, বিরুদ্ধবাদীর মতে, বিশেষ স্বীকার না করেও দুটি পার্থিব পরমাণুর পৃথকীকরণ সম্ভব। যদি ধরা হয়, দুটি পার্থিব পরমাণু আছে তার মধ্যে একটি, ধ্যান্যাঙ্কুরের আরম্ভক এবং অপরটি যবাঙ্কুরের আরম্ভক ফলতঃ একটিতে ধান্যত্ব এবং অপরটিতে যবত্ব জাতি বিদ্যমান, এই জাতির দ্বারাই দুটি পার্থিব পরমাণুর ভেদ সূচিত হতে পারে।

উক্ত আপত্তিটি গৃহীত হতে পারে না, কেননা ন্যায়-বৈশেষিকগণ পৃথিবীত্ব জাতির ব্যাপ্য অর্থাৎ ধান্যত্ব, যবত্ব প্রভৃতি কোন অপরা জাতি স্বীকার করেন না। এরূপ অস্বীকৃতির মূলে রয়েছে **"দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য-ব্যাপ্যজাতেঃ পরমাণুষ্বনঙ্গীকারাৎ"**[৩] - এরূপ গুরুপরম্পরায় প্রচলিত নিয়ম। তারফলে ধান্যাঙ্কুরের আরম্ভক এবং যবাঙ্কুরের আরম্ভক উভয়বিধ পরমাণুকে পার্থিবত্ব পুরস্কারে অবিলক্ষণ বলতে হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে ধান্যাঙ্কুরের আরম্ভক পরমাণু হতে যবের অঙ্কুর এবং যবাঙ্কুরের আরম্ভক পরমাণু হতে ধান্যাঙ্কুরের উৎপত্তির আপত্তি হয়। এই আপত্তি কারণের জন্য তত্তদবিজাতীয় অঙ্কুরের আরম্ভক পরমাণুতে বিশেষ পদার্থ স্বীকার আবশ্যক হয়। এইরূপে 'বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হলে ধান্যাঙ্কুরের আরম্ভক পরমাণুতে বিশেষ পদার্থ থাকার ফলে যেরূপ বৈশিষ্ট্য থাকে, সেরূপ বৈশিষ্ট্য যবাঙ্কুরের আরম্ভক পরমাণুতে থাকে না এবং একইভাবে যবাঙ্কুরের আরম্ভক পরমাণুতে বিশেষ পদার্থ থাকার ফলে যেরূপ বৈশিষ্ট্য থাকে সেরূপ বৈশিষ্ট্য ধান্যাঙ্কুরের আরম্ভক পরমাণুতে থাকে না। ফলে ধান্যাঙ্কুরের আরম্ভক পরমাণু হতে ধান্যাঙ্কুর এবং যবাঙ্কুরের আরম্ভক পরমাণু হতে যবাঙ্কুরই উৎপন্ন হয়।

তৃতীয়ত, নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি "বিশেষ" কে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেননি। বিশেষ পদার্থ অস্বীকৃতির পক্ষে রঘুনাথ শিরোমণি যে যুক্তিটি দিয়েছেন তা হল - বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকার করে তাকে স্বতোব্যাবৃত্ত বলার চেয়ে স্বীকৃত পরমাণু আদি নিত্যদ্রব্যগুলিকে স্বতোব্যাবৃত্ত বলা হোক। নিত্যদ্রব্যগুলি স্বতোব্যাবৃত্ত হলে বিশেষের সাহায্য ব্যতিরেকেই তারা অপর নিত্যদ্রব্য হতে নিজেকে ব্যাবৃত্ত করতে পারবে, ফলে বিশেষ স্বীকারের প্রয়োজন পড়বে না।

ন্যায় বৈশেষিকাচার্য্যগণ এই আপত্তি স্বভাবতঃই মেনে নেবেন না। তারা বলতে পারেন, বিশেষ পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে কেননা যোগীগণ নিত্যপরমাণু, আকাশ প্রভৃতির ন্যায় তদগত বিশেষ পদার্থ ও প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সুতরাং বিশেষ পদার্থ যোগীগণের প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় এর অপলাপ অযৌক্তিক।

এই আপত্তির উত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন, যোগীর প্রত্যক্ষ যদি বিশেষের সাধক হয়, তাহলে শপথপূর্বক যোগীগণকে জিজ্ঞাসা করুন - তারা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও সমবায় এই পাঁচটি ভাবপদার্থ হতে অতিরিক্ত বিশেষ নামক পদার্থকে আদৌ প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা – **"এবং তর্হি ত এব সশপথং পৃচ্ছ্যন্তাং কিমেতেতিরিক্তং বিশেষমীক্ষন্তে ন বেতি"**[৪] এই বক্তব্যের অভিপ্রায় হল বিশেষ পদার্থ যোগীদেরও প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। তিনি যোগীর বিশেষ প্রত্যক্ষ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

রঘুনাথ শিরোমণির 'পদার্থতত্ত্বনিরূপণ' এর উপর রঘুদের ন্যায়ালংকারকৃত টীকায় বলা হয়েছে—প্রমাণাভাববশতঃ বিশেষ কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নয় (**বিশেষপি ন পদার্থন্তর মানাভাবাৎ**), বিশেষ হল তর্করসিকগণের স্বীকৃত শশবিষাণতুল্য সম্পূর্ণ অলীক পদার্থ। (**"শশবিষাণতুল্য এব তর্করসিকাণাং ইতি ভাবঃ"**[৫] —শ্রী রঘুদেব ন্যায়ালংকারকৃত পদার্থতত্ত্বনিরূপমের টীকা)।

সুতরাং রঘুনাথ শিরোমণির বক্তব্য হল নিত্যদ্রব্য এবং নিত্যপরমাণুসমূহ স্বতঃই পরস্পর স্বতন্ত্র, একথা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে নিত্যদ্রব্য ও নিত্যপরমাণুতে এক একটী স্বতোব্যাবৃত্ত বিশেষ স্বীকারের কোন প্রয়োজন পড়ে না।

রঘুনাথ শিরোমণির এইরূপ বক্তব্য ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ মেনে নেবেন না। তাদের মতে, নিত্যদ্রব্যগুলি কখনোই ব্যাবর্তকস্বভাববিশিষ্ট হতে পারে না, কারণ নিত্যদ্রব্যগুলি জাতিমান পদার্থ, জাতিমান পদার্থকে স্বতোব্যাবর্তক বলা যায় না, নিত্যদ্রব্যে সত্তা এবং দ্রব্যত্ব জাতি থাকে, আর বিশেষে বিশেষত্ব বা অন্য কোন জাতি থাকে না। বিশেষ জাতিহীন পদার্থ ফলে একমাত্র বিশেষকেই ব্যবর্তকস্বভাববিশিষ্ট বলা যেতে পারে।

চতুর্থ, আচার্য উদয়ন পার্থিব পরমাণুগত পাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আদি গুণকে বিজাতীয় অঙ্কুরাদির নিয়ামক এবং এক পরমাণু হতে অপর পরমাণুর ব্যাবর্তক বলেছেন। আচার্য্য উদয়নের মতে – **"স্বগুণাঃ পরমানুনাং বিশেষাঃ পাকজাদয়ঃ"**[৬]।

অর্থাৎ তার মতে, পরমাণুতে উৎপন্ন বিশেষ বিশেষ পাকজ রূপরসাদি গুণই ধান্যের বা যবের পরমাণুকে ব্যাবৃত্ত করতে পারে বলে তদ্ তদ্ পরমাণু হতে ক্রমে ধান্যযবাদির পৃথক পৃথক অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। সুতরাং আচার্য্য উদয়ন কর্তৃক অতিরিক্ত বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকৃত না হলেও পরমাণুগত পাকজরূপাদিগুণ বিশেষ পরমাণু হতে অপর পরমাণুর ব্যাবর্তক হতে পারবে।

আচার্য্য উদয়নকৃত আপত্তিটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পরমাণুগত পাকজরূপাদিগুণ যদি পরমাণু হতে পরমাণ্বন্তরের ব্যাবর্তক হয় তাহলে বিশেষ রূপ অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করবার কোনো প্রয়োজনই পড়বে না।

তবে আপত্তিটি গ্রাহ্য হতে পারে না, কেননা পাকজ পরিবর্তনের দ্বারা বিজাতীয় তেজঃসংযোগের ফলে দ্রব্যের গুণচতুষ্টয়ের একই সময়ে পরিবর্তন ঘটে, কাজেই পিলুপাকবাদী বৈশেষিক দার্শনিকগণ পরমাণু থেকেই পরিবর্তন স্বীকার করবেন। এবং সেক্ষেত্রে পরমাণুর রূপরসাদিগুণের দ্বারা প্রত্যেকটি পরমাণুর ভেদ করা যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হল পার্থিব দ্রব্যেরই পাকজ পরিবর্তন হয় বলে পাকজরূপাদি গুণের দ্বারা দুটি সজাতীয় পার্থিব পরমাণুর ভেদসিদ্ধি হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য নিত্য দ্রব্যের পারস্পরিক ভেদসিদ্ধিতে বিশেষের আবশ্যকতা থেকেই যায়। সুতরাং লাঘব নীতি অনুসারে, সকল ক্ষেত্রেই নিত্যদ্রব্যের ব্যাবৃত্তির জন্য বিশেষ স্বীকার যুক্তিযুক্ত।

পঞ্চমত, নীলকণ্ঠী টীকাতে বিশেষ স্বীকারের বিপক্ষে একটি পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে একত্বাদি বিশেষধর্মের দ্বারাই পরমাণুসমূহের ভেদসিদ্ধি সম্ভব হতে পারে। সুতরাং অতিরিক্ত বিশেষরূপ পদার্থ স্বীকারের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

নীলকণ্ঠী টীকাতে উক্ত আপত্তিটি খন্ডন করতে গিয়ে বলা হয়েছে – একত্বাদি বিশেষধর্মের দ্বারা পরমাণুসমূহের ভেদসিদ্ধি অসম্ভব, কেননা এতৎ পরমাণুতে যে একত্ব বিদ্যমান, সেটি হচ্ছে এতৎ পরমাণুনিষ্ঠ একত্ব, তার দ্বারা তৎপরমাণু থেকে এতৎ পরমাণুর ভেদসিদ্ধি হলেও এতৎ পরমাণু থেকে তৎপরমাণুর ভেদসিদ্ধি হতে পারে না।

ষষ্ঠত, ভাস্করোদয় টীকাতে আবার বিশেষ পদার্থ স্বীকৃতির বিপক্ষে একটি পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, পরমাণুগত একত্ব এবং পরিমাণত্বই পরমাণুসমূহের পারস্পরিক ভেদসাধক হবে।

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকগণ এইরূপ আপত্তি মেনে নেবেন না, কেননা তাদের মতে একত্ব ও পরিমাণত্ব প্রত্যেক পরমাণুতেই বিদ্যমান থাকে ফলে তার দ্বারা প্রত্যেকটি পরমাণুর ভেদসিদ্ধি হতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমাদের এমন একটি অনুপম পদার্থ স্বীকার করতে হবে যার দ্বারা প্রত্যেকটি পরমাণুর পারস্পরিক ভেদসিদ্ধি হতে পারে সেই অনুপম পদার্থই হল বিশেষ।

সপ্তমত, 'ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী'-র দীনকরী টীকাতে আরেকটি পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত হচ্ছে যেখানে বলা হয়েছে - এতৎ পরমাণুত্বই নিত্যপরমাণুসমূহের ব্যাবর্তক বলে গণ্য হতে পারে, অতিরিক্ত বিশেষ রূপ পদার্থ স্বীকারের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

এইরূপ আপত্তি আচার্য্যগণ গ্রহণ করেননি। এর উত্তরে ন্যায়পক্ষে বক্তব্য এই যে, অব্যাবৃত্ত ধর্মের ব্যাবর্ত্তকত্ব সম্ভব নয় বলে ব্যবর্ত্তকান্তরের অপেক্ষাবশত অনবস্থা প্রসঙ্গ হয়। এটির ব্যাখ্যায় রামরুদ্র বলেছেন যে, এতৎ পরমাণুত্ব হল একটি অব্যাবৃত্ত ধর্ম তাই এতৎ পরমাণুত্বের দ্বারা অন্যান্য পরমাণুর থেকে এতৎ পরমাণুর ভেদ সাধন করা যায় না। তাই বিশেষ স্বীকার আবশ্যক।

এ পর্যন্ত ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে বিশেষ প্রসঙ্গে কী কী পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হয়েছে তার আলোচনা করা হল। এখন ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষ পদার্থটিকে কিভাবে খন্ডন করেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে এবং বৈশেষিক স্বীকৃত সমাধান প্রদর্শিত হবে।

মীমাংসা দর্শনে 'বিশেষ' পদার্থ পৃথক কোন মর্যাদা পায়নি, মীমাংসকগণ যেহেতু যোগীর সর্বজ্ঞতা স্বীকার করেননি, তাই তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষের অযোগ্য পরমাণুতে ব্যাবৃত্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং যোগীপ্রত্যক্ষের বিষয় বলে 'বিশেষ' পদার্থ স্বীকারের কোনো যৌক্তিকতা নেই[৭]।

উক্ত আপত্তিটি আমাদের কাছে নতুন কোনো আবেদন রাখে না, কেননা মীমাংসকগণের দর্শনচিন্তা যেহেতু সম্পূর্ণ ভিন্ন তাই তারা যোগীর সর্বজ্ঞতা অস্বীকার করে বিশেষ পদার্থ খণ্ডন করতেই পারেন। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে সর্বজ্ঞ যোগী স্বীকৃত হয়েছে তবে যোগীর প্রত্যক্ষই যে বিশেষ পদার্থ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ তা নয়, অযোগীর অনুমানও বিশেষ পদার্থ বিষয়ে একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ। তাই যোগীর সর্বজ্ঞতা অস্বীকৃত হলেই যে বিশেষ পদার্থ খণ্ডিত হয়ে যাবে এমনটা বলা যায় না।

যোগদর্শনেও বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হয়নি। যোগদার্শনিকগণ বলেন যে, সংস্থান ইত্যাদির দ্বারাই পরমাণুতে ব্যাবৃত্তি বুদ্ধি উৎপন্ন হতে পারে (ব্যাসভাষ্য ৩/৫৩)[৮]। তাই বিশেষ রূপ অতিরিক্ত একটি পদার্থ নিষ্প্রয়োজন।

উক্ত আপত্তিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি সংস্থানাদির দ্বারা পরমাণুতে ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি উৎপন্ন হয়ে যায় তাহলে একটি অতিরিক্ত 'বিশেষ' পদার্থ স্বীকার করার আবশ্যকতা থাকে না। তবে, উক্ত আপত্তিটি গৃহীত হতে পারে না কেননা পরমাণু নিরবয়ব বা অংশবিহীন, অংশী বা অবয়বী দ্রব্যর পক্ষেই কোনো সংস্থান বা দেশে থাকা সম্ভব। কিন্তু নিয়বয়ব বা নিরংশ পরমাণুর সংস্থানে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং সংস্থানাদির দ্বারাও পরমাণুতে ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি উৎপন্ন হতে পারে না।

অদ্বৈত বেদান্তে একটি মাত্র সত্তা স্বীকৃত হয়েছে তা হল আত্মা বা ব্রহ্ম, জগতে আর দ্বিতীয় কোন সত্তাই নেই যা হতে এই আত্মা ব্যাবৃত্ত হতে পারে। ভেদ পরিহারই অদ্বৈত দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য, আর 'বিশেষ' স্বীকৃত হয়েছে ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির জন্য তাই স্বাভাবিকভাবেই 'বিশেষ'

পদার্থটি অদ্বৈতবেদান্তে খণ্ডিত হয়েছে। অদ্বৈতবাদীদের যুক্তি হল– আত্মা সকলের পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞানের জন্য 'বিশেষ' কল্পিত হতে পারে না, কেননা আত্মার ভেদ সিদ্ধ হতে পারে না। তাই পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিশেষ স্বীকৃত হতে পারে না[৯]।

উক্ত আপত্তিটির উত্তরে বলা যেতে পারে, অদ্বৈত বেদান্ত এবং ন্যায় বৈশেষিক দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তা পোষণ করে। অদ্বৈতবেদান্ত যেমন একদিকে একত্ববাদী, তেমনই অপরদিকে ন্যায় বৈশেষিক দর্শন বহুত্ববাদী। তাছাড়া আরও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যে আত্মাকে অদ্বৈত বেদান্তে এক বলা হয়েছে সেই আত্মাকেই ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই ন্যায় বৈশেষিকগণের দার্শনিক চিন্তা যদি বিবেচনা করি তাহলে 'বিশেষ' স্বীকার না করার কোনো উপায় থাকে না।

অপর একটি আপত্তি উত্থাপণ করেছেন বেদান্তদেশীক। ইনি হলেন একজন প্রখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তিক, তিনি রামানুজ দর্শনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি পরমত ভঙ্গ করা কালে বৈশেষিকগণ স্বীকৃত বিশেষ পদার্থও খণ্ডন করেছিলেন। তাঁর মতে বিশেষ পদার্থ স্বীকারের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই কেননা অন্যোন্যাভাব বা পৃথকত্বের দ্বারাই দুটি পরমাণুর ভেদসিদ্ধি হতে পারে, অতিরিক্ত বিশেষ-রূপ পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা নেই[১০]।

উক্ত আপত্তিটি ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ মেনে নেবেন না কেননা তাঁদের মতে, বৈধর্ম্য সিদ্ধ না হলে আন্যান্যভাব বা পৃথকত্ব হতেও ভেদবুদ্ধি হতে পারে না, আর আমরা জানি, সজাতীয় পরমাণু সমূহে এমন কোন বৈধর্ম্য বা বিরুদ্ধ ধর্ম নেই যার দ্বারা প্রত্যেকটি পরমাণুর পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হতে পারে। অতএব বিশেষ রূপ অতিরিক্ত একটি ভেদক ধর্ম স্বীকার করতেই হবে যার দ্বারা প্রত্যেকটি পরমাণু এবং নিত্যদ্রব্যের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. "যথা ঘটাদিষু প্রদীপাৎ, ন তু প্রদীপে প্রদীপান্তারাৎ" - প্রশস্তপাদাচার্য, *প্রশস্তপাদভাষ্য* (প্রথমভাগ), দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম (সম্পাঃ), আদ্যাপীঠ বালক আশ্রম, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৭, পৃষ্ঠা-২৪৬।

২. "যথা ন যোগজাদ্ধর্মাদশুক্লে শুক্লপ্রত্যয়ঃ সঞ্জায়তে, অতান্তাদৃষ্টে চ প্রত্যভিজ্ঞানম্" - প্রশস্তপাদাচার্য, *প্রশস্তপাদভাষ্য* (প্রথমভাগ), দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম (সম্পাঃ), আদ্যাপীঠ বালক আশ্রম, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৭পৃষ্ঠা-২৪৬।

৩. মিশ্র, শ্রীকেশব, *তর্কভাষা,* শ্রীগঙ্গাধর করন্যায়াচার্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃষ্ঠা-৩৫৬।

৪. শিরোমণি, রঘুনাথ, *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ,* মধুসূদন ন্যায়াচার্য (সম্পাঃ), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৯৯।

৫. শিরোমণি, রঘুনাথ, *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ,* মধুসূদন ন্যায়াচার্য (সম্পাঃ), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৯৯।

৬. উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ, শ্রী হরিদাস ভট্টাচার্যকৃত টীকাসহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৬, মহালয়া-১৩৬৯ (প্রথমপ্রকাশ), পৃষ্ঠা-৭৬।

৭. বিশ্বনাথ, *ভাষা পরিচ্ছেদ,* শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী (অনুঃ), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৬৮।

৮. ঐ,পৃষ্ঠা-৬৮।

৯. *বেদান্তদর্শন,* স্বামী বিশ্বরূপানান্দ (অনুঃ), দ্বিতীয় অধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, মার্চ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৭২২।

১০. Chari, S, M, S, *Indian Philosophical System*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 2011, page-100.

বেদান্তসার ও মহাভারতে পঞ্চ মহাভূতের কার্যকারিতা : সাদৃশ্যমূলক আলোচনা

জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
হুগলী মহিলা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বেদান্তসার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ। মহাভারত একটি আদি কাব্য। এই ভিন্নধর্মী দুটি গ্রন্থেই জীবজগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পঞ্চ মহাভূতের কার্যকারিতা বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। সাদৃশ্যগত দিক দিয়ে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

বেদান্তসারে উল্লিখিত আছে তম: প্রধান বিক্ষেপশক্তি যুক্ত অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল, জল থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি। এই আকাশ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভূত থেকে সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূলভূতগুলো উৎপন্ন হয়। পঞ্চভূতের বিশেষ মিশ্রণই পঞ্চীকরণ। এই পঞ্চীকৃত ভূত থেকে চতুর্দশ ভুবন, ব্রহ্মান্ডের চারপ্রকার স্থূল শরীর ও খাদ্য পানীয় সৃষ্টি হয়।

মহাভারতের শান্তি পর্বের ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ অধ্যায়ে মানব দেহ এবং বৃক্ষে পঞ্চ ভূতের কার্যকারিতার বিষয়টি বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। অস্থি, ত্বক, মাংস, স্নায়ু এই পাচঁটি পদার্থ পৃথিবী থেকে, অগ্নিরূপ মহাভূত থেকে ক্রোধ, উষ্ণতা প্রভৃতি, আকাশ থেকে কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি এবং প্রাণী শরীরের জলে থাকে কফ, পিত্ত, মেদ, রক্ত যা শরীরে তাপমাত্রার ভারসাম্য ও পুষ্টি প্রদান করে, প্রাণ বায়ুর দ্বারা প্রাণী জীবিত থাকে।

সূচক শব্দ: মহাভূত, কোশ, জীবজগৎ, বেদান্তসার, কার্যকারিতা।

মূল আলোচনা:

বেদান্তসার ও মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রাণী ও জীবজগতের গঠন প্রক্রিয়ায় পঞ্চ মহাভূতের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। দুটি ভিন্নধর্মী গ্রন্থে উল্লিখিত পঞ্চ মহাভূত সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো সাদৃশ্যগত দিক দিয়ে পর্যালোচনা করতে আগ্রহী হয়েছি।

বেদান্তসারে ভারতীয় দর্শনের গভীর পর্যালোচনামূলক তত্ত্বগুলো লক্ষিত হয়। তবে তত্ত্বগুলো কেবল তত্ত্ব নয়, দর্শনের সঙ্গে মানবজীবন তথা মানবশরীর ও মনের যোগসূত্র আছে। এই গ্রন্থে ভূত সৃষ্টির অধ্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা প্রসঙ্গে ৩৪নং সূত্রে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তির কথা এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে - ঈশ্বর থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। তম: প্রধান অজ্ঞান থেকে আকাশাদি পাঁচটি মহাভূতের উৎপত্তি বর্ণনাপ্রসঙ্গে বেদান্তসারের ৩৫নং সূত্র থেকে জানা যায় যে,আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পাঁচটি সূক্ষ্মভূত ও অপঞ্চীকৃত ভূত নামে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অসংসৃষ্ট অবস্থায় এরা এক একটি গুণমাত্রের আশ্রয় হয়, যেমন - আকাশ স্পর্শের, তেজ রূপের, জল রসের, পৃথিবী গন্ধের। ৩৬নং সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে আকাশ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভূত থেকে সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল ভূতগুলি উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম শরীর সতেরোটি অবয়ববিশিষ্ট। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি বায়ু, বুদ্ধি ও মন। ৩৭নং সূত্র থেকে পাই শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। আকাশাদির পৃথক পৃথক সাত্ত্বিক অংশ থেকে যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো উৎপন্ন হয়।

যেমন, আকাশ থেকে শ্রোত্র, বায়ু থেকে ত্বক, তেজ থেকে চক্ষু, জল থেকে জিহ্বা এবং পৃথিবী থেকে নাসিকা। বিজ্ঞানময় কোশ, মনোময় কোশ ও প্রাণময় কোশ সূক্ষ্মশরীরের অন্তর্গত। ৩৮নং সূত্রে আছে যে,বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়র সঙ্গে মিলিত হয়ে বিজ্ঞানময় কোশ গঠিত হয়। এই বিজ্ঞানময় কোশই আমি কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দু:খী ইত্যাদি অভিমান করে থাকে। এজন্য একে ইহলোক ও পরলোকগামী ব্যবহারিক জীব বলা হয়। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়র সঙ্গে মিলিত হয়, একে মনোময় কোশ বলা হয়। ৩৯নং সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ - এই কর্মেন্দ্রিয়গুলি আকাশ প্রভৃতির সম্মিলিত রজ: অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। ৪০নং সূত্রে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ বায়ুর কথা বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ৪০নং সূত্র অনুযায়ী নাসিকার অগ্রদেশে যে বায়ু সম্মুখে গমন করে তাকে প্রাণ বলে। পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্তী যে বায়ু নিম্নে গমন করে তাকে অপান বলে। সকল শরীরে ব্যাপ্ত সবদিকে গমনকারী বায়ুকে ব্যান বলে। কণ্ঠদেশে স্থিত ঊর্ধগামী বায়ুর নাম উদান। শরীরমধ্যস্থ খাদ্য ও পানীয়র সমীকরণকারী বায়ুকে সমান বলা হয়। রস, রক্ত, মল প্রভৃতি রূপান্তরকারী সমীকরণ সমান বায়ুর মাধ্যমে হয়। ৪২নং সূত্রে পঞ্চ বায়ু পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়র সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাণময় কোশ নামে অভিহিত হয়।

বেদন্তসারে বিজ্ঞানময় কোশ, মনোময় কোশ ও প্রাণময় কোশকে একত্রে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়, যা লিঙ্গশরীর নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি বর্ণনা করে স্থূলভূতের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। স্থূলভূতগুলো পঞ্চীকৃত। পঞ্চ ভূতের বিশেষ মিশ্রণই পঞ্চীকরণ। পাঁচটি ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চাত্মক। আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অভিব্যক্ত হয়।

এই পঞ্চীকৃত ভূত সমূহ থেকে উপরে উপরে বিদ্যমান ভূ, ভুব:, স্ব:, মহ:, জন, তপ:, সত্য নামক লোকসমূহ ও নিম্নে যথাক্রমে বিদ্যমান অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল নামক লোকসমূহ, ব্রহ্মান্ড ও ব্রহ্মান্ডের অন্তর্গত চারপ্রকার স্থূলশরীর এবং খাদ্য পানীয় সৃষ্টি হয়।

বেদন্তসারের ৫২নং সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে,স্থূলশরীর চারপ্রকার জরায়ুজ, অন্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। জরায়ুজ থেকে উৎপন্ন হয় মনুষ্য, পশু প্রভৃতি। অন্ডজ থেকে পক্ষী, সর্প প্রভৃতি, স্বেদজ ক্লেদাদি থেকে উকুন, মশা প্রভৃতি এবং উদ্ভিজ্জ যেমন বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি। সমষ্টিগত ভাবে স্থূল শরীর দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে বৈশ্বনর বা বিরাট বলা হয়। এই স্থূল শরীরে অন্নের বিকার হয় বলে অন্নময় কোশ নামে অভিহিত হয়।

এবার মহাভারতের প্রসঙ্গে আসি। মহাভারতেও জীবজগত গঠনে পঞ্চ মহাভূতের ভূমিকা বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বের ১৮৪নং অধ্যায়ের ভৃগু- ভরদ্বাজ সংবাদের প্রথম শ্লোকে ভরদ্বাজ উল্লেখ করেছেন যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা যে মহাভূতগুলো সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো সকল পদার্থের ধারক রূপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করে আছে। ভৃগুর মতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী - এই পাঁচটি অপরিমিত, মৌলিক পদার্থ হওয়ায় "মহাভূত" শব্দে অভিহিত হয়। এদের অস্তিত্ব ব্যতীত কোনো কিছু কল্পনা করা যায় না। আকাশ শূন্যময়, বায়ু গতিক্রিয়া যুক্ত, অগ্নি তাপযুক্ত, জল তরল এবং পৃথিবী কঠিন হওয়ায় জীবজগতের শরীর এই পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী। স্বাভাবিক ভাবেই বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে চলাচল করে। আকাশ শূণ্যস্থান বলে আমাদের কোশের মধ্যে আছে। জলের মধ্যে যে রক্ত, লসিকা তরল পদার্থ থাকে, তা দিয়ে দেহের গঠন হয়। পৃথিবীর কঠিন রূপ অর্থাৎ স্থায়িত্ব হাড় মাংস দিয়ে গঠিত শরীরকে লক্ষিত করে।

শুধু প্রাণী নয় স্থাবর পদার্থও পঞ্চভূত দিয়ে গঠিত। মহাভারতের এই অধ্যায়ের ৭নং শ্লোকে বৃক্ষের ক্ষেত্রে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে এবং ভৃগু পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বৃক্ষে পঞ্চভূতের সংযোগের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। ১১নং শ্লোকে বলা হয়েছে পত্র, ত্বক, ফুল ম্লান হয়, শুকিয়ে যায়। সুতরাং স্পর্শ আছে। তাপের স্পর্শে পাতা, ফুল শুকিয়ে যায়! ১২নং শ্লোক থেকে জানতে পারি যে, বাইরের বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে ফল ও ফুল শুকিয়ে যায়। সুতরাং বৃক্ষ কর্ণর দ্বারা শব্দ গ্রহণ করে। ১৩নং শ্লোকের বিষয় হল লতা গাছকে জড়িয়ে থাকে এবং সব দিকে গমন করে। দেখতে না পেলে গমন করতে পারতো না! অতএব গাছেরা দেখতে পায়! ১৪নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে গাছেরা তাদের উৎকৃষ্ট বিভিন্ন গন্ধ দ্বারা নীরোগ থেকে পুষ্প ফল প্রসব করে। সুতরাং গাছেরা ঘ্রাণ নিতে পারে! ১৫নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে গাছেরা পা দিয়ে জল পান করে। তাদের ব্যাধি ও ব্যাধির প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। সুতরাং গাছেদের রসগ্রহণের ক্ষমতা আছে। এটি জৈবিক ক্রিয়াকলাপের নিদর্শন হিসাবে ধরা যেতে পারে! ১৬নং শ্লোকটিও ১৫নং শ্লোকের বক্তব্য সমর্থন করে। এখানে বায়ুযুক্ত গাছের পা দিয়ে জল পান করার কথা বলা হয়েছে। ১৭নং শ্লোকে গাছেদের কাটা অঙ্গের পুনরায় উৎপত্তি কথা বলা হয়েছে। অতএব গাছ অচেতন নয়! ১৮নং শ্লোকের বিষয় হল-- বৃক্ষের মধ্যে অগ্নি, বায়ু তাদের পান করা জলকে জীর্ণ করে এবং খাদ্যবস্তু পরিপাক করে। সুতরাং গাছের রস বৃদ্ধি হয়!

মানবশরীরে পঞ্চভূতের কার্যকারিতার বিষয়টিও বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এই অধ্যায়ে। শান্তিপর্বের ১৮৪ নং অধ্যায়ের ১৯নং শ্লোকে মানবদেহের পঞ্চভূতের কার্যকারিতা লক্ষিত হয়। ২০নং শ্লোকে ত্বক, অস্থি, মাংস, মজ্জা, স্নায়ু - এই পাঁচটি কঠিন পদার্থগুলো পৃথিবী থেকেই উৎপন্ন হয়। ত্বক মূলত: দেহের রক্ষাকারী, মাটির উপাদান ক্যালসিয়াম,ম্যাগনেসিয়াম ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের সংযোগে গঠিত। হাড় ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ফসফেট সমন্বিত, যা পৃথিবীর খনিজ পদার্থ থেকে উৎপন্ন। মজ্জা হাড়ের মধ্যে থাকে। মাংসের পুষ্টির জন্য যেসকল পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন, সবটুকুই পৃথিবী থেকে উদ্ভূত। স্নায়ুও সংকেতবাহী যা পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত উপাদান থেকে গঠিত। ২১নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে অগ্নিরূপ মহাভূত থেকে শরীরের বিভিন্ন উপাদান ও গুণাবলী উৎপন্ন হয়। যেমন - ক্রোধ, তেজ, চক্ষু, উষ্ণতা এবং যঠরাগ্নি। এদের মধ্যে উষ্ণতা এক প্রকার জীবনীশক্তি যা জঠরাগ্নি (হজমশক্তি), খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা শরীরে পুষ্টি প্রদান করে, শরীরের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে! ২২নং শ্লোক অনুযায়ী কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হৃদয় ও অগ্ন্যাশয়-- এই পাঁচটি পদার্থ প্রাণীদের শরীরে আকাশ মহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়। ২৩নং শ্লোকের বিষয় হল প্রাণীর শরীরের জলে থাকে কফ, পিত্ত, ঘর্ম, মেদ ও রক্ত। এদের মধ্যে পিত্ত হজম প্রক্রিয়া ও শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ঘর্ম শরীরকে তাপমাত্রার সামঞ্জস্য প্রদান করে। মেদ প্রবল শৈত্য থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং আঘাত থেকে শরীরকে প্রতিরক্ষা করে। প্রয়োজনীয় পুষ্টিও সরবরাহ করে। রক্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন কোশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পুষ্টি প্রদান করে।

প্রাণীদেহে পঞ্চবায়ুর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। প্রাণবায়ুর জন্য প্রাণী জীবিত থাকে। ব্যান বায়ুর প্রভাবে কার্য করে। অপান বায়ু প্রাণীর শরীরের অধোদেশ থেকে নির্গত হয় এবং সমান বায়ু থাকে হৃদয়ে। এভাবে বিভিন্ন বায়ু মানব শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে এবং হৃদপিণ্ডের সুস্থতা রক্ষায় সহায়তা করে। ২৫নং শ্লোক থেকে জানা যায় যে, উদান বায়ু দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস চলে। এই বায়ু কণ্ঠনালী, তালু প্রভৃতি স্থানবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সৃষ্টি করে। ২৬নং এবং ২৭নং শ্লোকে প্রাচীন ঋষিরা রূপ, রস প্রভৃতি গুণের মাধ্যমে পদার্থের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। পঞ্চ

মহাভূতের বিভিন্ন গুণ যেমন রূপ, রস, স্পর্শ,শব্দ ও গন্ধ প্রভৃতি প্রাণীরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করে। ৩০নং শ্লোকে মহর্ষি ভৃগু ঋষি ভরদ্বাজকে বলেছেন রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ এগুলোকে গুণ হিসাবে ধরতে হবে। তিনি রসের বিভিন্ন প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সকল বিভিন্ন প্রকার রস জল থেকে উদ্ভূত। ৩৫নং শ্লোক এবং ৩৬নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে বায়ুর গুণ স্পর্শ বিভিন্ন প্রকারের। ৩৮নং শ্লোকে শব্দকে আকাশের একমাত্র গুণ বলা হয়েছে যা বহুপ্রকার। ৪২নং শ্লোকে জল, অগ্নি ও বায়ু - এই তিনটে মহাভূত সব সময়ই প্রাণীদের শরীরে থাকে, এগুলো দেহের মূলস্বরূপ এবং প্রাণকে অবলম্বন করে থাকে!

বেদান্তসার ও মহাভারতে মানবশরীরের গঠন প্রক্রিয়া কীভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে উঠেছে তা উপরি-উক্ত আলোচনায় লক্ষিত হয়। দুটি গ্রন্থে দর্শনের বিষয়গুলো যেমন ব্যক্তি-আত্মা, শাশ্বত-পরমাত্মা ইত্যাদি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিজ্ঞানের দিকগুলোও ব্যাখ্যাত হয়েছে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী শুধু নয়, জীবজগতের উৎপত্তিগত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া যায়। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে জীবজগতের দেহসত্তা তথা যৌগিক সত্তার গঠনগত দিকগুলো এই দুটি গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। সেজন্য দুটি গ্রন্থই প্রাণী-কোশ ও জীবজগতের উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ!

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. Swami, Nikhilananda, 1990, Vedantasara of Sadananda, Kolkata, Advaita Ashrama

২. WARDER, A.K, 1988, INDIAN KAVYA LITERATURE: The Origins and Formation of Classical Kavya, Vol 2, New Delhi, Motilal Banarsidass Publishers PVT

৩. সিংহ, কালীপ্রসন্ন অনূদিত, ২০১৮, মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্যতীর্থ পাবলিশার্স

৪. পাল, বিপদভঞ্জন, ১৪১০, চতুর্থ সংস্করণ মহালয়া, বেদান্তসার:, কলকাতা--৬, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৫. সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস, ১৯৭৮, মহাভারত, শান্তি পর্ব, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী।

প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব ও সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি

দীপঙ্কর কৈবর্ত্ত্য
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ, শ্রীরামপুর, হুগলী

সারসংক্ষেপ: প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল নিবৃত্তি। সেইজন্য তখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থাতে নিয়মের কড়াকড়িও ছিল প্রচন্ড। আশ্রমধর্মের প্রথমটি ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম, যেখানে জীবনের প্রথম ২১ বছর গুরুগৃহে থেকে কঠোর তপস্যা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে একজনকে জীবনের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত হতে হত। বেদের স্মৃতিবাক্যেও বলা হয়েছে, 'ছাত্রাণামাধ্যয়নং তপঃ'। অর্থাৎ অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। প্রকৃত অধ্যয়ন বা শিক্ষাই পারে একজন প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে। যার ফলে সে আর নিজের ছোট্ট গন্ডিতে আবদ্ধ থাকবে না, স্বার্থ বুদ্ধি ত্যাগ করে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিতীয়বার ভাববে না। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যত মত প্রচলিত আছে সকলের প্রয়াস উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ তৈরি করা। প্লেটো বলেন, শিক্ষা হল শরীরের শিক্ষা ও মনের শিক্ষা-শরীরের জন্য জিম্ন্যাস্টিক ও মনের জন্য সংগীত। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে যদি উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় তাহলে দেশ এগিয়ে চলবে তার আপন লক্ষ্যে। প্লেটো রচিত Republic বা গণরাজ্য একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়কেই তিনি তাঁর দার্শনিক আলোচনার দ্বারা তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটিকে দর্শনের বিশ্বকোষ বলা হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, ন্যায়, চারুকলা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রায় প্রতিটি বিষয়েরই দার্শনিক আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। Republic গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল শিক্ষাতত্ত্ব। এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব এবং সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা মূলত দার্শনিক পদ্ধতি তথা বিশ্লেষণী পদ্ধতির সাহায্যেই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রয়াস করেছি।

সূচক শব্দ: 'শিক্ষা', 'শ্রেণীবিন্যাস', 'দার্শনিক রাজা', 'প্রাথমিক শিক্ষা', 'উচ্চশিক্ষা', 'জিম্ন্যাস্টিক', 'সংগীত'।

(i)

দার্শনিকেরা আজ পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কে যে সমস্ত তত্ত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে প্লেটোর শিক্ষা তত্ত্বই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে গণ্য হয়। যেকোন প্রকার শিক্ষাতত্ত্বই কিছু পরিমাণে দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ হয়। প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব দার্শনিকতার দিক থেকে অধিকতর সমৃদ্ধ। প্লেটোর অন্যতম পরিচয় হল, তিনি একজন দার্শনিক এবং অপরদিকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তিনি নিজে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও প্রধান অধ্যাপকের পদ আলোকিত করেছিলেন, যার নাম Academy। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনা তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। প্লেটো তাঁর Republic বা গণরাজ্য গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলেন। তিনি মনে করেন একটি আদর্শ রাষ্ট্র তিনটি মূল ভিত্তির উপর গড়ে উঠতে পারে, যার প্রথমটি হল শিক্ষা, দ্বিতীয়টি শ্রেণীবিন্যাস এবং তৃতীয়টি হল দার্শনিক রাজা (Philosopher King)। তিনি শিক্ষাকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন – প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা। আমরা এক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করব।

প্লেটোর সময়ে এথেন্সের ছেলেদের শিক্ষার দায়ভার পরিবারের উপর ন্যস্ত ছিল, এতে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, এবং দিনের বেলাতে সেখানে পড়াশোনা হত। শিক্ষাসূচীতে থাকতো ‘ব্যকরণ’ (গ্রামাতিকি), ‘সংগীত’ (মুসিকি), এবং ‘শরীরচর্চা’ (জিমন্যাস্টিকি)। ব্যকরণ অংশে ছেলেদের লিখতে ও পড়তে শেখান হত। সংগীত শিক্ষার অন্তর্গত ছিল আবৃত্তি (মূলত মহাকাব্য ও নাটকের আবৃত্তি), বাদ্য (মূলত বিনোদন), গীত (মূলত লিরিক কবিতা যা সুর সংযোগে গাওয়া হত), প্রাথমিক অঙ্ক, জ্যামিতি, ইত্যাদি। মিউজিক বা সংগীত বলতে বোঝাত সেই সমস্ত যার অধিষ্ঠাতা ছিলেন ‘মিউস’ নামক দেবতা। গীত, বাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের কলা (চিত্র, ভাস্কর্য, ইত্যাদি) সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক, দর্শন, ইত্যাদি। শরীরচর্চা বা জিম্ন্যাস্টিকের অন্তর্গত ছিল খোলা মাঠে খেলাধূলা ও ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম চর্চা। ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের এসব শেখান হত। ছেলেদের বয়স ১৮ পেরিয়ে গেলে দু’বছরের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। মেয়েরা বাড়িতে বসে গৃহ-শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করত। প্লেটো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষাসূচী মোটামুটি অপরিবর্তিত রেখেছেন; কিন্তু এর প্রকরণ, আবেদন, ও ব্যস্থাপনের আমূল পরিবর্তন করেন।

প্লেটো প্রাথমিক শিক্ষাকে ভবিষ্যতের শাসকদের জন্য শিক্ষা বলেছেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষার শুরুতেই স্থির করে দেওয়া হয়েছে কারা ভবিষ্যতে শাসক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা যারা গ্রহণ করবে তাদের কেউ কেউ ভবিষ্যতে শাসক হিসাবে নির্বাচিত হবে। শিক্ষার শুরুতে এরকম ভাবা হবে যে, ছেলে-মেয়েদের যে কেউ ভবিষ্যতের কর্ণধার। ভবিষ্যতের কর্ণধার ভেবে ছেলে-মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হবে তার অন্যতম লক্ষ্যই হবে চরিত্র গঠন। অবশ্য একই সাথে ছেলে-মেয়েদের মানসিক বিকাশের দিকটি কোন মতেই উপেক্ষিত হবে না।

প্লেটোর শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা হবে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। এদের থাকা-খাওয়া, পরন-পরিচ্ছদ, ও অন্যান্য ব্যয়ভার পরিবারকে বহন করতে হবে না, সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের দায় ও দায়িত্ব। ছেলে-মেয়েরা একসাথে পড়শোনা করবে, এবং শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। রাষ্ট্র সর্বস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থায় অর্থাৎ বিষয়-সূচীও হবে কঠোরভাবে রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যা শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী নয় বলে প্লেটো মনে করেন তাকেই তিনি পাঠ্য বিষয়সূচী থেকে বাদ দিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে প্রথমেই সাহিত্যের স্থান। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে গল্প বলা হয় ও চরিত্র চিত্রন করা হয়। প্লেটো হোমার, হেসিয়দ প্রভৃতি মহাকবিদের রচিত গল্পসমূহকে শিক্ষার পক্ষে একান্ত অনুপযোগী বলে মনে করেন এবং কঠোরভাবে এই কবিদের বাতিল করেন। তিনি এই সমস্ত কবিদের রচনা থেকে একের পর এক উক্তি তুলে ধরে দেখান যে, এরা যে সকল গল্প রচনা করেছেন সেগুলি যে শুধুমাত্র মনগড়া কাল্পনিক তাই নয়, সেগুলির বেশিরভাগই অনৈতিক গল্প। এদের রচনায় দেখা যাচ্ছে যে দেবতারা একে অপরের সাথে কলহে লিপ্ত, তারা প্রতারণা করছেন, মিথ্যা বলছেন, বহুরূপী সাজছেন, ইত্যাদি, আরও কত কি। আবার বীরপুরুষদের যে সকল চরিত্র এঁকেছেন তা মোটেই বীরপুরুষোচিত নয়, এমন হতে পারে যে, এই সকল মহাকবিদের রচনায় গভীর ও সুপ্ত বাণী আছে, কিন্তু শিশুরা প্রথমে গল্পের বহিরাবরণের দিকে আকৃষ্ট হবে। তারা আপাত ও প্রকৃতের পার্থক্য করবে না, এবং আপাতকেই সত্য বলে মনে করবে এবং তাকেই অনুকরণ করতে চাইবে। শিশুদের পক্ষে এর ফল ভাল হবে না।

মহাকবিদের রচনা শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাতিল করার পর প্লেটো বলেন, অতঃপর শিক্ষার উপযোগী নতুন সাহিত্য রচনা করতে হবে বা কবি ও গল্পকারদের সেরকম রচনা করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। গল্পগুলো হবে অলীক, কিন্তু মিথ্যা নয়। গল্পগুলোতে সহজ ও সরল নৈতিক উপদেশ থাকবে। গল্পের চরিত্র হিসাবে দেবতারাও থাকবেন, বীরপুরুষরাও থাকবেন। কিন্তু দেবতারা হবেন যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু সত্য, তারই প্রতীক। নীচতা, কুশ্রীতা, অনৈতিকতা দেব-চরিত্রের সাথে বেমানান। আবার কবি এবং লেখকদের বলা হবে তারা যেন এমন বীরপুরুষদের কাহিনী রচনা করেন যারা মানুষ হিসাবে সব দিক থেকে উন্নত। দয়া, মায়া, ভালোবাসা, ধৈর্য্য, শৌর্য্যের এরা হবেন চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি। যাদের কাছে এদের গল্প বলা হবে তারা এগুলোকে আদর্শ চরিত্র বলে মানবে এবং এদের মত হতে চাইবে।

প্লেটো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত সাহিত্যের বিষয়বস্তু, যথা দেব-চরিত্র, বীরপুরুষের চরিত্র, ইত্যাদির কথা বলেন। সেই সাথে তিনি সাহিত্যের আঙ্গিকের কথা বলেন। সাহিত্য যেমন গল্পকথন হয়, তেমনি আবার নাটকের আকারেও পরিবেশিত হয়। প্লেটো বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীদের শিক্ষাসূচী থেকে নাটককে সম্পূর্ণ বর্জন করার কথা বলেন। নাটক হল এমন সাহিত্য যা অভিনীত হবার যোগ্য। অভিনয় করতে গিয়ে একজন অভিনেতা অভিনীত চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়ে পড়েন। ফলে বিভিন্ন নাটক পড়তে গিয়ে বা বিভিন্ন নাটক অভিনয় করতে গিয়ে সে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ হয়ে পড়ে, এবং নিজের স্বতন্ত্র হারায় বা সেরকম সম্ভাবনা দেখা দেয়। পুনরায় নাটক আবেগকে উচ্চগ্রামে তুলে আনে। আবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যায়। এসব কারণে প্লেটো সহজ ও সরল সুর, সহজ ও সরল বাদ্য যন্ত্র অনুমোদন করেন। উচ্চগ্রামের সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র শিশুদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে বলে তিনি মনে করেন।

আগেই বলা হয়েছে, প্লেটোর শিক্ষাসূচীতে শরীরচর্চার স্থান রয়েছে। শরীরচর্চা বলতে প্লেটো শরীরকে সুস্থ রাখার চর্চাই বোঝাতে চান। যে শরীর-চর্চায় আনন্দ পাওয়া যায়, যে শরীর-চর্চায় রোগ-জ্বালা মুক্ত হয়ে জীবন-যাপন করা যায় এরূপ শরীর-চর্চাই আদর্শ। কঠিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য যে ধরণের অনুশীলনের দরকার প্লেটো তা শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বাতিল বলে গণ্য করেন। কঠিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দর্শকদের কাছে বিনোদন মাত্র। দর্শকদের বিনোদনের জন্য নয়, চরিত্র গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা-এই হল প্লেটোর সুস্পষ্ট অভিমত। যেহেতু সুস্থ শরীরে সুস্থ মন বাস করে সেহেতু শরীরচর্চা হল আসলে মনেরই চর্চা।

প্লেটোর মতে শিক্ষা হল পরিবেশ। একটি আদর্শ পরিবেশে শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলে তার মন আপনা থেকে ক্রিয়াশীল হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য তথ্য সরবরাহ নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল আত্মার দৃষ্টিকে আলোর দিকে প্রসারিত করা এবং তার ফলে আত্মা আপনা থেকে যা কিছু জানার, যা কিছু শেখার জানবে ও শিখবে। কেবলমাত্র তথ্য মুখস্থ করে শিক্ষিত হওয়া যায়-প্লেটো এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে মানুষ হয়ে ওঠাই শিক্ষা, সুস্থ জীবনের প্রতিশ্রুতিই শিক্ষা। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তির জীবনে ভবিষ্যতে আইনজ্ঞের প্রয়োজন হবে না, এবং চিকিৎসকের প্রয়োজন হবে খুবই কম। সে সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন নিয়ে বাঁচবে অন্য বহিরাগত শক্তির সাহায্য ছাড়াই।

সংক্ষেপে: (ক) প্রাথমিক শিক্ষা, প্লেটোর মতে; সার্বজনীন, আবশ্যিক ও আর্থিক দায়মুক্ত; (খ) শিক্ষা হল শরীরের শিক্ষা ও মনের শিক্ষা-শরীরের জন্য জিম্ন্যাস্টিক ও মনের জন্য সংগীত (Gymnastic for the body and music for the soul); (গ) শরীরের শিক্ষা ও মনের

শিক্ষা-এই উভয় শিক্ষাই আত্মার পুষ্টিসাধনের শিক্ষা; (ঘ) শিক্ষার আয়োজন হল পরিবেশ রচনার আয়োজন। শিক্ষা এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে এবং সেই পরিবেশে শিশু কালক্রমে কিশোর ও যুবকে পরিণত হলে তার মনে সুন্দরের ছায়াপাত ঘটবে এবং মন সুন্দরের দিকে চালিত হবে। যা সুন্দর তাই সত্য, তাই মঙ্গল। শিক্ষা মনকে সত্যের প্রতি ও মঙ্গলের প্রতি আগ্রাহী করে। (ঙ) প্রকৃত শিক্ষাই আদর্শ সমাজ গঠনের মূল হাতিয়ার। শিক্ষা আদর্শ শ্রমিক তৈরি করে না, শিক্ষা আদর্শ মানুষ তৈরি করে।

(ii)

প্রচন্ড ব্যস্ততা, নৈতিক বিপর্যয়, জটিল মানসিক জীবনযাপন, যান্ত্রিকতার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আমাদের প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্বের কিছু কিছু দিক হয়তো অমূলক বলে মনে হয়। তাই, প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্বের কিছু দিক আমাদের অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

প্রথমত, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা যা মানব প্রকৃতির বিরোধী বলেই মনে হয়। যাদের সেই অর্থে কেউই নেই তাঁদের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা গ্রহণীয় হলেও যাদের মাতৃস্নেহ এবং পিতৃস্নেহের সুযোগ রয়েছে তাদের সেই জায়গা থেকে বঞ্চিত করাটা উচিত বলে মনে হয় না। কারণ, পরিবারের মধ্যে থেকেই আমরা স্নেহ, ভালোবাসা কি সেগুলি বুঝতে শিখি।

দ্বিতীয়ত, ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় প্লেটো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে বিশেষ এক শ্রেণীরই শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি ক্রীতদাসদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে সেভাবে কিছুই বলেননি। এবং কোথাও যেন মনে হয়েছে তিনি উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এইরকম শিক্ষা বোধহয় আমরা কেউই মেনে নিতে পারি না। কারণ, অনেকেই হয়তো চাইবে না তাদের সন্তান-সন্ততি কেবল একজন রাজনৈতিক ব্যতিক্ত্ব হোক, সকলেই চান তাঁদের সন্তান-সন্ততি একজন ভাল মানুষ হোক।

তৃতীয়ত, প্লেটোর সময়ের শিক্ষাপ্রণালী এবং মানুষের জীবন যত সহজ ছিল আজকের বিশ্বে তা এক্কেবারেই নেই। শিক্ষার যে বৈচিত্র্য এখন দেখা যায় তা আমরা প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্বে দেখতে পাই না।

যদিও প্লেটো রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অভিভাবকদের জন্য শিক্ষার প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর শিক্ষা তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন তথাপি আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে প্লেটো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে এমন কিছু সার্বিক নীতি্র কথা বলে গেছেন যা প্রকৃত সার্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে আজও প্রযোজ্য।

প্রথমত, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভেদ মানা যাবে না। আজকের সমাজে women empowerment শব্দটি বহুল প্রচলিত। আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালেই দেখতে পাবো যে, শিক্ষাতে একশ্রেণীর মানুষের একচ্ছত্র অধিকার ছিল এবং নারীদের জন্য শিক্ষা! এ যেন ছিল এক অলীক কল্পনা। বিখ্যাত সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর জীবনী লক্ষ্য করলে কিছুটা বোঝা যায়। যদিও তার মাত্র কিছুদিন আগেই রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে সফল হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, যদিও আমরা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারি না তথাপি শিক্ষা যেহেতু ব্যয় সাপেক্ষ এক ব্যাপার তাই এক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রের যোগদানের কথা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করতে পারি না।

তৃতীয়ত, প্লেটোই প্রথম ব্যক্তি যিনি শিক্ষার সামাজিক দিকের কথা তুলে ধরেন। আমাদের প্রত্যেকের সফলতার পিছনে রাষ্ট্র তথা সমাজের সরাসরি যোগদান আছে। উচ্চশিক্ষার

ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আমরা পেয়ে থাকি তা আসে সাধারণ মানুষের আয়ের একটা অংশ থেকে। তাই, আমাদেরও উচিত সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া। এসব ভুলে আমরা পাড়ি জমাই বিদেশের মাটিতে কিঞ্চিৎ বেশি অর্থ এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য। এই কারণেই আমাদের দেশ অতি প্রাচীন এবং প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সভ্য হয়েও 'চির নাবালক চাষা'র দেশ হয়েই রয়ে গেছে। কারণ, দেশের মাটির প্রতি সেই টান এবং অনুভূতির ঘাটতি। তাই আমাদের দেশে প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্বের ব্যবহারিক দিকের প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী বলে মনে হয়। এখন যদিও এই অবস্থার কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে।

যাইহোক, এখন আমরা একটু বিশ্লেষণী আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবো। প্লেটো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে শিক্ষার যারা অধিকর্তা তারা বিবেচনা করে দেখবেন যে, কোন ছাত্র কি প্রকৃতির এবং কার মধ্যে কি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিবিধি নির্ধারণ করার দায়িত্ব থাকবে বিদ্যালয়গুলির এবং বিদ্যালয়গুলির সাথে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের গভীর যোগাযোগ থাকবে। কিন্তু, বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই একটি শিশু বড় হয়ে কি ধরণের কাজকর্মে নিযুক্ত হতে পারবে তা যেন তাদের অভিভাবকেরা প্রথম থেকেই স্থির করে ফেলেন। এইসব ক্ষেত্রে আবার শিক্ষা শেষ হলে অর্থ রোজগার কিভাবে করা যাবে সেই দিকটির প্রতিই বেশি নজর দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এখন অধিকাংশ পিতা-মাতাই চাইছেন যেন তাদের সন্তান-সন্ততি বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, স্কুল শিক্ষক, বড় একজিকিউটিভ অফিসার, ইত্যাদি পদে রত হয়। মনে হয়, এদের মধ্যে কেউই যেন ঐতিহাসিক, দার্শনিক, শিল্পী ইত্যাদি হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। সকলেই যেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর হওয়ার জন্যই জন্মেছে। যেকোন মূল্যেই ছেলে-মেয়েদেরকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি হওয়ার জন্য কোন ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ করে নিতে হবে। এবং তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তাদের সফল হয়ে বেড়িয়ে আসতেই হবে। এই ভাবনা প্রথম দিন থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, কত শিশুর যে সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে সত্যিই তার কোন ইয়ত্তা নেই। শিশুরা স্নায়ুর চাপে ভুগছে এবং বেশিরভাগ ভুলভাল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে নয়তো অতিরিক্ত ভেঙ্গে পড়ছে। এও একধরণের অসুস্থতা। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত মতামত না থাকায় এবং শিক্ষার মধ্যে কোনরকম নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এই অবস্থা দিনের পর দিন যেন আরও বেড়ে চলেছে।

শিক্ষার আসল লক্ষ্য হল মানুষ তৈরি করা ও উপযুক্ত কর্মের জন্য গড়ে তোলা। কিন্তু, বর্তমানের হালচাল বা হাবভাব দেখলে মনে হয় যেন শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য কর্মের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। ফলে যে সমস্ত শিক্ষায় বিশেষ কর্মকুশলতা অর্জন করা যাবে না সেগুলিকে অবহেলা করা হচ্ছে। সম্ভাবনা ও আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও অনেকে এসব জায়গায় নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে চাইছে না। ফলে আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে দেশে দেশে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, কলা, শিল্পকলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উপেক্ষিত। এগুলি মানব সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অংশ। এদের চর্চা বন্ধ হয়ে গেলে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে। শিক্ষাতত্ত্বের মধ্য দিয়ে যদি এইসব দিকগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করা হয় এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও চেতনার মধ্যে যদি এগুলি স্থান না পায় তাহলে তা হবে এক বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের হাত থেকে মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। আর তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাতত্ত্ব প্রয়োজন এবং প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব বহুলাংশে আমাদের সেই পথ দেখাতে পারবে বলে মনে হয়।

তাই প্লেটোর মত প্রাচীন হয়ে গেছে বলে মনে হলেও তাঁর সব কথা যে পুরনো হয়ে গেছে তা আমরা মানতে পারি না।

(iii)

যথার্থ শিক্ষা বিনয় দেয়, নম্রতা দেয়, ধীর স্থির করে, কাউকেই প্রতিযোগী ভাবতে শেখায় না, অহংকারী করে না, স্বেচ্ছাচারী করে না। উপযুক্ত শিক্ষাই পারে মানব মনের যথাযথ বিকাশ ঘটাতে। মনের বিকাশ ঘটলেই ধীরে ধীরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই জগতকে দেখার ও বোঝার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই চরিত্র গঠনের পথ মসৃণ হয়। প্লেটো আশা রেখেছেন উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ হয়ে উঠবেন প্রকৃত মানুষ। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মানুষ তৈরি করাই আমার লক্ষ্য।' তথাকথিত অর্থে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ স্ব-শিক্ষিত ও সুশিক্ষিত কোনটাই হতে পারে না। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই পথে-ঘাটে একজন পোষাকে-আশাকে ভদ্র, শিক্ষিত মানুষ অন্য আর একজনের সাথে বিরূপ বার্তালাপ করছেন। আসলে এই ধরণের মানুষগুলোর প্রকৃত শিক্ষা যে হয়নি নিঃসন্দেহে একথা বলাই যায়। কারণ উপযুক্ত শিক্ষা আমাদের মনুষ্যত্বে উন্নিত করে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, স্কুল শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, ইত্যাদি যা কিছুই হই না কেন যদি মানুষ না হই তাহলে মনুষ্য জন্মই বৃথা। তাই আমরা দেখতে পেলাম প্লেটো উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ তৈরির তাগিদে তাঁদের শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেভিড হিউমের একটি ছোট্ট বক্তব্য দিয়ে আলোচনা শেষ করব। তিনি তাঁর **An Enquiry Concerning Human Understanding**গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষে বলেছেন, 'Be a philosopher, but amidst all your philosophy be still a man'। অর্থাৎ দার্শনিক হও, কিন্তু তোমার সকল প্রকার দার্শনিক ভাবনার মধ্যেও অন্ততঃ একজন মানুষ হও। অর্থাৎ একজন প্রকৃত সৎ চরিত্রবান, মনুষ্যত্বযুক্ত মানুষ গড়ে তোলায় যে প্রকৃত ও যথাযথ শিক্ষার আবেদন একথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। তাই আমাদের স্ব-শিক্ষিত যেমন প্রত্যেককেই হতে হবে সেই সঙ্গে হয়ে উঠতে হবে সুশিক্ষিত। স্ব-শিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত হওয়া যদি সম্ভব হয় আমাদের পক্ষে, তখনই আমরা বিদ্যার অহমিকা থেকে বের হয়ে শিক্ষাকে আচরণে ফুটিয়ে তুলতে পারবো। আশা রাখবো, এর ফলস্বরূপ জীবনের পথ যতই আঁকা বাঁকা হোক না কেন আমরা তা মসৃণভাবে অতিক্রম করতে পারবো।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। Nettelship, Richard Lewis, *Lecture on the Republic of Plato,* Macmillon, New York, 1968.
২। Jowett, Benjamin, *The Dialouges of Plato,* Vol-II, Oxford, 1953.
৩। Conford, Francis Macdonald, (translate), *The Republic of Plato*, Oxford University Press, London, 1941.
৪। Plato, Translated from Greek by Benjamin Jowett with an itroduction by Dhananjay Singh, Rupa publishers, New Delhi, Fourth impression, 2017.
৫। Plato. *The Republic*, London: Penguin, 1987.
৬। Lindsay, A.D. *Plato: The Republic*, New York, 1995.
৭। দে, সুধাকান্ত, গণরাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কল্কাতা-৭০০০১৩, মার্চ, ১৯৯০।
৮। ফজলুল করিম, সরদার, এরিস্টটল-এর পলিটিকস, T.A.Sinclairকৃত ইংরেজি অনুবাদের অনুসরণে বাংলা অনুবাদ, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৫।
৯। আলম, মতিউল, অ্যারিস্টটলের পলিটিকস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, (বার্ট্রান্ড রাসেলের অনুবাদ), অবসর প্রকাশনা, ঢাকা ১১০০, জানুয়ারি, ২০১২।

আজীবকদের দার্শনিকতা : একটি ইতিবৃত্ত

পায়েল চট্টোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: ভারতের নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আজীবক হল এক অবলুপ্ত সম্প্রদায়। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের সমসাময়িক এই দর্শন। আজীবকদের ধর্মাচরণ পদ্ধতি, তাদের দর্শনমত, জীবন যাপন পদ্ধতি ভীষণই আশ্চর্যজনক এবং অভিনব। এরা একদিকে যেমন বেদের বিরোধিতা করেছে আবার বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিরোধী দর্শন এটি।

এরা জগতের কারণ রূপে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু, ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। এদের মতে নিয়তির নির্দেশেই বিশ্বসংসার পরিচালিত হচ্ছে। এই দর্শন মতের তথ্য সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায়না। এদের বিরোধী দর্শনে আজীবকদের যেভাবে সমালোচনা করা হয়েছে তার থেকেই এই মতের সম্পর্কে ধারণা করা হয় মাত্র। কিন্তু আজীবকের মত এক উদারনৈতিক, যুক্তিবাদী দর্শন মত। এই দর্শনের বিলুপ্তি সাধন কখনই কাঙ্খিত নয়। আজীবক মতের পুনরুদ্ধার এই প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা।

সূচক শব্দ: নাস্তিক, নিয়তিবাদ, পরমাণুবাদ, কর্মবাদ, ঋত।

মূল আলোচনা:

ভারতীয় দর্শন চিন্তাধারার দুটি স্রোতের পরিচয় পাওয়া যায় – এক, বৈদিক চিন্তন, অপরটি হল অবৈদিক চিন্তন। যেই দর্শন বৈদিক চিন্তাধারার অনুগামী তারা বেদকেই প্রমাণ বলে মনে করেন। অপরদিকে যে দর্শন মত বৈদিক চিন্তার বিরোধী তারা বেদকে অপ্রমান বলেন। এই অবৈদিক দর্শনগুলি বিভিন্ন নামের এবং প্রকারের; যেমন- অক্রীয়বাদী, সন্দেহবাদী, নিত্যবাদী, উচ্ছেদবাদী, আজীবক। এছাড়াও এই ধরনেরই অপর দুটি দর্শন হলো জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শন। অপরাপর অবৈদিক দর্শনগুলি ক্রমে উচ্ছেদ হয়ে গেলেও বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন পরবর্তীকালে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও বিপুল পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু এই ধরনেরই এক অবৈদিক দর্শন হলো আজীবক দর্শন। এই আজীবক দর্শন ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই দর্শনকে তাই 'lost religion of India' বলা হয়। কিন্তু বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনের পরই এই দর্শনের স্থান। আজীবক দর্শন যে কেবলমাত্র একটি অবৈদিক দর্শন তাই নয়, তার সঙ্গে এই দর্শন বৌদ্ধ ও জৈন মতের বিরোধী এক মতবাদ। পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই মতের উদ্ভব হয় এবং চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এই মতের সন্ধান ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের ৫০০ সাল আগে থেকে ১৪০০ সালের পর পর্যন্ত এই মতের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এরপর এর অবলুপ্তি ঘটছে।

আজীবক শব্দের অর্থ হলো ‘following the ascetic way of life’ অর্থাৎ সন্ন্যাসীর জীবনযাপনই আজীবক। এই মতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাখালি গোসালা।[১] এনাকে গোসালা মখালিপুত্রও বলা হয়। যদিও মাখালি গোসালাকে প্রথম আজীবক রূপে পাওয়া যায় কিন্তু সম্ভবত তিনি এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নন, বরং আজীবকদের তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আজীবকদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতার নাম কোন গ্রন্থেই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মাখালি গোসালার পূর্বেও যে

আজীবক সম্প্রদায় অস্তিত্বশীল ছিল তার স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। মাখালি গোসালার পিতার নাম মাখালি অথবা মানখা। তিনি একজন ভিক্ষুক। মাখালি গোসালার মায়ের নাম ভাদ্দা।[২] মাখালি গোসালার জন্মের পূর্বে তার পিতা বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করতে করতে একটা সময় সারাভানা গ্রামে যান। সেখানে গোবাহুলা নামে এক ধনী ব্যক্তির সাহায্যে তাঁর গোসলায় তাঁর থাকার স্থান হয়। সেই গোসালাতে মাখালি গোসালার জন্ম হয়। তাই তার নাম মাখালি গোসালা। মাখালি গোসালার জন্ম তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী জেলার তিরুপুতুর গ্রামে। তিনি প্রথম জীবনে পিতার জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই সময় শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। গোসালা ছয় বছর মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। উনার কাছেই তিনি জৈন ধর্ম শিক্ষা করেন। জৈন গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় যে, এরপর গোসালা জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। কারণ জৈন ধর্মের বেশ কিছু ত্রুটি তাকে বিচলিত করে। এর কয়েক বছর পর যখন তিনি মহাবীরের সম্মুখীন হচ্ছেন তখন তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক মানুষ। যার জীবন পন্থা, দর্শন, চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাকে এও বলতে শোনা যাচ্ছে যে পূর্বের যে গোসালা সে আর নেই, যিনি কিনা মহাবীরের শিষ্য ছিলেন।[৩] এই গোসালার আত্মা এক পরিবর্তিত আত্মা। এখন যে গোসালা মহাবীরের সম্মুখে দন্ডায়মান তার পুনর্জন্ম হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে আজীবক দর্শন ও জৈন দর্শন দুটি ভিন্ন দর্শনের দিশারী। যদিও কিছু অংশে এই দুইয়ের মিলও রয়েছে। এদের জীবনযাত্রার ধরন কিছুটা একই রকম কিন্তু সম্পূর্ণ এক নয়, বরং একে অন্যের বিরোধী।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ছেলে বিন্দুসার আজীবকের অনুগামী ছিলেন, ইনি সম্রাট অশোকের পিতা। অনেকের মতে বিন্দুসারের পত্নী আজীবকের অনুগামিনী, আর বিন্দুসার হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যাইহোক পরবর্তীতে বিন্দুসার আজীবকদের অনেকটাই সংরক্ষণ করেছেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এটাও সত্য। এই সময়টি আজীবক দর্শনের প্রভূত উন্নতির সময়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী। তিনি জৈন ধর্মেরই প্রচার এবং প্রসার করে গেছেন। তার পুত্র বিন্দুসার আজীবকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আর বিন্দুসারের পুত্র অশোককে পাওয়া যায় একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজারূপে। তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে এক চরম উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ-শ্রমণ এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি ভারতের বাইরে বিদেশেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার এবং প্রসার ঘটে এইসময়। এইসময়েই আজীবকদের একেবারে অবলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে। এমন কথিত আছে কুড়ি হাজার আজীবক সন্ন্যাসীকে রাজা অশোক হত্যা করছেন; কারণ তারা বৌদ্ধ ধর্মকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন বা টিপ্পনি করেন; যদিও এর সত্যতা বিষয়ে তেমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছেনা। আবার অপরদিকে এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে একটা সময় সম্রাট অশোক রাজগীরে অবস্থিত বারাবার নামক একটি গুহা আজীবকদের থাকার জন্য দিয়ে দিয়েছিলেন। যাইহোক উত্তর ভারত থেকে আজীবক দর্শন একটা সময় সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেলেও ১৬০০ সাল পর্যন্ত কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর দক্ষিণ দিকে এই সম্প্রদায়ের সন্ধান মেলে। এই সময়েই প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তি আজীবকের অনুগামী হয়। চতুর্দশ শতকের দিকে এই ধর্মের সমাপ্তি।

এখন প্রশ্ন হয় আজীবক সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও দর্শনকে বোঝার বা জানার উপায় কি? বস্তুত একটি সম্প্রদায় বা দর্শনকে জানার দুটি উপায় থাকে। ১. সেই সম্প্রদায়ের লিখিত নিজস্ব গ্রন্থ থেকে ২. অন্য সম্প্রদায়কৃত গ্রন্থে ওই সম্প্রদায়ের কিছু তথ্যের উপস্থাপনা থেকে।

আজীবক দর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যায় আজীবক সন্ন্যাসীরা তাঁদের দর্শন মত যে সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই প্রাথমিক উৎসগ্রন্থগুলি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন বৌদ্ধ, জৈন ও বিরোধী অন্যান্য গ্রন্থে আজীবকমতের বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু সমস্যা হল কখনোই একটি ভিন্ন বিরোধী সম্প্রদায় কর্তিক রচিত গ্রন্থে সেই সম্প্রদায়ের সঠিক রূপের সন্ধান পাওয়া যেতে পারেনা। যেমন যখন একটি জৈন গ্রন্থে আজীবক মতের উল্লেখ থাকবে স্বাভাবিকভাবেই জৈনগন নিজের মতের সমর্থনে যুক্তিপ্রদান করবে। আর সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিরোধী মতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা অস্বাভাবিক কিছু নয়।[৪] এই আজীবকদের কোন সূত্রগ্রন্থ না থাকায় আজীবক দর্শন সংক্রান্ত তথ্যগুলির যাথার্থতা বিষয়ে সংশয় জাগে। কিন্তু এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে আজীবকদের বক্তব্য যেমন মৌলিক তেমনি দৃঢ়। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করা অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছেও প্রায় অসম্ভব। যাইহোক আজীবক, জৈন এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সকলেই অন্ধ বিশ্বাসের বদলে যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি মতের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের পক্ষপাতি ছিলেন। এরা তিনজনেই বুদ্ধিবাদী। আবার বেদবিরোধী দর্শনের প্রচারক। ঈশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্ব যেমন তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন তেমনি যাতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই যে ধর্মাচরণে অধিকার আছে সে কথা সদর্পে ঘোষণা করেন। ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গড়ে ওঠা শ্রমন আন্দোলনের মুখপাত্র হলেন এই তিনটি দর্শন সম্প্রদায়। এটি একটি বেদ বিরোধী আন্দোলন; এরা বেদকে যেন পুনর্নির্মাণ করতে চাইছেন। বৈদিক ধর্ম পুনর্গঠিত হোক এমনটাই যেন এদের লক্ষ্য। যদিও বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে আজীবকদের চরম বিরোধী দর্শন বলেই দেখানো হয়েছে। ওই সকল গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় মাথালি গোসালা একজন উদ্ধত, অনিষ্টকারী ব্যক্তি। হাস্যকর তার জীবনযাত্রা এবং তার বক্তব্য। এমনকি আজীবকদের খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া বৌদ্ধ দর্শনে ভীষণভাবেই সমালোচিত হয়েছে। তাদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত হাস্যস্পদ একটি বিষয়। কারণ আজীবকগণ অত্যন্ত স্বল্প খাদ্য গ্রহণ করতেন। এই বিষয়টিকে বৌদ্ধ দর্শনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে আজীবকগণ প্রকাশ্যে খাদ্য গ্রহণ না করলেও লুকিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতেন। মনে হয় প্রভাকরদের অর্থাপত্তি প্রমাণের উদাহরণে আজীবকদের খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতিকে দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ অর্থাপত্তি প্রমাণের উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে - দেবদত্ত দিনের বেলায় খায় না অথচ মোটা। আবার সে অসুস্থও নয়। এর থেকে কল্পনা করা যায় যে দেবদত্ত রাত্রিবেলায় ভোজন করে। যদিও দেবদত্তের রাত্রিভোজন এর স্বপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। বিষয়টি কল্পিত মাত্র। এই কল্পনা বহুলাংশেই শ্লেষ সূচক। এই শ্লেষ আজীবকদের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়েছে একথা সহজেই বোঝা যায়।

আবার জৈন গ্রন্থেও পাওয়া যায় যে মহাবীরের সঙ্গে আজীবক সন্ন্যাসী মাখালি গোসালের এক সাংঘাতিক সংঘাত উপস্থিত হলে মহাবীরই সেই সংঘাতে বিজয়ী হন। এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মহাবীরের পরাজয়ের গল্প কোনোভাবেই জৈন গ্রন্থে দেখানো সম্ভব নয়। বস্তুত এই ঘটনার সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে আজীবকদের সমালোচনাই করা হয়েছে এবং এখানে একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে মাখালি গোসালা এই সব দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী। এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, বিরোধী একটি গ্রন্থ তার প্রতিদ্বন্দ্বী মতটি বিজয়ী মত রূপে প্রতিষ্ঠা করবে।

যাই হোক, এই সকল বিরোধী গ্রন্থ থেকে আজীবক সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে এটা বোঝা যায় যে আজীবক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য হলো নিয়তিবাদ[৫] অর্থাৎ এরা বিশ্বাস

করতেন যে, সব কিছুই পূর্বনির্ধারিত; ভাগ্যই সকল কিছুর নিয়ন্ত্রা, ব্যক্তির কোন প্রচেষ্টাই তার জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে কর্মবাদী তত্ত্ব এদের পরিহার করতে হয়েছে। কর্মবাদী তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। কর্মবাদী তত্ত্ব একদিকে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বর্তমান পরিস্থিতির কারণের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে তেমনি ইচ্ছার স্বাধীনতার কথাও স্বীকার করে নেয়। কারণ কর্মবাদ অনুযায়ী মনে করা হয় যে, ব্যক্তি যেমন কর্ম করবে তাকে অনুরূপ ফল ভোগ করতে হবে। সৎ কর্মের ফল শুভ; অর্থাৎ সুখপ্রদ এবং অসৎ কর্মের ফল অশুভ; অর্থাৎ দুঃখ প্রদানকারী। সুতরাং কোন কর্তা যদি ভালো ফল পেতে চায় অর্থাৎ সুখ ফল পেতে চায় তাহলে তাকে সৎকর্ম করে যেতে হবে। আর কর্ম করা বা না করা পুরোপুরি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে সুতরাং ব্যক্তির শুভ অথবা অশুভ ফলোপ্রাপ্তির জন্য দায়ী সেই ব্যক্তি নিজে।

এখন নিয়তিবাদ মানলে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা বলে কিছুই আর থাকেনা। কারণ সকল কিছুই যেহেতু পূর্বনির্ধারিত তাই ব্যক্তি কি কর্ম করবে তাও যেমন পূর্বনির্ধারিত তেমনি তার বর্তমান জীবন কেমন হবে তাও পূর্বনির্ধারিত। সুতরাং সে ভালো কাজ করুক বা মন্দ তার ফল কি হবে সেটি কর্মের উপর নির্ভর করে না। আগে থেকেই কোন অদৃশ্য শক্তি বলে সব কিছুই ঠিক করা আছে। যেন এক বিশ্বজনীন শাশ্বত নিয়ম পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সেই নিয়ম অনুযায়ী সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সুতরাং ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন গুরুত্বই এখানে নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৈদিক দর্শনেও ঋত নামক এক বিশ্বজাগতিক শাশ্বত নিয়মের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যে নিয়ম সকল ব্যক্তি এবং দেবতাও মেনে চলতে বাধ্য। এই ঋত অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও ঋকবেদের ঋষি ঋত প্রসঙ্গ স্বীকার করলেও কর্মবাদী তত্ত্বও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুতরাং আজীবক দর্শনের নিয়তিবাদের সঙ্গে ঋতর ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কথা বোধহয় বলা যায় না। যাইহোক, এখন প্রশ্ন হয় এই অদৃশ্য শক্তি যার দ্বারা বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা কি ঈশ্বর? আজীবকরা কখনোই বলবেন না যে এই শক্তি ঈশ্বর। কারণ কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব এরা স্বীকার করেনা। তারা বলবেন, এই সমগ্র বিশ্বসংসারের সৃষ্টির কারণ হলো পরমাণু। অর্থাৎ পরমাণু তত্ত্বের সাহায্যেই জগতের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা এরা করেন। ভাগ্য বা নিয়তি বলতে যা কিছু বোঝায় তা এই পরমাণুর দ্বারাই গঠিত। মহর্ষি কনাদ রচিত বৈশেষিক সূত্র গ্রন্থে পরমাণুর ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু বৈশেষিকাচার্যের স্বীকৃত পরমাণুবাদের সঙ্গে আজীবক স্বীকৃত পরমাণু তত্ত্বের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। কারণ, বৈশেষিক মতে জগতের উপাদান কারণ পরমাণুগুলি অনু পরিমাণ, নিষ্ক্রিয়, গোলাকার, সংখ্যায় অসংখ্য। পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে স্থূল জড় জগৎ উৎপন্ন করে। ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় পরমাণুর মধ্যে গতির সঞ্চার করেন এবং জীবের অদৃষ্ট অনুযায়ী কর্মফল ভোগের অনুকূল জগৎ রচনা করেন। এই জগত রচিত হয় পরমাণুগুলির সংযোগের ফলেই। পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন প্রথম সংযুক্ত পদার্থ হল দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুক জুড়ে তৈরি হয় ত্র্যণুক। চারটি ত্র্যণুক মিলিত হয়ে উৎপন্ন করে চতুর্ণ্যুক। এটি হল প্রথম দৃশ্যমান স্থূল পদার্থ। জীবের কর্ম এবং তজ্জন্য উৎপন্ন কর্মফলই পরমাণু সংযোগের কারণ।

অপরদিকে আজীবক দর্শনে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও সেই পরমাণুগুলির সংযোগের কারণ কোন কর্মফল ভোগের উদ্দেশ্য নয় অথবা কোন অদৃষ্ট শক্তির কর্তৃত্ব এর জন্য কল্পনা করা হয় না। আজীবকদের বক্তব্য হল নিয়তির ওপর কোন কিছুরই প্রভাব থাকতে পারে

না। আত্মার ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে আজীবকগণ বলেন আত্মা হল এক সৃষ্ট দ্রব্য। পরমাণুর সংযোগেই আত্মার সৃষ্টি। যেসকল দর্শন আত্মা স্বীকার করে তারা কেউই আত্মাকে সৃষ্ট দ্রব্য বলেন না। কারণ তাতে আত্মার নিত্যত্বের হানি হয়। তাদের মতে আত্মা এক, নিত্য ও বিভু। কিন্তু আজীবকরা মনে করেন আত্মাও পরমাণুর সংযোগে সৃষ্ট। এই আত্মাও নিয়তি অনুযায়ীই নিয়ন্ত্রিত হবে। বৌদ্ধদের মত এরাও বলেন আত্মা হল চেতনার নিস্তরঙ্গ প্রবাহ। কিন্তু এই প্রবাহ কর্মফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং নিয়তি নির্ধারিত। যেমন ভাবে একটি দড়িতে এক টুকরো ইট বেঁধে ঘোরালে সেটি ঘুরতেই থাকে যতক্ষণ না বাইরে থেকে কোন শক্তি তাকে আটকাচ্ছে। কারণ পাথরটার নিয়তি বা স্বাভাবিকই হলো সেটি সর্বদাই ঘূর্ণায়মান হবে, তেমনি আত্মা ও এক বন্ধনে আবদ্ধ। অর্থাৎ জীবের জীবন মরণ সুখ-দুঃখের বন্ধনে আবদ্ধ এই আত্মা। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় নেই, যতক্ষণ না কেউ এই বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করছে। অর্থাৎ কেউ যদি আত্মাকে বাইরে থেকে বন্ধন মুক্ত করে তবেই সে মুক্ত হতে পারবে। আর এটা কেবল নিয়তির দ্বারাই সম্ভব। এখানে কর্মের কোন ভূমিকা নেই।

এরপর আজীবক দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে যে আলোচনাটি তা হল বস্তুর গুণাগুণ কিভাবে নির্ধারিত হবে? সেই বিষয়ে আজীবকদের বক্তব্য কি হতে পারে? অর্থাৎ সকল বস্তুর গুণাবলী একই রকমের নয়। বস্তু ভিন্ন কারণ তাদের গুণগত প্রভেদ রয়েছে তাই। কিন্তু বস্তুর এইপ্রকার তারতম্য কেন হয়? এই প্রসঙ্গেও আজীবকদের বক্তব্য হল পরমাণু বিন্যাসের তারতম্যের কারণে বস্তুর গুণগত ভেদ ঘটে। আবার সময়ের সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রেই বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন আসে। কারণ পরমাণুগুলির বিন্যাসের পরিবর্তন হয়ে থাকে। প্রশ্ন হয়, পরমাণুর বিন্যাস পরিবর্তিত হয় কেন? এর উত্তরে যুক্তি হলো মহাজাগতিক শক্তির (cosmic force) কারণেই এই পরিবর্তন হয়। আর এসবই পূর্বনির্ধারিত। কারণ মহাজাগতিক শক্তি পূর্ব নির্ধারিত। সুতরাং তার ফলে পরমাণুর মধ্যে যে পরিবর্তন সংগঠিত হয় তাও পূর্ব নির্ধারিত কারণে হয়ে থাকে। এরথেকে এও বলতে পারা যায় যে পরমাণুর বিন্যাস ও তার আচরণ পূর্ব নির্ধারিত। ফলে, যে আত্মা এই পরমাণুর বিশেষ বিন্যাসে রচিত তাও কোন কর্মফল বা অদৃষ্ট ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আত্মাও কেবলমাত্র মহাজাগতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। আর কোন জীবেরই এরূপ ক্ষমতা নেই যে সে তার নিজের ইচ্ছেতে জীবন নির্বাহ করতে পারে।

এরা সময়ের যে বিভাজন, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই বিন্যাস স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের মত এরাও অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী। যেকোনো পার্থিব ভোগ বাসনা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার কথা এরাও বলতেন। এমনকি বস্ত্র পরিধানেরও এরা পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে দিগম্বর সম্প্রদায় বস্ত্র পরিধান করতেন না। তবে আজীবকদের এই বিনা বস্ত্রে সাধনার কারণ সম্পর্কে বৌদ্ধ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কোন এক গ্রামে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাখালি গোসালার একবার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে সেই দ্বন্দ্ব এমন ভয়ানক পরিস্থিতি ধারণ করে যে গ্রামবাসীগণ গোসালাকে মারতে উদ্যত হয়। তারা তাকে ধরার চেষ্টা করলে তিনি পালিয়ে বাঁচার জন্য দৌড়ে চলে যেতে চান। কিন্তু গ্রামবাসীরা গোসালাকে ধরে ফেলে এবং সেই দ্বন্দ্বে গোসালার পরিধেয় বস্ত্র গ্রামবাসীরা ছিনিয়ে নেয়। সেই থেকেই গোসালা ঠিক করে নেয় যে তিনি বিনা বস্ত্রে জীবন অতিবাহিত করবেন। তিনি প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মানুশীলনের প্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলি হাস্য রসাত্মক, ব্যঙ্গাত্মক ভাবে উপস্থাপন করতেন। স্বভাবতই এতে লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত এবং গোসালার সঙ্গে ওই সকল ব্যক্তির দ্বন্দ্বের সূচনা হতো। যাই হোক, এই সকল কাহিনীর সত্যাসত্য প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে একথা ঠিক যে

আজীবক সন্ন্যাসীদের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। কৃচ্ছতা সাধনই ছিল তাদের সাধনার অঙ্গ। এনারা কাদা মাটি মেখে থাকতেন এবং সর্বদাই হাতে একটি বাঁশের দন্ড ধারণ করে থাকতেন। বেশিরভাগ সময় একা একাই থাকতে পছন্দ করতেন এবং বাহ্যজগতের সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একান্তে সাধনা করতেন এরা। তবে ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতি তারা বিশেষ যত্নশীল ছিলেন, এমন বলা যায় না। কারণ নিজেদের কৌমার্য রক্ষার প্রতি তারা তেমন কঠোর ছিলেননা বা নারী সংস্রব এড়িয়ে চলতে হবে এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না তারা। অথবা যে সন্ন্যাসী কোন নারীর সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত সে পাপকর্মে নিযুক্ত, এমনটা তারা মনে করতেন না। আবার অনেক ধরনের আশ্চর্য কাজও তারা করতেন। অর্থাৎ যোগবিদ্যা, যাদুবিদ্যায় কোন কোন সন্ন্যাসী বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। যেমন পেরেকের উপর অথবা কাটার উপর শুয়ে থাকা, আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটা ইত্যাদি।[৬] যেকোনো প্রাকৃতিক অবস্থাকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাদের। বরং প্রকৃতির চরম অবস্থার মধ্যে কিভাবে নিরুদ্বিবিঘ্ন থাকা যায় সেটাই যেন ছিল তাদের লক্ষ্য। যেমন চরম শীতে রাত্রে তারা বাইরে বেরিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় সেই আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। আর দিনের বেলায় রৌদ্রে থাকার বদলে গুহার মধ্যে চলে যেতেন। অন্যদিকে গরমের সময় দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর রোদে বাইরে সময় কাটাতেন। আর রাত্রে গভীর জঙ্গলে চলে যেতেন। অনেক সময়ই তারা বড় মাটির পাত্রে প্রবেশ করে তপস্যা করতেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, আজীবকদের মূল আস্তানা ছিল এক মহিলা কুম্ভকারের গৃহে। তার নাম হালাহালা। এনার বাড়ি উত্তরপ্রদেশের শ্রাবস্তী নগরে। সেই জায়গাকার অনেক মানুষ আজীবকদের অনুগামী হন এবং তাদের জ্যোতিষবিদ বলে সমাদর করেন। এই সময় গোসালার জীবনে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির চরম উৎকর্ষতা সাধিত হলেও তার অন্তিম পরিণতি কিন্তু সুখদায়ক ছিলনা। বরং অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল সেই মুহূর্ত। তিনি রোগগ্রস্থ অবস্থায় মারা যান। এই সময় তার জ্বর হলে জ্বরের অবস্থা ভুলে থাকার জন্য এবং তার অতীত জীবনের সকল দুঃখ অপমান ভুলে থাকার জন্য অনেকটা পরিমাণে মাদক সেবন করেন। সেই অবস্থায় নাচ-গান করতে থাকেন। এই সময়ে তার হাতে ছিল একটি আম। তিনি তার অনুগামীদের নির্দেশ দেন তাকে সম্মানীয় উপায়ে সমাধিস্ত করতে। আবার তৎক্ষনাত তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন। আর অনুগামীদের পুনরায় নির্দেশ দেন তারা যেন তাকে সকল সম্ভাব্য উপায়ে অসম্মানিত করে। তার অনুগামীরা তার দুটি ইচ্ছাই পূরণ করেন এবং তাকে সমাধিস্থ করেন।

আজীবক দর্শনে যেমন প্রচলিত দার্শনিক মতের বিরোধিতা করা হয়েছে তেমনি একই সঙ্গে বিরোধী দর্শনের সাধন পদ্ধতিরও বিরোধিতা করা হয়েছে। এই দর্শনের সাধন পদ্ধতির অনন্যতা হল নাচ ও গানকে এরা সাধনার অন্তর্ভুক্ত করেন। এই নৃত্য-গীত পদ্ধতি অন্য কোন ধর্মানুশীলন পদ্ধতির মধ্যে দেখা যায়নি এর পূর্বে। এরও অনেক পরে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতকের সময়ে সুফি আন্দোলনের জোয়ার আসে। যারা নৃত্য গীতকে সাধনার অঙ্গ মনে করতেন। এরা মূলত প্রচলিত ইসলামিক প্রথার বিরোধিতা করে নতুন এক ইসলামীয় মতের সূচনা করেন। যেমন প্রচলিত ইসলামে নামাজ পড়ার পদ্ধতি অথবা বেশ কিছু জীবন যাত্রার পদ্ধতির এরা বিরোধিতা করেন। সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন ফারাসি ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনেরও একটি সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও এরা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। তবে কোন কোন সুফিসন্ত রাষ্ট্রের অধিনতাও স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ সুফিদের মধ্যেও দুধরনের সন্ন্যাসীর

সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একদল যারা মনে করতেন ঈশ্বরই চরম এবং অন্তিম সত্য। ব্যক্তি জীবনে রাষ্ট্র তথা সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন বলে এরা মনে করতেননা। অপরদিকে আরেক দল সুফি সন্ন্যাসী ছিলেন যারা ঈশ্বরকে জীবনের সর্বশেষ সত্য বলে মনে করতেন তাঁরা রাষ্ট্রেরও যে বিশেষ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন তা মেনে নিয়েছিলেন। সুফি দার্শনিকদের মধ্যে যেমন বেদান্তের প্রভাব রয়েছে তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। এরা সাধন পদ্ধতির মধ্যে নৃত্য-গীতকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কারণ এরা মনে করতেন নৃত্য গীত হলো ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার একটি উপায়। কিন্তু এই সুফি দর্শনের পূর্বে নৃত্যগীতের মাধ্যমে সাধন ভজনের কথা আজীবকগণ বলে গেছেন। এর পূর্বে বৌদ্ধ, জৈন অথবা সনাতন ধর্মেও নৃত্য গীত পদ্ধতির কথা কোথাওই বলা হয়নি। সুতরাং এটি অনস্বীকার্য যে আজীবক দর্শন এই দিক থেকে অনন্যতার দাবি রাখে।

কিন্তু আজীবক দর্শনের মূল সমস্যাই হল তাদের নিয়তিবাদকে কেন্দ্র করে। কারণ কোন ব্যক্তি যদি নিজে তার কর্মের নিয়ন্ত্রক না হয় তাহলে কর্মের দায়িত্ব তাতে বরতায়না। সে ভালো কাজ করুক বা মন্দ তার জন্য উৎপন্ন ফলটি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে এবং সেই ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। 'নৈতিক কাজ করা কর্তব্য' এমন নৈতিক কর্তব্যবোধ তার আর থাকে না। কারণ সবকিছু পূর্বনির্ধারিত হলে ভালো কাজের জন্য যে সে ভালো ফল পাবে তার নিশ্চয়তা নেই। আবার সমাজের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ধারণের দায়িত্বও তার নয়। ফলে ব্যক্তির ধর্মাচরণও মিথ্যা হয়ে যায়। এরথেকে এটাও বলতে হয় যে সামাজিক নৈতিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে বাধ্য যদি নিয়তির দ্বারা জগত সংসার নিয়ন্ত্রিত হয়, এমনটা মানা হয়।

আবার এমন প্রশ্ন জাগে যদি কর্মের কোন ভূমিকা ব্যাক্তি জীবনে না থাকে তাহলে আজীবক সন্ন্যাসীরাই বা কেন এতরকম সাধন ভজনের উপায় নির্দেশ করে গেছে? এত কঠিন তপশ্চরণের কারণই বা কি? তাহলে কি আজীবক দর্শনের মূল কিছু তথ্য অজ্ঞাত থেকে গেছে, যেগুলি কিনা বৌদ্ধ বা জৈন গ্রন্থগুলিতে প্রকাশ করা হয়নি? এমনও হতে পারে আজীবক মতের উৎকর্ষতা অনুমান করে সজ্ঞানে আজীবক দর্শনের উৎকৃষ্ট কিছু তত্ত্বের উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে। তবে আমার মনে হয় কেবলমাত্র দার্শনিক উৎকর্ষতা বা অনুৎকর্ষতা এই দর্শনের মানদণ্ড নয়, এর সঙ্গে একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত জড়িত রয়েছে। অপরাপর দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এক উচ্চবিত্ত প্রভাবশালী এবং উচ্চ বর্ণের কোন ব্যক্তি; যেখানে আজীবন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্ত পরিবারের এক ব্যক্তি। স্বভাবতই নিজেদের উৎকর্ষতা প্রমাণের জন্য অপর মতের অনুৎকর্ষতা প্রদর্শন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তবে যাইহোক, তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় আজীবক দর্শনের উৎপত্তি এবং বিস্তার অস্বাভাবিক কিছু বিষয় ছিল না। কারণ জাতিভেদ প্রথা সনাতন ধর্মের বেশ কিছু কলঙ্কিত রীতিনীতি,যা সেইসময় সাধারণ ব্যক্তি জীবনকে তোলপাড় করে তুলেছিল তখন সামাজিক সেই সকল কদর্যতার বিরুদ্ধে এ যেন এক তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলন। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি এমনকি নারী জাতিরও যে তপস্যা এবং নির্মাণে অধিকার আছে তা এই দর্শনে প্রথম দাবি করা হয়। সেই জন্যই হয়তো বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনের পর আজীবক সম্প্রদায় হল তৃতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী যারা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। এক বড় জনগোষ্ঠী এই সময় এই আজীবক মতের অনুসরণ করেছে এবং কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত এদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। পল্লব এবং চোল রাজাদের সময়ে এই ধর্মমত অত্যন্ত বাধা প্রাপ্ত হয়। চতুর্দশ শতকের শেষে এদের অনেকেই বৈষ্ণবদের ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এদের বেশ কিছু দর্শন মত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের মতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায়

এই সকল দর্শন মতের মধ্যেই মিশে গেছে আজীবক মত। এছাড়াও বৈষ্ণব ও ফকির সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই মতের অনেকাংশে মিলও পাওয়া যায়। সর্বশেষে আমার অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে এই যে, আজীবক মত কি ভারতবর্ষের দুর্গম পাহাড়-পর্বতে অথবা লোকসম্মুখের আড়ালে থাকা নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোন যোগসূত্রে গ্রথিত? অর্থাৎ নাগাসন্ন্যাসীগণ কি এইমত অনুসরণ করে চলে? আমার এই অভিমতের কারণ এই যে, এদের উভয়ের জীবন পদ্ধতির মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. Basham, A.L. (1981), History and Doctrins of The Ajivikas-A vanished Indian Religion, Motilal Banarasidass, p.3.
২. তদেব. পৃ- ৩৫
৩. তদেব. পৃ- ৩১
৪. Barua, B.M. (1920), The Ajivikas, Part-I, University of Calcutta, p-77
৫. তদেব. পৃ- ১৩
৬. তদেব. পৃ-৬৮

গ্রন্থপঞ্জী:

- Barua, B.M. (1920), The Ajivikas, Part-I, Calcutta: University of Calcutta.
- Basham, A.L. (1981), History and Doctrins of The Ajivikas-A vanished Indian Religion, Delhi: Motilal Banarasidass.
- ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (১৮৯০), জাতক কলিকাতাঃ করুনা প্রকাশনী।

কোভিড ১৯ ; সাহিত্যের আলোকে ইতিহাস, প্রান্তিক সমাজ ও মহামারী

কানু হালদার
অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়, ঠাকুরনগর

সারসংক্ষেপ: ইতিহাসের উপর দৃষ্টি রাখলে দেখা যায় প্রতিটি মহামারী কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। যার ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী। ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং সমাজতাত্ত্বিকরা এই ঘটনাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষন করেছেন। সমাজ কাল জাতি ধর্ম বর্ণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে কভিদ ১৯ 'গ্রেট ইকুইলাইজার' হলেও সব থেকে বেশি প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমাজ কাঠামোতে নীচের সারিতে অবস্থিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পরা জনগণ। কোভিড নিয়ে সাহিত্যিক, সমাজবিদ, দার্শনিক ও ইতিহাসবিদেরা মহামারী- অতিমারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের সূত্র খুজছেন সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে। এরা বর্তমান মহামারীর সম্ভাব্য প্রভাবের জন্য প্রতি তুলনা খুঁজছেন অতীতের মহামারী অতিমারির আর্কাইভে। যুক্তি হচ্ছে যে, এধরণের অতিমারি শুধু ব্যক্তিজীবনের বা অর্থনৈতিক জীবনের নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপরিকাঠামোতেও গভীর প্রভাব রেখে যায়, যেরকম তা দ্যাখা গেছে অতীতের মহামারী- অতিমারির ক্ষেত্রে। সেজন্যই অতীতের অভিজ্ঞতায় বার বার ফিরে যান, এবং সেই সূত্রে তাদের সৃষ্টি করতে হয় নতুন জ্ঞানের আর্কাইভ- সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস ও দর্শন থেকে। যুগে যুগে মহামারীকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির যে বিবর্তন ও বিকাশ কিংবা মহামারী কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের অনুষঙ্গ কতটুকু প্রসারিত হয়েছে। সে বিষয় আলোকপাত করা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।
সূচক শব্দ: মহামারী, করোনা, অতিমারি, বাংলা সাহিত্য, প্রান্তিক সমাজ, কোয়ারেন্টাইন, মরক।

ভূমিকা:
সমগ্র পৃথিবী জুড়ে করোনা অতিমারি পরিস্থিতি এক নতুন চ্যালেঞ্জ রূপে আবির্ভূত হলেও মড়ক বা মহামারীর ঘটনা গোটা পৃথিবী তথা ভারত দেশে প্রথম নয়। মড়ক নানা সময়ে কখনও বা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অতিমারি রূপে, কখনও বা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে মহামারী রূপে দেশে দেশে তার করাল ছায়া বিস্তার করেছে। বর্তমানে অতিমারী কবলিত পৃথিবীতে মড়ক ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ইতিহাস প্রাত্যহিক আলাপ আলোচনাতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবেই নয়, অতীতে ঘটে যাওয়া এই সব মহামারীর মারণ রূপ, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তার ভয়াবহ প্রভাব এবং সর্বোপরি তা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলি জানা ব্যক্তিগত কৌতূহল নিরসন ছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি বা সাংগঠনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। মহামারী বলতে- একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যায় কোন সংক্রমণকে বোঝায়। মহামারীর এই যে সংজ্ঞায়ন তা একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনস্বাস্থ্যের ইতিবাচক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। এর ব্যতিক্রম ও অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এই দুই ধরনের অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করে মহৎ শিল্প-

সাহিত্য বিনির্মাণ হয়েছে যুগে যুগে। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়কাল থেকে এই মহামারী বা মড়ক বারবার আলোচনার বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে।

সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজ, ইতিহাস ও দর্শন চর্চায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবিষ্কৃত ইবলা সারস বা এইডস এর মত মারন ব্যাধির ক্ষেত্রে ব্যাপক তথ্য তালাস দেখা যায়নি। কারন এগুলি ছিল এরিয়া ভিত্তিক বলা ভাল এর ব্যাপকতা তেমন ছিল না। এই তিনটে ব্যাধি কোন নির্দিষ্ট বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বত্র ছড়িয়ে পরার আশঙ্কা সীমিত ছিল। কিন্তু কভিদ ১৯ এর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ২০২০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের সকল দেশের অভ্যন্তরে কোভিদের মারোন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছিল। ২০২৩ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৭০ কোটি লোক আক্রান্ত হয়েছিলো। ৬০ লাখের ও বেশী লোক মৃত্যুবরণ করেছিল। এখনও পর্যন্ত প্রতিদিন সারা পৃথিবী জুরে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন।

কোভিড নিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় গবেষণা হওয়ার সাথে সাথে সমাজবিজ্ঞানেও গবেষণা শুরু হয়েছে। যদিও সংখ্যায় ক্ষীণ। কিন্তু ক্রমশ সমাজবিদ, দার্শনিক ও ইতিহাসবিদেরা, যারা মহামারী- অতিমারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের সূত্র খুঁজছেন সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে, এরা বর্তমান মহামারীর সম্ভাব্য প্রভাবের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ বা প্রতিতুলনা খুঁজছেন অতীতের মহামারী- অতিমারির আর্কাইভে। এদের যুক্তি হচ্ছে- অতিমারি শুধু ব্যক্তি জীবনের বা অর্থনৈতিক জীবনে নয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপরি কাঠামোতেও গভীরভাবে প্রভাব রেখে যায়। যেরকমটা দেখা গেছে অতীতের মহামারী/অতিমারির ক্ষেত্রে। উইলিয়াম ফকনারের মত এরা বিশ্বাস করেন, অতীত মৃত নয় এবং সেই অর্থে অতীত অতীতও নয়।[১] সেজন্যই অতীতের অভিজ্ঞতায় তারা বারে বারে ফিরে যান এবং সেই সূত্রে তাদের সৃষ্টি করতে হয় নতুন জ্ঞানের আর্কাইভ- সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস ও দর্শন গ্রন্থ থেকে।

‘মহামারি’র সঙ্গে বাঙালির পরিচয় অবশ্যই নতুন কিছু নয়। তবে বাঙালির সংসারে তার নাম ‘মহামারি’ ছিল না। বাঙালি আবহমান তাকে চিনত ‘মড়ক’ হিসেবে। মহামারি এ দেশের ইতিহাসে নতুন কিছুই নয়। বার বার এ দেশে আর পাঁচটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো মড়কও এসেছে। কিন্তু তার হিসেব প্রাগাধুনিক বাংলা তথা ভারত রাখত না। আসলে রাখার দরকারও ছিল না সে কালের রাষ্ট্রের। মুঘল শাসন ‘প্রজাহিতৈষী’ হতে পারে, কিন্তু আধুনিক অর্থে ‘কল্যাণকর’ ছিল না। সেখানে জনগণনার প্রয়োজন ছিল না। ‘জনস্বাস্থ্য’ ব্যাপারটাই ছিল ধারণার বাইরে। মড়ক তাই মড়কের মতো এসেছে, তার পরে প্রাকৃতিক নিয়মেই চলে গিয়েছে। অজন্মা, শস্যহানি, বর্গীর হেঙ্গামের মতো মড়কও একটা ‘হেঙ্গাম’ হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছে।[২]

বাংলা সাহিত্যে মহামারী:

কলকাতা শহরের প্রাথমিক পর্বে মরক ছিল এক অতি কমন ব্যাপার। সদ্য এ দেশে পা দিয়ে এখানকার জলবায়ু সহ্য করতে না পেরে যে দলে দলে সাহেব মারা গিয়েছেন। এ ছাড়া প্রচুর ডায়েরি, জার্নাল, স্মৃতি কথায় ঔপনিবেশিকতার সূত্রে আগত শ্বেতাঙ্গরা সেইসব মহামারীর ভয়াবহতা লিখে রেখেছেন। তবে এ নিয়ে দিশি মানুষের কোন অ্যাকাউন্ট নেই। কিন্তু, সম্প্রদায়গত ভাবে মড়ক প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলায় ছিল না, এমন নয়। শীতলা বা ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবির উপাসনা সেই সম্প্রদায়গত মড়ক-প্রতিরোধ কামনারই কথা বলে। মড়ক’কে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেখতেন শীতলা বা ওলাবিবি উপাসনাকারী বঙ্গজন। সাহেবরা যে সব রোগে মারা পড়ত, বাঙালির সেগুলো হলেও মারা যাওয়ার মতো কিছু ঘটত বলে মনে হয় না। কারণ, এখানকার জলবায়ুতে এখানকার বাসিন্দাদের ইমিউনিটি তৈরি হয়ে

গিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের সেই কালে এই সব লৌকিক দেবীর 'কাল্টের' উদ্ভবের সুবাদে তৈরি হয় দেবী-মহিমা কীর্তনকারী কাহিনি, পাঁচালি, ব্রতোপাখ্যান। সেই সব সাহিত্যও আধুনিক নয়। তা হলে কি ধরে নেব যে বাংলা আধুনিক সাহিত্যের প্রথম পুরুষের হাতেই রচিত হয় মড়কের প্রথম বর্ণনা?

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কালেই নাকি সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর বিখ্যাত 'অন্ন দে গো মা অন্নদা' রচনা করেছিলেন। কিন্তু এখানে বর্ণিত 'অন্ন' আক্ষরিক অর্থে 'ভাত' নয়, তার অন্য আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। তবু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বাস্তবের অন্নাভাব থেকেই কবির কলমে রূপক হিসবে উঠে এসেছিল 'অন্ন'।

'মহাস্থবির' এর ভাষ্য অনুযায়ী কর্পোরেশন থেকে প্লেগের টীকা দিতে চাইলে সহজে লোকে তা নিতে চায়নি। গুজব ছড়ায়, এই টিকা নিলে মৃত্যু ঘটবে। এর ফলে যা ঘটার তাই ঘটে, অচিরেই রোগ ছড়ায়। শহরের মানুষদের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মালম্বিরাই প্রথম টিকা নিতে এগিয়ে আসেন। মহামারির প্রথম ধাক্কা যদি বলতে হয়, সেটা ছিল ইংরেজি ১৮৯৮ সালের প্লেগ। এই প্লেগ মহামারির কালেই স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর সহ-সন্ন্যাসীরা সেবা করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। প্লেগ বোম্বাই প্রদেশে প্রথম দেখা দিলেও তা অচিরেই কলকাতা পৌঁছয়। এবং মহামারির আকার নেয়। এই মহামারির বর্ণনা বিশদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর 'মহাস্থবির জাতক'-এ। লেখক এই সময়ে বালক মাত্র। কিন্তু স্মৃতি থেকে তিনি যে বর্ণনা লিখেছিলেন, তা ভয়াবহ।

আধুনিক যুগে মহামারী কোন কোন দেশে বা স্থানে মানবিক সংকর তৈরি করলেও পূর্ববর্তী অমানবিকতার চেয়ে অপ্রতুল। মহামারীকালীন শিল্প-সাহিত্যে, চিত্রকলা, নাটক-সিনেমা ও কবিতার পাঠোদ্ধার থেকে অনুমেয় যে প্রাচীন, মধ্য কিংবা তার পরবর্তীকালে মহামারী বা মড়ক মানুষের জীবনে বিপন্ন করেছে। আর যারা বেঁচেছে তাদের মধ্য তৈরি হয়েছে বিভাজন ও অমানবিকতা। আধুনিক যুগে মানুষ সচেতন ও সাহসী হয়েছে তাই এ সঙ্কটকালে হাত বাড়িয়েছে। এসব সত্ত্বেও ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় থেকে মহামারী চলাকালীন সময়ে সহিংসতা, জনশ্রুতি, আতঙ্ক এবং বিক্ষোভের মতো এ রকম অসংখ্য অপ্রত্যাশিত ও অমার্জনীয় ঘটনা ঘটেছে যা শিল্প-সাহিত্যে অনুষঙ্গ হিসেবে স্থান করেছে পাকাপোক্তভাবে আর সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে আমরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-কালীন মহামারীর বর্ণনা পাই। যেমন : রোগ, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। 'বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হলে গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া পলায়।' মহামারীকে অনুষঙ্গ হিসেবে নিয়ে 'আনন্দমঠ' এর মতো কালজয়ী সাহিত্য রচিত হলো। আনন্দমঠ উপন্যাসে মহামারীকালীন চরম নিষ্ঠুরতার ছবি ফুটে উঠেছে। এ সময় কোন মানুষ মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেননি। তাই মহমারীকালীন নিষ্ঠুরতার প্রতিছবি আনন্দমঠ উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা অনুষঙ্গ।

তিনিই প্রথম দেখান 'মহামারি' টার্মটির সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের যোগ। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে) বাংলার পরিমণ্ডলকে আর যাই হোক 'আধুনিক রাষ্ট্র' বলা যায় না। 'মহামারি' অভিধানটির সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের যোগ নিবিড়, যা একান্ত ভাবেই আধুনিক রাষ্ট্রের উপজাত সে কথা আগেও বলেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তাই এক 'মড়ক'-এর কথাই বলে,

'মহামারি'-র নয়। 'মহামারি' বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যায় কোনও রোগের সংক্রমণকে বোঝায়। এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। 'নির্দিষ্ট জনসংখ্যা'। যেটা জনগণনা ছাড়া সম্ভব নয়। আর জনগণনা একান্ত ভাবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই দস্তুর। সে হিসেবে দেখলে, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তৃত হওয়ার আগে 'মড়ক' ছিল, কিন্তু 'মহামারি' ছিল না। 'আনন্দমঠ' লিখনের কালে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এই উপন্যাসের পটভূমিকা যে সময়ের কথা বলে, সেই সময়ে তা ছিল না। ফলে বঙ্কিম যা লিখেছিলেন, তা মড়কের বর্ণনা। যেখানে রাষ্ট্রিক অনুপ্রবেশ নেই, 'সামাজিক কাজ' হিসেবে 'ত্রাণ' বা 'সেবা'-র বন্দোবস্ত নেই। মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে মরে পড়ে থাকলেও তার কোনও গতি হয় না। কিন্তু, এখানে মনে রাখা দরকার— ১১৭৬-এর এই মড়কটি একটি মন্বন্তরের অনুষঙ্গে সৃষ্ট। মন্বন্তর যে মানবিকতার চরম বিলয় ঘটায়, তা 'আনন্দমঠ'-এই দৃশ্যমান। সেই বিলয়ের পরে মড়কে কে কার সেবা করবে? এই প্রশ্ন বঙ্কিম রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে উদার ও ঋজু চরিত্রের জ্যাঠামশাই জগমোহন মারা যায় মহামারীতে। চতুরঙ্গ উপন্যাস থেকে কিছুটা পাঠ নেয়া যাক : 'পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।'[৩] মহামারীতে যে চরম অমানবিক পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সাম্প্রদায়িক তকমা আঁটা হয় তারও প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। চতুরঙ্গে শ্রীবিলাসের উক্তি : 'আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম, কোন খেদ রহিল না।'[৪] দাদার মৃত্যু নিয়ে শচীশের বাবা হরিমোহনের বক্তব্য ছিল অতি সংক্ষিপ্ত : 'নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।'[৫] এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ মহামারীকালীন সাহিত্যে আর একটি বিষয় উল্লেখ করেন তাহলে হলো সঙ্কটকালে সাম্প্রদায়িকতা। বর্তমানে করোনাকালীন সময়ে শুরু থেকে সারা বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কুফল আমাদের দেখতে পেয়েছি। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্য থেকে উঠে এসেছে নানা রকম সাম্প্রদায়িক মন্তব্য যা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যাবস্থায় চরম ভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে একটি চিঠিতে লেখেন- 'বৌমার খুব কঠিন নুমোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই করে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্ছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধহয় অনেক দিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী ভুগছেন। তার মধ্য হেমলতা প্রায় সেরে উঠেছেন-সুকেশীর জন্য ভাবনার কারণ আছে- কিন্তু ছেলেদের মধ্য একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস তার কারণ-আমি ওদের বরাবর পাঞ্চ সিক্ত পাচন খাইয়ে আসছি'[৬] রবীন্দ্রনাথের মহামারী কেন্দ্রিক সাহিত্যে এবং এ চিঠিতে মহামারীর সামগ্রিক বিষয় উঠেছে। কবি মাত্রই সচেতন সত্তার অধিকারী তাই মহামারীর সঙ্কটকালে তিনি একজন চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকান্ত বার্মা যাওয়ার জন্য কলকাতা বন্দরে উপস্থিত হলে দেখতে পান চোদ্দ পনেরশ লোক ভেড়ার পালের মত সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করাতে জানতে পেলেন যে, বার্মায় এখনও প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে...। পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুন পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন। খবর

লইয়া জানিলাম, কথাটা quarantine: তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় শহরে থাকে, এবং সে পোর্ট হেলথ অফিসার এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র জোগার করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা।”[৭]

উপরের উদ্ধৃতিটির সঙ্গে বাঙালি সাহিত্যপ্রেমীর নতুন করে পরিচয় করানোর কিছু নেই। ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব। লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে এই অনুচ্ছেদটি যে দারুণ ভাবে প্রাসঙ্গিক, তা-ও বলার অপেক্ষা রাখে না। কোয়রান্টিনের সঙ্গে সেটাই বোধ হয় বাঙালি পাঠকের প্রথম পরিচয়। এই বর্ণনা শ্রীকান্তর বর্মা পৌঁছনোর মুহূর্তের। সেখানে প্লেগ দেখা দিয়েছে। বর্মাও তখন ইংরেজ কলোনি। ‘আধুনিক’ রাষ্ট্র ব্যবস্থার লক্ষণগুলো সেখানে ‘ক্রমে আসিতেছে’। এই লক্ষণগুলোরই অন্যতম হল জনস্বাস্থ্য। মহামারি দেখা দিলে জনস্বাস্থ্য বিধি মেনেই সদ্য বহিরাগতদের কোয়রান্টিন করে রাখার ব্যবস্থা সেখানকার ঔপনিবেশিক সরকার করেছিল। পরে শরৎবাবু কোয়রান্টিনের যন্ত্রণার কথা লিখেছিলেন। এবং এটা বলেছিলেন যে, এই করেন্টাইন এর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন এখানে কোন মুটে নেই নিজের মাল কাঁধে চাপিয়ে একা প্রবেশ করতে হয়। ঢোকার পর সমস্ত কাপড় লণ্ডভণ্ড করে ষ্টীমে ফোটান হয়। এনারা নাকি এমন কষ্ট দেয় কসাই ও নাকি তাদের ছাগল ভেরা দের দেয় না। কোয়রান্টিনের যন্ত্রণা পোহাতে হয় মূলত ‘ছোটলোকদের’।[৮] কভিদের সময় যে অস্থায়ী কয়ারেন্তাইন সেন্টার গুলো গড়ে উঠেছিল সেখানেও দুর্দশার সীমা ছিল না। খাওয়া, পানীয়জলের অভাব,একই ঘরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত লোকেদের বসবাস, শৌচাগারের অভাব, স্যানিটেশনের সমস্যা প্রভৃতি আর তার ভুক্তভোগী ছিল এই প্রান্তিক সমাজের মানুষগুলো। ‘আধুনিক’ রাষ্ট্র যে ‘জন’-কে তার টার্গেট করে, তারা তথাকথিত ভদ্রেতর। তা সে ইংরেজ জমানাই হোক, আর সাম্প্রতিক কালের জীবন্ত মানুষের উপরে কীটনাশক স্প্রে করা হোক, খেলা একই। শ্রীকান্তর বিবরনী থেকে এটাও স্পষ্ট যে, মহামারী ছোটলোক ও ভদ্রলোকের মধ্যে ব্যাবধান কমিয়ে নিয়ে আসেনি। বরং তাকে আরও প্রকট করে তোলে। করোনাকালীন সময়ে দেখা যায় ধনী ঘরের সন্তানরা অনলাইনে ক্লাস করছে বা কোচিং নিচ্ছে। কিন্তু গরিব ঘরের সন্তানরা সে সুযোগ নিতে পারছে না। প্রযুক্তিগত অসুবিধা থাকার জন্য শুধুমাত্র শিক্ষাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, স্বাস্থ্য ব্যাবস্থার ক্ষতি হয়েছে। সেক্ষেত্রে টেলি মেডিসিনের পরিসেবার কথা ধরা যেতেই পারে। করোনা মহামারী জাতীয় আয়ে সম্পদে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে ধনী গরিবের মধ্যেকার বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলেছিল।

শরৎচন্দ্র মহামারী বা মারীর সময়ে ছোটজাত ও উচুজাত শ্রেণীর মধ্যে ফারাকের বিষয়টি নিয়ে ভেবেছিলেন। পুরো উপন্যাস জুরে মহামারী বা মারী নিয়ে দুর্বিপাকের কথা লেখা আছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে যেখানে লেখক ইন্দ্রনাথের সাথে রোমাঞ্চকর নৈশ অভিযাত্রায় বেরিয়েছেন। - কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সাথে নাকে আসিয়া লাগিতে ছিল ………। নাকে কাপড় চাপা দিয়ে বলিলাম নিশ্চয়ই কিছু পচেছে ইন্দ্র! ইন্দ্র বলিল মড়া। আজকাল ভয়ঙ্কর কলেরা হচ্ছে কিনা! সবাই তো পোড়াতে পারে না- মুখে একটুখানি আগুন ছুইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল কুকুরে খায় আর পচে। তারই এত গন্ধ”[৯]

এর পরের গল্প আমাদের জানা। ইন্দ্রনাথ সেই ছয় সাত বছরের শিশুর মৃত দেহটিকে ডিঙ্গিতে তুলে দূরের চরের ঝাউবনের মধ্যে ফেলে রেখে এল। তখনই এল জাতপাতের প্রশ্ন।

কুণ্ঠিত হয়ে যেই জিজ্ঞাসা করিলাম কি জাতের মড়া- তুমি ছোঁবে? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘারের তলায় এবং অন্য হাত হাঁটুর নিচে দিয়া একটা শুষ্ক তৃণ খণ্ডের মত সছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল... মরার কি জাত থাকে রে?[১০]

শরৎচন্দ্র তৎকালীন মহামারীতে বার্মার সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবস্থা কেমন হয়েছিল তা তুলে ধরেছেন। এবং উদ্দেশ্য ছিল মহৎ ও কালজয়ী সাহিত্য সৃজন। তাঁর 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের বিষয়বস্তুও মহামারীকে কেন্দ্রিক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে মহামারীকে অনুষঙ্গ হিসেবে নিয়েছেন। প্লেগের পরীক্ষা কেমন, রোগের বিস্ততার ও ভয়াবহতার বিষয় তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'সকলেই অবগত আছেন, প্লেগ রোগে দেহের স্থান বিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তার সাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার-চিত্তে সেই সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা।'[১১] শরৎ বাবুর লেখা থেকে চারটি মহামারীর কথা জানা যায় – প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'আরণ্যক'। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'ধাত্রীদেবতা' ও 'গণদেবতা' উপন্যাসে কলেরা নামক মহামারীর উপজীব্য। তারাশঙ্করের, 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে দেখা যায় যে, 'শিক্ষিত ছেলেরা' বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা করে কলেরায় মৃত্যু আটকাতে চাইছে। করোনা অতিমারির সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষিত যুব সমাজ নিজেদের জীবন বাজি রেখে লাফিয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে রেড ভলেন্টিয়ার্সরা রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[১২] 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়, জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে কলেরার মড়ক বর্ণিত হয়েছে। যা মূলত উপন্যাসের উপজীব্য বা বিষয়বস্তু। **১৯১১** সালের ভারতবর্ষের মহামারী, প্লেগ সাহিত্যের অনুষঙ্গ হয়েছে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের অভিসার কবিতার রাজনর্তকী বাসবদত্তা গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়েছিল। কবির ভাষায়, 'নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ /রোহমসী-ঢালা কালি তনু তার/ লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখা/ বাহিরে দেলেছে করি প্রহার।/ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার মৃত্যু হয়েছি মহামারীতে।[১৩]

দেখার বিষয় এটাই যে, মড়ক যতটা দরিদ্র ও তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে ছড়াতে দেখা গিয়েছে, উচ্চবর্গীয় সমাজে ততটা নয়। এর থেকেই কি পাবলিক হাইজিনের ধারণার জন্ম? দারিদ্র আর অপরিচ্ছন্নতা হাত ধরাধরি করে চলে, আধুনিক রাষ্ট্রের এই বয়ান ঔপনিবেশিক ভারতেও লাগু হয়েছিল। বাংলা সাহিত্য কাঁটাছেড়া করতে বসলে দেখা যায়, নিম্নবর্গের সমাজে মহামারির প্রকোপ সাংঘাতিক। এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এ। শুয়োরমারি বস্তিতে কলেরা মহামারির যে মর্মান্তিক বিবরণ বিভূতিভূষণ রেখেছেন, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দারিদ্র।[১৪] সেই ভয়ঙ্কর দারিদ্রের সঙ্গে কলেরা মহামারির ভয়াবহতা মিশে যা তৈরি করেছে, তা বাংলা সাহিত্যেই নজিরবিহীন। কয়েক মুঠো ভাতের প্রতি এক কিশোরী বধূর যে আর্তিকে বিভূতিভূষণ তুলে এনেছিলেন, তা 'আরণ্যক'-এর পাঠক মাত্রেই জানেন। মৃত্যু সেখানে নৈমিত্তিক। চিকিৎসকহীন, শুশ্রুষাহীন মানব সমাজের চির অন্ধকারকে বিভূতিভূষণ লিখতে পেরেছিলেন। এ এক অসাধ্য সাধন।

বিদেশী সাহিত্যে মহামারী:

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক ও চলচ্চিত্রে যেমনি মহামারী বিষয়বস্তু ও আখ্যান হয়ে বিধৃত হয়েছে তেমনি বিশ্বসাহিত্যেও। সাহিত্য রোগবিস্তার ও মানব প্রকৃতি নিয়ে লেখা একটি ব্যতিক্রমী বই ড্যানিয়েল ডিফোর, 'আ জার্নাল অব দ্য প্লেগ ইয়ার' (১৭২২)। প্লেগ মহামারীকালীন সময়ে লন্ডনের সার্বিক বিষয় লেখক তুলে ধরেছে। মহামারীর প্রাদুর্ভাবকে অস্বীকার, মৃত্যু সংখ্যা কমিয়ে বলা, কিছু জনগোষ্ঠীর অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস, নানা গুজব প্রচার সর্বোপরি মহামারী নিয়ে কর্তৃপক্ষের কূটকৌশল বইটিতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ইতালির আলেসান্দ্রো মানজির উপন্যাস 'দ্য বিট্রথেড' প্লেগের ধ্বংস নিয়ে লেখা সবচেয়ে বাস্তবাদী সাহিত্যর মধ্যে অন্যতম বই। মহামারীতে কর্তৃপক্ষের অদক্ষতার বিষয়ে ১৬৩০ মানজোনি মিলান সাহিত্য রচনা করে। আবেয়ার ক্যামুর-'প্লেগ'। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস- এর 'লাভ ইন দ্র্য টাইম অব কলেরা' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে একটি সদ্য মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে। মৃত্যু কতটা সরল ও স্বাভাবিক মহামারীতে সেটা এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।' ওয়ান হাণ্ড্রেড ইয়ারস অব সলিটিউড' উপন্যাসেও মহামারীকে কেন্দ্র করে অদ্ভুত গল্প বলেন। গোটা উপন্যাসে এভাবে সার্কেস এক আশ্চর্য স্মৃতিবিহীনতা আর অতীতহীনতার মহামারীর জাদুব্যস্তবতার গল্প বলেন। হোসে সারামাগোর তাঁর 'ব্লাইন্ডনেস' উপন্যাস মহামারীর কেন্দ্রিক। ওরহান পামুকের মহামারী কেন্দ্রিক সাহিত্য সম্ভার 'নাইটস অব প্লেগ'। বইটিতে লেখক ১৯০১ সালের তৃতীয় প্লেগ মহামারীর ঐতিহাসিক বিষয় তুলে ধরেছে।

বাংলা সাহিত্যের আর এক বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের নায়ক শিবনাথকে দেখা যায় কলেরা মহামারির কালে সেবাব্রত গ্রহণ করতে। তারাশঙ্করের অন্যান্য রচনাতেও মহামারি, বিশেষ করে ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট পল্লিসমাজের কথা এসেছে। এসেছে সংবেদী নায়কের সেবাব্রত গ্রহণের কাহিনি। কিন্ত লক্ষণীয় এই যে, সব লেখাতেই মহামারি একটা 'প্রেক্ষিত'। তার ভয়াবহতা লেখায় উপস্থিত, কিন্তু সে নিজে লেখার মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় এখানে চরিত্রগুলির ব্রত গ্রহণ। মনে রাখতে হবে, সেই কাল গাঁধী-ব্রতের কাল। আর্তের সেবা যেখানে 'দেশের কাজ'। ফলে মহামারির উপক্রম লেখায় ঘটে 'দেশের কাজ'-কে জাস্টিফাই করতে। মহামারি নিজে 'বিষয়' হয়ে উঠে আসে না। বিভূতিভূষণের রচনায় মন্বন্তর যে 'অশনি সংকেত' দেখায়, মহামারি ততটা দেখায় না। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-তে সুরেশ মহামারিতেই সংক্রমিত হয়ে মারা যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার বেশি কিছু লভ্য নয়।

১৯১৮-য় ভারতে দেখা দেয় ভয়াবহ ফ্লু মহামারি। দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ তাতে উজাড় হয়ে যায়। শিমলা থেকে বিহার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যু-মিছিল। হিন্দি কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী, যিনি 'নিরালা' ছদ্মনামেই সমাধিক পরিচিত, লিখে গিয়েছেন এই মহামারির মর্মস্পর্শী বিবরণ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে উঁকি দেয়নি 'স্প্যানিশ ফ্লু' নামে পরিচিত এই অতিমারি। কারণ? সম্ভবত বাংলায় এর তেমন প্রাদুর্ভাব ছিল না বলেই কি এই অনুপস্থিতি? হতেই পারে।

মূল্যায়ন:

পরিশেষে এ কথা বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহামারি একটি বড় অধ্যায়। এখানে যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনের অভ্যন্তরে দেশের দারিদ্রতা, অনাহার, অপুষ্টি, রোগ বালাই, কুসংস্কার এর মত বিষয় গুলিকে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। সাথে সাথে রাষ্ট্রের সাথে রোগের সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র বা সমাজের সহিত রোগীর সম্পর্ক, জনস্বাস্থ্যের ধারণা তাৎপর্য পূর্ণ ভাবে উঠে আসে। সামাজিক সংকল্প, সমাজের উচ্চ নীচ ভেদ, স্যানিটাইজেসন, কোয়ারেন্টাইন কি নেই

সেখানে! বর্তমান অতিমারির সময়ে এ লেখাগুলি সাহিত্য হিসাবে আর আমাদের সামনে উঠে আসেনি বরঞ্চ উঠে এসেছে মহামারি প্রতিরোধের জ্ঞান হিসাবে। এখানেই তার সামগ্রিক সার্থকতা। কোভিড ১৯ নিয়ে কবিতা এবং সাহিত্য যা পাই তা সামাজিক মাধ্যমে বলা ভাল আন্তজাল পরিসেবায়, ছোট ছোট লেখার অভ্যন্তরে। এ বিষয়ে সব থেকে বেশী গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে বা হয়ে চলেছে অর্থাৎ নন ফিকশনাল। আশারাখি ভবিষ্যতে সাহিত্যে কোভিড নামক অতিমারি আরও বৃহৎ পরিসর নিয়ে লিখিত হবে।

সূত্র নির্দেশ:

১। M. Thomas inge editor ærequiem for a nun (1951)” willam Faulkner: the contemporarz reviews. Cambridge: Cambridge universitz press, print, American critical archives, 1995. p333

২। অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, শরৎবাবুর কোয়রান্টিন, বঙ্কিমের মড়ক, বাংলা সাহিত্যে মহামারি, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রবন্ধ, ৭ই এপ্রিল, ২০২০

৩। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, চতুরঙ্গ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৬

৪। তদেব, পৃ. ১৭৪

৫। তদেব, পৃঃ ২৯০

৬। চিঠিপত্র, খণ্ড ছয়, সংস্করন ১, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ১১০

৭। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব, ই বইপত্র, ২৬শে জানুয়ারী ২০১৬, পৃ. ৪৭-৪৯

৮। তদেব, পৃ. ৩৪

৯। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব, ওয়ান এসোসিয়েট পাবলিশিং কোং লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭

১০। তদেব, পৃ. ৭১

১১। প্রাগুক্ত, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৭২

১২। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৫৮, পৃ. ৬৮

১৩ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, কথা, অভিসার, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৩৮, পৃ. ৩০-৩৪

১৪। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৫৮, পৃ. ১০৯।

প্লেটোর ন্যায়তত্ত্বে সামাজিক স্তরবিন্যাস : একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা

লিথা ভট্টাচার্য
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার, সুযোগ - সুবিধা, নৈতিকতা বজায় থাকে। মানুষের কিছু কিছু নৈতিক অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যায়বিচারের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। সামাজিক ন্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর নাম আমাদের স্মরণে আসে তিনি হলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। প্লেটো তাঁর *দ্য রিপাবলিক* গ্রন্থে সামাজিক ন্যায়বিচারকে কিভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে। সামাজিক ন্যায়ের ধারণাটি অত্যন্ত মৌলিক একটি ধারণা, তাই ন্যায়ের ধারণাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদিও ন্যায়ের ধারণাটি গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের মধ্যে এক প্রকার সমতা বজায় রাখার জন্য, কিন্তু আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য বর্তমান। সমাজের কিছু বিশেষ শ্রেণী ক্রমশ অবহেলিত হয়ে চলেছে। প্লেটো যেভাবে ন্যায়ের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে সমাজের কিছু বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রবন্ধে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি প্লেটোর সামাজিক ন্যায়তত্ত্বে তিনি কিভাবে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর স্তরবিন্যাস করেছেন এবং এই স্তরবিন্যাস প্রতিটি শ্রেণীর প্রতি কতখানি ন্যায্যতা প্রদান করে।
সূচক শব্দ: সামাজিক ন্যায়, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণীবৈষম্য, অভিজাততন্ত্র।

মূল আলোচনা:

সামাজিক ন্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর নাম আমাদের স্মরণে আসে তিনি হলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা আছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Republic*-এ। অ্যাথেন্স নগররাষ্ট্রের নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অনাচার, রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত হয় *রিপাবলিক*। মনীষী প্লেটোর ধারণায় প্রচলিত ন্যায় - নীতি তথা আদর্শের সংকটের জন্যই অ্যাথেন্সের ওই দুর্দশা। প্লেটোর সময় গ্রীক সমাজে যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে তাকে রক্ষা করতে হলে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন ছিল। আদর্শ রাষ্ট্রে যাতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভেদ সৃষ্টি না হয় তার জন্য ন্যায়বিচারকে শক্ত হাতিয়ার রূপে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন প্লেটো।

প্লেটোর মতে ন্যায়

প্লেটোর ন্যায়ের ধারণা বাহ্যিক বা কৃত্রিম কিছু নয়, তা মানব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত মানবাত্মারই স্বরূপ। তাঁর মতে ন্যায়ের ধারণা ও আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা পরস্পর সম্পর্কিত। বস্তুত ন্যায়ের প্রকৃতি কীরূপ তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জীবনে কোনও প্রভেদ দেখতে পাননি। ব্যক্তিজীবনে যা ন্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনেও তা ন্যায়। ন্যায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির মধ্যে কোনও পার্থক্য করে না। ফলে এই ধারণা একটি বিরোধহীন ধারণা। প্রথমত, রাষ্ট্র তথা সমাজে এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির জীবনে সদগুণ কীভাবে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত - ন্যায়ের ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে প্লেটো তার সবিশেষ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত ন্যায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির একটি নিখুঁত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস রয়েছে। প্লেটোর মতে, সদগুণ কয়েকটি মৌলিক ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত। এই ধর্মগুলি হল - ১. জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (wisdom) ২. সাহসিকতা বা সংকল্পের দৃঢ়তা (courage or fortitude) ৩. মিতাচার বা আত্মসংযম (temperance or self control) ৪. ন্যায়পরতা (justice)। তিনি ন্যায়ের ধারণাটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন, কারণ এটি অপর তিনটির সমন্বয়ের ফল। এই চারটি ধর্মের মধ্যে প্রথম তিনটি যথাক্রমে মানবাত্মার তিনটি অংশের সঙ্গে যুক্ত ; শেষের ধর্মটি অপর তিনটি ধর্মের সমন্বয়। প্লেটোর মতে, মানবাত্মার বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত উচ্চতম অংশের মৌলিক ধর্ম হল জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। আত্মার অবিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত উচ্চতর বা মহান অংশের মৌলিক ধর্ম হল সাহস বা দৃঢ় সংকল্প। নীচ বা নিম্নমানের অংশের মৌলিক ধর্ম হল মিতাচার বা আত্মসংযম। ন্যায় হল এক সাধারণ ধর্ম - যখন আত্মার প্রত্যেকটি অংশ সহযোগিতার ভিত্তিতে সুসামঞ্জস্যভাবে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে, তখনই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়।[1]

আত্মার উচ্চতম অংশের কাজ হলো, অপর দুটি অংশকে সঠিক পথে চালিত করা। কোনও ব্যক্তিকে তখনই জ্ঞানবান বা প্রজ্ঞাবান বলা যাবে যদি সে বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে আত্মার বুদ্ধিযুক্ত অংশকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারে। কোনও ব্যক্তিকে তখনই সাহসী বলা যাবে যদি সে অকুতোভয়ে, মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত আত্মার উচ্চতম অংশের নির্দেশ অনুসারে কর্মসাধন করতে পারে। কোনও ব্যক্তিকে তখনই আত্মসংযমী বলা যাবে যদি সে তার আত্মার উচ্চমানের দুটি অংশের নির্দেশ অনুসারে তার পশু প্রবৃত্তিকে সংযত করে মার্জিত ও নির্দোষ সুখের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। এই তিনটি দিকের তিনটি মৌলিক ধর্ম - প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, আত্মসংযম যথাযথভাবে পালিত হলে তবেই ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব হয়, ব্যক্তির জীবন আনন্দময় হয় এবং ব্যক্তির জীবন তথা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কখনও রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরূপ করে না, অপরের সম্পদ চুরি করে না, বিশ্বাসঘাতক হয় না, দেশদ্রোহী হয় না, অথবা অনুরূপ দুষ্কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না।[2] আত্মিক পরিপূর্ণতা লাভ রূপে এই প্রকার ন্যায়ই হলো ব্যক্তির জীবনে পরমার্থ পরমানন্দ। স্পষ্টতই প্লেটোর মতে, সুসমঞ্জস্য আত্মিক বিকাশই হলো নৈতিক জীবনের লক্ষ্য, যেখানে আত্মার উচ্চতর অংশ নিম্নতর অংশকে সঠিকভাবে চালিত করে।

প্লেটোর সামাজিক স্তরবিন্যাস

প্লেটোর মতে, ন্যায় প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থান নির্ধারণ করে। এই নির্ধারণের ভিত্তি হল তার প্রকৃতিগত ও শিক্ষালব্ধ যোগ্যতা। ন্যায়বিচার সামাজিক বন্ধনস্বরূপ। এই বন্ধন সমাজকে সুসংহত করে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে। *রিপাবলিক* গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্লেটো মান অনুসারে তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। ১) উচ্চতম শাসক বা অভিভাবক শ্রেণী ২) মধ্যবর্তী যোদ্ধা বা প্রশাসক শ্রেণী ৩) নিম্নতম কারিগর শ্রেণী বা জনসাধারণ। যাঁরা বুদ্ধি প্রধান, যাঁরা প্রাজ্ঞ বা জ্ঞানবান তাঁরাই কেবল অভিভাবক বা শাসক শ্রেণীর অন্তর্গত হবেন। শুধুমাত্র তাঁরাই আইন ও শাসনকে পরিচালিত করতে পারেন যাঁদের রয়েছে পরিপূর্ণ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। এই জ্ঞান তাকে সবার জন্য আত্মত্যাগ করতে শেখায়। এই জ্ঞান বা প্রজ্ঞার ধারক খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি। প্লেটোর ভাষায়, অনেক কর্মকার পাওয়া সহজ কিন্তু ভালো রাষ্ট্রনায়ক পাওয়া সহজ নয়। প্রাজ্ঞবান ব্যক্তিরাই দেশের কর্ণধার হওয়া উচিত। প্লেটোর পরিভাষায় এঁরাই হল তার কথিত 'দার্শনিক রাজা' শ্রেণী।

মুষ্টিমেয় দার্শনিকই কেবল সত্যান্বেষী, জ্ঞানানুরাগী। এজন্য প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে দার্শনিকেরাই কেবল শাসক বা অভিভাবক হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। দার্শনিক অভিভাবক বা দার্শনিক রাজার কাজ হলো, তত্ত্বচিন্তার মাধ্যমে কল্যাণ বা মঙ্গলের ধারণাটির স্বরূপ নির্ধারণ করে কল্যাণসাধক নিয়ম বা আইন প্রবর্তন করা।

তেজ, বীরত্ব, সাহস, স্পষ্টবাদিতা, যাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেইসব ব্যক্তি হবেন যোদ্ধা বা প্রশাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে কোনও পরিস্থিতিতে যে কোনও বিপদ মোকাবিলায় এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি অগ্রসর হবেন কারণ তাঁরা অমিত তেজ তথা বিক্রমের অধিকারী। প্লেটো তাদেরকে সাহসের প্রতিভূ বলে মনে করেন। যোদ্ধার প্রধান কাজ হবে দুটি, প্রথমত বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিরোধী শক্তিকে, বিশৃঙ্খলাকামী শক্তিকে দমন করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা। প্রশাসকের প্রধান কাজ হবে অভিভাবকের নির্দেশ অনুসারে, তাঁদের প্রণীত জনকল্যাণসাধক আইনগুলিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা এবং আইন অমান্যকারীদের ঐসব আইন মান্য করতে বাধ্য করা।

মিতাচার ও আত্মসংযম হবে সর্বনিম্ন কারিগর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অভিভাবক ও যোদ্ধা বা প্রশাসক শ্রেণী ব্যতীত রাষ্ট্রের বাকি সব মানুষই হবে কারিগর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণী মূলত উৎপাদক শ্রেণী যাঁরা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকবেন না। প্লেটোর মতে, সামাজিক ব্যাধি বা অপরাধের মূল হল এই কারিগর শ্রেণী। এঁরা দার্শনিক শাসকের মতো প্রজ্ঞাবান নয়, আবার যোদ্ধাদের মতো তেজী বা সাহসী নয়। এঁদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল কামনা বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন। কিন্তু স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের কামনা বাসনার তৃপ্তিসাধন করলে রাষ্ট্রের অনেক আইনকে অমান্য করতে হয় এবং ফলত রাষ্ট্রে ন্যায়, কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। এজন্য আদর্শ রাষ্ট্রে কারিগর শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মস্বার্থ কিছুটা পরিত্যাগ করে অপরের স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। এটাই হলো মিতাচার। তেমনি এই শ্রেণীর মানুষদের এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রশাসকেরা যেসব আইন বাধ্যতামূলকভাবে তাদের প্রতি প্রয়োগ করেন সেইসব আইন প্রজ্ঞাবান অভিভাবক প্রণীত জনকল্যাণসাধক আইন। এমন উপলব্ধি হলে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্যবোধের উন্মেষ হবে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের সমাজসেবকরূপে গণ্য করে নির্দ্বিধায় রাষ্ট্রের আইনগুলিকে মান্য করবেন। এটাই হলো আত্মসংযমের ফল।

প্লেটোর মতে, ব্যক্তি জীবনে ন্যায় যেমন স্বতন্ত্র কোনও ধর্ম নয় - মানবাত্মার তিনটি মৌলিক ধর্মের - প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও আত্মসংযমের সমন্বয়, অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের ন্যায়ও কোনো স্বতন্ত্র ধর্ম নয়, তা হলো রাষ্ট্রের অন্তর্গত তিনটি শ্রেণীর যথা - কর্তব্য পালনের সমন্বয় মাত্র। সমাজ বা রাষ্ট্রের উৎপত্তি যদি মানুষের স্বভাবেরই স্বাভাবিক প্রকাশ হয়, তাহলে এমন সিদ্ধান্তই করতে হয় যে রাষ্ট্রের ন্যায়পরতা মানবাত্মার ন্যায়পরতারই স্বাভাবিক প্রকাশ।[3] কোনও ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন উপাদানের সুষ্ঠু সমন্বয় ও সঠিক বিন্যাসের ফলে যদি ব্যক্তি ভালো জীবন যাপনে সমর্থ হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় জীবনেও তাই হবে। অর্থাৎ ন্যায়সম্মত রাষ্ট্রীয় জীবন গঠন সম্ভব হবে ঐ রাষ্ট্রের জনগণের যথাযথ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে। দার্শনিক, যোদ্ধা, কারিগর শ্রেণী তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থেকে রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা করবে। নগর রাষ্ট্রে তখনই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় যখন কারিগর, প্রশাসক ও অভিভাবক শ্রেণীর প্রত্যেকে অপরের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে নিজ নিজ কর্তব্য সুসম্পাদন করে।[4]

প্লেটোর মতের পর্যালোচনা

'Republic' গ্রন্থে প্লেটোর ন্যায়তত্ত্বে বর্ণিত সামাজিক শ্রেণীবিভাজন বিভিন্নভাবে সমালোচিতও হয়েছে। প্লেটো তিনটি শ্রেণীর কর্মের মধ্যে একপ্রকার সমন্বয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীকে স্বতন্ত্র দায়িত্ব আরোপ করেছিলেন, যাতে সমাজে ন্যায় বজায় থাকে। এই শ্রেণী বিভাজন করে প্লেটো যোদ্ধা ও কারিগর শ্রেণীর তুলনায় অভিভাবক শ্রেণীকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। পরবর্তীকালে সমাজবিদরা প্লেটোর এই সামাজিক স্তরবিন্যাসকে সমর্থন করেননি। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে এই স্তরবিন্যাসের ফলে যোদ্ধা ও কারিগর শ্রেণীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তারা তাদের উন্নতির জন্য তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। এই দুই শ্রেণীর জীবনশৈলী সম্পূর্ণভাবে অভিভাবক শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। প্লেটো এই শ্রেণী বিভাজন করেছিলেন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণের ভিত্তিতে। সমাজে একজন ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারিত হবে তার গুণাবলীর ওপর নির্ভর করে। যার মধ্যে প্রজ্ঞা থাকবে তিনি অভিভাবক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবেন, যিনি সাহসী হবেন তিনি যোদ্ধা শ্রেণীর এবং যার মধ্যে মিতাচার বা আত্মসংযম থাকবে তিনি কারিগর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। কিন্তু যার মধ্যে মিশ্র গুণ থাকবে যেমন- কোনও ব্যক্তির মধ্যে আত্মসংযম এবং প্রজ্ঞা উভয় গুণই উপস্থিত থাকলে তাকে প্লেটো বর্ণিত শ্রেণীবিভাজনের কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে? প্লেটো তাঁর এই স্তরবিন্যাসে মানব প্রকৃতির জটিলতাকে বর্ণনা করেননি। এই শ্রেণীবিভাজন ব্যক্তির অনন্যতা এবং তার উন্নতির সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে। এই কঠোর শ্রেণীকরণের উপর নির্ভর করে ব্যক্তিকে যে সামাজিক দায়িত্ব দেওয়া হয় তা কতটা ন্যায্য সেই সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। কোনও কিছুর প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং নির্দিষ্ট গুণাবলীর অধিকারী হওয়া দুটি ভিন্ন বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - ধরাযাক X- এর মধ্যে আত্মসংযম গুণের আধিক্য আছে, তাই সে কারিগর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাও আছে অর্থাৎ তার মধ্যে আত্মসংযম ও সাহসিকতা- এই দুই প্রকার গুণই থাকায় সে একজন সৈনিক হতে চায়। কিন্তু প্লেটোর মতে এটা অন্যায্য। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কোনও না কোনও অনন্যতা থাকে। প্রতিভা বা গুণ সহজাত নয়, এর উন্নতি ঘটানো উচিত। তাই *রিপাবলিক* গ্রন্থে প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্রের উপস্থাপনা করেছেন, যাকে তিনি ন্যায় বিচারের আদর্শ প্রতীক বলে বিশ্বাস করতেন, সেখানে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা প্রাধান্য লাভ করে না।

প্লেটো তাঁর ন্যায়তত্ত্বে গণতন্ত্রকে সমর্থন করেননি কারণ তিনি মনে করতেন যে গণতন্ত্রের দ্বারা যে নিয়মনীতি সাধারণ মানুষের ওপর প্রযুক্ত হয় সেগুলি পর্যাপ্ত নয়। এই কারণে তিনি অভিজাততন্ত্রকে সমর্থন করতেন। এক্ষেত্রেও তিনি যোদ্ধা ও কারিগর শ্রেণীকে উপেক্ষা করে অভিভাবক শ্রেণীকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বার্টান্ড রাসেল এই বিষয়টি নিয়ে মত ব্যক্ত করেছেন তাঁর *Power; A social Analysis* গ্রন্থে। তিনি গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক স্বৈরাচারী হতে পারে না। গণতন্ত্রে যেহেতু জনসাধারণ শাসক নির্বাচন করতে পারে সেহেতু শাসক চরমপন্থী আচরণ করতে পারে না।[5]

যদিও প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু তাঁর এই সামাজিক শ্রেণীবিভাজনের দৃষ্টান্ত কার্ল মার্কস ও ম্যাক্স ওয়েবারের দর্শনেও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তি হল ভিন্ন। কার্ল মার্কস তাঁর *Communist Manifesto* গ্রন্থে বলেছেন - 'এযাবৎ সমস্ত মানব সমাজের ইতিহাস এক শ্রেণী দ্বন্দ্বের ইতিহাস'।[6] মার্কস উল্লেখ করেন যে সমাজ এই অবস্থায় এসেছে বিভিন্ন পর্যায়ে। উৎপাদন রীতির ওপর ভিত্তি করে এই কাঠামো গড়ে উঠেছিল। যতদিন পর্যন্ত সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিষয় ছিল না, ততদিন সমাজে কোনও শ্রেণী ছিল না। আদিম

যুগে কোনও শ্রেণী ছিল না অথবা দাসত্ব প্রথাও ছিল না। ধনতান্ত্রিক সমাজে দুটি শ্রেণী ছিল - প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিক শ্রেণী এবং বুর্জোয়া বা মালিক শ্রেণী। মালিক শ্রেণীই উৎপাদন রীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করত। ধনতান্ত্রিক সমাজে ন্যায় তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন শ্রমিক শ্রেণী তাদের শ্রমের যথার্থ মূল্য পাবে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এক প্রকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আছে, কিন্তু বিরোধিতার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বও আছে। সমাজে বসবাসের জন্য তারা একপ্রকার বোঝাপড়ার সম্পর্ক নিয়ে চলে। এমনকি কমিউনিজম বা সাম্যবাদেও কার্ল মার্কস কখনোই বলেননি যে প্রত্যেক সমাজে শ্রেণী ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা উচিত। প্রত্যেক সমাজে শ্রেণি থাকবে এটাই বাস্তব, মুখ্য বিষয় হল কিভাবে এই শ্রেণীবৈষম্য দূর করা যায়। জন রলসও বলেছেন একটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজে ন্যায় সুনিশ্চিত করার জন্য, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কল্যাণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কল্যাণের ওপর তিনি খুব একটা গুরুত্ব দেননি এবং মধ্যবিত্তদের চাহিদাকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। এই শ্রেণীবিন্যাসের ধারণা জার্মান সমাজবিদ ম্যাক্স ওয়েবারের দর্শনেও পাওয়া যায়। ওয়েবার সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তিনটি উপাদানের ভিত্তিতে- অর্থ, ক্ষমতা এবং পদমর্যাদা (Money, Power, Status)। সুতরাং শ্রেণী বিভাজন কোনও নতুন ধারণা নয়, এটি সর্বদাই ইতিহাসের একটি অংশ এবং চিন্তাবিদরা এটিকে সমাজের অখণ্ড অংশ বলে মনে করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এই শ্রেণি বিভাজনের ফলে নিম্নতর শ্রেণীরা কিভাবে উন্নতি করবে।

সিদ্ধান্ত

প্লেটোর ন্যায়তত্ত্বের ধারণা তা আদর্শবাদী বা কল্পনামূলক যাই হোক না কেন, বাস্তব জগতে এর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে। সমাজে ন্যায়ের প্রচলন হয় সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। যদিও বাস্তবে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা ও অসমতা দেখা দেয় যার ফলে বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মানব সমাজের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। প্লেটোর লক্ষ্য ছিল একটি শ্রেণী কাঠামো গঠন করা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে, এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে সঙ্গতি এবং ন্যায় বজায় থাকবে। যদিও এর বাস্তবায়ন খুবই জটিল। প্লেটো চেষ্টা করেছিলেন সমাজের প্রত্যেক সদস্যের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে, কিন্তু অভিভাবক শ্রেণী এখানে অধিক সুবিধা পেত, যা ন্যায়ের তত্ত্ব এবং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের বাস্তবতার মধ্যে একপ্রকার বিরোধিতার সৃষ্টি করে।

তথ্যসূত্র:

1) Coplestone, F. 1946 *A History of Philosophy.* Vol. I, US & Canada, Paulist Press, P- 220
2) Thilly, F.1982, *A History of Philosophy.* India, Indian University Press, Allahabad. P-90.
3) Plato, 1992 *The Republic* - Translated by Dr. A.D. Lindsay. Everyman’s Library. P-xxxi
4) Stace, Walter.T.1962, *A critical History of Greek Philosophy*, London, Macmillan. P-227
5) Russell, B.1961, *Power,* London & New York, Routledge, PP - 295-296.
6) Marx, Karl & Engels, Friedrich. (1848-1888) *Manifesto of the Communist party*: Marx and Engels in Selected works. Vol. I. Chicago, Charles H. Kerr & Company. P-108.

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসমাজ, পশ্চাৎপদতা ও সংরক্ষণ : একটি পর্যালোচনা

রকিবুল সেখ
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
গুরুদাস কলেজ

সারসংক্ষেপ: ইসলামিক নীতি অনুসারে জাত-পাত ভিত্তিক বিভাজনকে স্বীকৃতি দেওয়া না হলেও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে মুসলিম জনসমাজের মধ্যে জাত-পাত সদৃশ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। জাত-পাত ভিত্তিক এই সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারি রিপোর্টে তাদের এই অনগ্রসরতার চিত্রটি উঠে এসেছ। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থা দলিত জনগোষ্ঠীর থেকেও খারাপ। পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সময় রাজ্য সরকারের গৃহীত সংরক্ষণ ব্যাবস্থা এই জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের উচ্চ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও চাকরি প্রদানে অনেকাংশে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে।
সূচক শব্দ: মুসলিম জনগোষ্ঠী, জাতপাত, আশরফ, আজলফ, আরজল, পশ্চাৎপদতা, সংরক্ষণ।

মূল আলোচনা: ভারতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন সহ একাধিক ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস। এইসকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠী ভারতে বৃহৎ সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠী। ২০১১ সালের জনগণনা তথ্য অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৪.২৩ শতাংশ মুসলিম। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ মুসলিম যা উত্তরপ্রদেশের পরেই দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত। মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের অনুসরণকারী। ইসলাম ধর্ম সমতাভিত্তিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় নীতি অনুসারে এখানে সকল মানুষই সমান। জাত-পাত বা বর্ণবাদ, উচ্চ-নীচ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ এইসকল ভিত্তিতে ইসলাম ধর্মে কোনোরকম বিভাজন বৈষম্যের স্থান নেই। ধর্মীয় নীতি অনুসারে ইসলামিক মতাদর্শে জাত-পাতভিত্তিক বিভাজনের কোন স্থান না থাকলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সমাজতাত্ত্বিককদের লেখায় জাতপাত সদৃশ বৈশিষ্ট্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ঘৌস আনসারি (Ghaus Ansari), ইমতিয়াজ আহমেদ, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, এম. কে. এ. সিদ্দিকি, যোগিন্দর সিকান্দ, ভরত চন্দ্র রাউত প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের লেখায় ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতপাত ভিত্তিক আলোচনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনা, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ভারতের এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতার চিত্রটি উঠে এসেছে। এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসমাজ, তাদের পশ্চাৎপদতা এবং এরই ভিত্তিতে তাদের জন্য গৃহীত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মুসলিম জনসমাজ ও তাদের পশ্চাৎপদতা

সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকের লেখায় ভারতের মুসলিম জনসমাজের মধ্যে জাতপাতভিত্তিক ক্রমস্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়, ঘৌস আনসারি হলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ‘Muslim caste in Uttar Pradesh’ নামক গ্রন্থে দরজি, ধোবি, কামার, স্বর্ণকার, জুলাহা

বা তাঁতি, হাজাম, মিরসি (গান বাজনার সঙ্গে যুক্ত), তেলি (তেল প্রস্তুতকারক) প্রভৃতি মুসলিম জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। একইভাবে ইমতিয়াজ আহমেদ সম্পাদিত 'Cast and Social Stratification among Muslims in India' নামক গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম জনসমাজের মধ্যে আনসারি, রাই, কালাল, ধোবি, গাদ্দি, দাফালি, ভাঙ্গি বা হালালখোর, নাই (Nai), চিক প্রভৃতি জাতপাতভিত্তিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। দেবী চ্যাটার্জী তার 'মানবাধিকার ও দলিত' গ্রন্থে ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগোষ্ঠীর চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন ভারতীয় মুসলিমদের অধিকাংশই নিম্নবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত। নিম্ন বর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমদের আরজল বলা হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খটিক, মেথর, ভাঙ্গি, লাগবেগি, হালালখোর, মুচি, মুকরি ও গারুড়ি জাতপাতভিত্তিক মুসলিম জনগোষ্ঠী। ভারতের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপিকা জয়া হাসান (Zoya Hasan) 'Politics of Inclusion Caste, Minorities and Affirmative Action' নামক গ্রন্থেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আশরফ, আজলফ, আরজল জাতপাতভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাচার কমিটির রিপোর্টেও ভারতের মুসলিম জনসমাজকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি হল- ১) আশরফ- যারা বিদেশ থেকে মুলত আরব, ইরান, আফগানিস্থান এইসকল দেশ থেকে আগত। এরা উচ্চ শ্রেণির মুসলিম। সৈয়দ, সেখ, পাঠান এইসকল মুসলিম জনগোষ্ঠী এই শ্রেণির অন্তর্গত; ২) আজলফ- যারা ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যম পর্যায় থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান। এই শ্রেণির মুসলিম জনগোষ্ঠী হিন্দু জনসমাজের অনান্য অনগ্রসর শ্রেণির সমগোত্রীয়। বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী যেমন, জোলাহ, কুল্লু (Kullu) অর্থাৎ তেল পেশাইকারি, কুঁজড়া (Kunjra) অর্থাৎ সব্জি বিক্রেতা মুসলিম জনগোষ্ঠী এই শ্রেণির অন্তর্গত; ৩) আরজল- যারা ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থার নিম্ন শ্রেণি থেকে ধর্মান্তরিত। ডোম, চামার, বাগদি, হাড়ি, হালালখোর, লালবেগি মুসলিম জনগোষ্ঠীসমুহ এই শ্রেণির অন্তর্গত। এরা হিন্দু জনসমাজের দলিত জনগোষ্ঠীর সমগোত্রীয়। এম কে এ সিদ্দিকি -এর 'Marginal Muslim Communities in India', গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি জাতপাতভিত্তিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে সেগুলি হল মেদনিপুর জেলায় বসবাসকারী বেদিয়া, পাতুয়া (Patuas), ঘোসি (Ghosi), লোধা, কেলা (Kela) বা খারিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীসমুহ, মুর্শিদাবাদ জেলায় বসবাসকারী কান (Kan), সর্দার, আবদাল মুসলিম জনগোষ্ঠীসমুহ, উত্তর ২৪ পরগনার বেস্তি মাল (Besti Mal), বসিরহাটের নিকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রভৃতি।

সমাজতাত্ত্বিকদের উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ইসলাম ধর্ম সমতাভিত্তিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং ইসলামিক মতাদর্শ অনুসারে এখানে জাতপাত বা বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজনকে স্বীকৃতি দেওয়া না হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে মুসলিম জনসমাজের মধ্যে জাতপাত ভিত্তিক বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী জাতপাত ভিত্তিক এইসকল মুসলিম জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতার চিত্রটি উঠে আসে। ভারতের সংবিধানের ৩৪০ ধারা অনুযায়ী স্বাধীন ভারতবর্ষে পশ্চাৎপদ শ্রেণিসমূহকে চিহ্নিত করার জন্য প্রথম ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন গঠন করা হয় ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে যেটি কাকা কালেলকর কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশন ১৯৫৫ সালে মার্চ মাসে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের ২৩৯৯ টি জনগোষ্ঠীকে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যার মধ্যে ৮৩৭ টি শ্রেণিকে অধিক পশ্চাৎপদ শ্রেণি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এদের মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণের জন্য বি পি মণ্ডলের

সভাপতিত্বে আরেকটি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন গঠন করা হয় যা মণ্ডল কমিশন নামে পরিচিত। ১৯৮০ সালের ১২ ই ডিসেম্বর এই কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট অনুসারে ১১ টি সুচকের ভিত্তিতে সারা ভারতে ৩৭৪৩ টি জাতিকে (caste) পশ্চাৎপদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে ৮২ টি মুসলিম জাতপাতভিত্তিক জনগোষ্ঠী। এই ৮২ টির মধ্যে ১৯ টি জাতপাতভিত্তিক মুসলিম জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে আছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই ১৯ টি জাতপাতভিত্তিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর নামগুলি হল- আনসারি, ভাটিয়ারা, চিক, চুড়িদার, ডাফলি, দর্জি, ধুনিয়া, ফকির/সাই, হালালখোর, হাওয়ারি, ইব্রাহিমি, কসাই, কীচক, কোরেরী, রায়েন, মোমিন, নাই/হাজাম, রংরেজ এবং তুরহা। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী অনান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীসমুহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকাংশে পিছিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠী অধিকতর অনগ্রসরতার জন্য একাধিক কারণ লক্ষ্য করা যায়। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীরই শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো তাদের দারিদ্রতা এবং শিক্ষার বিষয়ে অসচেতনতা। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবার নিজেদের ছোট ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বা আলামিন মিশনের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের জন্য উদ্যোগী। কিন্তু দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশের পড়াশোনা প্রাথমিক স্কুলেই শেষ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাইমারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পর্যায়ে স্কুল ছুটের সংখ্যাটা অত্যন্ত বেশি এবং উচ্চশিক্ষায় অর্থাৎ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানোর সংখ্যাটাও নগন্য। তাছাড়া মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত যে সকল ছেলেমেয়েরা কোনরকম পড়াশোনা করে তাদের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মানও খুবই নিম্ন। ফলস্বরূপ তাদের পক্ষে কোনো চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও কঠিন হয়ে পড়ে। অনগ্রসর এই সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার কম ও স্কুল ছুটির সংখ্যা বেশি হওয়ার আরেকটি কারণ হলো অভিভাবকের শিক্ষার বিষয়ে অসচেতনতা। অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার হার প্রায় শূন্য এবং একই কারণে শিক্ষার বিষয়ে তারা অসচেতন। তারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি প্রাত্যহিক উপার্জনের নিরীখে বিচার করেন। এর ফলে তারা ছেলেদের একটু বড় হলেই স্কুলের পরিবর্তে বাইরে কাজ করতে পাঠায়।

প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে থাকার কারণ হিসাবে সরকারি ব্যবস্থাপনার অভাবকে নিঃসন্দেহে দায়ী করা যায়। ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রতি কিলোমিটারে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করে উঠতে পারিনি। বিশেষ করে অনগ্রসর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া সর্বাধিক মুসলিম অধ্যুষিত জেলা মুর্শিদাবাদে আজও কোন উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। অতি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও সেখানে যথাযথ পরিকাঠামো এবং শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ট কম। এইভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকতর অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে তাদের নিজেদের দারিদ্রতা, অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও ধর্মান্ধতাকে যেমন একদিকে বিশেষভাবে দায়ী করা যায় অন্যদিকে তেমনি এই সকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য যথাযথ সরকারি উদ্যোগ, কর্মসূচী গ্রহণ ও সুযোগ সুবিধার অভাবও অনেকাংশে দায়ী।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা

সন্তোষ রাণা তার ‘সমাজ ও গণতন্ত্র, গ্রন্থে সাচার কমিটি রিপোর্ট বিচার বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের অবস্থা অন্যান্য সকল রাজ্যের চেয়ে শুধু খারাপ নয়, বহুগুণ খারাপ। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস এবং তারা মূলত বাংলাভাষী। তাদের মধ্যে সুবিপুল অংশ নিম্ন বর্ণের হিন্দু জনসমাজ থেকে ধর্মান্তরিত। তাদের শিক্ষার স্তর ও গুণগতমান নিম্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিমদের আপেক্ষিক অংশ দীর্ঘকাল ধরে জাতি বৈষম্যের শিকার। তাদের অবস্থা তপশিলি জাতির মানুষের থেকেও খারাপ। সাচার কমিটির রিপোর্ট (২০০৬) অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতার প্রকৃত চিত্রটি উঠে আসে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী অনান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠী শিক্ষা, চাকরি, স্বাস্থ্য, দরিদ্র প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনেকটাই পিছিয়ে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ ব্যাবস্থা চালু করা হয়। সাচার কমিটির রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৪-২০০৫ সালে কেরলে মুসলিম ওবিসি-র শতকরা হার ৯৯.১ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৯৩.৩ শতাংশ, হরিয়ানাতে ৮৬.২ শতাংশ, বিহারে ৬৩.৪ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৬২.২ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ৬১.৭ শতাংশ, রাজস্থানে ৫৫.৮ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৫৪.৪ শতাংশ, উত্তারাঞ্চলে ৫৩.৩ শতাংশ, কর্ণাটকে ৫২.৭ শতাংশ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২.৪ শতাংশ। সুতরাং এই তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গে পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীসমূহকে অনান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকার অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে বিশেষভাবে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি। কারণ ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ প্রায় ৩৩ বছর পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসন বজায় ছিল। মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রসঙ্গ উঠলে বামেদের যুক্তি ছিল ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানের সংরক্ষণের কথা সংবিধানে নেই। অথচ ১৯৯৩ সালের পর ১২ টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বামপন্থী সরকার সংরক্ষণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে, যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এই প্রেক্ষিতেই বলা যায় যে, একই পদ্ধতিতে (যে পদ্ধতিতে ১২ টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংরক্ষণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল), সামাজিক ও অর্থনৈতিক বা পেশাগত অবস্থা বিবেচনার নিরীখে বা অনান্য রাজ্যগুলি যে পদ্ধতিতে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংরক্ষণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর মুসলিম জনগোষ্ঠীকেও সেই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যেতো কিনা তা নিয়ে বাম সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

২০০৯ সালে লোকসভা ভোটে বামপন্থীদের পরাজয় ও ভরাডুবি অবস্থা, অন্যদিকে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য সরকার অনান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ তালিকা ৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৭ শতাংশ করা হয় এবং পরবর্তী কয়েকমাসের মধ্যে ৪২ টি জাতিকে অনান্য অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ৪২ টি জাতির মধ্যে ৪১ টি মুসলিম জাতি, যার মধ্যে সর্দার, নিকারী, মিদ্দে, লস্কর, দর্জি, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি মুসলিম জাতপাতভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে এইসময়ে ১৭ শতাংশ সংরক্ষণের তালিকা দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়- একটি হল অপেক্ষাকৃত অধিকতর অনুন্নত শ্রেণী যাদের OBC-A শ্রেণীর তালিকাভুক্ত করা হয় এবং অন্যটি হল অনুন্নত শ্রেণী যাদের OBC-B তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাধারণত OBC-A তালিকায় ১০ শতাংশ সংরক্ষণের মধ্যে অধিক সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীকেই এই

তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৃনমূল কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ২০১২ সালে তৃনমূল কংগ্রেসের পরিচালিত সরকার নতুন করে শেখ, সর্দার, তরফদার সহ ৩৫ টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকাভুক্ত করে। এর ফলে রাজ্যের প্রায় ৮৭ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে রাজ্য সরকার মনে করে। কিন্তু ২০১০ সালে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকা বৃদ্ধি করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তকরণ, তালিকাকে OBC-A এবং OBC-B শ্রেণীতে বিভক্ত করা এবং পরবর্তীতে পুনরায় একাধিক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ- এসবের বিরুদ্ধে ২০১০ থেকেই কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক পিটিশন জমা পড়তে শুরু করে। এই প্রেক্ষিতে ২০২৪ এর মে মাসের ২২ তারিখে কলকাতা হাইকোর্ট ২০১০ সালের পরবর্তীতে অন্যান্য অনগ্রসর তালিকায় অধিকসংখ্যক ঐসকল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়াকে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে বাতিল করে। কোর্টের রায় প্রদানের ক্ষেত্রে যুক্তি ছিল, ২০১০ সালের পরবর্তীতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকা বৃদ্ধি নতুন আইন প্রণয়ন করে করা হয়নি, তা প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়েছিল; তালিকার বিভক্তিকরণ করার ক্ষেত্রে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশনের পরামর্শও নেওয়া হয়নি; আবার সংরক্ষণ তালিকায় নতুন করে জনগোষ্ঠীর নাম অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করার আগে কমিশন যথাযথ তথ্যভিত্তিকি সমীক্ষা করেনি।

কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের প্রেক্ষিতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ ব্যাবস্থা ২০০৯ সালের আগের অবস্থায় ফিরে গেল। কোর্টের রায়কে ঘিরে রাজ্য এবং ভারতীয় রাজনীতিতে নানা প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য করা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়েছে যা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী মুসলিম জনগোষ্ঠীসহ, মুসলিম সংগঠনগুলিও একত্রিতভাবে আইনি পদ্ধিতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ফিরে পেতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুল্যায়ন:

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নীতি অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে জাত-পাত ভিত্তিক, উচ্চ-নীচ বিভাজনকে স্বীকৃতি দেওয়া না হলেও, বাস্তবিকক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অনুসরণকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীসমুহের মধ্যে জাত-পাত এবং উচ্চ-নীচ বিভাজন দেখা যায়। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের লেখায় তা উঠে এসেছে, যা ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি কাকা কালেলকর কমিশন থেকে শুরু করে, মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ন্যায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতার কথা বলা হয়েছে। ২০০৬ সালের সাচার কমিটির রিপোর্টে সামগ্রিকভাবে ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসরতার প্রকৃত চিত্রটি উঠে আসে। এই রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামুলক আলোচনার করলে দেখা যায় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠী শিক্ষা, চাকরি, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকাংশে পিছিয়ে। ২০১৬ সালে The Association Social Network for Assistance to People (SNAP) প্রকাশিত Living Reality of Muslims in West Bengal: A Report অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার চিত্রটি ধরা পড়ে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থা অনেকাংশে দলিত জনগোষ্ঠীর থেকেও খারাপ। তাই গনতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর

উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সমান হওয়া প্রয়োজন। এই যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ ব্যাবস্থা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অবশ্যই সংরক্ষণের মানদণ্ড হওয়া উচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার মতো নির্ধারকসমুহ। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতা ইতিমধ্যে বিভিন্ন রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। প্রয়োজনে সরকারী উদ্যোগে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন জাত-পাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সমীক্ষার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরই ভিত্তিতে যেকোনো জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ত্রুটির বিষয়টি এড়িয়ে চলাও সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র:

১. Sachar Committee Report (2006)

২. Living Reality of Muslims in West Bengal: A Report published by (SNAP, 2016)

৩. Hasan, Zoya. (2009). Politics of Inclusion: Cates, Minorities, and Affirmative Actions. New Delhi: Oxford University Press

৪. Siddiqui, M.K.A. (General ed.) (2004). Marginal Muslim Communities in India. New Delhi: Institute of Objective Studies

৫. Ahmed, Imtiaz (ed.). (2018). Caste And Social Stratification Among Muslims in India. New Delhi. Aakar Books

৬. Dasgupta, Abhijit. (2009). On the Margins: Muslims in West Bengal. Economic and Political Weekly. Vol. 44. No. 16

৭. Rahman, Abdur. (2019). Denial And Deprivation. New Delhi. Manohar

৮. ইসলাম, শেখ মকবুল. (20১০). মুসলমান সমাজঃ বঞ্চনা অনুন্নয়ন ও সঙ্কট, কলকাতা: বুকস ওয়ে প্রকাশনী

৯. রাণা, সন্তোষ. (২০১৯). সমাজ ও গনতন্ত্র. কলকাতা. অন্তঃসার

১০. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ. 'জাতিগণনাই কি সমাধান'. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুন ২০২৪।

ইন্দিরা পার্থসারথি-র 'কুতুবমিনার ও একটি শিশুর হাসি : একাধারে শূন্যতা ও পূর্ণতা নিয়ে পথচলা মানবমনের কাহিনি

প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সৃষ্টির আদিম সময়কাল পেরিয়ে ধীরে ধীরে নিজস্ব হৃদয়বৃত্তির বহিঃপ্রকাশের হাত ধরে মানুষ গড়ে তোলে সমাজ ও সভ্যতা। হৃদয়ের নানা অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করতে শেখে ভাষায়। তারও পরবর্তীতে সময়ের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হয় সাহিত্যের। যা হয়ে ওঠে মানবমন, জীবনভাবনা ও সমাজ-সভ্যতার আয়নাস্বরূপ। ক্রমেই বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের কলমে যেমন মানবের জীবন ভাবনা ও বোধ ফুটে উঠতে শুরু করে, একইভাবে উঠে আসে মানবমন ও তার সমাজ-সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

ছয়ের দশকে ভারতীয় সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করা তামিল সাহিত্যিক ইন্দিরা পার্থসারথিও সেই ধারারই এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। যার বিভিন্ন লেখনীর মধ্যে দিয়ে বারে বারে উঠে আসে মানব মনের নানা অভিব্যক্তির কথা। দৈনন্দিন যাপনে ক্লান্ত মানব মন প্রতিদিনের ছুটে চলায় জীবনের নানা বাঁক বদল করে, অলি-গলি পেরিয়ে আমৃত্যু যেন এক অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সমানেই ছুটে চলে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সেই পথচলা তাদের যেমন ক্লান্ত করে একই ভাবে মনোজগতের নানা দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। খোঁজে আলো আর মুক্তির পথ। সাহিত্যিক তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে আলোর খোঁজে পথচলা সেই মানব মনের কথাই তুলে ধরেন। আলোচ্য গল্পটি সেই ধারাই অন্যতম উদাহরণ।

সূচক শব্দ: আধুনিক সময়, ছুটে চলা, ক্লান্ত মানবমন, হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব, মুক্তির অন্বেষণ।

মূল আলোচনা:

তামিল সাহিত্যজগতের এক স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যিক ও নাট্যকার হলেন ইন্দিরা পার্থসারথি। তামিলনাড়ুর কুম্বাকোনামে (১৯৩০ সালে) এক আয়েঙ্গার পরিবারে জন্মগ্রহন করা ও বেড়ে ওঠা সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম হল রঙ্গনাথন পার্থসারথি। ছেলেবেলায় আয়েঙ্গার অর্থাৎ তামিলভাষী হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে বৈষ্ণব ও রামানুজ প্রবর্তিত বিশ্বাদৈত দর্শনের ভাবাদর্শে বেড়ে ওঠা সাহিত্যিকের উচ্চশিক্ষায় গবেষণার বিষয় ছিল রামানুচার্যের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ। পরবর্তীকালে পেশাগত জীবনে দিল্লি, পোল্যান্ড, কানাডা, হল্যান্ড প্রভৃতি জায়গার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি সাহিত্যিক হিসেবে রচনা করেছেন একাধিক উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল রামানুচার্যের জীবনী রচনা। প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৬৭-তে এবং প্রথম উপন্যাস ১৯৬৮তে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কুরুথিপ্পুনাল' ও গল্প-সংকলন 'যুগ ধর্মম' তামিল ভাষাভাষী সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় পাঠ্য।

১৯৭৭ সালে দেশের একমাত্র তামিল সাহিত্যিক হিসেবে 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কারে সম্মানিত হওয়া ইন্দিরা পার্থসারথি এমন একজন সাহিত্যিক যার লেখনীতে বারবার উঠে এসেছে সমাজ ও সেই সমাজে বসবাসকারী নারী-পুরুষের কথা, তাদের মনোজগতে চলতে থাকা ভাঙা-গড়ার কথা। চেতনার জাগরণ, অবক্ষয়, বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে জীবনে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে অহর্নিশ ক্ষত-বিক্ষত হওয়া এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের সন্ধানে আমৃত্যু হেঁটে চলা মানবমনের কথা। যেখানে তাঁর লেখনীর চরিত্ররা অধিকাংশই শহুরে শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি হয়ে খোলামেলা মনে জীবনকে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরে মানব মনের নানা অজানা অভিব্যক্তির কথা।

আমাদের আলোচ্য গল্পটিও মানব মনের সেই আলো-আঁধারির গোপন কোণের কথা বলে পাঠকের কাছে। যে কোণের একদিকে আশার আলোর হাতছানি থাকে তো অপরদিকে থাকে তীব্র হতাশা আর শূন্যতার গভীর খাদ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানব মন যেখানে বহুধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। যার প্রাঞ্জল উদাহরণ হয়ে পাঠকের সামনে উঠে আসে ভাস্কর, অম্বুজা, মিস্টার চোপড়া, ঊষা প্রমুখ চরিত্রের জীবনভাবনা ও যাপনশৈলী। যেখানে জীবনের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি চরিত্রই যেমন নিজের নিজের ভূমিকায় সর্বস্ব উজাড় করে দিতে স্বচেষ্ট হয় তেমনই সচেষ্ট থাকে জীবনের অপ্রাপ্তি থেকে জন্ম নেওয়া যন্ত্রণার যে কঠিন বাস্তব তার থেকে মুক্তিলাভ করতে। ফলস্বরূপ প্রতিনিয়ত তাদের মনোজগতে চলতে থাকে এক অসম লড়াই। আলোচ্য কাহিনিতে একদিকে নিজেদের দাম্পত্যে এরকমই এক অসম লড়াইয়ে সামিল হয় ভাস্কর আর অম্বুজা। অপরদিকে নিজ নিজ ব্যক্তিজীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ানো বিচিত্র সংকটের সঙ্গে নিরলস লড়াই চালিয়ে যায় মিস্টার চোপড়া আর উষা। যেখানে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনের ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটতে থাকে তাদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী, মানসিক গঠন অনুযায়ী।

এক গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারের আবহে জন্ম থেকেই বেড়ে ওঠা অম্বুজা কোনোদিনই নিজের মধ্যে কোনো স্বতন্ত্র নারীসত্তা বা ব্যক্তিসত্তা গড়ে তুলতে পারেনি। গড়ে ওঠেনি তার নিজস্ব ভাবনার জগৎ বা জীবনদর্শন। ছিল না কোনো বিষয়ের প্রতি তার নিজস্ব আকর্ষণ বা অভিরুচি। আসলে যে পরিবারে তার বেড়ে ওঠা সেখানে মেয়েমানুষের কথা বলাই এক ভয়ংকর অপরাধের মতন মনে করা হত। সেই স্রোতেই ভেসে চলে বিবাহিত জীবনেও স্বামী ভাস্করই ছিল তার সমস্ত ভাবনা ও দিনযাপনের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে শুরু থেকেই ভাবনাগত দিক থেকে এক অদৃশ্য দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় অম্বুজার দীর্ঘ দুই বছরের রোগশয্যা। জীবন সম্পর্কে বাস্তব ধারণা ও কল্পনাশক্তির অভাব আর শিরদাঁড়ার কঠিন রোগে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার ফলস্বরূপ প্রবল হতাশা আর অসহায়তার ফলে অম্বুজার মনোজগতে এক তীব্র ভাঙনের সৃষ্টি হয়। সেই ভাঙনের ফাটলে জন্ম নেয় আত্মবিশ্বাসের অভাব, হীনমন্যতা, সংশয়, সন্দেহের মত মানসিক বিকৃতি। আর সেই বিকৃতির আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে থাকে তার মা। কারণ অল্প বয়সে স্বামীকে হারানো অম্বুজার মাও ছিলেন অম্বুজার মতই একই পথের পথিক। তার মধ্যেও ছিল না একজন নারী হিসেবে নিজস্ব কোনো স্বাতন্ত্র্যবোধ। স্বামীকে হারানোর পর বাবা-ভাইয়ের সংসারে তার জীবন ছিল পরগাছার মত। সেখানে তার কোনো নিজস্ব মূল্য ছিল না। উপরন্তু পরিবার-সমাজ-পরিস্থিতির চাপ তার চিন্তা করার শক্তিটাই কেড়ে নিয়েছিল। ফলে মেয়ের দৈহিক সৌন্দর্য নষ্ট হলে সে স্ত্রী হিসেবে ভাস্করের কাছে নিজের মর্যাদা হারাবে এই আতঙ্কে তিনি মেয়ের ভেঙে যাওয়া মনোবলকে পুনর্গঠন করার পরিবর্তে তাকে আরও ভেঙে ছড়িয়ে ফেলতে থাকেন। এ সবেরই এক ভয়ংকর পরিণাম রূপে দেখা যায়

চারপাশের প্রতিটা মানুষকে নিজের শত্রু মনে করতে শুরু করে অম্বুজা। আসলে দীর্ঘ রোগযন্ত্রণার হাত থেকে শারীরিক ভাবে মুক্তি পেলেও মনের দিক থেকে সে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে না। দিনে দিনে তার মনের উত্তরণ আলোর দিকে হওয়ার হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশই ভাবনার জটিল অন্ধকার গহ্বরে পথ হারিয়ে ফেলে।

অপরদিকে অম্বুজার মনোজগতের এই পরিবর্তন ও ভাঙনের প্রভাব দিনে দিনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে ভাস্করের মনের ওপরেও। নিজের সবচেয়ে কাছের মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক সাহচর্যের অভাব ক্রমশই তাকে একা করে দিতে থাকে, নিঃসঙ্গ হতে থাকে ভাস্কর। প্রতি মুহূর্তে অম্বুজার পঙ্গু হয়ে যাওয়া ভাবনা, মনের সন্দেহ, জটিলতা এই সবই সাহিত্য, আর্ট, ফিলসফি ইত্যাদি নানা বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা রাখা স্মার্ট, ঝকঝকে, উৎসাহী, উদ্যোমী তরুণ ভাস্করের চিন্তা-চেতনায় আঘাত করতে থাকে। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ তার মনে চলতে থাকে নানা টানাপোড়েন, জন্ম নেয় প্রবল দ্বন্দ্ব, বইতে থাকে ঝড়। নিজ দাম্পত্যে একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতায় ঘিরে থাকা ভাস্করের মন ছটফট করতে থাকে মুক্তিলাভের চেষ্টায়, খুঁজতে থাকে অবলম্বন।

এখানে লেখক পাঠকের সামনে তাঁর বিশ্লেষণী লেখনশৈলীর মাধ্যমে একদিকে তুলে ধরেন মানবমনের আয়নায় প্রতিফলিত হওয়া জীবনের এক কঠিন বাস্তবকে। যেখানে "মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় করে তার একাকীত্বকে, তার নিঃসঙ্গতাকে। তাই তার সমস্ত জীবন ধরে এই নিঃসঙ্গতা থেকে পালানোর চেষ্টা। এই নিঃসঙ্গতার আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্যই সে স্বামী-স্ত্রী, পরিবার, সমাজ ইত্যাদির কবচ বানিয়ে তার মধ্যে ঢুকে যায়।"[১] অপরদিকে প্রশ্ন রাখেন পাঠকের সামনে "কিন্তু এসব চেষ্টা কি সফল হয়? সে কি সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গতা থেকে রেহাই পায়?"[২] যার চিরাচরিত উওর হয় – পায় না। ভাস্করও পায়নি। সে ক্রমশই হতাশা আর একাকীত্বের অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। আলোর পথ খুঁজতে থাকে মুক্তির সন্ধানে। আর জীবনের এই অস্থির পর্যায়ে ভাস্করকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে থাকে তার অফিসের বস মিস্টার চোপড়ার ব্যক্তিত্ব ও দৈনন্দিন যাপনশৈলী। মিস্টার চোপড়া এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি ভাস্করের মতই আর্ট, সাহিত্য, ফিলসফি সহ নানা বহুমুখী বিষয়ে জ্ঞান রাখার সত্ত্বেও শিক্ষাজগতে প্রবেশ না করে বেছে নিয়েছেন এক অন্য জীবন, এক বানিজ্যিক সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রূপে। ভাস্করের মনে হয় যা হয়তো তার ভাবনা জগতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিন্দুতেই ভাস্কর ও মিস্টার চোপড়া একে অপরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আকর্ষিত হয়, মিল খুঁজে পায় একে অপরের ভাবনার জগতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাস্করের মনে হতে থাকে মিস্টার চোপড়ার জীবন অনেক বেশি স্বস্তির। তার একাকীত্ব নেই, মনের গভীরে নেই কোনো দ্বন্দ্ব বা জটিলতার আবর্ত। তিনি যেমন অসম্ভব ভালো ব্যবসায়িক হিসেব নিকেশ করতে পারেন তেমনই পারেন অদ্বৈতবাদের চুলচেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে। তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে উদাত্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন – "মানসিক সংঘর্ষ আমার হয় না।.....আমি সমাজকে গ্রাহ্য করি না। আমার জীবন আমার নিজের, তাতে আর কারো অধিকার নেই। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে অমর।"[৩]

ভাস্করকে তাই তিনি সব ভুলে জীবনকে উপভোগ করতে বলেন। কিন্তু নদীর এপাড় যেমন ওপাড়কে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই ভেবে যে, ওপাড়েই সর্বসুখ। একই ভাবে ভাস্করের মনে হয় মিস্টার চোপড়ার জীবন সব দিক দিয়েই পারফেক্ট। যেখানে কোন শূন্যতা, দ্বন্দ্ব বা জটিলতা নেই। যার একটা অন্যতম কারণ হয়তো মনের ভাবানুভূতিগুলোর প্রতি নিয়ন্ত্রণ মিস্টার চোপড়ার অনেক বেশি। যার কাছে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তই মূল্যবান, আর সেই মূল্যবান সমস্ত

মুহূর্তগুলিই তার কাছে উপভোগ করার সম্পদ। তাই তিনি বার বার ভাস্করকে বলতে থাকেন ছুটি নিতে সব কিছুর থেকে, এমনকি সমস্ত বন্ধন, সমাজ, নৈতিকতা থেকেও। ভাস্কর বেরিয়ে পড়ে অজানা অচেনা পথে মনের আশ্রয়ের খোঁজে। যে পথচলায় তার সঙ্গী হয় অফিস কলিগ ঊষা। ভাস্করের চোখে ঊষার জীবনও যাকে বলে সব দিক দিয়ে পারফেক্ট, উচ্ছ্বলতায় ভরপুর। কিন্তু সব সময় জীবনের প্রাচুর্যে ভরপুর থাকা মিস্টার চোপড়ার অনেক কাছের হয়েও যেমন তার মনের গোপন শূন্যতার কথা অজানা থেকে যায় ভাস্করের, তেমনই সে খোঁজ পায় না ঊষার মনের শূন্যতার, বেদনার। কিন্তু মিস্টার চোপড়ার মনের সেই শূন্যতার খোঁজ পেয়েছিল তার সেক্রেটারি মিস ঊষা আদওয়ানি। কিন্তু ব্যক্তি ঊষার মনে চলতে থাকা দ্বন্দ্বের খোঁজ তখনও অব্দি পায় না কেউই। আসলে আমাদের দৈনন্দিন এই অবিরাম ছুটে চলা জীবনে বহুক্ষেত্রেই কোনো একজন মানুষকে বাহ্যিক ভাবে চিনি বা জানি ভাবলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা হয়তো তাকে আদপেই চিনতে বা জানতে পারি না। বুঝতে পারি না একজন মানুষকে চিনতে বা জানতে হলে তার মনের ঠিক কতখানি কাছাকাছি যেতে হয়।

কাহিনিতে মিস ঊষা আদওয়ানি আধুনিক সময়ের সেই নারীদের প্রতিনিধি হয়ে পাঠকের সামনে উঠে আসে যারা সময় পরিস্থিতি যেমন যাই হোক না কেন সেই অনুযায়ী নিজেকে যেকোন ছাঁচে ঢেলে নিয়ে নিজস্ব সাবলীল ছন্দে পথ চলতে সক্ষম। স্বচ্ছন্দে পা বাড়াতে পারে অজানার উদ্দেশ্যে। আর সেই পথেই ঊষা বেরিয়ে পড়েছিল ভাস্করের সঙ্গে। বহুজাতিক বানিজ্যিক সংস্থায় কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে করতে মেকি হাসি ও মেকি বেগময় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া ঊষার মনও হাঁফিয়ে ওঠে, বিরতি চায়। যদিও এ জীবন তার নিজেরই বেছে নেওয়া। কিন্তু সেও মুক্তি চায়। কারণ মনের কোনো এক গোপন কোণে সেও স্বপ্ন দেখে স্বামী-সন্তান নিয়ে এক ছোট্ট সংসারের। কিন্তু তার বেছে নেওয়া জীবনের গতিময়তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না তার স্বপ্নগুলো। তাই অজানার উদ্দেশ্যে হারিয়ে গিয়ে মনের আলোর খোঁজ করতে চাওয়া ভাস্করের সঙ্গী হয় সে তার কর্পোরেট জগতের সমস্ত সাজসজ্জা, রঙ মুছে দিয়ে রঙহীন ভাবে, জীবনের নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে। তাদের সেই পথচলা থামে কুতুবমিনারের সামনে পৌঁছে। কুতুবমিনার – প্রাচীন ভারতের এই বিখ্যাত মিনারটি জীবনের এক চরম শূন্যতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভাস্কর আর উষার সামনে। যার কোনো নিজস্ব অর্থ নেই। যার মধ্যে প্রাণ নেই। নেই আবেগ অনুভূতির স্পর্শ। কিন্তু সেই বিশাল মিনারের সামনে ছুটে আসা এক তিন বছরের শিশুর হাসিতে প্রাণ খুঁজে পায় উষা। ভাস্কর পায় তার ক্লান্ত মনের কোণে চাপা পড়ে যাওয়া পিতৃস্নেহের স্পর্শ। মনে ভেসে ওঠে নিজের ছোট্ট মেয়ে রমার মুখখানি। আসলে জীবনে চলার পথে একদিকে যেমন থাকে তীব্র হতাশা শূন্যতা অপরদিকে তেমন থাকে এমন কিছু আবেগ-অনুভূতি যা অসীম শূন্যতার মধ্যেও আমাদের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। অপত্য স্নেহ মানব মনের সেই রকমই আবেগ। যাকে ঘিরে জীবনের কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষ খুঁজে নেয় লড়াই করে বেঁচে থাকার মনের জোর। কাহিনিতে সেই ছবিই তুলে ধরেছেন গল্পকার।

সমগ্র কাহিনি জুড়ে মানবমনের দ্বন্দ্বের নানা রূপের ছবি উঠে আসলেও প্রায় শেষ পর্যায়ে গিয়ে একটি ছোট্ট শিশুর মুখের হাসিই বদলে দেয় জীবন নিয়ে ভাস্করের সমস্ত হিসেব, মুছে দেয় সমস্ত দ্বন্দ্ব। কারণ জীবনের হিসেব নিকেশ মেলাতে বসলে দেখা যাবে এক ছোট্ট শিশুর হাসির আলোয় মনের সমস্ত অন্ধকার মুহূর্তে মুছে যায়। অপত্য স্নেহের যে সুখ তা হয়তো মানবমনের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত চাওয়া। আর এখানে ভাস্করের মনের শূন্যতার ধারণা তাসের

ঘরের মতন ভেঙে পড়ে যখন সে ঊষার মনের ভাবনার প্রসঙ্গে জানতে পারে মিস্টার চোপড়ার জীবনের বাস্তব কঠিন সত্যকে। তখন তার মনে হয় মিস্টার চোপড়ার মনের যে স্বতঃস্ফূর্ততা তা যেন কুতুবমিনারের মতই ফাঁপা শূন্য। আর সেই শূন্যতাকে ঢাকা দেবার এক মরিয়া চেষ্টা তিনি করে চলেন প্রতি মুহূর্তে। জীবনকে উপভোগ করার ভাবনায় বিশ্বাসী মিস্টার চোপড়া নিজেই নিজের জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে অক্ষম। অপর দিকে মিস্টার চোপড়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ঊষাও পারে না সব জানা সত্ত্বেও সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসতে। এ যেন জীবনের এক অদ্ভূত হিসেব। এই সমস্ত বিষয়কে অনুভব করার পরই ভাস্কর বুঝতে পারে মানব জীবন ও মনের যে নিজস্ব ছন্দ ও গতি তার থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। যেদিকে যেখানে যেভাবেই যাও জীবনের দাঁড়িপাল্লায় হিসেব তোমাকে দিতেই হবে। তাই কাহিনি শেষে দেখা যায় মনের যে জটিল আবর্ত ও দ্বন্দ্ব থেকে সে পালাবার চেষ্টায় সব কিছু থেকে ছুটি নিয়েছিল তা সাময়িক।

আসলে জীবনে চলার পথে মনের কোনো ছুটি নেই। মানব জীবনে মন হচ্ছে নদীর মতন, সে তার নিজস্ব ছন্দে, গতিতে পথ চলে। সেই চলার পথে সেও এক কূল ভাঙে তো এক কূল গড়ে। একদিকে থাকে জীবনের শূন্যতা তো অপরদিকে পূর্ণতা। প্রকৃতপক্ষে গল্পকার তাঁর লেখনী সমূহের মধ্যে দিয়ে নানাভাবে সমাজের প্রতি তাঁর নঞর্থক প্রচেষ্টাকেই তুলে ধরেছেন – যেখানে সবই প্রশ্ন, কোনো উত্তর নেই। এই কাহিনির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শিক্ষিত আধুনিক শহুরে নারী-পুরুষের জীবনকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন বলেই তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে জীবনের এই দিকটিকে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে এও বুঝেছিলেন মানব মন তো সব সময় জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর তো দেয় না, পাওয়া যায় না। যেমন পায়নি ভাস্কর, অম্বুজা, ঊষা। কিন্তু তাও মানুষের মন তার নিজস্ব হিসেবেই এগিয়ে চলে জীবনের একদিকে শূন্যতা ও পূর্ণতার ডালি নিয়ে। তাই কাহিনির শেষে ভাস্করও ঊষাকে ফেরার কথা বলে তার জীবন ও মনের চিরাচরিত পুরনো ছন্দে। কারণ এক ছোট্ট শিশুর হাসির তুলনায় যেখানে কুতুবমিনারের ঐতিহাসিক মূল্য ও জৌলুস ফিকে হয়ে যায় সেখানে বাকি মনের হিসেব খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে।

তথ্যসূত্র:

১। রামকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ‘ভারতজোড়া গল্পকথা’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মার্চ ২০২২, পৃঃ ১৩৫।
২। প্রাগুক্ত।
৩। তদেব, পৃঃ ১৩৭।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে ফটোগ্রাফি ও ওয়াল্টার বেঞ্জামিন : সত্ত্বা/আভা/জ্যোতির একটি সমালোচনামূলক আলোচনা

অচিন্ত্য দেবনাথ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ: আলোচ্য গবেষণা পত্রটিতে দার্শনিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের আধুনিক ফটোগ্রাফির সত্ত্বা/আভা/জ্যোতি সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত নকলিকরণ তত্ত্বের উপর খানিক সমালোচনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। যা এই সামান্য পরিসরে ঐতিহাসিকতার দ্বারা ভীষণ ভাবে সিক্ত ও নানা ধারায় প্রবাহিত। এই পত্রটি যে কেবল বেঞ্জামিনের মূল বক্তব্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছে তাই নয় সাথে এও পরিবেশন করেছে যে কেন বেঞ্জামিন ফটোগ্রাফির নকল উৎপাদন ও সত্ত্বা/আভা/জ্যোতির সম্পর্কে তাঁর পূর্বেকার অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন।
মূলশব্দ: ফটোগ্রাফি, সত্ত্বা/আভা/জ্যোতি, নকলিকরণ, মাত্রা।

মূল আলোচনা:
ব্যুৎপত্তিগত উৎপত্তি বিষয়ে তেমন কোন বিতর্ক না থাকলেও ওয়াল্টার বেঞ্জামিন ফটোগ্রাফির নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে যে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণেরসংশ্লেষন করেছেন তা সাধারণ মস্তিষ্কের উপলব্ধির বহির্ভূত বিষয় বলা যথেষ্ট স্বাভাবিক। যেমনভাবে বলা যায় ব্যক্তি-বস্তুর নিজস্ব সত্ত্বা/আভা/জ্যোতি ভাষায় ব্যক্ত করার বিষয় নয় বা তা অনুভূতির গণ্ডীর অভ্যন্তরীণ আশয় বলেও মনে হয় না। কারণ অনুভূতির সাথে স্পর্শতা নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উষ্ণতা, বেদনা প্রভৃতির অনুভুতি স্পর্শের মাধ্যমে উপলব্ধি হয়। আবার কিছু অনুভুতি আছে যারা স্পর্শের বহির্গত কিন্তু উপলব্ধির অন্তর্গত। তাই দেখা যায় সমস্ত স্পর্শই অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধ কিন্তু সকল উপলব্ধির অনুভূতি স্পর্শ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে *aura* হল এইরকম যে স্পর্শের বহির্গত কিন্তু উপলব্ধির অন্তর্গত। তাই ফটোগ্রাফির বা চিত্রের নিজস্ব সত্ত্বা/আভা/জ্যোতি কোনো ভাবে মৌখিক ভাষ্য বা লিখিত অক্ষরে প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব কিনা তা বিচার সাপেক্ষ (যদিও সমস্ত ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ নয়)।

বিচার সাপেক্ষ এই কারনে যেহেতু চক্ষু দ্বারা পর্যবেক্ষিত কিংবা কর্ণ দ্বারা শ্রুত সমস্ত কিছু হাত দ্বারা লিখিত অক্ষরের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত ভাব বহন করে (বাকি তিন ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ জিহ্বা, ত্বক ও নাসিকার প্রাপ্তি উক্ত দুই ইন্দ্রিয়ের সাপেক্ষে লঘু এবং এই তিন ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্তি হাতে লেখা অক্ষর দ্বারা আবদ্ধ সম্ভব কারন তা উপরিক্ত দুই ইন্দ্রিয় দ্বারা যাচাই করা সহজ। যেমন ভাবে বলা যায় গরম জিনিস দেখেই উপলব্ধি করা যায় যে তা গরম, ত্বক দ্বারা তাকে স্পর্শ করে যাচাই করার প্রয়োজন হয় না)।

বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে গেলে উদাহরণ বিশেষ জরুরী। উদাহরণ হিসাবে বস্তুর একমাত্রিকতা, দ্বিমাত্রিকতা, ত্রিমাত্রিকতার কথা বলা যায়, যে বিষয়/বস্তু ত্রিমাত্রিক তার ভাব অক্ষরে প্রকাশ/বদ্ধ করা অতিসহজ যেহেতু তা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা পরীক্ষিত ও অন্তর্ভুক্ত, অপরদিকে একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিকতার ক্ষেত্রে এইটি পর্যায়ক্রমে দুর্লভ (এবং মাত্রাহীনের ক্ষেত্রে অসম্ভব)। আর *aura* যেহেতু দৃশ্যত দৃষ্টিগোচর নয় (অর্থাৎ একমাত্রিকও নয় বা মাত্রা ছাড়া বা

মাত্রাহীন) তা লিখিত আকারে প্রকাশ করা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিধি অঙ্কে লিখবার মতই বাতুলতার সমান। ধরুন একটি সৌন্দর্য সম্পন্ন নারী বা অতীব সৌন্দর্য সম্পন্ন নারী কিংবা ঠিক তার বিপরীত কেউ (মানে পুরুষ) রাস্তায় হাঁটছে (হাতে অঙ্কিত চিত্র কিংবা ক্যামেরায় বন্দি ছবি) তার দৃশ্য নিশ্চয় চাক্ষুষ করবার নিমিত্ত এবং তা প্রকাশ্যে লিখবার নিমিত্ত সুযোগ্য অক্ষরাদি মোটামুটি সকল ভাষাতেই বর্তমান।

এইবার সেই নারীর *aura* যা দৃষ্টির অগোচর (যদিও সৃষ্টির গোচরে কার্যত অদৃশ্য) ও মাত্রাহীন তা হাতে লেখা অক্ষরে আবদ্ধ করা সম্ভব কি? যদি সম্ভবও হয় তাহলে হাতে অঙ্কিত চিত্র কিংবা ক্যামেরায় বন্দি ছবি কার *aura* আছে আর কার নেই কিংবা কে কারটি নষ্ট করছে তা খানিক মুরগী ও ডিমের জন্ম কাহিনীর লুপের ন্যায় নয় কি? সুতরাং এই বলা বাঞ্ছনীয় যে হাতে অঙ্কিত চিত্র কিংবা ক্যামেরায় বন্দি ছবি কোনটির *aura* কিরকম কিংবা একটি অন্যটির *aura* নষ্ট করছে অথবা দুই-র ভিন্ন ভিন্ন *aura*আছে- এইসব কটি শব্দগোষ্ঠীসমূহ লুপের সৃষ্টি করছে[i]। এর কারন হিসাবে বলা যায় অক্ষর সমূহের জটিল প্রয়োগ দ্বারা যেকোনো ধরনের লেখায় লুপের সৃষ্টি করা যায়। যা বেঞ্জামিন *aura*-র চরিত্র চিত্রায়নে করেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে লূপটি ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের নিজের তৈরি এবং তিনি তাঁর তৈরি লূপে নিজেই অনবরত ঘুরেছেনএবং অপরকেও ঘোরাচ্ছেন।

যাইহোক, এখন দেখা যাক *Little History of Photography*তে কি করে ওয়াল্টার বেঞ্জামিন ফটোগ্রাফির নিজস্ব সত্ত্বা ফিরিয়ে এনেছেন। আলোচ্য স্থলে উল্লেখ্য যে তিনি *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*-এ এই বলে বক্তব্য রেখেছেন যে হস্ত চিত্রের সত্ত্বা/আভা/জ্যোতি আধুনিক ফটোগ্রাফি ধ্বংস করেছে[ii]। সুতরাং তাঁর এই দুটি ভিন্ন বক্তব্য যারা পরস্পর বিরোধী তার ব্যাখ্যা খানিক জটিল। এমতাবস্তায় *aura*-র ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন অনেকটা এইরূপে:

> what is aura, actually? A strange weave of space and time: the unique appearance or semblance of distance, no matter how close it may be. (Benjamin, 1931-1934, p. 518)

যদিও তিনি *aura*[iii] র বিশেষত্ব আরোপে শ্রেণীবিভাজন করেছিলেন এবং ঐতিহ্যগত ভাবে চিত্রিত চিত্রের *aura* নিয়ে ফটোগ্রাফির ছিনিমিনি খেলা এসকল তত্ত্ব দিয়েছিলেন তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি নিজ মতের পরিবর্তন করেন। বিশেষভাবে ইংরেজ চিত্রকর ডেভিড অক্তাভিয়াস হিল প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে একজন চিত্রকার হিসাবে ডেভিড হারিয়ে গেলেও তিনি একজন ফটোগ্রাফার হিসাবে ইতিহাসে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন[iv]।পরবর্তীতে বক্তব্য আরও জোরালো করবার উদ্দেশ্যে বেঞ্জামিন বলেছেন ক্যামেরার লেন্স চক্ষুর তুলনায় অধিক আবেদন করার সামর্থ্য রাখে:

> Forit is another nature which speaks to the camera rather than to the eye:"other" above all in the sense that a space informed by human consciousness gives way to a space informed by the unconscious. Whereas it is a common place that, for example, we have some idea what is involved in the act of walking (if only in general terms), we have no idea at all what happens during the fraction

> of a second when a person actually takes a step. Photography, with its devices of slow motion and enlargement, reveals the secret. It is through photography that we first discover the existence of this optical unconscious, just as we discover the instinctual unconscious through psychoanalysis. Details of structure, cellular tissue, with which technology and medicine are normally concerned-all this is, in its origins, more native to the camera than the atmospheric landscape or the soulful portrait. Yet at the same time, photography reveals in this material physiognomic aspects, image worlds, which dwell in the smallest things-meaningful yet covert enough to find a hiding place in waking dreams, but which, enlarged and capable of formulation, make the difference between technology and magic visible as a thoroughly historical variable (Benjamin, 1931-1934, pp. 510-511).

এই স্থলেও তার পূর্ব অবস্থান থেকে বিচ্যুতি দেখা যায়। এই বিচ্যুতির কারন দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় প্রথমত, যান্ত্রিক ক্যামেরা টেকনোলজির অভাবনীয় উন্নতি[v] দ্বিতীয়ত, বেঞ্জামিনের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর আন্তরিকতা। তিনি নিজেও এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আর ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই বেশি দেরি না করে তিনি ফটোগ্রাফির *aura* সম্পর্কে নিজ বক্তব্য স্বচ্ছতার সঙ্গে পেশ করেন। এই স্বচ্ছতা যদিও প্রথমক্ত *aura* যা কিনা হস্ত চিত্রের ক্ষেত্রে সংযুক্ত হয়েছিল শীঘ্রই তা বিস্তারিত হয় ফটোগ্রাফির পরিধিতেও। আরও কয়েকটি বিস্তারিত উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন ভাবে বলা যায় *Little History of Photography* তিনি বলেছেন:

> Immerse yourself in such a picture long enough and you will realize to what extent opposites touch, here too: the most precise technology can give its products a magical value, such as a painted picture can never again have for us (Benjamin; 1934-1935 p. 5).

এটি তাঁর বাড়াবাড়ির দৃষ্টান্ত যে ফটোগ্রাফি এক অলৌকিক ক্ষমতার প্রতিফলন করে যা হাতে আঁকা চিত্র কখনই ধারন করতে পারে না। এই বাড়াবাড়ি উন্মত্ততার পর্যায়ে পর্যবেশিত হয়েছে যখন তিনি তাঁর উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এই মন্তব্যটি কোট করেছেন: *"The illiteracy of the future, "someone has said, "will be ignorance not of reading or writing, but of photography."* (Benjamin; 1934-1935 p. 527) উনিমাথায় রাখেননি যে হাতে লেখা অক্ষর ও টাইপ করা অক্ষর উভয়ই একই অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু হাতে আঁকা ছবি আর ক্যামেরায়বন্দী ছবি একই অর্থ প্রকাশ নাও করতে পারে। সর্বোপরি এখনও পর্যন্ত (যা তাঁর [বেঞ্জামিনের] ভবিষ্যৎ) মানে বর্তমানে তো দূর সুদূর

ভবিষ্যতেও ফটোগ্রাফি পড়া এবং লেখার স্থান দখল করবে বলে মনে হয় না। আরও বলা যায় যে যদি ফটোগ্রাফি পড়া এবং লেখার স্থান দখল করার ক্ষমতা রাখত তাহলে মিশরের হায়রোগ্লাফি[vi] ও হড়প্পার পিক্তোগ্রাফী লুপ্ত হত না হলে, বরং তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ত এবং লিখিত অক্ষরের উদয় হত না। যাইহোক তিনি এইভাবে এক অর্থে ফটোগ্রাফির নিজস্ব সত্ত্বা/আভা/জ্যোতি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন বলা যায়। তিনি আবার ফটোগ্রাফির তত্ত্বগত বিশ্লেষণ করে তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা প্রমান করতে সচেষ্ট হয়েছেন, আলোচ্য উক্তিটি এই সম্পর্কে সবিশেষ আলোকপাত করে:

> In the final analysis, mechanical reproduction is a technique of diminution that helps people to achieve control over works of art - a control without whose aid they could no longer be used (Benjamin; 1934-1935 p. 523).

এরপর আরও একটি উদাহরণের সাহায্যে বেঞ্জামিন ফটোগ্রাফির *aura* প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং তা করতে গিয়ে তিনি সুরেলিয়ালিস্তদের কথা বলেছেন। খ্যাতনামা আতগেত সম্পর্কে নানা মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি সুক্ষভাবে ফটোগ্রাফির বিশেষত্ব আরোপ করেছেন ও ফটোগ্রাফিক *aura*-র আগমন ঘটিয়েছেন। এই আগমন খানিকটা তার নিজস্বতার উপর নির্ভরশীল আবার খানিকটা বেঞ্জামিনের স্ব-আরোপিত বক্তব্যের ঝনঝনানি। যাইহোক আতগেত সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

> He was the first to disinfect the stifling atmosphere generated by conventional portrait photography in the age of decline. He cleanses this atmosphere-indeed, he dispels it altogether: he initiates the emancipation of object from aura, which is the most signal achievement of the latest school of photography. (Benjamin; 1934-1935 p. 518).

এভাবে এক এক করে নানা উদাহরণ সহযোগে বেঞ্জামিন ফটোগ্রাফির *aura* ফিরিয়ে কার্যত তাঁরই বক্তব্যের শূন্যস্থান ভরাট করেছেন। অবশ্য তা করতে গিয়ে তিনি অনেক সময়েই হস্ত চিত্রের প্রতি বিরূপ-পক্ষপাতিত্ব করেছেন তাঁর পূর্ব পক্ষপাতিত্বের ন্যায্যতা প্রমান করতে। আর এই পক্ষপাতিত্ব-ন্যায্যতার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় তিনি উন্নত ফটোগ্রাফি দ্বারা ভীষণ ভাবে অভিভূত[vii]। অভিভূত হবার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাঁর বিশিষ্ট কিছু ফটোগ্রাফির উপর অভিভূতকর সারগর্ভ কিছু বক্তব্যে। এগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য:

> Everything about these early pictures was built to last. Not only the incomparable groups in which people came together-and whose disappearance was surely one of the most precise symptoms of what was happening in society in the second half of the century but the very creases in people's clothes have an air of permanence. Just consider Schelling's coat. It will surely pass into immortality along with him: the shape it has borrowed from its wearer is not unworthy of the creases in his face. In short,

> everything suggests that Bernard von Brentano was right in his view that "a photographer of 1 8 5 0 was on a par with his instrument" -for the first time, and for a long while the last (Benjamin; 1934-1935 p. 514).

দার্শনিক Schellingর পরিধানে যে কোটটি ছিল তার অমরত্ব প্রাপ্তির যে উচ্ছ্বাস বেঞ্জামিন প্রকাশ করেছেন তার দ্বারা ফটোগ্রাফিক *aura*-র অনন্য এক মাত্রা প্রাপ্তি ঘটেছে। সর্বোপরি ফটোগ্রাফিক *aura*-র সময়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার আদম্যতা বিস্ময়কর। এরপর বেঞ্জামিন আরও কয়েকটি উদাহরণযোগে ফটোগ্রাফিক *aura*-র পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস করেছেন। এই পর্যায়ক্রমিক ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টান্ত হল এই যে:

> The more far-reaching the crisis of the present social order, and the more rigidly its individual components are locked together in their death struggle, the more the creative-in its deepest essence a variant (contradiction its father, imitation its mother)-becomes a fetish, whose line aments live only in the fitful illumination of changing fashion. The creative in photography is its capitulation to fashion. (Benjamin; 1934-1935 p. 526).

পরিশেষে বলা যায় বেঞ্জামিন এইরকম একের পর এক যুক্তি ও উদাহরণ পরিবেশন করেছেন যার ফলে ফটোগ্রাফি একটি সুষ্ঠু শৈল্পিক সৌন্দর্যের উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। আর এই সুষ্ঠু শৈল্পিক সৌন্দর্যের উচ্চতায় যেকোনো শিল্পে (ফটোগ্রাফি যার বহির্গত নয়) সত্ত্বা/আভা/জ্যোতি প্রযুক্ত অবশ্যম্ভাবী যা কোন মতেই অনস্বীকার্য নয়। আর একই সাথে এটি স্বীকার্য সত্য বলে বেঞ্জামিন প্রতিভাত করেছেন যে ফটোগ্রাফির *aura* কাল্পনিকতার গণ্ডী পেরিয়ে বাস্তবিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এবং এই নতুন ফটোগ্রাফিক *aura*-র আবেদন আরও বেশি স্থায়ী যা বেঞ্জামিনের আর একটি উক্তিতে আরও স্পষ্ট:

> The synthetic character of the expression which was dictated by the length of time the subject had to remain still which isthe main reason these photographs, apart from their simplicity, resemble well-drawn or well-painted pictures and produce a more vivid and lasting impression on the beholder than more recent photographs (Benjamin; 1934-1935 p. 514).

তাহলে আলোচ্য পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে বেঞ্জামিন দীর্ঘ বাদ-অনুবাদ ও উদাহরণের সমন্বয়ে ফটোগ্রাফিক*aura*-র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। যাইহোক *aura* বিষয়ক আর একটি বক্তব্য হল এই যেব্যক্তি/বস্তু/বিষয়ের *aura* নির্ণয় করা সহজাত বৈশিষ্ট্য তা অর্জিত নয় এবং *aura* নিজে *aura*-র সহজাত গুণ। আরও বলা যায় *aura* সহজাত বলে তা চিরন্তন ও শাশ্বত তা অর্জিতের ন্যায় ক্ষণিক নয়[viii]। এভাবেই আমরা উক্ত প্রশ্নের যথাসাধ্য ন্যায্য উত্তর দিতে পারি।

End notes:

---

i. তা সত্ত্বেও বলা যায় বিবেচনার সহিত বিচারের যে সাধারণ সুত্র সেই যোগ ত্যাগ না করেও সত্ত্বার সাত্ত্বিকতা নিয়ে বিশেষ বক্তব্য পেশ আসাধারনের সাধারণত্বই প্রকাশের ইঙ্গিত দেয় আবার একই সাথে সাধারণ হওয়াই অসাধারণের প্রতীক বলা যায়। আর এই ভাবে এই দুই শব্দদ্বয় গুরুঅর্থে যে মানে খেলার রচনা করছে তার শুরু শেষ একই অর্থাৎ আদি-অন্ত বর্জিত লুপ। ঠিক এই কারণেই ওয়াল্টার বেঞ্জামিন একটি শব্দ-লূপের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছেন এবং প্রথমে চিত্রের সত্ত্বা/আভা/জ্যোতি আধুনিক ফটোগ্রাফি ধ্বংস করেছে বলে অভিযোগ করেছেন আবার সেই তিনিই পরে ফটোগ্রাফির নিজস্ব সত্ত্বা/আভা/জ্যোতির সপক্ষে শাওয়াল করেছেন।

[ii]বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে বেঞ্জামিনের ভাষায় বলা যায় যেঃ

> Even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one element: its presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to be. This unique existence of the work of art determined the history to which it was subject throughout the time of its existence. This includes the changes which it may have suffered in physical condition over the years as well as the various changes in its ownership.1 The traces of the first can be revealed only by chemical or physical analyses which it is impossible to perform on a reproduction; changes of ownership are subject to a tradition which must be traced from the situation of the original.

সুতরাং দেখা যায় যে বেঞ্জামিন তাঁর *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction* এ দ্বার্থ্যহীন ভাষায় যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তার ঠিক বিপরীত চিত্র প্রদর্শন করেছেন *Little History of Photography* তে।

iii. আলোচ্য অংশে *aura*-র পরিবর্তে essence শব্দটিও ব্যবহার করা যেত। কারন যে অর্থে তিনি *aura* ব্যবহার করেছেন তার সবকটি বৈশিষ্ট্যই essence শব্দটিও বহন করে। যদিও একটির অন্তর্নিহিত ও অপরটির বহির্মুখী প্রবণতা বর্তমান তবুও বলা যায় উভয়েই এমন একটি ধারণার সাথে সম্পৃক্ত যা স্পর্শের উর্দ্ধে কিন্তু উপলব্ধির অভ্যন্তরে বসবাস করে।

[iv]বেঞ্জামিন হিলের ফটোগ্রাফিতে যে বিশিষ্টতা খুঁজে পেয়েছেন তা অপূর্ব দক্ষতায় লিখিত অক্ষরে ব্যক্ত করেছে

> With photography, however, we encounter something new and strange: in Hill's New haven fish wife, her eyes cast down in such indolent, seductive modesty, there remains something that goes beyond testimony to the photographer's art, something that cannot be silenced, that fills you with an unruly desire to know what her name was, the woman who was alive there, who even now is still real and will never consent to be wholly absorbed in "art "(Benjamin; 1934-1935 p. 510).

ফটোগ্রাফির সত্ত্বা/জ্যোতি/আভা তিনি এইভাবেই প্রতিপন্ন করেছেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে ঠিক এই একইরকম বিশিষ্টতা হস্তচিত্রেও পাওয়া সম্ভব।

v ক্যামেরার উন্নতি প্রসঙ্গে বলা যায় বর্তমানে ক্যামেরা বন্দী ছবিতে সুপারজুম করে তার কোষ পর্যন্ত আবদ্ধ করা সম্ভব, যা হস্তচিত্রে অসম্ভব যেখানে জলরং কিংবা তেলরং কাগজ/কাপড় কিংবা অন্য কিছুর উপর অন্য কিছুর প্রতিফলন ঘটায় (ক্যামেরাও অনেকাংশে তাই করে) এবং তা কখনোই প্রতিফলিত বস্তুর কোষ পর্যন্ত গভীর নয় কিন্তু তার অগভীর উপরিভাগ প্রায়শই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

vi. ফটোগ্রাফির সত্ত্বা/জ্যোতি/আভা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি প্রাচীন মিশরে হায়রোগ্লাফির প্রসঙ্গ টেনে বলেছেনঃ "*alongside the prospects for photographing the stars and planets we find the idea of establishing a photographic record of the Egyptian hieroglyphs*" (Benjamin; 1934-1935 p. 508).

vii. যেমন ভাবে বলা যায় তিনি শিল্প ও ফটোগ্রাফিকতার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেনঃ

> But the emphasis changes completely if we turn from photography-as-art to art-as-photography. Everyone will have noticed how much easier it is to get hold of a painting, more particularly a sculpture, and especially architecture, in a photograph than in reality (Benjamin; 1934-1935 p. 523).

viii. যারা শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিকম" পড়েছেন তারা সকলেই জানেন যে চারুদত্তের বালক সন্তান সোনার শকট বা গাড়ি নিয়েখেলবার নিমিত্ত বায়না ধরেছিল এবং সেই সূত্রে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সোনার পরিবর্তে মাটির শকট দিয়ে বালকের মন ভুলানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল। তা হলে বালকের এটি সহজাত বুদ্ধি যে মাটির শকট আর সোনার শকট উভয়েই শকট হলেও ভিন্ন প্রকৃতির *aura* বর্তমান। সে নিশ্চয় *aura* সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনা করেনি তবু সে উভয় শকট কোনটি মাটির আর কোনটি সোনার তা সহজেই সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তাই সহজাত বৈশিষ্ট্য বলে তা শিশুর কাছে কোন জটিল রহস্য বহন করে আনেনি।

তথ্যসূত্র:

Benjamin, Walter SELECTED WRITINGSVOLUME 2, PART21931-1934Translated by Rodney Livingstoneand Others, Edited by Michael W. Jennings, Howard Eiland, and GarySmithTHE BELKN AP PRESS OF H ARVARD UNIVERSITY PRESSCambridge, Massachusetts, and London, England.

Benjamin, Walter *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction* Illuminations Edited and with an Introduction by Hannah Arendt.

গোষ্ঠীসাহিত্যে ব্যক্তিচেতনা : মধ্যযুগের কবিদের আত্মবিবরণী

হুমায়ুন কবির
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম

সারসংক্ষেপ (Abstract) : মধ্যযুগের গোষ্ঠীকাব্যে ভণিতা দেওয়া একটা রীতি। ভণিতার সূত্র ধরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন গোষ্ঠীকাব্যে ব্যক্তিচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর রচনা হলেও পৃথক কবিনাম ভণিতা থেকে প্রাপ্ত। আবার, মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্য নির্দিষ্ট রসগোষ্ঠীর রচনা সেখানেও ভণিতা থেকে কবিনাম জানা সম্ভব হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যশাখা ব্যতিরেকে মঙ্গলকাব্যশাখা বা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য শাখার কবি গোষ্ঠী নিজের আত্মপরিচয় তুলে ধরতে কাব্যের প্রারম্ভে নিজবিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। কবি পরিচিতির এই বিবরণী কাব্যের অংশহিসেবেই কবিগণ রচনা করেছেন। আখ্যানের অংশবিশেষরূপে আত্মবিবরণীর আন্তরিকতায় কবি সংক্ষিপ্তভাবে নিজের কথা, পরিবারের কথা বা বংশের পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন, সমাজের কথা বিবৃত করেন। পূর্বাপর জীবনের বর্ণনামূলক আত্মবিবরণী মধ্যযুগের সকল কবির রচনায় পাওয়া যায় না। পনেরো শতকের কবি কৃত্তিবাস তাঁর আত্মবিবরণীতে নিপাঠভাবে বংশের কথাই বলেছেন। কবি কৃত্তিবাস তাঁর আত্মবিবরণীতে নিজের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন অর্থাৎ পূর্বপুরুষ ও বংশের গুণকীর্তনের পর নিজের কথা বিবৃত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্যের আত্মবিবরণী সমাজ সচেতন কবির ব্যক্তিজীবন ইতিহাসের অনেক চিত্রই উঠে আসে। “শুন ভাই সভাজন” সম্বোধনে কবি ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতায় জানাচ্ছেন, গোপীনাথ নন্দী নিয়োগীর তালুকে প্রজারূপে কবি দামিন্যাই বসবাস করতেন, ছয়-সাত প্রজন্ম থেকেই তাঁরা বসবাস করতেন এবং চাষকার্য ছিল তাঁদের জীবিকা। বাস্তববোধ সম্পন্ন কবি আত্মবিবরণীতে নিজজীবন কাহিনি সমাজের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো সামাজিক পটভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করেননি, পারিবারিক পটভূমিতে নিজজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। পারিবারিক জীবনের পটভূমিকায় সুখ দুঃখের অনুভূতির চেতনায় ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যক্তিজীবন। সতেরো শতকের কবি সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে কবিকৃত আত্মকথা, যেখান থেকে ব্যক্তিজীবনের প্রথম দিকের ঘটনার আভাস পাই। এইভাবে মধ্যযুগের আত্মবিবরণীর বিশ্লেষণে উঠে আসে কবির জীবন ও সমাজ পরিচয়। এখানে নির্বাচিত আত্মবিবরণী আধারে বিধৃত হয়েছে ব্যক্তিচেতনাহীন কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ।
শব্দ-সূচক (Keywords): বাংলা সাহিত্য, মধ্যযুগ, আত্মবিবরণী, রামায়ণ, মঙ্গলকাব্য, প্রণয়কাব্য, সমাজ, সংস্কৃতি।

মূল আলোচনা (Discussion):

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ থেকে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ (১৯৫২ খ্রি.) কাব্য পর্যন্ত সুদীর্ঘ বছরের বিভিন্ন প্রকরণের সাহিত্যশাখায় কবিদের আত্মপরিচিতি দেওয়ার প্রথা থাকলেও

তা কাব্যের অংশরূপেই। মধ্যযুগের গোষ্ঠীকাব্যে ভণিতা সূত্রে কবি পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন বৈষ্ণব পদাবলি একটি রসগোষ্ঠীর রচনা হলেও ভণিতা থেকে পৃথক কবিনাম জানা সম্ভব হয়েছে। তবে এপ্রসঙ্গে কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫ খ্রি.) বলেছেন— "পদাবলী একটা রসগোষ্ঠীর রচনা। যাঁহাদের নামের ভণিতা আছে তাঁহারা যেন উপলক্ষ মাত্র। কাহার রচনায় যে কাহার ভণিতা আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাহার ঠিক নাই। একটা ভণিতা দিতে হয় তাই যেন দেওয়া হয়েছে।... যাঁহার যে উপাধিই থাকুক সকলেই 'দাস'। পদের যাঁহার ভণিতা থাকে, ভাষা যদি তাঁহার নিজস্ব হয় ভাব তাঁহার নয়— ভাব ঐ রসগোষ্ঠীর নিজস্ব।"[১] বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যশাখা ব্যতিরেকে মঙ্গলকাব্যশাখা বা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য শাখার কবি গোষ্ঠী নিজের আত্মপরিচয় (সকল কবির কাব্যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায় এমন নয়) তুলে ধরতে কাব্যের প্রারম্ভে নিজবিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা আত্মজীবনীর সূচনা এবং আমরা অনেক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ পেয়েছি। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রথম আত্মজীবনী রচনা করেন, রাসসুন্দরী দাসী রচনা করেন 'আমার জীবন' নামে আত্মজীবনী। এইসব রচনা সাহিত্যরূপে পদবাচ্য। স্বতন্ত্র আকারে রচিত না-হলেও মধ্যযুগের আত্মবিবরণীকে "বাংলা আত্মজীবনীর প্রথম ক্ষীণ সূত্র বলে মনে করা ভুল হবে না"[২] বলে সমালোচক মন্তব্য করেছেন। প্রাগাধুনিক যুগের ছোটো ছোটো কবিতার মধ্যে নয়, বিভিন্ন আখ্যানকাব্যের মধ্যে দীর্ঘ কলেবরে আত্মবিবরণী বিধৃত তবে উদাহৃত আত্মজীবনীর সমধারায় একে ফেলা যাবে না। স্বাধিকার চেতনায় ব্যক্তিত্ববোধের কোনো অভিব্যক্তিতে এগুলি রচিত নয়, কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ রূপে এগুলির আত্মপ্রকাশ।

আখ্যানের অংশবিশেষরূপে আত্মবিবরণীর আন্তরিকতায় কবি সংক্ষিপ্তভাবে নিজের কথা, পরিবারের কথা বা বংশের পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন, সমাজের কথা বিবৃত করেন। গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ যেমন কবি নির্দেশ করেন, তেমনি পৃষ্ঠপোষক রাজার বদান্যতার বিবরণ দেন। ফলে জীবনের মূল তাৎপর্যের পরিচয়ে পাঠকের কাছে প্রকাশিত হন কবি। সেদিক থেকে আত্মবিবরণীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিদ্যমান। নিম্নে নির্বাচিত কবি কৃত আত্মবিবরণী অবলম্বনে বিষয়টি আলোচনা করা চেষ্টা করা হল।

দুই

পঞ্চদশ শতাব্দীর "এ বঙ্গের অলংকার" কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করে বাঙালির জনমানসে ভাস্বর হয়ে আছেন। রামায়ণে কবির আত্মবিবরণীর যে অংশ বিধৃত তাতে কবি তাঁর নিজপূর্বপুরুষদের বিবরণ এবং নিজ কবিসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কবি আত্মবিবরণীতে নিজের জন্মসাল উল্লেখ না-করে শ্লোক বিবৃত করেছেন—

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।"[৩]

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯ খ্রি.), যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬ খ্রি.), নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮ খ্রি.) প্রমুখ তাঁর জন্মসাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এপ্রসঙ্গে সুখময় মুখোপাধ্যায় সময়কাল নির্ণয় করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত— "কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী (অর্থাৎ শুক্লা পঞ্চমী) তিথিতে, রবিবারে-ধরা যাক 'ক' সালে। তাহলে বাংলা রীতি অনুযায়ী 'ক' +১১ সালের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তিনি এগার বছর পূর্ণ করে ('এগার নীবড়ে') বার বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন এবং ঐ

সালের ('ক'+১১) ঐ তিথি পড়েছিল শুক্রবারে। এই যোগাযোগ খুব সচরাচর ঘটে না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় গেলে যে-সময়ে কৃত্তিবাসের জন্মগ্রহণ করার কথা) এই যোগাযোগ সত্যই ঘটেছিল ১৪৪৩ ও ১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দের ক্ষেত্রে। স্বামী কানু পিল্লাইয়ের Indian Ephemeries, vol. V. p. 88, 110) থেকে দেখছি যে, ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী (শুক্লা পঞ্চমী) তিথি পড়েছিল রবিবারে- ৬ই জানুয়ারি তারিখে...।"[৪] অর্থাৎ কৃত্তিবাস ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি উক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে অভিমত দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃত্তিবাসের সময়কাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

কবি আত্মবিবরণীর প্রারম্ভে নিপাঠ ব্যক্তিপরিচয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।।"[৫]

পূর্ববঙ্গে সেসময়ে কোনো এক অস্থিরতার টালমাটাল পরিস্থিতির প্রমাদে নরসিংহ ওঝা সুখী গৃহ পরিবার নিয়ে সেদেশ ত্যাগ করে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। কিন্তু বসতির উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ অবস্থায় বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। ফলে রাত্রে গঙ্গাতীরেই শুয়ে পড়েন। রজনী অবসানের এক প্রহর পূর্বে দৈববাণী শুনে নরসিংহ সেখানে বাস করতে লাগলেন।

নরসিংহের পুত্রের নাম গর্ভেশ্বর। মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ নামে তিন তনয় গর্ভেশ্বরের। মুরারির পুত্র বনমালী হলেন কবি কৃত্তিবাসের পিতৃদেব। নিজের ভাইবোনদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন— "ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী"[৬]। ভাইবোনদের সবার থেকে বড়ো ছিলেন কৃত্তিবাস। তাঁর মায়ের নাম মালিনী।

কৃত্তিবাস নিপাঠভাবে বংশের কথাই বলেছেন। নিজের পিতৃকুলের পরিচয় প্রদানে শেষ করেননি, বংশের গৌরবের কীর্তিকথায় আত্মপরিচিতি দীর্ঘ করেছেন। তাঁদের বংশে আবির্ভাব ঘটেছিল একেক জন গুণী মানুষদের। "মুখটী বংশের" কীর্তিমান সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র বিভাকর ছিলেন পিতার মতোই খ্যাতনামা দিগ্‌বিজয়ী একজন পণ্ডিত। নিশাপতি নামে তাঁর অপর এক ছেলের বাড়িতে থাকতেন "সহস্র সংখ্যক লোক"। রাজা গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে তিনি "প্রসাদী এক ঘোড়া" উপঢৌকন স্বরূপ পেয়েছিলেন। তাঁর বংশের ঐশ্বর্য, কুলেশীলে সমৃদ্ধ ছিল বলে "ব্রাহ্মণ সজ্জনে" আচার শিখতেন, অনুকরণ করতেন।

কবি কৃত্তিবাস তাঁর আত্মবিবরণীতে নিজের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন অর্থাৎ পূর্বপুরুষ ও বংশের গুণকীর্তনের পর নিজের কথা বিবৃত করার মধ্য দিয়েই আত্মবিবরণী সমাপ্ত করেছেন। নিজের জন্মকথা বর্ণনার পর বিদ্যাভাসের কথা বলেছেন। তাঁর বিদ্যাশিক্ষার বর্ণনায় পাই—

"এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেল্যাম উত্তর দেশ।।
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
বারান্তর উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গা পার।।"[৭]

বারো বছর বয়সে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য উত্তরদেশ পাড়ি দেন। "ব্রহ্মার সদৃশ" গুরুকে বিদ্যা অর্জনের পর দক্ষিণা দিয়ে রাজা গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এই অবসরে তিনি পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত রাজসভার চিত্র তুলে ধরেছেন। নয়টি দেউড়ি পার হয়ে রাজ সম্মুখে স্বরচিত সাতটি শ্লোক পড়ে শোনান কবি। ছন্দ সুষমা মণ্ডিত কবিকৃত শ্লোক শুনে রাজার

অভিব্যক্তি বর্ণনা— "শ্লোক শুন্যা গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়।"[৮] এবং খুশি হয়ে রাজা কবিকে "পাটের পাছড়া" উপহার দেন। গৌড়েশ্বরের নিকট কবি যা চাইবেন তাই পাবেন জেনেও তিনি গৌরব ভিন্ন কিছু চাননি—

"যথা যথা যাই আমি গৌরবমাত্র সার।
কারো কিছু নাঞি লই করি পরিহার।।"[৯]

খুশি হয়ে রাজা রামায়ণ রচনা করতে অনুরোধ করেন। বলা যায় কবি নিপাঠ আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন। বৃহত্তম সমাজের প্রেক্ষাপটে নিজেকে স্থাপন করে বর্ণনা করেননি। পূর্বপুরুষদের নাম ও গুণের কথা তুলে ধরেছেন। গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ তিনি করেননি পরিচয় অংশে। শ্লোক রচনা করে গৌড়েশ্বরের প্রশংসা লাভে ও রামায়ণ রচনার উপদেশের কথা তুলে ধরেছেন।

তিন

ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের আত্মবিবরণীতে সমাজ সচেতন কবির ব্যক্তিজীবন ইতিহাসের অনেক চিত্রই উঠে আসে। দামিন্যাই কবির নিবাস। এই গ্রামেই শঙ্করের আবির্ভাবে কবির কবিত্ব লাভ হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন—

"গঙ্গাসম সুনির্মল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে।
সেই সে পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।।"[১০]

"শিশুকাল" অর্থাৎ অতিঅল্প বয়সেই তিনি কবিত্বলাভ করেছিলেন, রচনা করেছিলে শিবের সংগীত। এখানেই কবি তাঁর উত্তরপুরুষ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের নামও উল্লেখ করেছেন। জানা যায় কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র।

'আত্মপরিচয়'-এর পরবর্তী অংশ 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ'-এ কবির ব্যক্তিগত জীবনের দৈন্যপীড়িত কষ্টক্লিষ্ট জীবনের পরিচয় বিধৃত। "শুন ভাই সভাজন" বলেই কবি ব্যক্তিগত জীবন বর্ণনা করেছেন। গোপীনাথ নন্দী নিয়োগীর তালুকে প্রজারূপে কবি দামিন্যাই বসবাস করতেন, ছয়-সাত প্রজন্ম থেকেই তাঁরা বসবাস করতেন এবং চাষকার্য ছিল তাঁদের জীবিকা। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার ও পীড়নে অতিষ্ঠ প্রজার প্রতিনিধি কবি মুকুন্দ সপরিবারে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দেশ ত্যাগ করেন, অবশ্য গ্রামের মোড়লের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন কবি ও তাঁর পরিবার।

শাসকের অত্যাচারে দেশহারা উদ্বাস্তু মানুষের মতোই ব্রাহ্মণভূমি যাবার পথশ্রান্ত কবির দুঃখ দুর্দশা প্রকটভাবে দৃশ্যমান। বাসভূমি দামিন্যা ছেড়ে যাবার পর কবির সহায়-সম্বল বিত্তটুকু পথে অপহরণ করে নেন রূপ রায়। সর্বস্বান্ত কবিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন যদু কুণ্ডু তিলি। তিনি পথশ্রান্ত কবিকে নিজঘর নিয়ে গিয়ে তিন দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী দেন। এই খাদ্যদ্রব্য যে যথেষ্ট ছিল না কুচট্যা নগরে উপনীত হবার পর কবিকৃত বর্ণনায় সে দৃশ্য ধরা পরেছে—

"তৈল বিনা কৈল স্নান করিলঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।"[১১]

অন্নের জন্য শিশুর এই কান্না বুঝিয়ে দেয় নিরুপায় কবির দুঃখদুর্দশা। কি খেয়ে শিশুর কান্না থেমেছিল তার উল্লেখ না-পেলেও পথশ্রান্ত কবিকে শ্রান্তি অপনোদন করতে হয়েছিল "পুখুরি আড়া" অর্থাৎ পুকুরের পাড়ে এবং নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিলেন "উদক" অর্থাৎ পুকুরের বা

বিলের জলেই। শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেবী চণ্ডী দেখা দিয়ে সংগীত অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে আজ্ঞা দিলেন। মর্মস্পর্শী করুণ চিত্রের পর দেখি কবি দেবীর আদেশে শিলাই নদী পার হয়ে আড়রাতে উপনীত হলে "ব্যাসের সমান" নরপতি বাঁকুড়া রায় কবিকে আশ্রয় দেন। বদান্যরাজা কবিকে "দশ আড়া ধান" দেন এবং নিজপুত্রের (রঘুনাথ রায়) শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত করেন।

বাস্তববোধ সম্পন্ন কবি নিজজীবন কাহিনি সমাজের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন ফলে সেসময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র উঠে এসেছে। তখন জমি কোণাকুণি দড়ি দ্বারা পরিমাপ করা হত ফলে পনেরো কাঠায় এক বিঘা বলে জোর করে নির্ধারণ করে দিতেন এবং "খিল ভূমি" অর্থাৎ অনুর্বর জমিকে "লিখে নাল" অর্থাৎ উর্বররূপে লিখতেন। উপকার না-করেই কর্মচারীদের উৎকোচ নেওয়ার মতো অপকর্ম চিত্রিত। টাকার দ্রব্য তখন দশ আনা, জনসাধারণের কাছে টাকা ছিল না, টাকার অভাবে "ধান্য গরু" বিক্রি হত না, এমন বিপাকীয় অবস্থা দেশে তখন কবি দেশ ছাড়েন। তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক দিকটি প্রাণবন্তভাবে কবির আন্তরিকতায় কাব্যে বাণীরূপ লাভ করেছে।

চার

ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো সামাজিক পটভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করেননি, পারিবারিক পটভূমিতে নিজজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। কবিরা চার ভাই। ছোটো ভাই রামেশ্বর কবির প্রাণের সমান হলেও বড়ো দাদা রত্নেশ্বর ছিলেন কবির ভাষায় "বড় নিদারুণ"। নিদারুণ দাদার জলন্ত অনলসম মন্দবাক্য অত্যাচারে কবি রূপরাম গৃহছেড়ে অভিমানে দেশান্তরে পড়তে যাচ্ছেন। কিন্তু খুঙ্গি পুথি ছাড়া সম্বল কিছুই ছিল না, তাই দেখি—

"মণিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি।...
রাজারাম রায় দিল কড়ি বার পণ।।"[১২]

অল্পবয়সে গুরুর কাছে পড়তে গেলে তাঁকে "বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।"[১৩] গুরুগৃহে হরষিত মনে সযত্নে পড়ার পর নবদ্বীপে যাত্রার মানস করেন কবি। কিন্তু নবদ্বীপে যাবার আগে মায়ের কথা মনে পড়ে। জননীকে দীর্ঘদিন না-দেখতে পাওয়ায় বালক রূপরামের মন উদ্বিগ্ন।

গৃহে প্রত্যাবর্তনরত উদ্বিগ্ন বালকের মন দীর্ঘদিন পর মা-বোনদের সঙ্গে মিলনের আশার আনন্দে চঞ্চল। তবে সন্ধ্যাবেলা হটাৎ গৃহে আগমনের অভিজ্ঞতা কবির মোটেও সুখকর হয়নি। কবি বর্ণিত পঙ্‌ক্তিতেই মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে পাঠকের চিত্ত—

"দাদাকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল জ্বর।।
তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পারা।
পালাবার পথ নাই বুদ্ধি হৈল হারা।"[১৪]

দাদা রত্নেশ্বরের ভর্ৎসনায় মিলনের আনন্দঘন পরিবেশের পরিবর্তে কবির মন বিষণ্ণ। বিষণ্ণমনে আবার বিদায় নেন। গৃহত্যাগী তিন দিনের অনাহারের ক্লেশ কবিকে ঠাকুর দাস পাল "আড়াইসের ধান" দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে "আড়াইসের ধানের কিনিল চিড়াভাজা।"[১৫] ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সেটুকুও তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তির সহায়ক হয়ে ওঠেনি। তীরে রেখে স্নান করতে গেলে বাতাসে উড়ে যায় চিড়াভাজা, অগত্যা শুধু জল পান করেন। ক্ষুধায় কাতর বালকের মন আশার আনন্দে ভরে ওঠে দিগনগরে তাঁতিদের ঘরে "চিড়া দধির ঘটা" দেখে। অবশেষে কবি আশ্রয় পান গোয়ালাভূমের রাজা গণেশরায়ের নিকট এবং ধর্মঠাকুর রাজাকে স্বপ্নে রূপরামকে দিয়ে কাব্যরচনা করতে বলেন। পারিবারিক জীবনের পটভূমিকায় সুখ দুঃখের

অনুভূতির চেতনায় ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যক্তিজীবন। পরিবারের বড়ো দাদার নিষ্ঠুরতা যেমন উঠে এসেছে অনুরূপ সমাজের মণিরাম রায়, রাজারাম রায়দের কবির প্রতি সহানুভূতিশীল মানবিক হৃদয়ের পরিচয়ও প্রকাশিত হয়েছে।

পাঁচ

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি সৈয়দ আলাওলের আত্মকাহিনির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। আলাওল তাঁর রচিত কাব্যের সর্বত্রই অল্পবিস্তর আত্মকাহিনি বলেছেন। আমাদের আলোচ্য 'পদ্মাবতী' কাব্যে কবিকৃত আত্মকথা, যেখান থেকে ব্যক্তিজীবনের প্রথম দিকের ঘটনার আভাস পাই। ব্যক্তিজীবনের পরিচয় প্রসঙ্গে আলাওল বলেন ফতেয়াবাদের জালালপুরের অধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য সন্তান তিনি, তবে তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করেননি। কোন কাজে (বিশেষ করে বলা হয়নি) পিতাপুত্র জলপথে যাচ্ছিলেন, পোর্তুগিজ হার্মাদদের নৌকা সঙ্গে সংঘর্ষের সময় পিতা নিহত হলে অভিভাবকহীন আলাওল দুঃখ ভোগ করার পর রোসাঙে উপস্থিত হয়ে রাজ আসোয়ার রূপে নিযুক্ত হন—

"কার্যগতি যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন।।...
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙে আসিয়া হৈলোঁ রাজ আসোয়ার।।"[১৬]

পিতার মৃত্যুর পর আহত আলাওলের রোসাঙে উপনীত পর্যন্ত জীবনের দুঃখময় পরিস্থিতির বর্ণনা করে অশ্বারোহী সৈনিক পদ লাভ করেন। "তালিব এলেম বুলি করন্ত আদর"[১৭] অর্থাৎ কবি রোসাঙের গুণী মানুষজন আদর করে "তালিব এলেম" বলতেন। রোসাঙের মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মাগণ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন আলাওল। জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যকথা শুনে মাগণ ঠাকুর কবিকে বাংলা ভাষায় বিবৃতিধর্মী পয়ার ছন্দে অনুবাদ করতে বলেন। তাঁরই আদেশে কবি পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন।

উপসংহার:

উদাহৃত কবিগণ কৃত আত্মবিবরণীতে যে বংশপরিচয় ও ব্যক্তিজীবন চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে মধ্যযুগের অপরাপর কবির আত্মকাহিনিতে বিশেষভাবে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের নিপাঠ আত্মবিবরণীতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির ঝাপটায় জীবনের সুখদুঃখের কথা বর্ণিত হয়নি। পারিবারিক পটভূমিতে রূপরামের আত্মবিবরণীতে ব্যক্তিজীবনের যে চিত্র বিধৃত তা সহানুভূতি জাগায় কবির প্রতি। বিড়ম্বিত জীবনের পরিহাসে রোসাঙে উপনীত হবার পূর্বপ্রেক্ষাপটে আলাওলের বর্ণিত কাব্যপঙ্ক্তি থেকে উঠে আসে কবির প্রথম দিকের জীবনের বাস্তবতা। আমত্য সন্তান সুখে দিন অতিবাহিত হবার পরিবর্তে পোর্তুগিজ হার্মাদের সঙ্গে যুদ্ধ, পিতার মৃত্যু কবি জীবনে তৈরি করে বিড়ম্বন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক ইতিহাসের প্রমূর্ত চিত্র আত্মকাহিনিগুলি। মূল কাহিনির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে রচিত আত্মবিবরণী কবিদের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনি সম্বন্ধে আলোচনার উপকরণ স্বরূপও।

অন্ত্যটীকা :

১. রায়, কালিদাস, ১৯৫৫, 'পদাবলী-সাহিত্য', কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-4
২. বসু, সোমেন, ১৯৫৬, 'বাংলা সাহিত্যে আত্মবিবরণী', কলিকাতা, সতেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ-১৮

৩. মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), নভেম্বর ১৯৯৭, 'রামায়ণ', কৃত্তিবাস, কলকাতা, ভারবি, পৃ-২০ (ভূমিকা অংশ)
৪. তদেব, পৃ-৬৭ (ভূমিকা অংশ)
৫. তদেব, পৃ-১৮ (ভূমিকা অংশ)
৬. তদেব, পৃ-২০ (ভূমিকা অংশ)
৭. তদেব, পৃ-২১ (ভূমিকা অংশ)
৮. তদেব, পৃ-২৩ (ভূমিকা অংশ)
৯. তদেব, পৃ-২৩ (ভূমিকা অংশ)
১০. মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), মার্চ ২০১৩, 'চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা', কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ-৮
১১. তদেব, পৃ-৯
১২. কয়াল, অক্ষয়কুমার (সম্পা.), জানুয়ারি ২০১১, 'ধর্মমঙ্গল', রূপরাম চক্রবর্তী, কলকাতা, ভারবি, পৃ-৪৮
১৩. তদেব, পৃ-৪৮
১৪. তদেব, পৃ-৫০
১৫. তদেব, পৃ-৫০
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), ফেব্রুয়ারি ২০০২, 'পদ্মাবতী', সৈয়দ আলাওল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃ-২০
১৭. তদেব, পৃ-২০

সহায়ক গ্রন্থ:

১. কয়াল, অক্ষয়কুমার (সম্পা.), জানুয়ারি ২০১১, 'ধর্মমঙ্গল', রূপরাম চক্রবর্তী, কলকাতা, ভারবি।
২. মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), নভেম্বর ১৯৯৭, 'রামায়ণ', কৃত্তিবাস, কলকাতা, ভারবি।
৩. মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), মার্চ ২০১৩, 'চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা', কলকাতা, প্রজ্ঞাবিকাশ।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), ফেব্রুয়ারি ২০০২, 'পদ্মাবতী', সৈয়দ আলাওল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
৫. বসু, সোমেন, ১৯৫৬, 'বাংলা সাহিত্যে আত্মবিবরণী', কলিকাতা, সতেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

কালুয়াষাঁড় ও কুঁয়োর সাহেব : নয়াগ্রামের দুই লোকদেবতা

অনিমেষ কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নয়াগ্রাম পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু গভর্নমেন্ট কলেজ

সারসংক্ষেপ: পশ্চিমবঙ্গের এক নবগঠিত জেলা ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রাম জেলার ওড়িশা সীমান্ত ছুঁয়ে থাকা একটি ব্লক নয়াগ্রাম। নয়াগ্রামের বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পূজিত হয়ে আসছেন বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী। এরকমই দুই লোকদেবতা নিমাই নগর গ্রামের বাবা কালুয়াষাঁড় ও কুমারপুর গ্রামের কুঁয়োর সাহেব। কোনো না কোনো সংকট-মুক্তির আশায় মানুষ ছুটে আসেন এই দুই থানে, মানত করেন, নানা উপচার সহযোগে পূজা দেন। মানুষের বিশ্বাস মানুষকে নিয়ে আসে এই দুই থানে।
সূচক শব্দ: ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, লোকদেবতা, থান, মানত।

মূল আলোচনা:

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলা ঝাড়গ্রাম। নবগঠিত এই ঝাড়গ্রাম জেলার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে ওড়িশা সীমান্ত ছুঁয়ে থাকা এক ব্লক নয়াগ্রাম। নয়াগ্রামের উত্তরে সুবর্ণরেখা নদী, পশ্চিমে গোপীবল্লভপুর, পূর্ব ও দক্ষিণে ওড়িশা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ ও বালাসোর জেলা। ওড়িশা সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের এই নয়াগ্রাম ব্লকের বেশিরভাগ অংশই ছিল গভীর জঙ্গল। এখনও ইতিউতি জঙ্গল চোখে পড়ে। লালমাটির বন্ধুর এই ব্লকের জনঘনত্ব বেশ কম।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গ্রামের মতোই নয়াগ্রাম ব্লকের অন্তর্গত এই গ্রামগুলিতে নানা ধরনের দেবতার পুজো হয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসে। শাস্ত্রীয় দেবতার পাশাপাশি বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পুজোও হচ্ছে নিজস্ব আঞ্চলিক রূপে। লোক সাধারণ দ্বারা পূজিত এই লোকদেবতা পুজোর শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মকানুন নেই। সাধারণত অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কেউ পুজো করে থাকেন। দেবদেবীর মন্দির থাকে না, সাধারণত খোলা আকাশের নিচে, গাছের তলায়, রাস্তার মোড়ে দেবদেবীর অবস্থান। এই লোকদেবতা কোথাও নিঃসঙ্গ, একক আবার কোথাও সপার্ষদ। নির্দিষ্ট কোনো আকার হয় না। অনেক সময় প্রতীকী আকার থাকে। কোনো কোনো দেবতা শুধুমাত্র মুণ্ডে সীমাবদ্ধ, কেউবা আবক্ষ, কেউবা দণ্ডায়মান। নয়াগ্রামে সবথেকে বেশি পূজিত হন শীতলা দেবী। আগে কোনো গাছের তলায় পূজা পেলেও, বর্তমানে অধিকাংশ জায়গায় পাকা মন্দির হয়েছে। পুজো করেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ। নিত্যপূজার পাশাপাশি বসন্তকালে, বিশেষ করে চৈত্র মাসের কোনো একদিন বিশেষ পুজো হয়। বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে রক্ষা করেন শীতলা দেবী। নয়াগ্রামে শীতলা মায়ের থান ও মন্দিরের আধিক্য থেকে এটা সহজেই অনুমেয় এখানে গরমের আধিক্যের পাশাপাশি, এখানে মানুষজনের চর্মরোগ হতো। ষষ্ঠী দেবীর পূজা এখানে অধিক প্রচলিত। সাধারণভাবে সারাবছরই বিভিন্ন ধরনের ষষ্ঠীব্রত পালিত হলেও সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবে ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথির পুজো নারীরা বেশি করেন। যা ঝিঙে ষষ্ঠী বা চাপড়া ষষ্ঠী নামে পরিচিত। পুকুরের পাড়ে এই পুজো হয়। পুজো করেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কেউ। পুজোয় ঝিঙে আবশ্যক। মনসা পুজো হয় প্রায় প্রতি গ্রামে। আগে গাছতলায় পুজো হলেও, এখন অধিকাংশ জায়গায় পাকা মন্দির। পূজারি কোথাও ব্রাহ্মণ

সম্প্রদায়ের আবার কোথাওবা নিম্নবর্ণের। জঙ্গল ঘেরা জায়গায় মূলত সর্পভয় নিবারণের জন্য পুজো করা হয়। মা বাশুলি বুড়ি বন্ধ্যাত্ব নিবারণের দেবী। টিকরাপাড়া গ্রামে এই দেবীর থান আছে। মূলত গ্রামের মানুষজন এখানে পুজো দেন। মকর সংক্রান্তির দিন এখানে বিশেষ পুজো হয়। ডাহি মৌজায়, সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে সাঁতাইবুড়ির অবস্থান। আগে গাছতলায় পুজো হতো। পুজো দিতেন মূলত যারা ঘাটে নৌকো পারাপার করতেন। মাঝি ও যাত্রীদের নদী পারাপারের সময় যাতে কোনো বিপদ না হয়, সেই জন্য এই দেবীর পুজো। এখন এই লৌকিক দেবীর পাকা মন্দির হয়েছে। মকর সংক্রান্তির সময় এখানে মেলা বসে। নয়াগ্রামে বেশ বড়ো অংশের মানুষ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের গ্রামদেবতা আরাধনার জন্য জায়রা থান আছে। সেখানে পুজোর পাশাপাশি শালবৃক্ষের পুজো করেন, যা ইঁদ পূজা নামেও পরিচিত। প্রকৃতির নতুন রূপকে স্বাগত জানাতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ সারুল পুজো করেন। চৈত্রের শেষদিকে শাল, মহুলের যখন নতুন পাতা আসে তখন জায়রা থানে বা কোনো শাল গাছের নিচে হয় সারুল আরাধনা। সাঁওতালদের সঙ্গে মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষদেরও এই পুজো করতে দেখা যায়। এই সারুলের পরেই মানুষজন নতুন পাতা ব্যবহার করেন। এইরকমই বিশ্বাস মানুষের। এই বিশ্বাস, বিভিন্ন রকম মঙ্গল কামনায় নয়াগ্রামের মানুষ বাবা কালুয়াষাঁড় থানে ও কুঁয়োর সাহেব থানে পুজো দেন। নিম্নে এই দুই লোকদেবতার বিশদে পরিচয় দেওয়া হল।

বাবা কালুয়াষাঁড়

ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত নিমাই নগর গ্রামে অবস্থিত বাবা কালুয়াষাঁড় মন্দির। নয়াগ্রাম বটতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে যে রাস্তাটা কলমাপুখুরিয়া হয়ে রামেশ্বর মন্দিরের দিকে গেছে, সেই পথ ধরে কিলোমিটার দুই গেলেই নিমাই নগর গ্রাম। আর এই গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত এই থানটি। খড়িকা থেকে গোপীবল্লভপুরের দিকে কিলোমিটার দুই গেলেই কুজি গ্রাম। এই গ্রাম থেকে জঙ্গলের রাস্তা ধরে কিলোমিটার ছয় গিয়েও পৌঁছানো যায় এই থানে। ঘন শাল জঙ্গলের মাঝে বেশ কিছুটা অংশ পরিষ্কার করা, সেখানেই বাবা কালুয়াষাঁড়ের অবস্থান। থানের উপরে ছায়া করে আছে, আম, মুচকুন্দ, কাঁটা বাঁশের ঝোপ। নিচে অর্থাৎ থানের ভিতর বড়ো গাছের শিকড় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। সেই শিকড়েই লাল সুতোয় বাঁধা আছে অজস্র পোড়া মাটির ঘোড়া। দক্ষিণ মুখে প্রবেশ পথ। পথের দুই দিকে দুইটি পাথরের হাতি দাঁড়িয়ে আছে। প্রবেশের পর পাথরের একটু চাতাল। এই চাতালের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মানত করা মাটির ঘোড়া রাখা। এই চাতালের একেবারে উত্তর দিকে একটা ছোটো গর্ত। এই গর্তে আলো পৌঁছোয় না। জানা যায় এখানেই কালো রঙের পাথরে বাবা কালুয়াষাঁড় আছেন। লোক বিশ্বাস এখানে সবসময় একটা সাপ থাকে।

কালুয়াষাঁড় দেবতার পুজো প্রচলনের কাহিনি যা জানা যায়, তা খানিকটা এরকম। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে এই দেবতার উৎপত্তি। এখানে মহাজনদের অনেক গরু ছিল। রাখালরা গরু চরাত। গরু চরাতে চরাতে একটা গরু জঙ্গলে হারিয়ে যায়। সবার অনুমান নিশ্চয়ই বাঘের পেটে চালান হয়ে গেছে। সপ্তাহ তিনেক পরে দেখা যায় জঙ্গলে একটা নতুন বাছুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাখালরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে, কাদেরও বাছুর কিনা! কিন্তু সবাই বলে, এই বাছুরটা তাদের নয়। তাহলে এই সুন্দর বাছুর টা কার? সব রাখালই সম্মত হল, সন্ধ্যা হলে বাছুরটাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় কোনো ভাবেই সেই বাছুরটাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া গেল না, বরং বাছুরটা আরও গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

রাখালরা মালিককে বলল। মালিকরাও কয়েকজন এসে চেষ্টা করল, কিন্তু ঘরে ফেরাতে সমর্থ হল না। সেই রাত্তিরেই মহাজন স্বপ্নাদেশ পায়। আমি এই দেবতা আছি, আমি তোর গাভিকে রেখেছি। আমার পুজো করিস। পরদিন সকালে সবাই দেখে, গাভি দাঁড়িয়ে আছে। গাভির বাঁট থেকে দুধ পড়ছে লতাপাতা জড়ানো যেই জায়গায়, সেখানে কালো রঙের এক পাথর-মূর্তি। সেই থেকে পুজো শুরু হয়।

সপ্তাহের দুই দিন, মঙ্গলবার ও শনিবার এখানে পুজো হয়। সকাল ৯ টা থেকে শুরু হয়, চলে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন, পুজো দেন, মানত করেন, পাথরে ঠুকে নারকোল ভাঙেন, লাল সুতো জড়ানো ছোটো পোড়া মাটির ঘোড়া বেঁধে দেন গাছের শিকড়ে। পুজোর দায়িত্বে আছেন অব্রাহ্মণ দেহুরি (পদবি -ভুঁইয়া) সম্প্রদায়ের লোক। প্রজন্ম পরম্পরায় পুজো করে আসছেন ওনারা। থানের পুজোর দায়িত্বে আছেন নয়াগ্রামের দীপালি ভুঁইয়া। আগে পুজো করতেন তাঁর স্বামী। স্বামী গত হওয়ার পর পুজো করেন দেওর সুভাষ ভুঁইয়া। পুজোর সময় একজনই ঢোল বাদক থাকেন। সে ঢোলের আওয়াজ অন্যরকম, জঙ্গলের মাঝের নীরবতাকে ভেঙ্গে দেয় নিমেষে। দীর্ঘদিন ধরে ঢোল বাজাচ্ছেন নয়াগ্রামের সত্যেন মণ্ডল। মাঝে মাঝে ছেলে রবীন্দ্র মণ্ডল আসেন। থানের চারিদিকে খড় দিয়ে, পাতা দিয়ে ছাওয়া ছোটো ছোটো চালা। পুজোর দিন এখানে দোকান বসে, প্রসাদী ফলমূলের দোকান, খাবারের দোকান, মাটির ঘোড়ার দোকান। থানের সবথেকে কাছের চালায় কয়েকটি মাটির উনুন করা। এখানে পায়েস বা ক্ষীরভোগ রান্না হয়। এই ভোগ রান্নার দায়িত্বে কয়েকজন আছেন। রায়গরিয়া গ্রামের প্রতিমা দিগর, নয়াগ্রামের যুধিষ্ঠির দন্ডপাট এই ভোগ রান্না করেন। তবে পুজো দিতে এসে অনেকে নিজেরাই ভোগ প্রস্তুত করে দেবতাকে নিবেদন করেন। পুজোয় বলি প্রচলিত আছে। কালো পাঁঠা, কালো মুরগি বলি হয়। কথা বলে জানতে পারলাম, পুজোর দিন প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টা পাঁঠা এবং ১৫০ থেকে ২০০ মুরগি বলি হয়। সে সব ভক্তরাই আনেন, মানত করে। মানত করে অনেকে মাথা ন্যাড়া করেন, কেউ মন্দির চত্বরে অধ্যা দেন অর্থাৎ হাত জড়ো করে উপুড় হয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকেন। সাধারণ ফলমূল নিয়ে আসেন বেশিরভাগ। তবে এই পুজোর মূল প্রসাদ মহুয়া ফুলের নির্যাস, মদ। যা ঝুরি প্রসাদ নামে পরিচিত। বেশিরভাগ মানুষই আসেন কোনো না কোনো সংকট মুক্তির জন্য। চাকরি-বাকরি, ব্যবসা, গৃহের কল্যাণ, অসুখবিসুখ, বিবাহ, সন্তান – সব বিষয়ে ভালোর কথা ভেবে মানত করে লোকেরা। প্রতিবছর আসেন পুজো দিতে, এরকম ভক্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়। মানুষের বিশ্বাস মানুষকে নিয়ে আসে বাবা কালুয়াষাঁড়ের থানে।

কুঁয়োর সাহেব

নয়াগ্রাম ব্লকের অন্তর্গত কুমারপুর গ্রামে অবস্থিত বাবা কুঁয়োর সাহেবের থান। নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে পূর্বদিকে যে রাস্তাটা তুফুরিয়া, জারকা হয়ে ফুলদহ গ্রামের দিকে গেছে, ওই পথেই এই থান। গ্রামের নাম কুমারপুর। এই গ্রামের নাম কুঁয়োর সাহেব বা কুমার সাহেব-এর থেকেই এসেছে। গ্রামে ঢোকার মুখে দ্বারিকাপল্লী কে এস শিক্ষায়তন। এই শিক্ষায়তনের একেবারে পাশেই অবস্থান এই কুঁয়োর সাহেবের।

কুঁয়োর সাহেব বা কুমার সাহেব। এই ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় লোকমুখে। গেরুয়া পোশাক পরিধান করতেন, ঘুরে বেড়াতেন লাঠি হাতে। কোনো রাজা একসময় গ্রামে অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। রুখে দাঁড়ান কুমার সাহেব। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কুমার সাহেব অত্যাচারী রাজার হাত কেটে পুঁতে রাখেন। মনে করা হয়, বর্তমানের

থানের ঠিক মাঝখানে এটি পোঁতা হয়েছিল। তখন জামিরাপালের রাজা দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথকে স্বপ্নে দর্শন দেন, থান প্রতিষ্ঠার কথাও জানান। পূজারি বিষয়ক নির্দেশিকায় জানান, জেলে সম্প্রদায়ের কেউ, বিশেষ করে পালুই পদবিধারী কেউ এই থানে পুজো করবেন।

জঙ্গলের ধার ঘেঁষা কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করা। এখনও খান দশেক ছোটো-বড়ো গাছ রয়েছে। থানের পশ্চিম দিক অর্থাৎ সামনের দিকে সিমেন্টের চাতাল। চাতালের উপর দুই দিকে সারি দিয়ে রাখা পোড়া মাটির, সিমেন্টের তৈরি হাতি-ঘোড়া। এই চাতাল থেকে এক সংকীর্ণ রাস্তা থানের মাঝখান দিয়ে পুবের দিকে গেছে। থানে প্রবেশ ও প্রস্থানের পথে বাঁশ-বাখারি দিয়ে গোল দরজার মতো করা, তা থেকে ফুলের মালা ঝুলে আছে। থানের মাঝখানে ছোটো ছোটো পোড়া মাটির ঘোড়া স্তূপাকার হয়ে আছে। পৃথক কোনো মূর্তি নেই।

নিত্যপুজো হয় সকাল সাড়ে আটটা – নটার সময়। কুমারপুর, বীরকাদা, টিকরাপাড়া, ফুলদহ গ্রাম থেকে মানুষজন আসেন এখানে পুজো দিতে। এছাড়াও দূরদূরান্ত থেকেও আসেন, বিশেষ করে ওড়িশা জেলা থেকে। পুজো দেওয়ার সময় মানুষ ফল-মূল নিয়ে আসেন। তবে কেউ ক্ষীরভোগ, কেউ সুজি, কেউবা খিচুড়ি নিয়ে আসেন বা এই থানে এসে প্রস্তুত করেন। বর্তমানে পুজোর দায়িত্বে আছেন বীরকাদা গ্রামের জাদু পালুই। এছাড়াও পুজোর কাজে সাহায্যের জন্য আরও চার জন আছেন। মূলত সন্তান কামনায় বা বিশেষ করে পুত্র সন্তান কামনায় লোকেরা আসেন এই থানে পুজো দিতে। লাল ঘুন্সি, নারকোল ও পোড়া মাটির ঘোড়ায় জড়িয়ে থানের মাধবীলতার শিকড়ে বেঁধে দেন। মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রত্যাশায় কুঁয়োর সাহেবের উদ্দেশে কোনো কিছু উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে আসেন আনেকে। কেউ ফলমূলের, কেউ ক্ষীরভোগের, কেউ খিচুড়ি ভোগের। কেউ পাঁঠা মানত করতেই পারেন। সেক্ষেত্রে পুজো দিতে আসতে হবে বুধবার অথবা রবিবার। সপ্তাহের এই দুই দিন এখানে পাঁঠাবলি হয়।

শ্রাবণের শয়ন পূর্ণিমা থেকে অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টমী পর্যন্ত চার মাস সময় এই থান বন্ধ থাকে। এই থানে বিশেষ পুজো হয় ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহে। পাশের মাঠে মেলা বসে, চলে এক সপ্তাহ ধরে।

এই লোকদেবতার থানে লোকচিকিৎসা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আরও এক স্বপ্নদর্শনের কথা। গত কুড়ি বছর থেকে এই থানে দেহে জীবকোষের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধি জনিত দুরারোগ্য ব্যাধি বা কর্কট রোগের ওষুধ দেওয়া হয়। এই ওষুধ দেন খগেন ভুঁইয়া। এই ব্যক্তি স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে এই ওষুধের (গাছের পাতা) কথা জানতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে, ওড়িশার বিভিন্ন জায়গা থেকে কর্কট রোগমুক্তির আশায় মানুষজন আসেন এই দৈব ওষুধ নিতে। সংকট-মুক্ত হওয়ার পর ভক্তরা বড়ো হাতি-ঘোড়া নিয়ে এসে পুজো দেন থানে।

উপসংহার: সময় ও সমাজ বদলাচ্ছে। নয়াগ্রামের সমাজেও এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। তবু লোকদেবতা বাবা কালুয়াষাঁড় ও কুঁয়োর সাহেবের প্রভাব, গুরুত্ব কমেনি এতটুকুও। পরিবারের কোনো একজন যদি বাবা কালুয়াষাঁড়-এর কাছে কোনো মানত করে পুজো দেন, পরিবারের সবাই তিন দিন, সাত দিন অথবা একুশ দিন পর্যন্ত নিরামিষ আহার করেন। নতুন বাইক, স্কুটি কেনা হলে, আগে পুজো দেওয়া হয় থানে। গ্রামের কোনো শুভ অনুষ্ঠানের আগে সবাই পুজো দিয়ে যান কুঁয়োর সাহেবের থানে। গ্রামে বিয়ের পর নবদম্পতি থানে আসেন, প্রণাম করেন। সমস্ত রকম অভিঘাত সরিয়ে রেখে এভাবেই গ্রামের মানুষ এই দুই লোকদেবতার প্রতি, থানের প্রতি বিশ্বাস অটুট রেখেছেন।

ক্ষেত্রানুসন্ধান ও ক্ষেত্র গবেষণায় যাদের সাহায্য পেয়েছি, তারা হলেন -
১। দীপালি ভুঁইয়া, গৃহবধূ, বয়স ৬১, নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম।
২। সত্যেন মণ্ডল, ঢোলবাদক, বয়স ৬৪, নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম।
৩। শিলা আগুয়ান, ছাত্রী, বয়স ২১, কুমারপুর, ঝাড়গ্রাম।
৪। অমিতা সিং, ছাত্রী, বয়স ২১, বীরকাদা, ঝাড়গ্রাম।
৫। লিলিমা সাহু, বয়স ২১, টিকরাপাড়া, ঝাড়গ্রাম।
৬। খগেন ভুঁইয়া, কৃষিজীবী, বয়স ৬২, কুমারপুর, ঝাড়গ্রাম।
৭। পিয়ালী বেরা, ছাত্রী, বয়স ২২, দোলগ্রাম, ঝাড়গ্রাম।

সহায়ক গ্রন্থ:
১। *বাংলার লৌকিক দেবতা,* গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দে'জ, এপ্রিল ১৯৭৮
২। *লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ,* বরুণকুমার চক্রবর্তী, পুস্তকবিপণি, জানুয়ারি ১৯৮৪
৩। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,* দুলাল চৌধুরী, পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পা:), পুস্তকবিপণি, ২০১৩
৪। *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান,* বরুণকুমার চক্রবর্তী, দে'জ, নভেম্বর ২০১৫
৫। *পূজা পার্বণের উৎসকথা,* পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তকবিপণি, জানুয়ারি ২০২০
সহায়ক পত্রিকা:
১। সৃজন, সম্পা: – লক্ষ্মণ কর্মকার, মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি (বিশেষ সংখ্যা), vol no 17, Issue– (2-3), Dec.2009 – Mar.2010।

নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংকট-সম্প্রীতি

মৌসুমী পাত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

সারসংক্ষেপ: বর্তমান সময়ে সবথেকে চর্চিত বিষয় সাম্প্রদায়িকতা। ব্রিটিশ আগমনের পর ভারতবর্ষের সর্বধর্ম-সমন্বয় রীতির উপর প্রথম আঘাত নেমে আসে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরও আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা থেকে মুক্তি পাইনি। আজও ভারতবর্ষে যত্রতত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে চলেছে এবং তার ক্ষতিকর ফল ভোগ করে চলেছে আপামর ভারতবাসী। সমাজের জন্য ভয়ংকর ও ক্ষতিস্বরূপ এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমাজ-মনস্ক প্রগতিশীল লেখকেরা বারবার সরব হয়েছেন সাহিত্যের নানান সংরূপকে অবলম্বন করে। তবে সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপের তুলনায় ছোটোগল্পেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংঘাত-সংঘর্ষের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে বহু ছোটোগল্পে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ, তথা মানবতার সংকট এবং সর্বোপরি মানব মৈত্রী ও ঐক্যের কথা উঠে এসেছে। এই ধরনের অজস্র গল্পের মধ্যে আমরা বিভিন্ন লেখকের কয়েকটি গল্প বেছে নিয়েছি আলোচ্য প্রবন্ধে। গল্পগুলো পর্যালোচনা করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংকট ও সম্প্রীতি ভাবনার পরিচয় খুঁজে নিতে চেয়েছি — যা বর্তমান সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্মোচন বলেই মনে করি।
সূচক শব্দ: হিন্দু-মুসলমান, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, সম্প্রীতি, সদ্ভাব, মানবতার সংকট, বাংলা ছোটোগল্প।

মূল আলোচনা:

আজকের সময়ে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা সাম্প্রদায়িকতা। তবে বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার যে উগ্র রূপ দেখা যায় তা অতীত ভারতবর্ষের সঙ্গে একেবারেই সম্পৃক্ত নয়। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে নানা জাতিধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। দেশের এই সমন্বয়ধর্মী পরিবেশ বদলে যেতে থাকে ব্রিটিশ আগমনের পর থেকে। ব্রিটিশ শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে প্রতিক্রিয়ায় এদেশে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়। ব্রিটিশদের প্রচ্ছন্ন মদতে এই সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং দীর্ঘদিন একসঙ্গে বাস করে আসা হিন্দু-মুসলমান পরস্পরবিরোধী শত্রু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পরবর্তীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব তুঙ্গস্পর্শী হয়, যার অনিবার্য পরিণাম হিসেবে নেমে আসে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ। ভারত ভাগকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় বলে ভাবা হলেও আসলে তা হয়নি। দেশভাগ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি বরং জনমানসে স্থায়ী বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, হিংসা-হানাহানি জাতির জীবনকে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালে বাংলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পরিলক্ষিত হয়েছে

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সহিংস রূপ। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বাঙালি জনজীবন। বাঙালি জাতির জীবনে নেমে পাশে অপরিসীম দুর্ভোগ। ছোটোগল্প আপন স্বভাবধর্মে সমকালের প্রতি আসক্ত। তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংকটলগ্নে মানবতার এই ক্ষতবিক্ষত জীর্ণ রূপ এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষের নির্মম নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে বাংলা ছোটোগল্পের বয়ানে। দেশ ও জাতির এই সংকটলগ্নে আমরা পেয়েছি বহু গল্পকারের অজস্র বাংলা ছোটোগল্প। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, মানবতাবাদী সাহিত্যিকরা সাম্প্রদায়িক হিংসার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকে আশ্রয় করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সজীব করতে সচেষ্ট হন। তাই তাঁদের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ, মানবিক সংকটের পাশাপাশি এই উপদ্রুত সময়েও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্ক দেখা যায় তারও দৃশ্যায়ন ঘটেছে। বলা ভালো ছোটোগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে সাম্প্রদায়িক সংঘাতজনিত উত্তেজনা, উদ্‌বেগ, আতঙ্কের ছবি যেমন দৃষ্ট হয় তেমনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবিও দুর্লভ নয়।

মনোজ বসুর *‘হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা’* গল্পটি দেশভাগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে রচিত। গল্পের চরিত্র বিপিন রাজনৈতিক কর্মী। সে রাজদ্রোহের অপরাধে দু’বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসে দেখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তার চিরকালের চেনা গ্রামের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, জাতিতে জাতিতে হিংসা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। গ্রামে ফিরে যাবার পথে খেয়া ঘাটে এসে দেখে ধর্মের ভিত্তিতে মাঝিদের ঘাট আলাদা হয়ে গেছে। নৌকা থেকেই দেখতে পায় তাঁর স্বপ্নের গ্রাম যেখানে হিন্দু-মুসলিমানের সহাবস্থান ছিল তা সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস আগুনে জ্বলছে। পরিবেশ কতটা আতঙ্কের তা মাঝির কথায় স্পষ্ট হয় –

> “ওপারে মোছলমান, এপারে হিন্দুরা পিরথিমে আর
> নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা থাকলো না, বাবু।”[১]

সাম্প্রদায়িকতার চরম নিকৃষ্ট পরিচয় প্রকাশিত হয় যখন বিপিন অতি সন্তর্পণে গ্রামে পৌঁছানোর পর তাঁরই পুত্রের কাছে ভুলবশত শত্রুরূপে চিহ্নিত হয় এবং পুত্রের ছুঁড়ে দেওয়া ইঁটের আঘাতে আহত হয় যদিও পরমুহূর্তে দেখা যায় বিপিনের পুত্র সুকুমার অপরাধ বোধে, গ্লানিতে পিতার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। চূড়ান্ত অস্বস্তিকর মুহূর্তে নিরদ তাঁকে প্রবোধ দেয়, বিপিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সর্বোত্তম আশাবাদ —

> “হ্যাঁ, পুবে ফর্সা দিচ্ছে, সূর্য উঠছে, মানুষ মানুষকে চিনবে, ঐ সব পোড়া
> ঘর-বাড়ির ছাইয়ের গাদায় ফুল ফুটে উঠবে।”[২]

বিপিনের মতো এই আশাবাদ আসলে লেখকেরও। তিনিও চান এমন এক নতুন সকালের আগমন। যে সকালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেকেই শুভচেতনায় জেগে উঠবে সম্প্রীতির লক্ষ্যে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সমরেশ বসুর *‘আদাব’* গল্পটির পটভূমি ছেচল্লিশের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। গল্পের শুরুতেই লেখক দাঙ্গাবিধ্বস্ত শহরের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন —

> “শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু
> আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই—দা, শড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে।”[৩]

দাঙ্গা-আক্রান্ত এই সময়ে অবিশ্বাসের বাতাবরণে হিন্দু-মুসলমান একে অপরকে দেখতে শুরু করে শত্রুর আক্রমণের ভঙ্গিতে, সংশয়ের ইঙ্গিতে। এমনই অবিশ্বাসের বাতাবরণে সাক্ষাৎ হয়

সুতাকলের এক হিন্দু শ্রমিকের সাথে এক মুসলমান মাঝির। ভয়াবহ আবর্তে একে অপরকে দেখে সন্দেহে, উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। উভয়েই উভয়কে ভাবে খুনি। কেউ কারও জাতধর্ম প্রকাশ করে না। দুজনেই আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে। এরপর প্রকাশিত হয় দুটি মানুষের ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়। তারপর আর দাঙ্গা নয় নরকের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় জীবন — দুটি ভিন্ন জাতির দুটি মানুষ। মরণাগ্নির দিনে জীবনের শপথ নেয় মুসলমান মাঝি আর হিন্দু সুতা-মজুর। একে অপরের প্রতি সন্দেহ মিটে যায় অচিরেই। দাঙ্গাপীড়িত বীভৎস সময়ে একে অপরকে বাঁচানোর জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মানবিক নির্মিতিতে সেই রক্তাক্ত সময়ে শুভসম্প্রীতির সূচনা হয় এভাবেই। দুজনের কণ্ঠে ঝরে পড়ে বিভেদের রাজনীতির প্রতি চরম অনাস্থা। নির্মম-নিষ্ঠুর দাঙ্গার প্রতি দুজনেই খড়্গহস্ত। মাঝির কণ্ঠে শোনা যায় —

> "আমি জিগাই, মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দুগা লোক মরব, আমাগো দুগা মরব। তাদের দ্যাশের কী উপকারটা হইব।"[৪]

সুতা-মজুর বলে —

> "—আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা —হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলা-মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব।"[৫]

সুতা-মজুর ও মাঝির বিবেকের এই জাগরণ, তাদের এই দাঙ্গাবিরোধী উক্তি মেকি সভ্যতার মুখোশ খুলে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিষ্ঠুর নির্মম রূপ দেখিয়ে দেয়— জয়ী হয় সম্প্রীতি। হৃদয়ের কাছাকাছি আসে জাত-ভুলে যাওয়া দুটি মানুষ। তাই মুসলমান মাঝি পথ-কুকুরদের হাত থেকে বাঁচাতে হিন্দুকে পথ দেখায়, তারপর মুসলমানের পাড়া ইসলামপুরের ফাঁড়ি থেকে ফিরে যেতে বলে হিন্দু সুতা-মজুরকে। অপরদিকে ঈদে যোগদানের নেশায় মাঝি মৃত্যু ফাঁদে পা দিলে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ে হিন্দু সুতা-মজুরের কণ্ঠে। মাঝি চলে যেতেই সুতা-মজুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বিভেদহীন আকুতি —

> "ভগবান—মাঝি য্যান বিপদে না-পড়ে।"[৬]

তার আগে বিদায় বেলায় মাঝিও সুতা-মজুরকে বলে যায় —

> "নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।— আদাব।"[৭]

— এই আদাব রাখিবন্ধনের আদাব— দাঙ্গা নয়, রক্ত নয়, ঘৃণা নয়, মানুষে মানুষে সম্প্রীতির আদাব।

দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে রচিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'খতিয়ান'* গল্পটি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রেক্ষাপটে লিখিত এই গল্পে দু'বন্ধুর ধর্ম আলাদা কিন্তু তাদের পেশা এক, তারা দুজনেই একই কারখানার হতদরিদ্র শ্রমিক। তারা কারখানার মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে একত্রে ধর্মঘট করেছে এবং জয়ীও হয়েছে। হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাদের অসহায় অনুভব—

> "... তাদের মিল আছে, তারা বন্ধু বটে, কিন্তু আর যেন এক নয়,— দু'জনে তারা দু'দলের হয়ে গেছে, ..."[৮]

তবুও জাতিধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এক বন্ধু আরেক বন্ধুর পাশে থাকে, বিপদে পরিত্রাতা হয়ে দাঁড়ায়। দাঙ্গার আগুনে তাদের দুজনের বস্তিই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বস্তির আগুনে লাল হয়ে যায় আকাশ, আগুনের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে যায় মানুষের মাংস পোড়ার গন্ধ। হিন্দু-মুসলমান লাশ পাশাপাশি পড়ে থাকতে দেখে এক বন্ধু বিধাতার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় —

"... মড়াপচা গন্ধ শুকে বুঝতে পারছ কোনটা হিঁদুর, কোনটা মুসলমানের?"[৯]

দাঙ্গার অবসানে কারখানার গেটে এসে তারা জানতে পারে তাদের আর কাজ নেই। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কারখানার মালিকপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করেছে এবং তারাও ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের দলে। অথচ মাত্র এক মাস আগে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও প্রতিরোধে মালিকপক্ষ তিন জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেও পুনরায় কাজে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। সাম্প্রদায়িক সংঘাত সংঘর্ষ তাদের জীবনকে বদলে দেয়। কারখানা থেকে একসঙ্গে ছাঁটাই হয়ে রেশনে লাইনে দাঁড়ায় দুজনেই। সেখানেও দুজনেই একইভাবে বঞ্চিত হয়। অবশেষে ১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে তাদের বোঝাই করা হয় পুলিশের গাড়িতে, এই চূড়ান্ত নিগ্রহ ও বঞ্চনার মুহূর্তে তাদের উপলব্ধি —

"তুই গরিব, আমি গরিব। আমরা গরিবের জাত।"[১০]

সম্প্রদায় আলাদা হওয়া সত্ত্বেও অসহায় দারিদ্র্য তাদের এক সূত্রে বেঁধে রাখে। দুটো ভিন্ন ধর্মের মানুষের এই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, সাম্প্রদায়িক হিংসা-হানাহানির আবহেও সমরেখায় অবস্থান জাতিধর্মের ঊর্ধ্বে সমন্বয় ও সংহতির কথা বলে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা *'বিশ্বাস'* গল্পটিও কলকাতা শহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে লিখিত। গল্পটিতে দেখা যায়, পরেশ আর রহমান কলকাতা শহরে ছোট্ট এক পল্লীতে থাকত। তাদের মধ্যে ছিল নিখাদ খাঁটি অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। আকস্মিকভাবে পরিস্থিতির বদল ঘটে। লেখক বর্ণনা করে বলেছেন —

"নূতন যুগও আসিল—যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি, কাটাকাটি এ তো তাহার সাধারণ দান—সর্বজনের জন্য; ..."[১১]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উত্তেজনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে হাওয়া এসে লাগে রহমানের গায়ে, সাম্প্রদায়িকতার বিবেকহীন দংশনকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। তবুও সে বন্ধু পরেশকে সাবধান করে বলেছিল বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যেতে কিন্তু পরেশ তার বিশ্বাসের অসীম শক্তিতে স্ত্রী-সন্তান সহ বাড়িতেই থেকে যায়। এই বিশ্বাসের জোরেই সে জেহাদের দিন বেরিয়ে পড়ে রুগ্ন মেয়ের জন্য ওষুধ আনতে, ফিরে এসে দেখে পরিবার-পরিজনের অগ্নিদগ্ধ দলিত শবদেহ। অচিরেই রহমানকেও বিশ্বাসের মূল্য দিতে হল। একতরফা নিধন যজ্ঞের প্রতিক্রিয়ায় যখন হিন্দুরা রুখে দাঁড়াল তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতায় আক্রান্ত হল রহমানের স্বজনপরিজনরা। হিংসায় উন্মত্ত জনতার ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে রহমান উপলব্ধি করে —

"কেহ বাঁচিবে না। না হিন্দু, না মুসলমান, একখণ্ড দেশ থাকিবে পড়িয়া—শ্মশান-শকুনেরা উল্লাসে ডানা ঝাপটাইতেছে।"[১২]

চারিদিকে যখন অবিশ্বাস আর অন্ধকার তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটে চলা রহমানের হঠাৎ চোখে পড়ে, শিশুকন্যা নুরীকে পরম মমতায় আগলে রেখেছে পরেশ এই দৃশ্য যথার্থ অর্থেই হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক আন্তরিক বিশ্বাসের আলোকে প্রজ্বলিত করে।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *'স্বাক্ষর'* দুজন বিপরীতধর্মী মানুষের বন্ধুত্বের গল্প। দীননাথ এবং জহুরালি দুজনেই ফেরিওয়ালা, ফেরি করেই তাদের সংসার চলে ছোটো তাদের জীবনের বৃত্ত ছোটো তাদের চাওয়া পাওয়া। আকস্মিকভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে শহরের পরিস্থিতি বদলে যায় —

"মুহূর্তে যে কী হ'য়ে গেলো দীননাথ আর জহুরালি কিছু কিনারা করতে পারলো না। চোখের সামনে দোকান-দানি পুড়তে লাগলো, লুঠ হ'তে

> লাগলো। গলিঘুঁজির মোড়ে নিরুদ্দেশ পথিকের বুকে-পিঠে ছুরি বসতে লাগলো। শান্তিপ্রিয় নিশ্চেষ্ট গৃহস্থের আঙিনা পিছল হ'য়ে উঠলো শিশু-শাবকের রক্তে। কলকাতার রাস্তায় শকুনের পাখসাট।"[১৩]

এই সংঘাত-সংঘর্ষময় পরিস্থিতিতে দীননাথ ও জহুরালির বন্ধুত্বে চিড় ধরে। দাঙ্গার এক রাতে দু'বন্ধু নিজেদেরকে দেখতে পায় পরস্পরবিরোধী প্রতিপক্ষ হিসেবে। একজনের হাতে বোতল, অন্যজনের হাতে ইঁট। একে অন্যকে জখম করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, এমন সময় মিলিটারি গাড়ির আগমণে দাঙ্গা বন্ধ হয়। অতঃপর দেখা যায় মিলিটারি গুলির হাত থেকে রক্ষা পেতে দু'বন্ধু আবার মিলিত হয়েছে একই আশ্রয়ে। তারা অন্ধকারে পরস্পরকে চিনতে পারে পরিচিত কণ্ঠস্বরে। তখন একে অপরের আঘাতের খবর নেয়। দাঙ্গায় পরিশ্রান্ত হয়ে তারা জাতিগত, ধর্মগত বিভেদকে উপেক্ষা করে একটি বিড়িতে ভাগাভাগি করে টান দেয় — এভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন নিভে যায়, জয়ী হয় মানবতা, বন্ধুত্ব।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত *'উস্তাদ মেহেরা খাঁ'* গল্পটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত। গল্পটি উস্তাদ মেহেরা খাঁ নামক এক সংগীতশিল্পীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মেহেরা খাঁ বড়ো মাপের একজন শিল্পী, শঙ্করের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী তাঁকে নিজের বাড়িতে সাদরে বরণ করে নেন। দীর্ঘ সময় ধরে এমনকি জগন্নাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পরও তাঁর বাড়িতেই থেকে যান উস্তাদজী। যদিও জগন্নাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শঙ্করের আধুনিক গানের প্রতি মনোভাব ও চোরাটান উস্তাদজীকে আহত করে। তবু এরই মধ্যে তিনি আপন আদর্শে অবিচল থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলেন। তারপর হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সব বদলে দেয়। যে উস্তাদজীকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে নিকট আত্মীয়ের চোখে বিনম্র শ্রদ্ধায় আগলে রেখেছিল তারাই তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল। উস্তাদজীর মুসলিম পরিচয়টাই সকলের কাছে বড়ো হয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি একদিন মেহেরা খাঁকে নিরাশ্রয় করে পথে নামতে বাধ্য করল —

> "বৃষ্টি পড়ছে দাঙ্গা-কলঙ্কিত কলকাতায়—নেমেছে শোকের মত শ্রাবণের রাত্রি। তানপুরা-কাঁধে পথে পথে ঘুরছেন উস্তাদজী।"[১৪]

শেষমেষ শিল্পীর জীবনপ্রদীপ নিভে গেল কলকাতার পথে উন্মত্ত দাঙ্গায়। সাম্প্রদায়িক মানুষের পাশবপ্রবৃত্তির কাছে মানবতা লুণ্ঠিত হল, নির্মমভাবে খুন হলেন অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধে বিশ্বাসী মহানশিল্পী মেহেরা খাঁ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতায় শিল্পীর মৃত্যু হলেও বেঁচে থাকল তার শিল্প। শঙ্করের স্ত্রী রমার মধ্যে শিল্পী রেখে গেলেন তার সঙ্গীতরত্নের উত্তরাধিকার। শিল্পীর জীবনবসান হলেও শিল্পের অপমৃত্যু না ঘটিয়ে লেখক আসলে গল্পে প্রকারান্তরে শিল্পী-মানুষের চিরন্তন জয়ের কথাই ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ গল্পে একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলুষিত রূপ যেমন ফুটে উঠেছে তেমনই সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানুষের শুভবুদ্ধির জয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নবেন্দু ঘোষের *'উলুখড়'* গল্পটিরও প্রেক্ষাপট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশভাগের সমকালীন উত্তেজনাময় জীবনের স্পর্শ লেগে আছে আলোচ্য ছোটোগল্পটিতে। আজিজ তার স্ত্রী জোহরা ও একমাত্র মেয়েকে নিয়ে কলকাতা শহরের এক বস্তিতে থাকে। সে পেশায় ট্র্যামের কনডাক্টর। ট্র্যাম কোম্পানির শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের গাফিলতি ও অবিচার সহ্য করতে না পেরে কোম্পানির শ্রমিকেরা ধর্মঘটে নামে। আজিজও এই ধর্মঘটে নিজেকে সামিল করে এবং পেটের দায়ে পেশা বদল করতে বাধ্য হয়। সে শিয়ালদার মোড়ে ফুটপাতে মনিহারি জিনিস ও শেষে কমলালেবু বিক্রি করে কোনোরকমে সংসার চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে কলকাতা শহরে

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণে হিন্দু-মুসলমান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিঘ্নিত হয়। দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ শহরে উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতেও ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঊর্ধ্বে এক ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের মনোভাব বজায় রাখে। এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত 'ধর্মঘটী ট্রামশ্রমিক' হিসেবে আজিজও বিভেদের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেয় তার যাবতীয় সাম্প্রদায়িক পরিচয়। খেটে খাওয়া মানুষের পরিচয়কে সঙ্গে করে দাঙ্গা উন্মত্ত শহরের পথে নামে সে, স্ত্রীর আপত্তির প্রশ্নে জানায় —

> "... দশ বৎসরের পুরোনো মজদুর আমি, আমায় কেউ মারবে না। কারণ সবাই জানে যে আমরা একতরফা কারো সুখ চাই না—আমরা চাই সবার সুখ, সবার শান্তি—"[১৫]

— আজিজের এই উক্তি ভয়াবহ রক্তপাতের মাঝেও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মানবতাবাদী উচ্চারণ। এ হেন মানবতাবাদী, সমন্বয়ধর্মী আজিজ, মেয়ে রাবেয়ার অসুস্থতায় তাকে হিন্দু ডাক্তার রায়ের কাছে নিয়ে যায়। তার এই নির্বাচন কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে তোয়াক্কা করে না। ডাক্তার রায়ও জাতি-ধর্মের পরিচয়কে তুচ্ছ করে আজিজের মেয়ের জন্য প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে বলেন—

> "এবার তাড়াতাড়ি চ'লে যাও—এ-পাড়ায় আসতে তোমার ভয় হ'লো না?"[১৬]

— সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিবাদভূমিতে ডাক্তার রায় ও আজিজের এই মনোভাব সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঊর্ধ্বে সম্প্রীতির বার্তা। তবুও ভাগ্যের পরিহাসে অসাম্প্রদায়িক আজিজই শহর জুড়ে চলতে থাকা সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হয়। গল্পটিতে লেখক নবেন্দু ঘোষ একাধারে হিংসাত্মক সংঘর্ষের ছবি যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনই সংঘাতপূর্ণ সময়েও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পরিচয়ও ফুটিয়ে তুলে পাঠককে ইতিবাচক ভাবনার জগতে পৌঁছে দেন।

রমেশচন্দ্র সেনের *'শাদা ঘোড়া'* গল্পটিও দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা শহরের পটভূমিতে রচিত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই লেখকের বর্ণনায় দাঙ্গা-আক্রান্ত কলকাতা শহরের বাস্তব প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে —

> "ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন রক্তস্নানের পর কলিকাতার অবস্থা একটু শান্ত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান নিজ-নিজ পল্লিতে কিছুটা নিঃসংকোচে বাহির হয়। কিন্তু কেমন যেন থমথমে ভাব।"[১৭]

দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার থমথমে পরিবেশে চাঁদ নামের একটি ঘোড়া প্রাণের উন্মাদনা ফিরিয়ে আনে। এই নিরীহ প্রাণীটিকে কেন্দ্র করে সকলেই সহজ হয় তাদের মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসে। আগুন্তক ঘোড়াটিকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান, ছোট-বড়ো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মেতে ওঠে। সকলের আন্তরিকতা ও আদর যত্ন সত্ত্বেও ঘোড়াটি অভুক্ত থাকে এবং ধীরে ধীরে কাহিল হয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে খুঁজে খুঁজে হিন্দু পাড়ায় আসে তার মুসলমান সহিস। সহিসের হাতে ঘোড়াটিকে খাবার খেতে দেখে সকলেই খুশি হয়। এমন সময় খবর আসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার। উদ্ধত হিংস্র জনতা পাড়ায় ঢুকে পড়ে এবং মুসলমান সহিসের প্রাণসংশয় হয়। শেষ পর্যন্ত পাড়ার হিন্দু যুবক যমুনাপ্রসাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বৃদ্ধ সহিসের প্রাণ রক্ষা পায়। নিরীহ মানুষটির প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে আপন জাতির সঙ্গে বিরোধিতা করে সে তাকে প্রাণে বাঁচায়। ইতিমধ্যে এসে পড়ে মিলিটারি সৈনিকের দল, দাঙ্গা-পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রনে আসে। ঘন্টাখানেক পর চিৎকার চেঁচামেচি গুলির লড়াই থেমে

গেলে দেখা যায় রিক্ত রাজপথে গুলিবিদ্ধ ঘোড়ার প্রাণহীন নিথর দেহ — সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার নিষ্ঠুর পরিণাম। ঘোড়াটির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উন্মত্ত মানুষের পাশবিকতার নৃশংসরূপ প্রত্যক্ষ হলেও ঘোড়াটির মৃত্যু পরবর্তী হিন্দু-মুসলমানের অভিন্ন বেদনার যে প্রকাশ গল্পে লক্ষ্য করা যায় তাতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের মানবিক হৃদয়-ধর্ম চমৎকারভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানির অভিজ্ঞতার ক্ষতকে সংবেদনশীল লেখকেরা তাদের গল্পে ধরে রেখেছেন। সাম্প্রদায়িক সংঘাত, সংঘর্ষ তথা সংকট তাদের গল্পে উঠে এসেছে নানান প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সহ। গল্পগুলোতে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন যেমন উঠে এসেছে তেমনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র। কোনো গল্পকার দেখিয়েছেন দাঙ্গার নিষ্ঠুর পরিণাম, আবার কোন গল্পে উঠে এসেছে দাঙ্গার আবহাওয়ায় হিন্দু-মুসলমান প্রীতি-সম্পর্কের কথা, আবার কেউ জোর দিয়েছেন হিন্দু-মুসলমানের নিখাদ বন্ধুত্বের ওপর। তাই বলা যায়, গল্পগুলো পাঠ করে এবং পর্যালোচনা করে আমাদের দাঙ্গার ভয়াবহতা সম্পর্কে যেমন সচেতনতা তৈরি হয় তেমনই গল্পে প্রতিফলিত মানুষে মানুষে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির বার্তা আমাদের ইতিবাচক চিন্তা-চেতনার জগতে পৌঁছে দেয়। বিভিন্ন লেখকদের এই গল্পগুলো যেন সম্মিলিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শান্তি ও সহাবস্থান এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যের কথা বলেছে। দাঙ্গা ও সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার গল্পকারদের এই আন্তরিক প্রয়াস ও প্রচেষ্টা বর্তমান দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ সময়েও আমাদের ধর্মের উর্ধ্বে, ঘৃণার ঊর্ধ্বে, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মানবতার পক্ষে প্রাণিত করে তথা শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে উদ্‌বোধিত করে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, মনোজ। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ। "হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা"। *দুঃখ-নিশার শেষে,* কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৯।
২. তদেব, পৃ. ঐ।
৩. বসু, সমরেশ। ১৯৯২। "আদাব"। *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন (প্রথম খণ্ড),* সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩২৯।
৪. তদেব, পৃ. ৩৩২।
৫. তদেব, পৃ. ঐ।
৬. তদেব, পৃ. ৩৩৪।
৭. তদেব, পৃ. ঐ।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। "খতিয়ান"। *খতিয়ান,* কলিকাতা, ষ্টুডেন্টস বুক সাপ্লাই, পৃ. ২।
৯. তদেব, পৃ. ৬।
১০. তদেব, পৃ. ৯।
১১. মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ। "বিশ্বাস"। *কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার,* কলিকাতা, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, পৃ. ৫।
১২. তদেব, পৃ. ২৯।
১৩. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। ১৯৯২। "স্বাক্ষর"। *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন (প্রথম খণ্ড),* সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১২৭।

১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। ১৯৯২। "উস্তাদ মেহেরা খাঁ"। *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন (প্রথম খণ্ড),* সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২০৮।

১৫. ঘোষ, নবেন্দু। ১৯৯২। "উলুখড়"। *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন (প্রথম খণ্ড),* সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২৫৬।

১৬. তদেব, পৃ. ২৫৮।

১৭. সেন, রমেশচন্দ্র। ১৯৯২। "শাদা ঘোড়া"। *ভেদ-বিভেদ দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন (প্রথম খণ্ড),* সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৬৪।

অস্তিবাদী দর্শনের আলোকে কার্তিক লাহিড়ীর উপন্যাস

অমিত মুর্মু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সারসংক্ষেপ (Abstract): স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে যেমন জোরালোভাবে উঠে আসতে থাকল রাষ্ট্র-সমাজ ও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঠিক তেমনই কিছু স্রষ্ঠা তুলে ধরতে চাইলেন মানুষের অবচেতনের সেই নিঃসঙ্গতাকে। যে নিঃসঙ্গতাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না অনুভব করা গেলেও তার বীভৎসতাকে অনুধাবন করা যায় না। অথচ মানুষ যার থেকে নিস্তার পেতে চেষ্টা করে যাচ্ছে নিরন্তর। একপ্রকার লড়াই করে চলেছে তার নিজেরই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। নিরন্তর ঘটে চলা এই দ্বন্দ্ব-অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে একদল লেখকগোষ্ঠী তাদের চিন্তা চেতনার জগতের মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতি বা অবচেতন মনের ধ্যান ধারণাকে জায়গা দিতে শুরু করলেন। নিঃসন্দেহে সেই লেখক গোষ্ঠীর একজন হলেন কার্তিক লাহিড়ী। কার্তিক লাহিড়ী তাঁর উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে মানুষের অবচেতনে ঘটে চলা দ্বন্দ্ব ও নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর 'শৌভিক এবং সৌভিক' উপন্যাসের দেখবো কীভাবে নামের দুটো অর্থ নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শৌভিক ঠিক করতে পারে না তার নামের কোন্ অর্থ কার্যকরী হবে। 'আকাশ-কুসুম' উপন্যাসে প্রজেশ আগের মতো কবিতা লিখতে না পারায় তার মনের মধ্যে এক ভয়, সংশয় কাজ করে, মনে হয় তার অস্তিত্ব যেন বিলীন হয়ে গেছে। উল্টোদিকে 'লালফিতের গেরো'-তে পরেশ বেঁচে থেকেও সরকারী খাতায় মৃত বলে প্রমাণিত হচ্ছে, যার কারণে মরিয়া হয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে তার অস্তিত্ব। 'স্বেচ্ছামৃত্যু'-তে বাদলের টিকে থাকার জন্য জরুরী হয়ে পরেছে আর্থিক সংস্থান। কিন্তু সে কিছুতেই তার জন্য একটা চাকরি জোগাড় করতে পারে না। তাই অসহায় বাদল বাবাকে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে বলে। এখানে সবাই যেন নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা সামাজিক স্বীকৃতি পেতে চাইছে। সবাই যেন সমাজের একটা অংশ হয়ে উঠতে চাইছে। এই হয়ে উঠতে গিয়ে যে যে সমস্যার সম্মুখীন তারা হচ্ছে সেটিই দেখার বিষয়।

সূচক শব্দ (key words): কার্তিক লাহিড়ী, অস্তিবাদী, সংকট, অবচেতন, দ্বন্দ্ব।

মূল আলোচনা (Discussion) :

পাশ্চাত্যে কয়েকজন দার্শনিক প্রচলিত দর্শন ধারার পরিবর্তন করে 'অস্তিবাদ' নামক এক ব্যতিক্রমধর্মী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। অস্তিবাদী দার্শনিকদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ব্যক্তি মানুষ, একদিক থেকে অস্তিবাদ হল মনুষ্য পরিস্থিতির দর্শন। এই দর্শন শুধু মাত্র মানুষের 'সত্তা' বা 'অস্তিত্ব' বিষয়ে আলোচনা করে। আবার এই 'অস্তিত্ব' শব্দটি জগতের সকল বস্তু সম্পর্কেও ব্যবহৃত হতে পারে, কারণ জগতের সকল বস্তুই 'অস্তিত্বশীল'। 'অস্তিত্ব' শব্দটি এসেছে 'Ex-sist' (latin : ex-sistere) থেকে যার অর্থ হল stand out, অর্থাৎ (সচেতন) ক্রমবিকাশ বা ক্রম অভিব্যক্তি; অথবা ব্যক্তির অন্তরের বিচিত্র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। প্রচলিত অর্থে 'অস্তিত্ব' বলতে 'থাকা' বা 'বিদ্যমানতা'কে বোঝায়। অস্তিবাদীরা অমূর্ত সামান্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তারা শুধু মাত্র মূর্ত বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, জগতে মানুষ ভিন্ন অন্য কোন

কিছুর অস্তিত্ব নেই, তাঁদের কাছে অস্তিত্ব বলতে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে বোঝায়। কেননা একমাত্র মানুষই নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। মানুষ ব্যতীত অন্য জীব, যারা জগতে বর্তমান অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণীরা সচেতনভাবে নিজেদের অস্তিত্বকে ইপ্সিত রূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ঠিক একইরকম ভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন—ঝড়, ভুমিকম্প, বন্যা, দাবাগ্নি ইত্যাদি, দুর্গম পাহাড়-পর্বত, গহন-বন, হিংস্র-জীবজন্তু, সর্বোপরি এ সবই তো প্রতিনিয়ত দিচ্ছে আত্মহননের হুংকার। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষ কিন্তু অন্যান্য সব কিছুর মতন প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে শুধুমাত্র সহজাত প্রবৃত্তি চালিত হয়ে অভিযোজন করে না, করতে পারে না। সে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তোলে উত্তরোত্তর কঠোর থেকে কঠোরতর, উন্নততর থেকে উন্নতমানের প্রতিরোধ। আর মানুষের এই কঠিনতর, উন্নততর, প্রতিরোধ বহুলাংশে সার্থক, আজ তা বাস্তব, কাজেই তা স্বীকৃতি অস্বীকৃতির উর্দ্ধে। আর এভাবেই অস্তিত্বকে রক্ষা করে চলেছে প্রতিটি মানুষ, তাই আবহমান কাল থেকে সকল বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হয়ে। তাই তো সে নিজেকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে আত্মসচেতন, স্বাধীন, অস্তিত্বশীল সত্তারূপে। মানুষ ভিন্ন অন্য কোন কিছুই প্রকৃত অর্থে অস্তিত্বশীল হতে পারে না, তা উপলব্ধি করা একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তাই এই অস্তিত্ব মানুষেরই, অন্য কোন কিছুর নয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অস্তিবাদ কেবল মাত্র মানব-অস্তিত্ব সম্পর্কে আগ্রহী। অস্তিবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন ‘বেঁচে থাকা’ আর ‘অস্তিশীল’ হওয়া এক জিনিস নয়। অর্থহীনভাবে জীবনযাপন করাকে বেঁচে থাকা বলা গেলেও অস্তিত্বশীল বলা যায় না। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ এক প্রকার বিশেষ ব্যক্তি মানুষে পরিণত হওয়া, তাই বলা হয়েছে—

> “Man exist and make himself develop into what he wants to be. He does not have a fixed essence that is given to him in a readymade manner. Rather, he makes his own nature out of his freedom and the historical conditions in which he finds himself.”[১]

অস্তিত্ব যেহেতু ব্যক্তি মানুষের জীবনের একটি বিশেষ অবস্থা, সেহেতু এটি অপরিহার্য ভাবে আত্মগত ও নিজস্ব যা একমাত্র নিজ অভিজ্ঞতা দিয়েই জানা বা বোঝা সম্ভব।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫ সাল, লুক্রেশিয়াস তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আত্মহত্যাকে নিজের করে নিয়ে লিখলেন,

> “প্রত্যেকেই নিজের কাছ থেকে পালাতে চায়, কিন্তু পারে না, শুধু অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের সঙ্গে নিজেকে ঘৃণা করে বেঁচে থাকে”[২]

নিজেকে অবহেলা করার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নিজেকে ভালোবাসার গূঢ় ইচ্ছা। কারণ, অবহেলা করার মধ্যেও স্বাধীনতাকে ভালোবাসা আছে। যদিও, স্বাধীনতা কী এই নিয়েও প্রশ্ন থাকে, তবে এটি নিশ্চিত যে, স্বাধীনতা আর যাই হোক, ‘ব্যক্তি-আমি’কে বাদ দিয়ে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। মর্তুকাম এই পৃথিবীর কাছে যথার্থ মানব (Authentic Man) এর নিজের অঞ্চলটি কী নামে পরিচিত হবে এই জিজ্ঞাসা থেকেই তার সিসিফাসের নিয়তিকে নিজের ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা। কিন্তু, মানুষ সম্ভাবনাময়। তার নিয়ন্ত্রক সে কেবল নিজে। সে পারে না এমন কিছুই নেই, তার অহংকার এখানেই যে, সে শয়তান যেমন হতে পারে তেমনি হয়ে উঠতে পারে দেবতাও। কোনো যুক্তি, কোনো সীদ্ধান্তের বন্ধনে জীবন বাঁধা নেই এই বিশ্বাসেই সে আস্থাশীল, এই

বিশ্বাসেই যথার্থ অস্তিত্ব তার। অস্তিত্ব-অন্বেষণের এই দুর্বার পথে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে হাঁটার মধ্যেই তার অবাধ স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা নিয়ে ভাবিত অস্তিবাদী দার্শনিকরাও একই কথা বলে থাকেন। বলে থাকেন, স্বাধীন সত্তা অস্তিবাদী দৃষ্টিতে যে কোনো কাজই করার অধিকারী, কেননা অস্তিত্বের পূর্ববর্তী কোনো সত্তার ধারণা দ্বারা সে বদ্ধ নয়। মানুষ যা কিছু করে বা করেছে বা করতে পারে তাকেই সামগ্রিকভাবে মানবিক বলে স্বীকার করা ছাড়া যৌক্তিক বিবেচনায় আর কোনো উপায় নেই।

অর্থাৎ মানুষ যা করে তাই তার ধর্ম। এই ধর্মে তার বাধা আছে, এই ধর্মেই তার মুক্তি। সে নিঃসঙ্গ হয়, সে দীর্ণ হয় তবুও বিশ্বাস করে, 'Life is more than logic'.

> "Human presence in the world is not a form of being, but a form of doing, of choosing and making itself."[৩]

জীবনকে যুক্তি দিয়ে বাঁধা যায় না এই কথা অস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত মানুষ মাত্রই জানে। আর জানে বলেই, কার্তিক লাহিড়ীর 'শৌভিক এবং সৌভিক' উপন্যাসে নায়ক জাদুকর না অভিনেতা সে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। স্কুলের ধ্রুব স্যারের কথা অনুযায়ী নায়ক হয়ে যায় দুটি চরিত্র। তার নামের বানানের হেরফেরে যে এরকম সমস্যা হতে পারে সেটা আগে জানা ছিল না শৌভিকের। 'শৌভিক' এই নামটা যখন ইংরেজিতে লেখা হয় তখনই বাংলায় হয়ে যায় 'সৌভিক'। কারণ 'sh' না লিখে সে 's' দিয়ে তার নাম লেখে। 's' দিয়ে লিখলে বাংলায় দাঁড়ায় 'সৌভিক'। 'শৌভিক' কথার মানে 'ঐন্দ্রজালিক', আর সৌভিক কথার অর্থ 'বাজিকর'। একটি অক্ষর তার চরিত্র বদলে দেবে এই বিস্ময়ে ক্লান্ত সে। সে বুঝে উঠতে পারে না, বাজিকর হিসেবে মানানসই নাকি অভিনেতা হিসেবে। সে জানে না জীবন কোন পথে নিয়ে যাবে, তবে এইটুকু বুঝেছে স্ব-অস্তিত্বের মানদণ্ড তার ভেঙে গেছে। সে অন্যের কাছে পরিচিত তার পোষাকে, তার মানিয়ে নেওয়ার অভ্যাসে।

বস্তুত এই কারণেই নামের দুটি অর্থের মধ্যে যে কোনো একটাকেই সে গ্রহণ করতে হবে। এই গ্রহণ করার মধ্যেই তার অস্তিত্ব-অন্বেষণে একধাপ এগিয়ে যাওয়া। সঠিক নির্বাচনের উপরেই তার অস্তিত্বের যথার্থতা নির্ভর করছে তাই সে মামার দেওয়া এই নামের মানে জানতে আগ্রহী। কিন্তু সে কিছুতেই মামাকে পায় না। মামার কাছে দীর্ঘদিন থাকার ফলে সেখানে আবিষ্কার করে একটা আসত ঘর। যেখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের পোশাক রয়েছে। আর এই বিভিন্ন রকমের পোশাক পরে নিজেকে সেই পোশাকের চরিত্রে দেখতে থাকে, আর তার মনে হয়—

> "শিকারের পোশাকে শিকারি
> পুরোহিতের পোশাক পরে পুরোহিত
> প্লেয়ারের পোশাক পরে প্লেয়ার
> অফিসের পোশাক পরে অফিসার...
> পোশাক তাহলে মানুষকে বদলে দিতে পারে? একবার বদলে গেছি, সব সময়ে বদলে যাবো? আগেই এ কথা মেনে নেবো না
> দেখব আবার, তারপর সিদ্ধান্তও নেওয়া যেতে পারে।"[৪]

সে এই সহজে বদলে যাওয়াটাকেই মেনে নিচ্ছে না। পরবর্তীতে কি হতে চলেছে বা সে কি হবে সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতার থেকে সে যখন দেখে এই পোশাকের ভূমিকা বেশি, তখন তার সচেতন সত্তা তার অস্তিত্ব নিয়ে শৌভিককে প্রশ্ন করে। ব্যক্তিত্বের

স্বাধীন নির্বাচনের প্রশ্নে সে সজাগ হয়ে ওঠে। তাই সে বলে—"নিজের ব্যক্তিত্বের কোনো ভূমিকা থাকে না, কেন এমন হচ্ছে।"[৫] তার এই আত্মজিজ্ঞাসার কারণ তার স্বাধীন চেতনা। তার চেতনা স্বাধীন বলেই সে বলতে পারছে এই কথা। অযথার্থ অস্তিত্ব (Inauthentic Eixtence) থেকে যথার্থ অস্তিত্বের (Authentic Existence) দিকে যাত্রা করছে সে। কিয়ের্কেগার্দও এই কথাটিকে মানতেন যে, জীবন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের চেষ্টায় সর্বদা লিপ্ত থাকা। যেটা আমরা এখানে শৌভিকের মধ্যে দেখতে পাই।

আবার 'লালফিতের গেরো' উপন্যাসে পরেশ একটি সরকারি অফিসে জমি সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট তুলতে যায়। সেখানে গিয়ে তার দেওয়া আবেদন পত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ অফিসের অফিসারই তাকে জানায় ১৬ জুলাই এর মধ্যে এলে কাজ হয়ে যাবে। কথা মতো পরেশ ১৬ জুলাই এ অফিসে হাজির হয়। কিন্তু তার আবেদনপত্র এবং সার্টিফিকেট কোনোটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ অব্দি কাহিনি এই খোঁজার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। একটা জায়গায় এসে অফিসের কর্মচারীরা তার সার্টিফিকেট খুঁজে পায়। কিন্তু সেখানে পরেশকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু পরেশ এটার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে। সে বলে—

> "আমি তো বেঁচে আছি এখনও, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি কথা বলছি"[৬]

তার এই কথাকে অগ্রাহ্য করে অফিসের সকলেই বলে ওঠে, বড়ো সায়েব যখন সই করে দিয়েছেন তখন—

> "আপনি মৃত, অফিসিয়ালি মৃত"[৭]

নির্বাচনের স্বাধীনতা সম্ভাবনারই নামান্তর। সম্ভাবনা সততই অস্থির কেননা পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তী নির্বাচনে মধ্যবর্তী অনিশ্চিত এক বিষাদপূর্ণ উদ্‌বেগের জন্ম দেয়। তাই একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সত্তাই উদ্‌বেগে মথিত। পরেশ উদ্‌বিগ্ন। সে জানে বেঁচে থাকার কেবল খাতা কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বাধীন অস্তিত্ব প্রশ্ন করে, বলে, আমি জীবিত, আমি তোমাদেরই লোক। আর তাই—

> "ফাইলের স্তুপের ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে পরেশ বলে ওঠে, এই তো আমি বেঁচে আছি, আমাকে মারতে পারেনি আপনারা কেউ, এমনকি বড়ো সায়েবের সইও নয়।"[৮]

অন্যদিকে 'স্বেচ্ছামৃত্যু' উপন্যাসে বাদলকে দেখি একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে। নানান চেষ্টা করেও সে একটা চাকরি যখন খুঁজে পায় না। তখন তার মনে হয় এই জীবনটাকে শেষ করে দেওয়ায় উচিত। কারণ, আত্মহত্যাই হল হতাশা থেকে মুক্তির পথ। তার ভাষায়,

> "এ জীবন রেখে লাভ কী? কারও কোনো কাজে লাগলই না, এমনকি নিজেরও নয়, কেবল রাশি রাশি ব্যর্থতা, হতাশা।"[৯]

এই সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যেই তার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা খবর পায় সে, বাবার চাকরি থাকাকালীন বাবা মারা গেলে তার বাড়ির প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান সেই চাকরিটি পায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে সেই ছেলেকে হতে হবে যোগ্য। আর বাদল কোনো পথ না পেয়ে তার বাবার কাছে গিয়ে ছেলেকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখে। বাদলের বাবা এই বিষয়ে কিছু বুঝতে না পারলে বাদল তাকে জানায় আত্মহত্যার কথা। একমাত্র বাবা-ই পারবে বাদলকে এই পরিস্থিতি

থেকে উদ্ধার করতে। বাদলের কাছে এই একমাত্র পথই খোলা আছে, 'বাবাকে সরে যেতেই হবে'। আর সরে গেলেই বাবার চাকরি পেয়ে যাবে সে। চাকরি এলেই,

> "বদলে যাবে তার জীবন, পরিবারের অনেক কিছু, যে সব বন্ধু, পরিচিত জন তাকে খরচের খাতায় লিখে রাখে, তাদের চোখেও সে হয়ে উঠবে সম্ভ্রান্ত, মান্যযোগ্য এক মানুষ।"[১০]

সমাজের একজন হয়ে ওঠার এই নিরন্তর প্রয়াসই তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সে গোষ্ঠীবদ্ধ রূপে বাঁচতে চায়। নির্বাচিত হতে চায় অন্যের দ্বারাও। অবশ্য, তার মধ্যে বাবার জন্যও সহানুভূতি কাজ করে চলে। পরিবারের কথা চিন্তা করে সে। তাই সে ভাবতে পারে না বাবাকে ছাড়া পরিবারের অবস্থা। আর এই সিদ্ধান্তের জন্য তার মধ্যে একটা অনুশোচনা ও অসহায়তা কাজ করে চলে। বাদলের দেওয়া সময় থেকে আর একটু সময় চেয়ে নেয় তার বাবা। তাই উপন্যাসের শেষে—

> "বাবার কথা যেন আর্তি হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাদলের বুকের ওপর ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে সারা শরীর চুরমার করে দিতে থাকে, বাদল ঘেমে নেয়ে এক'শা হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে আর্তির শেষ সীমা অবধি ততখন..."[১১]

বাদলের এই আর্তি শূন্যতাকে অতিক্রম করার। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ব্যাকুল চেষ্টাই যেন এখানে ধরা পড়েছে।

'আকাশ কুসুম' উপন্যাসে প্রজেশ আগের মতো একটাও কবিতা লিখতে পারে না। তার মধ্যে যে কবি সত্তা ছিল সেটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই লিখতে না পারার মধ্যে থেকে একটা সংশয়, একটা অনিশ্চয়তা একটা উদ্‌বেগ দেখা দিচ্ছে তার মধ্যে। বন্ধুমহলে নিজের নাম, যশ, খ্যাতি হারিয়ে ফেলার ভয় তাকে আসতে আসতে গ্রাস করতে থাকে। আর এই পতনের থেকে নিজেকে উত্থানের পথে চালিত করতে চায়। তাই সে বলে—

> "আমাকে ঐ মান বজায় রাখতে হবে, নইলে...ভয় ভয় কেবল ভয়
> তাহলে হারিয়ে ফেলবো নিজের জায়গা, নিজের মান সম্ভ্রম..."[১২]

এই ভয় বাইরের কোনো বস্তুকে থেকে নয়। এটা প্রজেশের অন্তর্স্থিত ভয়। সমাজচ্যুত হবার ভয়। তাই প্রজেশ এখানে সমাজে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে চায়, নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া। প্রজেশের 'আমিত্ব' যে সৃষ্টি করতে পারে সেই 'আমি' থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সে ধীরে ধীরে। যাকে কিয়েের্কেগার্দ বলেছেন "God-side of man"[১৩] যে সৃষ্টি করতে পারে ও কল্পনা করতে পারে। এই 'আমিত্ব' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বলেই সে পালিয়ে যাচ্ছে নদীর ধারে নির্জনতায়। আর সেখানে খুঁজে পাচ্ছে ওপর দুই চরিত্র বাবলু আর মান্টিকে যেখানে তারা এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটায় যেটার কোনো অর্থ হয় না। বাদল জানতে চাই—

> " তোমরা কী করছো এতো রাতে?
> —আমরা সিঁড়ি বানাচ্ছি।
> —সিঁড়ি?
> —হ্যাঁ, রাবণ যেটা তৈরি করে যেতে পারেন নি, আজ করবো কাল করবো করতে করতে যুদ্ধ বেধে গেল ব্যাস, সেই সিঁড়ি..."[১৪]

এই সিঁড়ি কোথায় পৌঁছাবে কেউ জানে না, তবু অবিরাম সিঁড়ি ভাঙা। পরিচিত জগৎ হঠাৎই সেই মানুষকে মায়া ও আলো থেকে বঞ্চিত করলে নিঃসঙ্গ হয়। নির্বাসিত হয় 'আমি'র অঞ্চল

থেকে। জীবনকে মনে হয় তখন absurd। হয়তো এজন্যই যুক্তিবাদী বাদল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় কোনো রকম বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই। যেহেতু বাদল কবিতা লিখতে পারছে না, সমাজে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পারছে না। তাই এই ধরনের অর্থহীন ঘটনাকে সামনে রেখে যুক্তি খোঁজার পথে হেঁটেছে। ব্যক্তিমানুষের সন্ধানে এইভাবেই হাঁটতে হাঁটতে একদিন 'আমি'র অঞ্চলে পৌঁছে যাবে এই আশাতে তার নিঃশ্বাস নেওয়া।

তথ্যসূত্র: (References)

১। Bhadra, Mrinal kanti, 1990, *A critical phenomenology and existentialism,* New delhi, Indian council of philosophical research, p. 129

২। চাকলাদার, মনোজ (অনুবাদক), ২০০৬, কামু, আলব্যের, *দ্য মিথ অব সিসিফাস,* কলকাতা, এবং মুশায়েরা, পৃ. ১৬

৩। Blackham, Harold John, November 2012, *six existential thinkers,* London, routledge & kegan paul Ltd, p. 124

৪। লাহিড়ী, কার্তিক, জানুয়ারী ২০১৮, *শৌভিক এবং সৌভিক,* কলকাতা, প্রতিভাস, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২৪৪

৫। তদেব

৬। লাহিড়ী, কার্তিক, জানুয়ারী ২০১৩, *দশটি উপন্যাস,* কলকাতা, প্রতিভাস, পৃ. ৫৭২

৭। তদেব

৮। তদেব, পৃ. ৫৮০

৯। তদেব, পৃ. ৫৮৩

১০। তদেব, পৃ. ২৩২

১১। তদেব, পৃ. ২৫৫

১২। লাহিড়ী, কার্তিক, ২০০৫, *আকাশ কুসুম,* কলকাতা, অণিমা প্রকাশনী, পৃ. ৮

১৩। krimmse, Bruce H. (editor), *Kierkegaard's journals and notebooks,* princetone university, Princeton & oxford press, p. 21

১৪। লাহিড়ী, কার্তিক, ২০০৫, *আকাশ কুসুম,* কলকাতা, অণিমা প্রকাশনী, পৃ. ২৫-২৬।

ঋগ্বেদে সরস্বতী : নদীরূপা তথা দেবীরূপা

অর্জুন কুমার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ
জে.কে.কলেজ, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় সভ্যতা তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক জনপ্রিয় নাম সরস্বতী। তিনি আমাদের অন্তঃস্থ শক্তির প্রতীক। আবার তিনিই হারিয়ে যাওয়া নদী। আমাদের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিতে এভাবেই মিলেমিশে আছেন সরস্বতী। ঋগ্বেদে তাঁর প্রথম বহিঃপ্রকাশ। ঋগ্বেদের সর্বমোট পাঁচটি সূক্তে প্রায় ৮০টি ঋকে তিনি স্তুত হয়েছেন। 'সরস্' (সৃ+অসুন্) শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়ে ও তারপর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন 'সরস্বতী' শব্দ। নিরুক্ততে 'সরস্' শব্দের অর্থ বাক্ ও উদক। তাই সরস্বতী বাক্ ও জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ঋগ্বেদে তিনি একাধারে 'নদীতমে' বা নদীরূপা আবার অন্যদিকে 'দেবিতমে' বা দেবীরূপা। নদীরূপটি অধুনা অদৃশ্য। কিন্তু দেবীরূপে আজও তিনি ভুবন বিদিত। তবে ঋগ্বেদের যুগ থেকেই তিনি দেবীর আসনে বিরাজিত। নদী ও দেবীরূপের একাত্মতা ঘটেছে এখান থেকেই। অধিভূত দৃষ্টিতে যা জলের ধারা, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাই প্রাণের ধারা এবং অধিদৈব দৃষ্টিতে বিশ্বজনীন চিৎ শক্তির প্রবাহ। ঋক্-সংহিতায় এই তিনটি ভাবই মিলেমিশে একাকার হয়েছে। নদী তথা দেবী উভয় রূপেরই মনোজ্ঞ চিত্র ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ ঋগ্বেদে। তারই সামান্য প্রতিফলন রয়েছে প্রস্তুয়মান এই গবেষণা পত্রটিতে.
সূচক শব্দ: বেদ, সংস্কৃতি, সরস্বতী, ঋগ্বেদ, ঋষি, দেবতা, মন্ত্রভাক্, সূক্তভাক্, অম্বিতমে, দেবিতমে, সপ্তথী, অসূর্যা, ত্রিষধস্থা, পাবকা, ধিয়াবসু।

মূল আলোচনা:

"চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ সর্বং বেদাৎপ্রসিদ্ধ্যতি।"[১]

ভারতবর্ষের সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতিরূপ যাবতীয় স্বর্ণিম ঐতিহ্য তার সমস্তই বেদরূপী পরম জ্ঞানের মধ্যে সমাহিত। তাই যে কোন পার্থিব তথা পারমার্থিক বিষয়ের আদি উৎস অথবা বর্ণনা খুঁজতে হলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বেদের উপর সর্বপ্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করতেই হয়। অন্যথা সেই বিষয়ের বর্ণনা যেন অপূর্ণতাই থেকে যায়। আমাদের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিতে এক জনপ্রিয় নাম সরস্বতী। তিনি বাগ্দেবী। জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রতিমা। আবার তিনিই অধুনা অবলুপ্ত নদী। এভাবেই সরস্বতীকে চেনে ভারতীয় জীবনধারা। ঋগ্বেদেই তাঁর প্রথম বহিঃপ্রকাশ। এই বেদ থেকেই তাঁর নদী ও দেবী উভয় রূপরই সামান্য প্রতিফলন ঘটেছে। উত্তরবর্তী রচনাবলীতে এই রূপ দুইটি আরও পল্লবিত হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রত্যেকটি সূক্ত বা মন্ত্রই কোন না কোন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। প্রত্যেক সূক্তের সঙ্গেই সম্পৃক্ত থাকে ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও বিনিয়োগ। দেবতাজ্ঞান ব্যতীত মন্ত্রার্থের সম্যক্ জ্ঞানও অসম্ভব। তাই আচার্য শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

"বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নতঃ।
দৈবতজ্ঞো হি মন্ত্রাণাং তদর্থমবগচ্ছতি॥" (বৃহদ্দেবতা,১/২)

অর্থাৎ বেদের প্রতিমন্ত্রে দেবতাজ্ঞান অত্যাবশ্যক। বৈদিক ক্রান্তদ্রষ্টা ঋষির মননে বিবিধ সূক্তে বহুবিধ দেবতা স্তুত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত স্ত্রী-দেবতা হলেন সরস্বতী। পৃথিবী, ঊষা, রাত্রির ন্যায় তিনিও একজন মুখ্য স্ত্রী-দেবতা।ঋগ্বেদের সর্বমোট পাঁচটি সূক্তে প্রায় ৮০টি ঋকে সরস্বতীর দেবীরূপের প্রতিফলন রয়েছে। এগুলির মধ্যে ৬/৬১, ৭/৯৫ ও ৭/৯৬ এই তিনটিতে সম্পূর্ণ সূক্ত জুড়েই রয়েছে সরস্বতীর স্তুতি। আবার অবশিষ্ট সূক্তদুটির কিছু কিছু মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়েছে তাঁর স্তুতি। তাই তিনি একাধারে সূক্তভাক্ ও মন্ত্রভাক্ দেবতা। এছাড়াও আরো বহু স্থানে বহু মন্ত্রে তাঁর নদীরূপটিরও পরিচয় ফুটে উঠেছে। ঋগ্বেদে তিনি একাধারে 'নদীতমে' বা নদীরূপা আবার অন্যদিকে 'দেবিতমে' বা দেবীরূপা। এখান থেকেই সরস্বতীর নদীরূপ ও দেবীরূপের উন্মোচন হয়। নদীরূপটি অধুনা অদৃশ্য। কিন্তু দেবীরূপে আজও তিনি ভুবন বিদিত। তবে ঋগ্বেদের যুগ থেকেই তিনি দেবীর আসনে বিরাজিত। নদী ও দেবীরূপের একাত্মতা ঘটেছে এখান থেকেই। তারই সামান্য বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এই গবেষণা পত্রটিতে।

সরস্বতী নামের ব্যুৎপত্তি তথা অর্থ বিশ্লেষণ

ভারতীয় সংস্কৃতি তথা হিন্দু জীবনধারায় এক জনপ্রিয় নাম সরস্বতী। 'সরঃ অস্ত্যস্যাঃ'- এই বিগ্রহে 'সরস্' (সৃ+অসুন্) শব্দের উত্তর 'মতুপ্' প্রত্যয়ে ও তারপর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্'-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন 'সরস্বতী' শব্দ। এই 'সরস্' শব্দের জ্যোতিঃ, জল, অমৃত, বাক্ প্রভৃতি বহু অর্থ বহুত্র লক্ষিত হয়ে থাকে। নিরুক্ততে 'সরস্' শব্দের অর্থ করা হয়েছে'বাক্' ও 'উদক'।তাই সেখানে সরস্বতী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"নদীবদ্ দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।"[২]

অর্থাৎ বাক্ ও জলের অধিষ্ঠাত্রী হলেন সরস্বতী। শতপথব্রাহ্মণেও একস্থলে 'বাক্-রূপা' সরস্বতীর দর্শন মেলে- "বাক্ সরস্বতী।" (শতপথ.৭/৫/১/৩১)। এই বাক্ মূলত মাধ্যমিকা। তাই সরস্বতীকে মধ্যমস্থানগত দেবতা বলা যায়। মেঘগর্জনই মাধ্যমিকা বাক্। তা মেঘরূপ উদকে নিহিত থাকে। আবার তিনি সরস্ বা জলকে নদীরূপে প্রবাহিত করান। নিরুক্তের ভাষায়-

"সরস্বতী সর ইত্যুদকনাম সর্তেস্তদ্বতী।"[৩]

অর্থাৎ প্রবহমানা বলেই তিনি নদীরূপা। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে সরস্বতী বাক্ ও নদী উভয়রূপেই স্তুত হয়েছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে তৃতীয়সূক্তের "মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।" (ঋক্.১/৩/১২) ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্যও বলেছেন-

"দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহদেবতা নদীরূপা চ।"

অতএব সরস্বতী নদী ও দেবী উভয়রূপেই প্রথিত। এই দ্বিবিধরূপেরই সুচারু বর্ণন মেলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদে।

ঋগ্বেদে নদীরূপা সরস্বতী : আলোচনার পৃষ্ঠভূমি

ঋগ্বেদে সরস্বতীর দ্বিবিধরূপের মধ্যে নদীরূপটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক মূল্যের নিরিখে এই নদীরূপটি গবেষকদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অধুনা গঙ্গানদীর মতোই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রপরম্পরায় সরস্বতীর পবিত্রতম স্থান দৃষ্ট হয়ে থাকে। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে 'নদীতমে' (ঋক্.২/৪১/১৬) বা শ্রেষ্ঠ নদীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অথচ কালের দুর্নিবার গতিতে অধুনা সেই নদী অবলুপ্ত। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও চলছে তার খোঁজ। তাই এই নদী সম্পর্কে বিশেষ অবধারণার জন্য ঋগ্বেদের উপর সর্বপ্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হয়। কারণ এখানেই তাঁর প্রথম বহিঃপ্রকাশ। সম্পূর্ণ ঋগ্বেদে মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ বার সরস্বতী নদীর উল্লেখ

দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের "মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।" (ঋক্.১/৩/১২) ইত্যাদি ঋকে সরস্বতীর নদীরূপত্ব প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। তাই এই ঋকের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য বলেন-

"অনয়া তু নদীরূপা প্রতিপাদ্যতে।"

'নদীসূক্তে' ২১টি সিন্ধুর বর্ণনায় গঙ্গা যমুনার সঙ্গে সরস্বতীর একত্র উল্লেখ প্রাপ্ত হয়-

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতুদ্রি।"[৪]

এরূপ বিবিধ উল্লেখ থেকেই সরস্বতী নদী সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবধারণা পেয়ে থাকি।

সরস্বতী নদীর উদ্গম ও প্রসার : ঋগ্বেদ তথা অন্যান্য শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে

সরস্বতীর নদীরূপটি অধুনা অদৃশ্য। তাই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে উক্ত এই নদীর প্রকৃত উৎস আজও অমীমাংসিত। ঋগ্বেদের একটি ঋকে আমরা দেখতে পেয়ে থাকি-

"একাচেতৎসরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।"[৫]

অর্থাৎ 'সরস্বতী কোন একটি পর্বতমালা থেকে সমুদ্রে নেমে এসেছে'। পণ্ডিতদের অনুমান এই পর্বত আসলে হিমালয় পর্বতশৃঙ্খলা, যার 'প্লক্ষ প্রস্রবন' (যমুনোত্রীর পাশে) থেকে সরস্বতী নদীর উদ্গম। তাণ্ড্যব্রাহ্মণে এরূপ সংকেত রয়েছে[৬]। আবার নদীসূক্তে বলা হয়েছে, এই নদী যমুনার পূর্বে ও সতলুজ বা শতদ্রুনদীর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে[৭]। মনুস্মৃতিতে দৃষদ্বতী ও সরস্বতী উভয় নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশকে ব্রহ্মাবর্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে-

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে॥" (মনু.২/১৭)

মহাভারত মহাকাব্যে সরস্বতী নদী সম্পর্কে বহু রোচক তথ্য পাওয়া যায়। এখান থেকে জ্ঞাত হয় সরস্বতী নদী মরুস্থলে 'বিনাশন' নামক স্থানে লুপ্ত হয়েছিল। এছাড়াও পুরাণাদি বিবিধ সাহিত্যে এই নদীর প্রশস্ত্য উল্লেখ দৃষ্ট হয়ে থাকে। এই সমস্ত উল্লেখ ও বিভিন্ন আধুনিক যান্ত্রিকতার সাহায্য নিয়ে একদল গবেষক মনে করেছেন, সরস্বতী নদী প্রাচীনকালে পাঞ্জাবের সিরমূ নামক পার্বত্য প্রদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে অম্বালা, কুরুক্ষেত্র, কৈথল প্রদেশে প্রবাহিত হয়ে হরিয়ানার সিরসা জেলার দৃশদ্বতী বা কাংগার নদীতে মিলিত হয়েছিল[৮]। যদিও এই মতের প্রামাণিকতা একেবারই নির্বিবাদসিদ্ধ নয়। উপমহাদেশের সর্বত্রই এই নদীর খোঁজ এখনও অব্যাহত।

ঋগ্বেদে চিত্রিত নদী সরস্বতীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য

১. অম্বিতমে

"অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।" (ঋক্.২/৪১/১৬) ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে নদী সরস্বতীকে 'অম্বিতমে' বা 'শ্রেষ্ঠ মাতা' বলা হয়েছে। তিনি স্নেহশীল আদর্শ মাতা। মাতার প্রধান ভূমিকা সন্তান প্রতিপালন। নদী সরস্বতীও তাঁর অমৃতরূপ জলরাশি দ্বারা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণ করেন। ঋগ্বেদের নিম্নোক্ত মন্ত্রে তারই প্রতিচ্ছবি রয়েছে-

"যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি।"[৯]

২. সপ্তথী

"আ যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তথী সিন্ধুমাতা।" (ঋক্.৭/৩৬/৬)- ঋক্-সংহিতার এই মন্ত্রে সরস্বতীকে 'সপ্তথী' বলা হয়েছে। এই 'সপ্তথী' পদের অর্থ 'সাতটির মধ্যে একটি'। সায়ণ, গেল্ডনার, গ্রিফিথ, উইলসন সবাই এই অর্থে একমত। ঋগ্বেদের বহুত্র আমরা সপ্ত নদীর উল্লেখ পেয়েছি। সেখানে সিন্ধুকে তাদের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তম স্থানীয়া বলা হয়েছে। এখানে 'সপ্তথী' বিশেষণ তারই দ্যোতক।

৩. পারাবতঘ্নী

"ইয়ং সুষ্মেভির্বিসখা" (ঋক্.৬/৬১/২) ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীকে 'পারাবতঘ্নী' বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'পারাবত' শব্দটি 'পারা' ও 'অবরা'শব্দদ্বয়ের সম্মিলনে গঠিত। যার অর্থ- দূরে ও কাছে। অতএব 'পারাবতঘ্নী' পদটির অর্থ-'নদী সরস্বতী তীর ধ্বংসকারী'। আবার গ্রিফিত এর অর্থ করেছেন, 'পাহাড়ে খাঁজ থেকে উন্মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে'। অর্থাৎ সরস্বতী পাহাড় থেকে অবতরণের সময় পাহাড়ের খাঁজ ধ্বংস করেন।

৪. অসুর্যা

"বৃহদু গায়িষে বচোঽসূর্যা নদীনাম্।" (ঋক্.৭/৯৬/১)ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীকে 'অসূর্যা' বলা হয়েছে। মনিয়র উইলিয়াম 'অসুর্যা' শব্দটির অর্থ করেন, 'স্বর্গীয় বা দৈব', অথবা 'অশুভশক্তিযুক্ত'। সায়ণাচার্য বলেন, 'অসুর্যৈ বলবতী'। আসলে সরস্বতী অতীব প্রাণোচ্ছল নদী বলে এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে।

৫. ঘোরা

ঋগ্বেদে বহুত্র নদী সরস্বতীর 'ঘোরা' বিশেষণটি প্রাপ্ত হয়। সরস্বতী নদীর জলধারা অত্যন্ত বেগবান ও উদ্দাম-উন্মত্ত প্রকৃতির-

"ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎসানু গিরীণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ।"[১০]

তাই নদী সরস্বতীর 'ঘোরা' বিশেষণটি অতি সঙ্গত।

এছাড়াও নদী সরস্বতীর 'নদীতমে', 'বাজিনীবতী', 'বৃত্রঘ্নী', 'সিন্ধুমাতা', 'উদকবতী', 'অন্নবতী' প্রভৃতি আরো বহুবিধ বিশেষণ ঋগ্বেদে বহুত্র প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

সরস্বতী নদীর গুরুত্ব : ঋগ্বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে

প্রাচীন আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে নদী সরস্বতীর ভূমিকা অনন্য। সরস্বতী নদীর জলরাশী ছিল অতীব পবিত্র, স্বচ্ছ ও নির্মল। এই নদীর পুণ্যতোয়া জলে অবগাহনাদির দ্বারা শরীর এবং মন শীতল ও শুদ্ধ হয়। এই নদী ধনাঢ্যজন পদবেষ্টিতা, কৃষির সহায়ক ও নদী পথে বাণিজ্যের আনুকূল্য দানপূর্বক ধনদাত্রী। তাই ঋগ্বেদে উক্ত হয়েছে-

"যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি।
যো রত্নধা বসুদিব্যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ॥"[১১]

পাহাড় থেকে সমতলে আসার সময় নদী সরস্বতী শস্যক্ষেত্রকে উর্বর করে তোলে। সমস্ত ভূমি হয়ে ওঠে শস্যশ্যামলা। এই নদীর পবিত্র জল শস্য উৎপাদনে সাহায্য করে বলে নদীকে 'বাজিনীবতী' বলা হয়ে থাকে। তারই প্রতিফলন রয়েছে ঋগ্বেদে-

"ত্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ুংষি দেব্যাম্।" (ঋক্.২/৪১/১৭)

এরূপ কৃষি-অন্ন-বাণিজ্যাদি ছাড়াও আর্য সংস্কৃতির ধার্মিক পরিমণ্ডলেও নদী সরস্বতীর ভূমিকা ছিল অসামান্য। এর জলপ্রবাহ নির্মল, স্বচ্ছ ও পবিত্র। বিবিধ যজ্ঞীয় কার্যে এই নদীর পবিত্র জল ব্যবহৃত হত। এর তটেই অনুষ্ঠিত হত বৈদিক যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ড। এই নদীর জলে পিতৃতর্পণ করা ছিল অতি পুণ্যের কর্ম। আবার এর তটে সর্বদা গীত হত পবিত্র বেদমন্ত্র। যার অনুরণন প্রতি আর্যবাসীকে আন্দোলিত করত।

ঋগ্বেদে দেবীরূপা সরস্বতী

ঋগ্বেদে সরস্বতী যেমন একাধারে পবিত্রতমা নদী তেমনি তারই পাশাপাশি মানুষের উপাস্য দেবী। বস্তুত দেবীরূপেই তিনি ভুবন বিদিত। দেবী হিসাবেই ঋগ্বেদে তাঁর প্রথম বহিঃপ্রকাশ-

"পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।" (ঋক্.১/৩/১০)

ঋগ্বেদে সরস্বতী কখনও সমস্ত সূক্ত জুড়ে (৬/৬১, ৭/৯৫ ও ৭/৯৬) স্তুত হয়েছেন, কখনও আবার একটি বিশেষ ঋকে এবং কখনও বা তৃচে অর্থাৎ তিনটি ঋকে (১/৩/১০-১২) স্তুত হয়েছেন। তাই দেবী সরস্বতীকে সূক্তভাক্ ও মন্ত্রভাক্ দেবতা বলা হয়। বর্তমানে এই দেবীর সঙ্গে আমরা এত বেশী পরিচিত যে, বর্তমানের বাগ্দেবী সরস্বতীর সঙ্গে বৈদিক সরস্বতীর প্রভেদটি আমাদের একেবারই বিস্মৃত হয়ে যায়। তবে বর্তমানের ন্যায় বৈদিক যুগেও দেবীর মহিমা কোন অংশে কম ছিল না। ঋগ্বেদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির আকুতি তথা স্তুতি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

ঋগ্বেদে দেবী সরস্বতীর কতিপয় বিশেষণের পর্যালোচনা

ঋগ্বেদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মননে সরস্বতীর দৈবী স্বরূপের বহুবিধ বিশেষণ প্রকাশিত হয়েছে। তারই কতিপয় পর্যালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে।

১. দেবিতমে

"অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।" (ঋক্.২/৪১/১৬) ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে দেবী সরস্বতীকে 'দেবিতমে' বা 'শ্রেষ্ঠ দেবী' বলা হয়েছে। তিনি স্নেহপরায়ণা মাতৃশ্রেষ্ঠা। অজ্ঞাননাশিনী। তাঁর স্তুতিকারী মানুষ সদা উত্তম জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে। তাই দেবীর কাছে ঋষির করুণ আকুতি-

"অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি।" (ঋক্.২/৪১/১৬)

অর্থাৎ 'আমরা মূর্খ বালকের ন্যায়, অতএব আমাদের তিনি যেন উত্তম জ্ঞান প্রদান করেন'। তিনি আবার প্রভূত সম্পদ্ দাত্রী। অতএব ঋষির মননে সরস্বতী দেবীশ্রেষ্ঠা।

২.সপ্তধাতু ও ত্রিষধস্থা

ঋগ্বেদের একস্থানে সরস্বতীকে 'সপ্তধাতু' ও 'ত্রিষধস্থা' বলা হয়েছে-

"ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী।
বাজে বাজে হব্যা ভূৎ॥" (ঋক্.৬/৬১/১২)

অর্থাৎ 'ত্রিলোকব্যাপিনী, সপ্তাবয়বা, পঞ্চশ্রেণীর(চতুর্বর্ণ ও নিষাদ) সমৃদ্ধিবিধায়াণী দেবী সরস্বতী যেন প্রতিযুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন'। সায়ণাচার্য এই মন্ত্রে 'ত্রিষধস্থা' পদের অর্থ করেছেন- 'ত্রিষু লোকেষু সহাবতিষ্ঠমানা ত্রিলোকব্যাপিনী'। অর্থাৎ দেবী সরস্বতী স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনে বিরাজমানা।

৩. বৃষ্ণঃপত্নী

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের একটি ঋকে সরস্বতীকে বৃষ্ণঃপত্নী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে-

"দমুনসো অপসো যে সুহস্তা বৃষ্ণঃপত্নীর্নদ্যো বিভত্বষ্টাঃ
সরস্বতী বৃহদ্দিবোত রাকা দশস্যন্তীর্বরিবস্যন্তু শুভ্রাঃ॥"[১২]

সায়ণাচার্যের মতে, এখানে সরস্বতী 'বিষ্ণুর পত্নী'। কিন্তু গ্লেডনার ও উইলসন 'বৃষ্ণঃপত্নী' পদের দ্বরা সরস্বতীকে 'বৃষবঃ বা ইন্দ্রের পত্নী' বলে মনে করেছেন। আসলে বৃষ্টির দেবতা হলেন ইন্দ্র। তাঁর প্রদত্ত জলরাশিতেই নদীসমূহ পূর্ণতা পেয়ে থাকে। স্বামীই স্ত্রীকে গর্ভবতী করে থাকেন। অতএব সমস্ত নদীসমূহ হল বৃষ্ণোর (ইন্দ্রের) পত্নী। আবার সরস্বতীও একটি নদী। এই হিসাবে সরস্বতীকেও ইন্দ্রপত্নী বলাটা অমূলক নয়।

৪. পাবকা

ঋক্-সংহিতায় একটি মন্ত্রে সরস্বতীর বিশেষণরূপে 'পাবকা' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে-

"পাবকা নঃ সরস্বতী।" (ঋক্.১/৩/১০)

আচার্য সায়ণ এই 'পাবকা' পদটির অর্থ করেছেন- 'শোধয়িত্রী'। স্কন্দস্বামী বলেন- 'অংহসাং পাপানামপনেত্রী' অথবা 'ক্ষরিত্রী উদকনাম্'। গ্রিফিথ-এর মতে, 'নষ্টধনী'। আবার গ্লেডনারের মতে এর অর্থ- 'উজ্জ্বল'। দেবী সরস্বতী আমাদের জ্ঞানালোকে গমন করান। অজ্ঞান তথা সমস্ত পাপের নিরাকরণ করান। তাঁর পবিত্র জলেও পাপের নাশ হয়ে থাকে। এতএব তাঁর 'পাবকা' বিশেষণটি খুবই সঙ্গত।

৫. হিরণ্যবর্তনী

সরস্বতীর আরেক প্রখ্যাত বিশেষণ 'হিরণ্যবর্তনী'। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে এই বিশেষণ লক্ষিত হয়-

"উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ।" (ঋক্.৬/৬১/৭)

এই 'হিরণ্যবর্তনিঃ' পদের অর্থ- 'হিরণ্যবতী অর্থাৎ সোনায় ভরপুর'। অর্থাৎ সরস্বতী প্রভুত ধনশালী ও ধনসম্পদ্ প্রদানে অত্যন্ত উদার। তিনি স্বর্ণময় পথে পরিভ্রমন করেন। তাই তাঁর 'হিরণ্যবর্তনী' বিশেষণ সঙ্গত।

৬. ধিয়াবসু

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে দেবী সরস্বতীর এই বিশেষণটি প্রাপ্ত হয়। আচার্য সায়ণ এই 'ধিয়াবসু' শব্দের অর্থ করেছেন- 'ধিয়াবসুঃ কর্মপ্রাপ্য ধননিমিত্তাভূতা বাগ্দেবতায়া তথাভিধানম্'। ঐতরেয় আরণ্যকেও বলা হয়েছে, 'বাগ্বৈ ধিয়াবসুঃ' (১/১/৪)। অর্থাৎ সরস্বতী এই বিশেষণে বাগ্দেবীরূপে অভিহিত হয়েছেন।

৭. চোদয়িত্রী সুনৃতানাম্

"চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী।" (ঋক্.১/৩/১১)- এই মন্ত্রে সরস্বতীর 'চোদয়িত্রী সুনৃতানাম্'-এই প্রখ্যাত বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে। 'চোদয়িত্রী' শব্দটি এসেছে চুদ্-ধাতু থেকে। যার অর্থ-'প্রেরণা বা উৎসাহ দেওয়া'। আচার্য সায়ণ, মাধব, গ্রিফিত, উইলসন প্রায় সকলেই এরূপ অর্থ করেছেন। আচার্য সায়ণ 'চোদয়িত্রী সুনৃতানাম্'-এর ব্যাখ্যায় বলেন- 'সুনৃতানাম্ প্রিয়ানাম্ সত্যবাক্যনাম্ চোদয়িত্রী প্রেরয়তি।' অর্থাৎ সরস্বতী সুবাক্য, সত্যবাক্য ও সুসঙ্গীতের উৎসাহদাত্রী। আবার বুদ্ধিরও তিনি উৎসাহদাত্রী।

এছাড়াও ঋগ্বেদে দেবী সরস্বতী 'সুষমা', 'শুভ্রা', 'সুপেশস্', 'চিত্রায়ু', 'ঘৃতাচী', 'মরুৎসখা' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বিশেষণেরও অধিকারী হয়েছেন।

ঋগ্বেদে চিত্রিত দেবী সরস্বতীর মাহাত্ম্য তথা কার্যাবলী

ঋগ্বেদে স্ত্রীদেবতাসমূহের মধ্যে অন্যতমা সরস্বতী। ক্রান্তদ্রষ্টা ঋষির কাছে এই দেবী অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিবিধ মনোবাসনা নিয়ে দেবী সরস্বতীর কাছে ঋষিগণ আবাহন করে থাকেন। আর দেবী মুক্তহস্তে ভক্তের অভিলাষ পূরণ করে থাকেন। ঋগ্বেদের বিবিধ সূক্তে দেবীর এরূপ মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। আর তার থেকেই দেবীর বহুবিধ কার্যাবলীরও অনুসন্ধান মেলে। তারই পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হচ্ছে।

১. জ্ঞানের দেবী

সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রতিমা। অজ্ঞান থেকে জ্ঞানালোকের পথে তিনিই সমস্ত মানুষকে গমন করান। তাই ঋগ্বেদে দেবীর উদ্দেশ্যে ত্রিকালদর্শী ঋষির কাতর আর্তি-

"অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি॥" (ঋক্.২/৪১/১৬)

অর্থাৎ 'হে মাতৃশ্রেষ্ঠা, নদীশ্রেষ্ঠা ও দেবীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী! আমরা মূর্খ বালকের ন্যায়, অতএব আমাদের উত্তম জ্ঞান প্রদান করুন'। অতএব সরস্বতী জ্ঞান বা বিদ্যার দেবী। দেবীর এই রূপটি অধুনা সর্ববিদিত।

২. ধনপ্রদায়িত্রী

সুখ সমৃদ্ধির জন্য ধনসম্পদ্ অত্যাবশ্যক। তাই ঋগ্বেদের বিবিধ সূক্তে ঋষিকবিগণ দেবীর কাছে প্রভূত ধনসম্পদ প্রাপ্তির আর্তি জানিয়েছেন-

"যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি।
যো রত্নধা বসুদিব্যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ॥"[১৩]

তিনি নহুষ ও চিত্র নামক রাজাকে প্রচুর ধন দান করেছিলেন। এরূপ বিবরণ ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হয়ে থাকে-

"ইন্দ্রো বা ঘেদিয়ন্মঘং সরস্বতী বা সুভগা দদির্বসু।
ত্বং বা চিত্র দাশুষে॥
চিত্র ইদ্রাজা রাজকা ইদন্যকে যকে সরস্বতীমনু।
পর্জন্য ইব ততনদ্ধি বৃষ্ট্যা সহস্রময়ুতা দদৎ॥"[১৪]

অতএব সরস্বতীর ধনদাত্রী রূপটিও ঋগ্বেদে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩. সুখ তথা আনন্দদাত্রী

ঋগ্বেদের কিছু মন্ত্রে সুখ ও আনন্দদায়িনী রূপেও দেবী সরস্বতী স্তুতা হয়েছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে আমরা দেখতে পাই-

"ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভূবঃ।
বর্হিঃ সীদনত্বস্রিধঃ॥" (ঋক্.১/১৩/৯)

অর্থাৎ 'অগ্নিরূপা ইলা, সরস্বতী ও মহী- এই দেবীত্রয় সুখ উৎপন্ন করেন। তাঁরা যেন হিংসাশূন্য হয়ে কুশোপরি উপবেশন করেন'। আবার অন্য একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে-

"পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ।
গ্নাভিরচ্ছিদ্রং শরণং সজোষা দুরাধর্ষং গৃণতে শর্ম যং সৎ॥"[১৫]

এরূপ ঋগ্বেদের আরও বহু মন্ত্রে সরস্বতীর সুখ ও আনন্দদাত্রী রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

৪. অন্নপ্রদাত্রী

ঋগ্বেদে দেবী সরস্বতীর এই রূপটিও বেশ পরিচিত। এখানে কিছু মন্ত্রে দেবী সরস্বতীকে অন্নপ্রদানকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারই নিদর্শন মেলে এই শ্লোকে-

"পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।" (ঋক্.১/৩/১০)

আবার আরেকস্থানে উল্লিখিত হয়েছে-

"ত্বে বিশ্বা সরস্বতি! শ্রিতায়ুংষি দেব্যাম্।" (ঋক্.২/৪১/১৭)

অর্থাৎ 'হে সরস্বতী! তুমি দ্যুতিমতি, অন্ন তোমায় আশ্রয় করেছে'। অতএব দেবী সরস্বতী উপাসকদের অন্নপ্রদানও করে থাকেন।

৫. সন্তানপ্রদায়িত্রী

ঋগ্বেদের কিছু মন্ত্রে দেবী সরস্বতীর কাছে ঋষিদের দ্বারা সন্তান লাভের প্রার্থনাও পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং দেবীর আরেক মাহাত্ম্য হল- সন্তান প্রদান করা। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে সেরকম দৃষ্টান্তই প্রতিবিম্বিত হয়-

"গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।

গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাং পুস্করস্রজা॥"[১৬]

অর্থাৎ 'হে সিনীবালি! গর্ভকে ধারণ কর। হে সরস্বতী! তুমিও গর্ভকে ধারণ কর। পদ্মমালাধারী দেব অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ উৎপাদন করুন'। এরূপ বর্ণনা থেকে দেবীর সন্তানদাত্রী রূপটিও স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়ে থাকে।

বৈদিক যজ্ঞীয় পরিমণ্ডলে সরস্বতী

বিভিন্ন বৈদিক যাগ-যজ্ঞের সঙ্গে দেবতার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিহিত থাকে। কারণ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগই হল যাগ। তাই 'কাত্যায়ন-শৌতসূত্র'-এ বলা হয়েছে-

"দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ।" (কাত্যা.শ্রৌ.সূ.১/২/২)

বৈদিক যাগ-যজ্ঞের সংখ্যা বহুবিধ। এদের মধ্যে 'হবিষ্পঙ্ক্তি' অর্থাৎ পঞ্চহব্যযুক্ত যজ্ঞে সরস্বতী বাক্-রূপে স্তুত হন। 'অগ্নিমারুতশস্ত্র'-এ'শোধনকারিণী' (পাবীরবী) সরস্বতীর উদ্দেশ্যে ঋক্ মন্ত্র পাঠ করতে হয়। 'অন্বারম্ভনীয়' ইষ্টিযাগে ঋগ্বেদের "পাবকা নঃ সরস্বতী" (১/৩/১০) ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠ হয়। আবার ঋগ্বেদের ১/৩/১০-১২ এই তিনটি মন্ত্র 'প্রউগ শস্ত্র'-এ দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে পঠিত হয়ে থাকে। এরূপ বিবিধ যাগ-যজ্ঞে দেবী সরস্বতীর বহু মন্ত্রপাঠের বিধান রয়েছে।

উপসংহার:

ঋগ্বৈদিক দেবতানিচয়ের মধ্যে সরস্বতী অন্যতমা। ঋগ্বেদে তিনি মুখ্যত দ্বিবিধা- নদীরূপা তথা দেবীরূপা। উভয়রূপেরই সুচারু প্রতিফলন রয়েছে এখানে। তবে বৈদিক নদী রূপটি আসলে দেবীরূপের স্থূলবিগ্রহ। দেবী সরস্বতীর অমূর্ত ভাবটি নদী সরস্বতীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেই যেন বৈদিক জীবনধারা পরম আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিল। কিন্তু কোন এক সময়ে কোন কারণে হয়ত বহু আর্যগণ সরস্বতী নদীর উপকূল ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তখন তাদের আর নদীরূপের সাক্ষাৎ দর্শনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। যে কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন সাকার প্রতীকের। যার ফলে সাধক ও শিল্পীর শুদ্ধা মননশক্তির সিদ্ধিস্বরূপ নির্মিত হয় দেবীর কল্পিত বিগ্রহ। এই বিগ্রহই উত্তরবর্তীকালে মাটির প্রতিমার রূপ পরিগ্রহ করে গৃহে গৃহে পূজিত হয়। আর এতেই নিহিত আছে সরস্বতীর নদী ও দৈবী রূপ। অতএব বর্তমানের সরস্বতীর বিগ্রহরূপের অর্চনা দ্বারা সরস্বতীর উভয়রূপেরই আবাহন করা হয়ে থাকে- এরূপ অবধারণা অমূলক নয়।

তথ্যসূত্র:

১। মনুসংহিতা, ১২/৯৭
২। নিরুক্ত, ২/১/২৩/৩
৩। নিরুক্ত, ৯/২৬/4
৪। ঋগ্বেদ, ১০/৭৫/৫
৫। ঋক্. ৭/৯৫/২
৬। তাণ্ড্য. ২৫/১০/২১
৭। https://hi.m.wikipedia.org
৮। https://hi.m.wikipedia.org
৯। ঋক্. ১/১৬৪/৪৯
১০। ঋক্. ৬/৬১/২
১১। ঋক্. ১/১৬৪/৪৯

১২। ঋক্.৫/৪২/১২
১৩। ঋক্.১/১৬৪/৪৯
১৪। ঋক্.৮/২১/১৭-১৮
১৫। ঋক্.৬/৪৯/৭
১৬। ঋক্.১০/১৮৪/২

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি:

১. উপাধ্যায়, বলদেব ও ব্রজবিহারী চৌবে। *সংস্কৃত বাঙ্ময় কা বৃহদ্ ইতিহাস।* প্রথম খণ্ড, বেদ। লখনঊ : উত্তরপ্রদেশ সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

২. ত্রিবেদী, রামগোবিন্দ সম্পাদক। *ঋগ্বেদসংহিতা* (সায়ণভাষ্য সহিত)। বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১-৯ খণ্ড, ২০০৭।

৩. দত্ত, রমেশচন্দ্র অনুবাদক। *ঋগ্বেদসংহিতা* (প্রথম খণ্ড)। কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।

৪. জয়ন্তকৃষ্ণ ও হরিকৃষ্ণ সম্পাদক।*মনুস্মৃতিঃ।* মুম্বই : ভারতীয় বিদ্যা ভবন, প্রথমভাগ, ১৯৭২।

৫. ঝাশর্মণ, মুকুন্দ সম্পাদক। *নিরুক্ত।* বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯৮৯।

৬. ঘোষ, ঝুমা। *ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেবী সরস্বতী।* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০।

৭. সাতবলেকর, দামোদর সম্পাদক। *ঋগ্বেদসংহিতা* (সুবোধভাষ্য সহিত)। কিল্লাপারডি, গুজরাত : স্বাধ্যায় মণ্ডল, ২০০০।

৮. Macdonell, Arthur Anthony and Arthur Berriedale Keith :*Vedic Index of Names and Subjects,* Vol. 1-2, Indian Texts Series, The Government of India, 1912।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নৌকা : প্রতীক, প্রেক্ষাপট ও চরিত্র

ইয়াসমিন প্রামানিক
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
পান্ডবেশ্বর কলেজ, পশ্চিম বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: মানব সভ্যতার আদিম সূচনালগ্ন থেকেই নৌযান একটি প্রধান পরিবহন উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নৌকা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতিতেও এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সুপ্রাচীন যুগে মানুষ গমনাগমনের জন্য পশু-চালিত যানবাহন ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করত। তবে মানুষের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির তাগিদ সেই প্রাচীন যোগাযোগ পদ্ধতিকে ক্রমান্বয়ে আধুনিক যান্ত্রিক প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই বিবর্তনের ধারায় মানব সভ্যতা তার বর্তমান উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছেছে। সাহিত্য, যা মানব সভ্যতার নির্যাস, তার রূপান্তরও এই পরিবর্তনের প্রভাবে অনিবার্য ছিল। পশু-চালিত যান থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তির বাহনে রূপান্তর, সাহিত্যেও তার গভীর ছাপ ফেলেছে। এই রূপান্তরের ধারায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাদ যাননি। তাঁর সাহিত্যকর্ম, বিশেষত ছোটগল্পসমূহে নৌকার উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নৌকা শুধু পটভূমির একটি অনুষঙ্গ হয়ে থাকেনি; বরং তা কখনো কখনো গল্পের এক শক্তিশালী চরিত্রে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটগল্পে নৌকাকে কখনো কেবল পরিবহনযান হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং অনেক সময় এই নৌকা গল্পের প্রবাহ ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বাহক হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে নৌকা যেন শুধু বাহ্যিক যাত্রার প্রতীক নয়, বরং জীবনের অন্তরাত্মার যাত্রারও রূপক। যদিও তাঁর গল্পে নানা ধরনের যানবাহনের উল্লেখ রয়েছে, তথাপি নৌকা তাঁর সাহিত্যকর্মে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নৌকা কখনো ঘটনার প্রধান প্রেরণাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে, আবার কখনো গল্পের পরিণতির নির্ধারক হিসেবে ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর গল্পে নৌকার উপস্থিতি কেবল ঘটনার ধারাকেই বহমান করেনি, বরং এটি কখনো কখনো মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবনার গভীরতাও প্রকাশ করেছে। এই প্রবন্ধে মূলত আলোচনা করা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে নৌকা কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে এবং কীভাবে এই নৌকা গল্পের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে ও মানবিক অনুভব প্রকাশে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছোটগল্প, নৌকা, রূপক, বাংলা সাহিত্য।

মূল আলোচনা:

মানব সভ্যতার ইতিহাসে নৌকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এটি শুধু বাহন হিসেবে নয়, বরং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অভিজ্ঞতার বাহক ও প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্যকর্মে বিশেষত ছোটগল্পে নৌকাকে একটি গভীরতর রূপকে পরিণত করেছেন। নৌকা এখানে কেবল গল্পের অনুষঙ্গ নয়, বরং মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সম্পর্কের গভীরতা, এবং জীবনের চলমানতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের নদীময় জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে নৌকার অনন্য প্রতিচ্ছবি এঁকেছে। এই প্রবন্ধে

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নৌকার প্রতিভা, তার ব্যঞ্জনা ও সাহিত্যিক গুরুত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ (২৩ জানুয়ারি ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পতিসর ত্যাগ করে সাজাদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। পথের ধাপে ধাপে, পতিসর থেকে কালিগ্রাম হয়ে সাজাদপুরের দিকে তিনি নৌকাযোগে এগিয়ে যান। এই যাত্রার অভিজ্ঞতা তিনি ইন্দিরা দেবীকে একখানা চিঠিতে বর্ণনা করেন। তিনি লেখেন,

> *“প্রভাতের প্রথম আলো ফোটার পর বোট ছেড়ে দিলাম। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে পৌঁছালাম কাঁচি কাঠায়। কাঁচি কাঠা বলতে বোঝায় একটি সরু, সংকীর্ণ খাল, প্রায় বারো-তেরো হাত চওড়া। এই খাল সর্পিল পথে বিলের সমস্ত জল প্রবল বেগে বহন করে নিয়ে যায়। এই খালের মধ্যে আমাদের বিশাল নৌকা নিয়ে পড়া মানে ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি হওয়া। প্রবল স্রোতের টানে আমাদের বোট যেন বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে। মাঝিরা লগি হাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে নৌকাটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, যেন উন্মত্ত স্রোত নৌকাটিকে ডাঙার গায়ে আছড়ে না ফেলে দেয়। কোনো কোনো সময় প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নৌকা ডাঙার কাছে গিয়ে ঠেকে যাচ্ছে, মড়মড় শব্দ তুলে প্রায় উল্টে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও অবশেষে আমরা খোলা নদীতে এসে পড়লাম।”*[১]

রবীন্দ্রনাথের এই যাত্রাপথের অনবদ্য বিবরণ তাঁর ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। জমিদারি কাজের প্রয়োজনে তিনি শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি অঞ্চলে নৌকাযোগে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভ্রমণের পথে তিনি দূর থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন গ্রামীণ জনপদ ও সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা। নদীর বুকে ভেসে চলা নৌকা থেকে তিনি গভীর মনোযোগে লক্ষ্য করেছেন সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, তাদের পরিশ্রম, দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা। এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের নদীবিধৌত জীবনে নৌকা, ডিঙি, বজরা ইত্যাদি জলযান ছিল নিত্যসঙ্গী। এই পরিবেশ ও বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তিতেও ছাপ ফেলেছে। জমিদার হিসেবে গ্রাম-পরিদর্শনের সময় তিনি এই জীবনধারাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে নৌকা কেবল চলাচলের বাহন হিসাবেই নয়, বরং কোথাও তা কাহিনির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। কখনো কখনো এটি একটি জীবন্ত চরিত্রে রূপ নিয়েছে, যা গল্পের গতিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। উদাহরণস্বরূপ, গল্পের চরিত্রদের জীবনদশায় নৌকার ভূমিকা কখনো নিয়তি নির্দেশক, কখনোবা সংকটমোচক হয়ে উঠেছে। এমনকি কোথাও নৌকা উপমারূপে ব্যবহৃত হয়ে গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ গ্রন্থের প্রায় পনেরোটি গল্পে নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে এটি কখনো প্রতীক, কখনো ঘটনাপ্রবাহের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের এই নদীময় জীবনের পরিক্রমা তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নৌকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এসব অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পগুলিতে একদিকে যেমন গভীরতা এনেছে, অন্যদিকে তা বাঙালি জীবনের বাস্তব রূপটিকেও তুলে ধরেছে। তাঁর সাহিত্যে নৌকা শুধু যাত্রাপথের অনুষঙ্গ নয়, বরং জীবনের কাব্যিক উপাদান, এক অনিবার্য বাস্তবতার সঙ্গী। ‘ঘাটের কথা’ গল্পটি বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম বলা যেতে পারে যে, এটি ১২৯১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনায় নদীতীরবর্তী এক পুরাতন ঘাটের কথা তুলে

ধরা হয়েছে, যেখানে ঘাটের স্মৃতিমগ্ন নিরবতা ভাষা পেয়েছে। সেখানে জোয়ারের উত্তাল জলধারায় দোদুল্যমান নৌকাগুলি যেন জীবনের দুরন্ত যৌবনের প্রতিচ্ছবি। এই তুলনার মধ্য দিয়েই গল্পের মূল সুরটি রূপায়িত হয়েছে। যেমন-

"জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙ্গার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে- দুরন্ত যৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।"[২]

এখানে, নদীর কূলে গঙ্গার কথা এসেছে। শরতের সোনালি আলোকছটায় আলোকিত প্রকৃতির চিত্ররূপায়ণ করা হয়েছে। পালতোলা নৌকার সঙ্গে পাখির সাদৃশ্য টেনে এনে বলা হয়েছে—

"রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোট ছোট নৌকাগুলি তেমনি ছোট ছোট পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখাদুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।"[৩]

পুরোনো বাঁধাঘাট মানুষের জীবনের নানা ঘটনার নিরব সাক্ষী হয়ে উঠেছে। চক্রবর্তীদের বাড়ির খুতখুঁতে বৃদ্ধার স্মৃতিচারণে উঠে আসে শিশুকালের খেলার কথা—

"ঘৃতকুমারীর পাতাকে নৌকা করে গঙ্গার জলে ভাসানো ছিল তার প্রিয় খেলা।"[৪]

এই চিত্রে শিশুমনের সরলতা ও নির্মল কল্পনার রূপ ফুটে ওঠে। সেই বৃদ্ধা যখন অন্য শিশুদের আচরণে শাসন করতেন, তখন নিজের শৈশবের স্মৃতির প্রতি ঘাটটি যেন এক নিঃশব্দ হাসিতে সাড়া দিত। এভাবেই ঘাটটি যেন মানবীয় অনুভবের রূপ পেয়েছে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পেও নৌকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পোস্টমাস্টার যখন রতনকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হন, তখন তার মনোযন্ত্রণার প্রতীক হয়ে উঠে আসে নৌকার যাত্রা।

"ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।"[৫]

নৌকাটি এখানে অমোঘ নিয়তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। যখন পোস্টমাস্টারের হৃদয় ব্যথায় কাতর, তখনই নৌকার পালে বাতাস লাগে, যেন বিধির অঙ্গুলি নির্দেশে সম্পর্কের ছেদ ঘটে।

'দালিয়া' গল্পে ইতিহাসের রূঢ়তা ও ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির মিশ্রণ দেখা যায়। মোগল-রাজপুত্রদের দ্বন্দ্ব, শাসুজার পরাজয় ও তার পরিবারের করুণ পরিণতি নৌকাজাত্রার মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। শাসুজার কন্যাদের নিয়তি, নদীর বুকে মৃত্যুর অভিমুখী যাত্রা যেন জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতার কথা বলে। 'একটা আষাঢ়ে গল্প' রূপকধর্মী আঙ্গিকে নৌকাকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতীক করে তুলেছে। রাজপুত্রের যাত্রাপথ, জীবনের সংগ্রাম ও প্রাপ্তির কাহিনি যেমন সমুদ্রের তরীতে গাঁথা, তেমনই মায়ের অপেক্ষা ও সন্তানের ফিরে আসার মহিমা ধরা পড়েছে সোনার তরীর উজ্জ্বলতাতে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে নৌকা কেবল বাহন নয়, জীবনের অন্তর্নিহিত চলমানতার প্রতীক। তার লেখায় নদীর তরঙ্গের সঙ্গে জীবনের গতিশীলতা, অপেক্ষা, প্রাপ্তি ও বিচ্ছেদের চিত্ররূপ যেন জীবনের গভীরতর সত্যের বার্তা দেয়। চতুর্থীর সূচনা লগ্ন থেকেই গঙ্গাতটে একে একে নোঙর ফেলতে শুরু করল অসংখ্য তরী। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে

প্রতীয়মান হয়, যেন এ নৌযানগুলোই প্রবাসীদের ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষাকে সুনির্দিষ্ট রূপদান করেছে। বৈদ্যনাথ শিল্পসত্তার অধিকারী এক সংবেদনশীল মানুষ। তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান অবিনাশ বাবার কাছে শারদোৎসবের উপহার হিসেবে একটি নৌকোর দাবি জানিয়েছিল। সে তো ইচ্ছা করলেই অন্য কোনো খেলনা গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের শিশু-মন স্বাভাবিকভাবেই নৌকোর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট; কারণ, দূরদেশের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রতীকস্বরূপই নৌকা চিত্রিত হয়েছে বারবার।

বৈদ্যনাথ ধীরস্থিরভাবে বসে কাঠের খণ্ডগুলিকে ছেদন, শুদ্ধিকরণ ও সংযোজন করে নিপুণ দক্ষতায় প্রস্তুত করলেন দুটি কিশোর-মনোরঞ্জক নৌকা। তিনি কেবল কাঠের খণ্ডকে নিছক খেলনায় রূপ দিলেন না, বরং তাঁতে প্রতিষ্ঠা করলেন বাস্তবিক নৌযানের বৈশিষ্ট্য। মাস্তুল গাঁথলেন, সুক্ষ্মভাবে কাটা বস্ত্রখণ্ডে পাল মেলালেন, লাল শালুর পতাকা দুলিয়ে দিলেন বাতাসে, সুদৃশ্যভাবে স্থাপন করলেন হাল ও বৈঠা। এমনকি নৌকার প্রাণস্বরূপ এক কর্ণধার ও যাত্রীসঙ্গীও নিযুক্ত করলেন। এই সুনিপুণ খেলনাগুলি শৈশবের অবিনাশকে মুগ্ধ করলেও বৈদ্যনাথের সহধর্মিণী মোক্ষদার হৃদয়ে কোনো স্পন্দন তুলল না, কারণ তাঁর চেতনাজুড়ে কেবলমাত্র গহনার মোহ। তাই, পিতার প্রগাঢ় স্নেহমিশ্রিত উপহারটিকে তিনি অবহেলার সঙ্গে জানালা দিয়ে নিক্ষেপ করলেন বাইরে। এখানে লক্ষণীয় যে, খেলনা নৌকাদুটি যেন স্বয়ং বৈদ্যনাথের ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি—সরল, উদার ও নির্মল—যেখানে কোনো কৃপণতা নেই, কৃত্রিমতা নেই, শুধু নির্মল শিল্পের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এইসব ছোটগল্পের সৃজনকর্মে নিবিষ্ট ছিলেন, তখন তাঁর অবস্থান ছিল নদীময় বাংলার বুকে। স্বভাবতই, নৌকা সেখানে কেবল বাহন নয়, বরং জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই, তাঁর রচনায় নৌকা-সংক্রান্ত অনুষঙ্গ বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। সে সময় সমাজে নৌকা নির্মাণের উপকরণ ও কাঠামোগত পরিভাষা ছিল প্রচলিত এবং সর্বজনবিদিত। 'ছুটি' গল্পের সূচনায়ই আমরা দেখি, কিশোর ফটিক নদীতীরে পড়ে থাকা শালকাঠটিকে গড়িয়ে ফেলে দিতে চায়, যা আসলে নৌকার মাস্তুল নির্মাণের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই সামান্য ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, নদীকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে নৌকা কত গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

ফটিকের ছোটভাই মাখনের সঙ্গে তুমুল দ্বন্দ্বের পর সে কিছু কাশবন থেকে গুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে আধডোবা এক পরিত্যক্ত নৌকার গলুইয়ে বসে চিন্তাগ্রস্তভাবে কাশের গোঁড়া চিবোতে থাকে। তার কিশোর মনে তখন দুর্ভেদ্য উথাল-পাথাল ভাবনার স্রোত—বাড়ি ফিরে গেলে মায়ের তিরস্কার, অপমানের তীব্র দহন, আত্মসম্মানের সঙ্গে তার এক অব্যক্ত লড়াই। এমনই এক সময় দূরাগত এক নৌযান ঘাটে এসে ভিড়ল—যেন কাহিনির গতিপথকে অনিবার্য মোড় দিতে এল সেই নৌকা। সেই জলযান থেকে নেমে এলেন এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, যিনি ফটিকের কাছে চক্রবর্তীদের বাড়ির সন্ধান চাইলেন, কিন্তু সদুত্তর পেলেন না। কিয়ৎপরেই আমরা জানতে পারি, তিনি ফটিকের মামা, যিনি তাকে নিজের সংসারে নিয়ে যেতে এসেছেন। নতুন গৃহে প্রবেশ করলেও ফটিকের অন্তর আত্মস্থ করতে পারেনি শহুরে কঠিন কাঠামোকে। তার পরিচিত পরিবেশে নদীর স্নিগ্ধতা ছিল, জলভরা গাঙ ছিল, খোলা আকাশের নিবিড়তা ছিল, অথচ এখানে ইষ্টক-সংকীর্ণ নগর-পরিসরে সে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ছোটোবেলা থেকে প্রকৃতির যে বন্ধন তাকে আগলে রেখেছিল, শহুরে জীবনের অনভ্যস্ত রূঢ়তা তার সমস্ত স্বপ্নকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। ফটিকের অন্তিম মুহূর্তে তার শৈশবের সেই নদীময় জীবন, সেই জলযান, সেই অবাধ

প্রকৃতি যেন হৃদয়স্পর্শীভাবে ফিরে আসে। মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো তার কানে বেজে ওঠে স্টিমারের জল মাপার সুর—সেই অনাদিকালের খালাসিদের টানটান স্বরে গাওয়া—

“এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এনা।”[৬]

এখানে কোনো জলযান দৃশ্যমান নয়, কিন্তু শব্দের গভীর প্রতিধ্বনি আমাদের এক অনন্ত যাত্রার দিকে নিয়ে যায়। এই যাত্রা যেন বৈতরণীর বুকে চিরঅপরাহ্নের দিকে, যেখানে নৌকা কেবল বাহন নয়, বরং এক অনন্ত গন্তব্যের ইঙ্গিত।

‘সমাপ্তি’ গল্পে অপূর্বকৃষ্ণ ও মৃণ্ময়ীর প্রথম সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে নৌকা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আধুনিক মননের তরুণ অপূর্ব যখন ছুটির অবকাশে কলকাতা থেকে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর প্রথম অবতরণ ঘটে নৌকা থেকে। কিন্তু সেই অবতরণের মুহূর্তেই তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে নদীর পিচ্ছিল তীরবর্তী কর্দমে পা পিছলে পড়ে যান। এই অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার দৃশ্যে মৃণ্ময়ীর মুখে অপ্রত্যাশিত অট্টহাস্য ফোটে। অপূর্ব এই পরিস্থিতিতে একপ্রকার সংকোচবোধে আক্রান্ত হন। মৃণ্ময়ীর এই সরল অথচ মর্মান্তিক হাসি অপূর্বর অন্তর্মনে এক গভীর প্রতিযোগিতার সুর সৃষ্টি করে, যেন তার পুরুষত্বের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। অপূর্ব মনের গহীনে এই অবমাননা গ্রহণ করতে পারেন না। এই অবমাননার অনুভব থেকেই অপূর্বর মনে মৃণ্ময়ীর প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ জন্ম নেয়। প্রথমদিকে মৃণ্ময়ী তার বিবাহিত জীবন সহজে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু অপূর্বর অগাধ সহিষ্ণুতা ও গভীর মানবিক ঔদার্য মৃণ্ময়ীর মনোজগতকে আকৃষ্ট করে তোলে। এখানে নৌকাগুলি যেন সেই মানসিক সংযোগের মাধ্যম হিসেবে কার্যকর হয়েছে। মৃণ্ময়ী তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তা সহজে গ্রহণযোগ্য হয়নি। বাধ্য হয়ে এক রাতে তিনি পালানোর সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামের সদাশয় মাঝি বনমালি, মৃণ্ময়ীর অন্তরঙ্গ পরিচিত, তাকে আশ্বাস দিয়ে নৌকায় তুলে নেন। যদিও বনমালি তাকে বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাস্তবে তা ছিল কেবল এক সান্ত্বনার আশ্বাস। নৌকার দোলায় মৃণ্ময়ী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হন এবং পরবর্তী সময়ে জাগ্রত হয়ে নিজেকে শ্বশুরবাড়ির বিছানায় আবিষ্কার করেন।

এই বন্দী জীবনের শিকলে বাঁধা পড়বেন কিনা, সেই প্রশ্নের মীমাংসা ঘটে অপূর্বর উদারতাসম্পন্ন আচরণে। তিনি মৃণ্ময়ীকে মুক্তির স্বাদ দেন। যখন চারপাশের সবাই মৃণ্ময়ীর অন্তর্জগত অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তখনই মৃণ্ময়ী অনুভব করেন অপূর্বর অন্তর উপস্থিতি—নৌকাযাত্রার মাধ্যমেই। এই পর্যায়ে নৌকা যেন কাহিনির গতিবিধি নির্ধারণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। অপূর্ব, এই সুযোগে মৃণ্ময়ীর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁরা দুজনে গোপনে মৃণ্ময়ীর পিতার গৃহে পৌঁছানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অপূর্বর নিমন্ত্রণ ছিল সাদামাটা অথচ অন্তরঙ্গ:

“তবে এসো, আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।”[৭]

সেই নিঃসঙ্গ রাতের অন্ধকারে, জনশূন্য পথ ধরে, মৃণ্ময়ী প্রথমবারের মতো স্বেচ্ছায় স্বামীর হাতে হাত রেখে জীবনপথে যাত্রা শুরু করেন। নৌকায় চেপে দুজনে পৌঁছে যান মৃণ্ময়ীর পিতৃগৃহে। অপূর্বর সঙ্গে এই নৌকাযাত্রা কেবল তাদের শারীরিক ভ্রমণই ছিল না, বরং ছিল এক মানসিক বন্ধনের জার্নি, যা ভবিষ্যতের গভীর সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করে।

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পেও নৌকাকে কেন্দ্র করে ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, সপ্তম পরিচ্ছেদে গিরিবালার বিবাহ অনুষ্ঠানে অনাহূত শশিভূষণ নৌকাযোগে কলকাতা প্রত্যাবর্তন

করছিলেন। সেই নৌকা থেকে তিনি দেখতে পান মহাজনের নৌকা ও স্টিমারের মধ্যে গতি ও শক্তির প্রতিযোগিতা। হঠাৎই ইংরেজ ম্যানেজার সাহেব দ্রুতগতির দেশি পালতোলা নৌকার অগ্রগতি মেনে নিতে না পেরে বন্দুকের গুলিতে মহাজনী নৌকার পাল ছিন্ন করে দেন। ফলে নৌকাটি উল্টে যায় এবং এক মশলা কুটতে থাকা ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, যদিও বাকিরা প্রাণে রক্ষা পান। শশিভূষণ নিজের নৌকা দিয়ে উদ্ধার কার্য সম্পাদন করেন। এই ঘটনায় ইংরেজদের অহংকার ও স্থানীয়দের প্রতি ঔপনিবেশিক নির্মমতার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়। স্টিমার যেন ইংরেজ শাসকের ক্ষমতার প্রতীক, যা দেশীয় সংস্কৃতি ও উন্নয়নকে দমন করতে তৎপর। এই দুঃসহ অভিজ্ঞতা শশিভূষণের মনোজগতে গভীর ছাপ ফেলে।

গিরিবালার বিদায়ের ঘটনাটিও নৌকাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। গিরিবালাকে তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোর জন্য শশিভূষণ নিজে উপস্থিত হন, যদিও কেউ তাকে আমন্ত্রণ জানাননি।

> *"নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে।"*[৮]

এই বিদায় দৃশ্য কেবল গিরিবালার নয়, বরং শশিভূষণের গ্রাম ছাড়ার মর্মান্তিক সংকেত। এরপর শশিভূষণের গ্রামে আর কোনো সংযোগ অবশিষ্ট থাকে না। অষ্টম পরিচ্ছেদে শশিভূষণ আবার নৌকাযোগে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেই সময় এক প্রশস্ত মোহনায় আহারের প্রস্তুতির মধ্যেই ইংরেজ সুপারিনটেনডেন্টের বোট জেলেদের জালে আটকে যায়। ইংরেজ সাহেব জাল ছিঁড়ে দেন ও নিরপরাধ গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতন চালান। এই নিষ্ঠুরতায় শশিভূষণের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তিনি নিজের ন্যায়বোধের তাড়নায় সাহেবের উপর আক্রমণ করেন, যার ফলস্বরূপ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

গল্পের প্রতিটি বাঁকেই নৌকা যেন নিয়তির অনিবার্য প্রতীক হয়ে ওঠে, যা কাহিনির গতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নৌকার সান্নিধ্যেই শশিভূষণের জীবনযাত্রার সিদ্ধান্ত ও মর্মান্তিক পরিণতির সূত্রপাত ঘটে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আপদ' গল্পে নীলকান্তের আগমন শরৎ ও কিরণময়ীর জীবনে এক আকস্মিক ও নাটকীয় ঘটনার সূত্র ধরে ঘটে। এই আগমনের কেন্দ্রে ছিল একটি নৌকাডুবির মর্মান্তিক ঘটনা। নীলকান্ত সিংহ যাত্রার নিমিত্তে বাবুদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথে নৌকাডুবির কারণে সে তার সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে তার দক্ষ সাঁতার কৌশলের কারণে সে মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণরক্ষা করে। গল্পের সূচনাতেই এই নৌকাডুবির বর্ণনা এসেছে, যা সমগ্র কাহিনির এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

গল্পে নীলকান্ত ও সতীশের মধ্যে যে বিবাদের সুত্রপাত ঘটে, তার এক অনিবার্য পরিণতিতে সতীশ চুরি করে নেয় নীলকান্তের দোয়াতদানটি। দোয়াতদানটির নির্মাণশৈলীতে দুই পাশে দুটি ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াতটি স্থাপিত ছিল। হয়তো এটি একটি সাধারণ খেলনা, কিন্তু তার নৌকার গঠন সহজেই নির্দেশ করে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচেতনায় নৌকার প্রতি এক সুগভীর আকর্ষণ ছিল। তাঁর সৃষ্টিকর্মে শিশুর খেলাধুলা বা কল্পনার জগতে নৌকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। কাগজের নৌকা কিংবা ছোট নৌকা আকৃতির খেলনা ছিল তাঁর প্রিয় অনুষঙ্গ। এই আকর্ষণ কেবল তাঁর ছোটগল্প বা উপন্যাসে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর কবিতাতেও নৌকার আবেগ ও রূপক বিস্তৃতভাবে উপস্থিত ছিল।

'দিদি' গল্পে নীলমণির দিদি শশী তার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষার্থে নিজস্ব দাম্পত্য সম্পর্ক এমনকি জীবনের মায়া ত্যাগ করেন। এখানে নৌকার প্রসঙ্গ একবার উঠে এসেছে। অন্যদিকে, 'অতিথি' গল্পে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নৌকায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তারাপদর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নৌকা এখানে যেন তারাপদর এক প্রতীকী সঙ্গী, যা নিরন্তর গতি ও পরিবর্তনের ধারক। যেমন নৌকা ঘাটে ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রী ও সামগ্রী পৌঁছে দেয়, তেমনি তারাপদর জীবনে কোনো স্থায়ী স্থিতি নেই। জীবনের নিয়মে ঘাটের শ্যাওলার মতো কোনো স্থানে থিতু হলে নৌকার নষ্ট হয়ে যাওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি তারাপদর পক্ষেও স্থায়ী কোনো সম্পর্ক বা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। 'দুরাশা' গল্পে বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যা নূরউন্নীসা, ব্রাহ্মণ কেশরলালের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণকে শ্রদ্ধা করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক আহত কেশরলালকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য নূরউন্নীসা তার মুখে জল দেন। মুসলিম নারী হয়ে ব্রাহ্মণ ধর্মলঙ্ঘনের অপরাধে কেশরলাল খেয়ানৌকায় চেপে অদৃশ্য হয়ে যান।

> *"সেখানে একটি খেয়ানৌকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্রোতে গিয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল।"*[৯]

এই নৌকার স্মৃতি নবাবপুত্রীর মনোজগতে দীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে গেঁথে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও মানবিক দায়িত্বের সংঘাতে বিভক্ত এই মুহূর্তের স্মৃতি কাহিনির গভীরে আবদ্ধ হয়ে আছে।

'অধ্যাপক' গল্পে কথক প্রতিবেশিনীর পরিচয় জানতে কৌশলে একটি ছোট নৌকা ভাড়া করেন। নদীটি পদ্মা নয়, গঙ্গা। কথকের নিজের স্বীকারোক্তি—

> *"পরদিন মধ্যাহ্নে একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাল্লাদিগকে দাঁড় টানিতে নিষেধ করিলাম।"*[১০]

এখানে নৌকা যেমন ঘটনার বাহক, তেমনি মানবিক মনোজগতের এক গভীর প্রতীক। কথকের অন্তর্লোকের দ্বিধা, লজ্জা ও কৌতূহলের জটিলতা নৌকাযাত্রার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে নৌকা শুধু কাহিনির বাহক নয়, বরং প্রবাদের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। 'রাজটীকা' গল্পে নবেন্দু দুই বিপরীতমুখী দলের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে বিপাকে পড়েন। তার অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে বাংলা প্রবাদ 'দু নৌকোয় পা' দিয়ে—

> *"সাহেব এবং শ্যালী এই দুই নৌকায় পা দিয়া হতভাগা বিষম সংকটে পড়িল।"শেষ পর্যন্ত শ্যালীরা তার এক নৌকা ডুবিয়ে দেয়।'মণিহারা' গল্পে নৌকা ও বোটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।"*[১১]

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধা ঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। মণিমালিকা স্বামীর কাছ থেকে অলংকার বাঁচাতে মধুসূদনের সহায়তায় গৃহত্যাগ করে। নৌকার প্রবাহিত ধারা যেন তার জীবনের অনিশ্চিত পথচলার প্রতীক। এই নৌকা খোলা নদীর খরস্রোতে মিলিয়ে যায়, যেমন তার জীবন মিলিয়ে যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে ডাক্তারবাবুর মানবিকতা ফুটে উঠেছে সর্পদংশনে নিহত এক কন্যার মৃত্যুর ঘটনায়। একটি পানসি নৌকায় করে মৃতদেহ থানায় আনা হয়। ডাক্তারবাবুর মর্মবেদনা এবং মানবিকতা এই ঘটনায় ফুটে ওঠে। 'শুভদৃষ্টি' গল্পে কান্তিচন্দ্র ও সুধার সম্পর্ক গড়ে ওঠে বোটের পটভূমিতে। বোটে বসে শিকার করা,

পরিচয়ের সূত্রপাত, এবং সম্পর্কের পরিণতি—সব কিছুতেই নৌকার উপস্থিতি অনিবার্য। ‘শাস্তি’ গল্পে চরিত্র চিত্রণে নৌকার রূপক ব্যবহার হয়েছে—

“একখানি নূতন তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল।”[১২]

উপসংহার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে নৌকা কেবল বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, বরং তা জীবনের গভীরতর সত্য, মানবিক অনুভূতি এবং সম্পর্কের প্রবাহের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর গল্পে নৌকা কখনো নিয়তির অনিবার্যতা, কখনো বিচ্ছেদ ও যাত্রার রূপক, আবার কখনো গল্পের ঘটনাপ্রবাহের চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। এটি বাঙালি জীবনযাত্রার এক অন্তরঙ্গ উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে। নৌকার এই প্রতীকী ব্যবহারের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ শুধু গল্পের নাটকীয়তা ও গভীরতা বৃদ্ধি করেননি, বরং মানবিক অনুভবের এক নতুন মাত্রাও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে নৌকার এই বহুমাত্রিক উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং পাঠকদের অন্তরকে স্পর্শ করেছে।সবশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নৌকা কেবল যানের প্রতীক নয়, বরং চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবনের অনিশ্চয়তা ও সামাজিক দ্বন্দ্বের রূপক। গল্পের প্রতিটি পরত, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ঘটনার নাটকীয়তা নৌকার মাধ্যমে সুচারুরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা তাঁর সাহিত্যকে বিশ্বমানের মর্যাদা প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র:

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘ছিন্নপত্র’, পত্রসংখ্যা ১৯।
- —. “অধ্যাপক”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ৩৪৪।
- —. “ঘাটের কথা”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ১।
- —. “ছুটি”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ১২৮।
- —. “জন্ম”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ৩৬৭।
- —. “দুবুর্দ্ধি”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ৩৯৭।
- —. “দুরাশা”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ৩২৫।
- —. “পোস্টমাস্টার”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ২১।
- —. “মণিহারা”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ৩৬২।
- —. “মেঘ ও রৌদ্র”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ২১৭।
- —. “রাজটীকা”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ৩৫৫।
- —. “শাস্তি”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ১৬৮।
- —. “সমাপ্তি”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ১৮২।
- —. ‘স্বর্ণযুগ”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ১০০।
- —. “একটি আষাঢ়ে গল্প”, *গল্পগুচ্ছ অখণ্ড,* বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ৮২।

উদ্ভব ও বিবর্তনের পথে সুন্দরবনের সমবায় ও ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন (১৯০৪-৪২)

ইন্দ্রজিৎ দাস
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

সারসংক্ষেপ: ইউরোপে একত্রে জোটবদ্ধ হয়ে জীবিকা নির্বাহ করার উপায় কো- অপারেটিভ প্রণালী যা, বাংলায় সমবায় নামে অধিক পরিচিত। কো- অপারেটিভ প্রণালী বা সমবায় দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়। ইউরোপে এই প্রণালী উনিশ শতকে কার্যকরী হলেও ভারতবর্ষে তথা বাংলায় সমবায় প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা বিশ শতকের প্রথম পর্বে আরম্ভ হয়েছে। স্কটল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের (১৮৬০-১৯৩৯) উদ্যোগে বিশ শতকে সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলে সমবায় আন্দোলন সূচিত হয়েছিল। গোসাবা, রাঙাবেলিয়া এবং সাতজেলিয়া, এই তিনটি লট গোসাবা লটদারী নামে পরিচিত। স্যার হ্যামিল্টন প্রান্তিক এই এলাকার জমিদারীতে সমবায় ব্যবস্থা বিকাশের ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। জমিদারী এবং সমবায় ভিন্ন বিষয় হলেও সমসাময়িক সময়ে সীমিতভাবে এর বিকাশ ঘটেছিল। এই প্রবন্ধে গোসাবার সমবায় আন্দোলন এবং প্রান্তিক মানুষদের আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্র গুলি আলোচিত হয়েছে।
সূচক শব্দ: সমবায়, দারিদ্র, প্রান্তিক, জমিদারী, আর্থিক সচ্ছলতা।

মূল আলোচনা:

"The way from poverty to plenty"

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করেছিল। যার ফলশ্রুতি হিসাবে উনিশ শতকে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল নিম্নবিত্ত মানুষ। তদসহিত শিল্পবিপ্লবের অঙ্গ হিসাবে মানুষের পরিবর্তে স্থান পেল যন্ত্র। এই আধুনিক যন্ত্রের অধিক ব্যবহার শ্রমিকদের গুরুত্বকে হ্রাস করেছিল। শ্রমিকদের এই অবস্থা অনুধাবন করে ওয়েলসের একজন সফল ব্যবসায়ী সর্বপ্রথম সমবায় নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন। উইলিয়াম কিং 'The Co-oparate' নামক মাসিক পত্রিকাটির মাধ্যমে এই সমবায় নীতির সুফল দিকগুলি প্রচারিত করেছিল। এইভাবে সমবায় ভান্ডার গড়ে উঠেছিল ইংল্যান্ডে। শ্রমিকদের অবস্থারও উন্নতি সাদৃশ্য হয়েছিল। ভারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। এই কৃষি অর্থনীতিতে উৎপাদকের স্থান নিয়েছিল কৃষক। আধুনিক ভারতে কৃষকদের অবস্থা সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছিল ইংরেজ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী ব্যবস্থায়। উচ্চহারে রাজস্ব আদায়ের জন্য নানান ব্যবস্থার প্রচলন ঘটলেও কৃষকদের অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। কৃষকদের এই সঙ্গীহীন অবস্থা দূরীভূত করার জন্য কৃষিঋণ প্রদান করা হলেও ঋণের অবস্থাও শোচনীয় ছিল। এমতাবস্থায় সমবায় প্রচলন করার জন্য সুপারিশ করেন উইলিয়াম বার্ন ও জাস্টিস রাণাডে। তবে ভারতে প্রথম সমবায়ের বা গ্রামীণ অর্থায়নের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৯১-৯২ সাল নাগাদ পাঞ্জাব প্রদেশে। এইসময় মাদ্রাজ সরকার ফ্রেডরিক নিকলসনকে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের নির্দেশ দেন।[১] সমবায় ব্যাংক গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল মূলত কৃষকদের আর্থিক দুরাবস্থা দূর করার জন্য। তবে বিশ শতকের প্রথম পর্বে

ভারতে সমবায় ব্যবস্থা বিকাশে আগ্রহ দেখায় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৪ সালের ২৪শে মার্চ ভারতে প্রথম সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ হয়। যা ভারতে গ্রামীণ অর্থায়নের একটি নতুন ব্যবস্থার আইনি ভিত্তি স্থাপন করে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন লর্ড কার্জন। সমবায় আন্দোলনের সুফল বাণী কিংবা সমবায় তত্ত্ব দিকে দিকে প্রচারিত করেছিলেন ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন। তাঁর এই উদ্যোগ মূলত সুন্দরবনে লক্ষণীয়।

ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ছিলেন আদতে স্কটিশ। বিশ শতকের গোড়ায় সুন্দরবনের গোসাবা অঞ্চলে তাঁর উদ্যোগে সূচনা হয়েছিল সমবায় আন্দোলনের। তিনি মেসার্স ম্যাকিনন অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি জাহাজ কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার হওয়ার সুবাদে জাহাজে করে প্রায়শই বাংলাদেশের নদনদীতে ভ্রমণ করতেন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জীবনযাপন সম্পর্কে আগ্রহী হন এবং চাষিদের দুরাবস্থার কথা উপলব্ধি করেন। যেহেতু ১৭৭০ সাল নাগাদ ইংরেজ সরকার অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় এবং জলদস্যুদের প্রতিরোধ করবার জন্য সুন্দরবনের জমিতে ইজারা প্রথা বা লিজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই শ্বাপদ-সংকুল জলাভূমি নেবার লোক তেমন দেখা গেল না। যারা নিলেন, তাদের ও কেউ কেউ কয়েক বছরের ব্যবধানে সরকারকে জমি ফেরত দিলেন। হ্যামিল্টন সুন্দরবনের গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া এই তিনটি লট জেলা কালেক্টরের নিকট লীজ নিয়ে এখানকার জমিদারি সত্ত্ব অর্জন করেন ১৮৬০ সাল নাগাদ। হ্যামিল্টন গতানুগতিক কিংবা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি প্রচলিত শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই তিনি পরাধীন ভারতে একটি "আদর্শ গ্রাম" নির্মাণে মনস্থ হলেন। অর্থাৎ একজন প্রজা কল্যাণকামী শাসক হিসেবে এবং সেই সঙ্গে সুষ্ঠু সমাজ ভাবনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তাঁর সুষ্ঠু সমাজ ভাবনার রূপই হল 'সমবায়'। যার মূল উদ্দেশ্য নিহিত ছিল শোষণ- পীড়নহীন ও বঞ্চনাহীন মুক্ত সমাজ ব্যবস্থায়। অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ মানুষের সমাজ, যেখানে প্রত্যেক মানুষ কায়িক বা বৌদ্ধিক শ্রমের যথার্থ মূল্য পাবে।[২]

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম ব-দ্বীপ হলো সুন্দরবন। সুন্দরবন জল, জঙ্গল ও জনপদের সমন্বয়ে গঠিত। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী ব্যবস্থার দরুন সুন্দরবনকে সর্বপ্রথম ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮১৬ সালে মিস্টার স্কটের উপর সুন্দরবনের ভার ন্যস্ত হয়। খুলনা, বাখরগঞ্জ, যশোর ও ২৪ পরগনা নিয়েই গঠিত হয়েছিল সুন্দরবন। সুন্দরবনের বিস্তৃতি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীর মোহনা থেকে বাংলাদেশের মেঘনা নদী পর্যন্ত। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিদ্যাধরী নদীর তীরবর্তী দ্বীপময় অঞ্চলটি গোসাবা নামে পরিচিত।[৩] এই অঞ্চলের জমিদারী লাভ করে ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন প্রথমে দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষদের সাহায্যে জঙ্গল হাসিল করে জমি উদ্ধার করেন এবং পরবর্তীতে বাঁধ নির্মাণের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরা ছিল মূলত পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের ও অন্যান্য জায়গা থেকে মুন্ডা, ওরাঁও ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরা।[৪] এখানকার অধিকাংশই খেত মজুর ভূমিহীন এবং প্রান্তিক গরিব চাষী। যেহেতু এখানে জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ সেহেতু এখানকার মানুষের নিত্য সঙ্গী ছিল সংগ্রাম। কেবলমাত্র প্রকৃতির রুদ্ররোষ নয় তার সঙ্গে রোগব্যাধিরও প্রকোপ ছিল। সেই সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের নিত্য সঙ্গী ছিল দারিদ্র ও ক্ষুধা। এরূপ প্রেক্ষাপটে ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন গোসাবার মানুষজনকে আত্মনির্ভরতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আজীবনের সঞ্চিত অর্থ তিনি এই তিনটি দ্বীপের উন্নতিতে ব্যয় করেছিলেন। হ্যামিল্টন সাহেব তাঁর গ্রামোন্নয়নের আদর্শ ও পরিকল্পনা 'New India and how to get there' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।[৫]

গ্রাম কেন্দ্রিক জীবনে স্বার্থপরতা লক্ষণীয়। ফলস্বরূপ স্বার্থপরতাই গ্রামের মানুষজনকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তারা ভুলেই গেছে বিচ্ছিন্নতা অনগ্রসরতার মূল ভিত্তি। মানুষ একলা নিজে নিজেই সম্পূর্ণ নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) স্বদেশী সমাজ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তারা যদি পরস্পরের মিলিত হয়ে কোন কাজ সম্পাদন করতো সমষ্টি ভাবে তাহলে সেখানে আত্মশক্তি কিংবা তাদের দুর্বলতা প্রকাশ হইতো না। আসলে ভরসাই ধনী হওয়ার একমাত্র পথ বা উপায়।[৬] সমবায় নীতির সদুরপ্রসারী প্রভাব ইউরোপে লক্ষণীয় শুধু তাই নয় এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপীয়রা প্রতিনিয়ত অগ্রসর হয়েছে সেদিক থেকে বাঙালি হিন্দু সমাজ খুবই দুর্বল কিন্তু এই দুর্বলতাকে যিনি সফলতায় পরিণত করেছিলেন তিনি হলেন স্কটিশ ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন। তাঁরই হাত ধরে সুন্দরবনবাসী দুঃসহ এবং দৈন্যতাকে সপাটে উৎপাটীত করেছিল। দারিদ্রতা ও মুক্ত পেয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমবায় নীতি ব্যতীত সাধারণের উন্নতি অসম্ভব।

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকেই বাংলা তথা ভারতের দরিদ্র নিরন্ন কৃষকের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল কৃষি ঋণ সমস্যা। ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন কৃষকদের দুরাবস্থার উৎস অনুধাবন করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কর শস্যের পরিবর্তে নগদে পরিশোধ করতে হত, সুতরাং তাদের মহাজনদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। যার দরুন বিপুলসংখ্যক কৃষকের নিত্যসঙ্গী ছিল চরম দারিদ্র্য। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ব্রিটিশ ভারতে কৃষক ও শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা সরকারের কাছে প্রথম লিখিতভাবে পেশ করেন। সেই রিপোর্টে তিনি কৃষকের দারিদ্র্য ও দুর্গতির এবং আর্থিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় হিসাবে আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন অতিরিক্ত ঋণ ভারকে দায়ী করলেন। উত্তরোত্তর মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের নিকট পেশ করলেন। মূল ঋণ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন সুদের চক্রবৃদ্ধি হার তাকে এমন ভাবে বিপর্যস্ত করে যে সে শুধু তার চাষের জমি নয় ভিটেমাটির সাথে বলদ, লাঙ্গল সবই হারিয়ে বংশপরম্পরায় জমিদার কিংবা মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হয়।[৭] সেই সঙ্গে মিথ্যে ঋণপত্রে নিরক্ষর চাষীকে দিয়ে আঙ্গুলের ছাপ নেওয়াও বহু চাষীর জীবনে দুর্বিষহ নেমে এসেছিল। কৃষি প্রধান এই দেশে চাষের আয়ের খুব সামান্য অংশ প্রধান উৎপাদক চাষী পেত। ফলস্বরূপ তার সঞ্চয় থাকে না বললেই চলে। এই সামান্য আয়ে তাদের অন্ন বস্ত্রের সমাধানও অসম্ভব। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন বন্যা, অতিবৃষ্টির দরুন ফসল বিনষ্ট হয়। আবার পণ্যমূল্য হ্রাস কৃষককে ঋণ গ্রহণে বাধ্য করেছে। সুতরাং কৃষকের জীবনে চরম দুর্বিসহতা ছিল নিত্যসঙ্গী তা বলাই বাহুল্য। এইভাবে এদেশে দরিদ্রতা অতিমাত্রায় বর্ধিত হয়েছে।ড্যানিয়েল সমবায়ের আদর্শকেই গ্রাম বাংলার নিপীড়িত কৃষকের মুক্তির পথ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।[৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে গোসাবাতেই ভারতে প্রথম সমবায় সমিতি ও সমবায় গ্রাম স্থাপিত হয়েছিল স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্ঠায়। এই গ্রামীন অর্থায়নের উদ্দেশ্য নিহিত ছিল কৃষকদের মধ্যেকার পারস্পরিক সহযোগিতায় ও কৃষি সমস্যার সমূহের সমাধানে। অর্থাৎ স্বল্প আয়ের মানুষদের মিলিত প্রচেষ্টায় ও সাহায্যার্থে সঙ্ঘ-শক্তির ভাব জাগিয়ে তুলে স্বকীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেমন- ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশে

সমবায় সমিতির জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে তার সমস্ত শক্তি ও অর্থ দিয়ে গোসাবাকে ভারতের এক সমৃদ্ধতম গ্রামে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন সমবায়ের ভিত্তিতে।

ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন উপলব্ধি করেছিলেন যে মহাজনদের জটিল শোষন চক্র থেকে গরিব ও অশিক্ষিত মানুষকেই মুক্ত করতে হবে তবেই তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে এবং গ্রামকে কেন্দ্র করে বা গ্রাম কেন্দ্রিক সমবায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এভাবেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে সুন্দরবনের গোসাবাকে কেন্দ্র করে প্রায় ১০ হাজার একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি সমবায় ভিত্তিক জমিদারী।[৯] এটি পরবর্তীতে 'হ্যামিল্টনের লাট' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯০৪ সালে তাঁর সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথের মাধ্যমে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন গোসাবায় মহাজনী চক্র থেকে চাষীদের মুক্ত করতে না পারলে তার স্বপ্নের সমবায়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। ১৯১২ সালে তিনি দুর্দশা গ্রস্থ কৃষকদের কাছ থেকে ঋণের তালিকা সংগ্রহ করেন এবং সেই ঋণ নগদে মিটিয়ে দেন। কোন মহাজন গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়। এইভাবে গোসাবাতে জমিদারি প্রথার অবলুপ্তিকরন ঘটে।

গোসাবাতে ১৯১৫ সালে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক পর্বে যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন। এই সোসাইটির যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল ৫০০ টাকা মূলধন নিয়ে। প্রাথমিক পর্বে এই সমবায় নিয়ে সদস্যদের মধ্যে তেমন কৌতূহল ছিল না। কারণ তারা বেশি আগ্রহী ছিল টিপসই দিয়ে সহজে স্টেট থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে। এমতাবস্থায় সমবায়ের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তোলার জন্য সরকার সমবায় বিভাগে নতুন পরিদর্শক হিসেবে নীরেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়োগ করেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই মূল সমস্যা অনুধাবন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি এস্টেট থেকে ঋণ প্রদান করা বন্ধ করলেন। প্রাথমিক পর্বে চাষীরা অখুশি হলেও পরবর্তীতে সমবায়ের প্রতি তাদের আগ্রহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। যার ফলশ্রুতিতে গোসাবার বিভিন্ন গ্রামে সমবায়ের নতুন নতুন শাখা গড়ে ওঠে। সূচনা পর্বের এই সমিতি গুলোতে পরিচালনার জন্য মূলধনের যোগান দিয়েছিলেন স্বয়ং হ্যামিল্টন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এই শাখা সমবায় সমিতি গুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য গোসাবায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ব্যাংক গ্রামের লোকেদের আত্মশক্তির প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ কথা বলা যায়।[১০] এইভাবে গোসাবাতে উত্তরাত্তর সমবায় ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯ টি সমবায় ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৮২ এবং মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১১৮৩০ টাকা। সমবায় সমিতিতে ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার আচার-আচরণ এবং পরিশোধের ক্ষমতার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। উক্ত বিষয়ের জন্য ব্যাংকের অধ্যক্ষগণ ঋণগ্রহীতাকে সদুপদেশ এবং সাধুতার শিক্ষা প্রদান করতেন। তবে স্বল্পকালীন ঋণ প্রদানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই ব্যাংক বা ধনভাণ্ডার জনসাধারণের দারিদ্র দূরীকরনে সহায়তা প্রদান করেছে। এই ব্যাংক থেকে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অল্প সুদে ঋণ লাভ করেছে এবং তা কোন কাজে বিনিয়োগ করে আর্থিক অবস্থারও উন্নতি বিধান করেছে। শিল্পী শিল্পকর্মের জন্য, কৃষক কৃষিকাজের জন্য এবং শ্রমজীবী মানুষ প্রয়োজনীয়াদির জন্য এই ধনভান্ডার বা ব্যাংক থেকে অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের সাংসারিক অভাব মোচন করেছেন।

কালের নিয়মে গোসাবার সমবায় আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল। ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এই সমবায়ে প্রজাদের অর্থাৎ কৃষকদের স্বার্থে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ

করেছিলেন। সমবায়ের কাজকর্ম দেখভালের জন্য তিনি অক্ষয় কুমার মিত্রকে নিয়োগ করেন। অক্ষয় কুমার মিত্র গোসাবা ও পশ্চিম আরামপুরকে নিয়ে একটি ক্রেডিট ব্যাংক স্থাপন করেন। গোসাবায় সমবায় আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে নির্মিত হয়েছিল সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট, পানীয় জলের পুষ্করিণী, যৌথ শস্য ভান্ডার, সমবায় ভান্ডার, আদর্শ কৃষি ফার্ম ও ক্রেতা সমবায় সমিতি, যামিনী রাইস মিল, ধর্ম গোলা, চাল কল ইত্যাদি। তদ্‌সহিত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসারে বালক, বালিকাদের ও বয়স্কদের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছিল। হ্যামিল্টন সাহেব ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাদের সুচিকিৎসায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে গোসাবাতে গড়ে ওঠে ঋণদান সমিতি, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় 'গোসাবা আদর্শ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র'। এই গবেষণা কেন্দ্র গোসাবাকে এক ফসলি থেকে দু ফসলি করার জন্য উৎসাহিত করে। এখানেই শুরু হয় প্রথম 'অধিক খাদ্য ফলন আন্দোলন'।[১১] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে একটি ধানকলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সমবায় ভান্ডার, আদর্শ কৃষি ফার্ম ও ক্রেতা সমবায় সমিতি গঠন করেন।[১২] মূলত ধনী মালিকদের নিপীড়ন ও অত্যাচারের থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই সমবায় সংঘ গুলি গঠিত হয়েছিল। তাঁর সমবায় ভাণ্ডার গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, কৃষকরা যে শস্য উৎপাদন করবেন, সেই শস্য ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় সঞ্চিত করবেন। এখান থেকে কৃষকরা একদিকে যেমন প্রাপ্য অংশ লাভ করবেন তেমনি কৃষি ঋণ ও মুকুব হবে। তিনি মানবকল্যাণ পরীক্ষা কেন্দ্রে ধীরে ধীরে এক নতুন অর্থনৈতিক পরিকাঠামা চালু করতে সমর্থ হয়েছিলেন যার নামকরণ হয়েছিল ম্যান স্ট্যান্ডার্ড ফাইন্যান্স।[১৩]

উত্তরাত্তর গোসাবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনঃরায় জমি উদ্ধারের কাজ শুরু হয়। এইসময় গোসাবার মোট জনসংখ্যা ছিল ১০০০০।১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গোসাবায় সেন্ট্রাল ব্যাংক স্থাপন এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ গোসাবায় একটি ধান বিক্রয় কমিটি গঠিত হয়। কলকাতায় ধান বিক্রয় সমিতির নিজস্ব আড়ৎ না থাকায় তা অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। তদসহিদ ওজনজনিত অসুবিধা দূরীভূত করতে এবং উপযুক্ত মূল্যের আশায় "কেন্দ্রীয় সমবায় ধান্য বিক্রয় সমিতি" গঠিত হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে যামিনী রাইস মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে। বাংলার সমবায় সমিতির তৎকালীন রেজিস্ট্রার যামিনী ভূষণ মিত্র গোসাবার সমবায় আন্দোলনে সহায়তা করার কারনে তাঁর নামেই এই মিলের নামকরণ। ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রজাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করে 'সমবায় ধর্ম গোলা' গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। প্রজারা এই ধর্মগোলায় ধান গচ্ছিত রাখত। মহামারী কিংবা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লে ধর্ম গোলায় গচ্ছিত ধান প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করা হত। ধর্মগোলার সংরক্ষণের দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ড্যানিয়েলের সমবায় ভাবনা বহুমাতৃক প্রকল্পের রূপ ধারণ করেছিল।

ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন গোসাবাকে আত্মনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কৃষির উপর গুরুত্ব দেননি তিনি কুটির শিল্পেও সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি গোসাবাতে ১৯২৯ সালে একটি বয়ন শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য শ্রীরামপুর উইভিন বিদ্যালয় থেকে অভিজ্ঞ শিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়। ফলশ্রুতি হিসাবে বয়ন শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয় বিচ্ছিন্ন এই গোসাবা দ্বীপটিতে। হ্যামিল্টন ১৯৩৪ সালে 'রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ইনস্টিটিউট' স্থাপন করেন গোসাবাতে। এই ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে যুব সমাজকে প্রশিক্ষিত করে এক শ্রমভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো চালু করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, শ্রমশক্তি হল ভারতবর্ষের মূল সম্পদ। সুতরাং তাঁর সমবায়ের মূল ভিত্তি ছিল

অর্থ নয় শ্রম। ১৯৩৬ সালে হ্যামিল্টন গোসাবা সমবায় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়াতে এক টাকার কাগুজে নোটের প্রচলন করেন। উক্ত নোট গুলোর উপর ছিল ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও ম্যানেজার সুধাংশু বাবুর স্বাক্ষর।[১৪] হ্যামিল্টন সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এই নোটের বিনিময়ে তাঁর সমবায় ভান্ডার থেকে এক টাকা মূল্যের চাল, কাপড়, তেল ও অন্যান্য সামগ্রী দিতে বাধ্য থাকবেন। ভারতবর্ষের কোনো জমিদারী ব্যবস্থায় আঞ্চলিক মুদ্রা প্রচলন করার এমন দৃষ্টান্ত আর নেই। গর্বিত সাহেব ঘোষণা করলেন – India;s road to independence runs through Gosaba with its sound man standard finance।[১৫]

ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্রিক ভাবনাকে কার্যকরী করতে প্রয়োজন ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর। সমবায়ের স্বার্থে এ সকল কর্মীগণ গ্রামের অর্থায়ন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকবে। ফলস্বরূপ তিনি গোসাবাতে কেবলমাত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেননি তৎসঙ্গে কবিগুরুর সহিত আলোচনার মধ্য দিয়ে গোসাবা বোলপুর সমবায় ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সাহেব হ্যামিল্টন দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর গ্রাম কেন্দ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থা সফল হলে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান ঘটবে। এভাবেই তিনি এদেশের শ্রমশক্তিকে পূর্ণাঙ্গ রূপে ব্যবহার করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

৩

সর্বশান্ত প্রজাকে নিয়ে হ্যামিল্টন গোসাবাতে বিশ্বের প্রথম সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যামিল্টনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সমবায় ভাবনা ও পল্লী পুনর্গঠন বিষয়ে কবিগুরুর আগ্র ছিল সর্বজনবিদিত। গোসাবার আদর্শ কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা, যৌথ ভাণ্ডার, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কবিকে উৎসাহিত করেছিল।[১৬]এই পল্লী উন্নয়ন ভাবনাকে স্বচক্ষে অনুধাবন করে প্রশংসাও করেছিলেন। কবি যে স্বদেশী সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার পরিপূর্ণ রূপ ছিল সুন্দরবনের গোসাবা। তাই তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ হোক গোসাবা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামকে কেন্দ্র করে এক নতুন সমাজের স্বপ্ন ও দেখেছিলেন। সমাজ চিন্তক হ্যামিল্টন ও রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা এবং সমবায় ভাবনা তত্ত্বগত দিক থেকে পৃথক ছিল। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আত্মনির্ভরতায় অনভ্যস্ত মানুষজনকে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে দিতে। আসলে তাদের নিজেদের ক্ষমতার উপর আস্থাশীল বিশ্বাসী করে তুলতে চেয়েছিলেন। ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ পল্লীবাসী ভাবতেন তাদের এই দুর্দশা পূর্ব জন্মের কর্মফল তাই বর্তমান জীবনের দুঃখ-দৈনতা থেকে তারা রেহাই পাবেন না। এই অসহায়তা তাদেরকে গ্রাস করেছিল। পল্লীগ্রামের মানুষকে এই অসহায় থেকে মুক্ত দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে লিখছেন স্ব-ক্ষমতাই হলো সামাজিক কল্যাণের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। আত্মশাসনের শক্তিতে উদবোধিত হয়ে স্বদেশী সমাজকে সম্পূর্ণ সাবলম্বী হতে হবে বলে মনে করেন।[১৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন আমাদের জীবনের ভিত্তি হলো পল্লী। তাই তার উন্নয়নের প্রশ্নে অসহায় গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরতার সহিত পরমুখাপেক্ষী না হয়ে আত্ম-শাসনেরও প্রয়োজন বলে মনে করেন। তবেই ভারত সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষ আজ দারিদ্রই, পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ আজও দিকে দিকে স্বল্পধনের পথরোধ করে দাঁড়ায়নি। এই জন্যই সমবায় নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় ভাবনার সমগ্র রূপটা এইভাবে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ধণতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় অ-স্বাধীনদের নিজস্ব ক্ষমতার প্রতি আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে না পারলে এই উন্নয়ন ব্যর্থ হবে তা বলাইবাহুল্য। তিনি সমবায় পদ্ধতিতে ১৯০৫ সালে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তার একক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রথম হেলথ কো-অপারেটিভ গড়ে উঠেছিল। রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের ব্যবস্থার পাশাপাশি তিনি কুটির শিল্পের উন্নয়নেও সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এভাবেই তিনি তার সমবায় ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন।

৪

ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলনের পথিকৃত হ্যামিল্টন তার আপন সংগঠনের দ্বারা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের দরিদ্র নিরন্ন কৃষক, শ্রমিকের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য সমবায় ভিত্তিক সমাজ এবং শোষণকারী মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার্থে প্রয়োজন সমবায় ব্যবস্থা। তিনি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে তাঁর অর্জিত বিপুল ধন রাশিকে সমবায়ের মাধ্যমে ও দেশের দরিদ্র জনগণের উন্নততর জীবন যাত্রার জন্যে দান করে। ড্যানিয়েল তাঁর স্বপ্নের আদর্শ গ্রাম নির্মাণে নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি প্রান্তিকদের নিয়ে একটি উন্নত সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য সমবায়ই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে প্রচার করেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে সর্বসাধারণের স্থায়ী মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তিকে উদ্ভাবিত করা। গোসাবার আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে তার সমবায়ের ভাবনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বপ্রথম তিনিই ছিলেন গোসাবা দ্বীপ তথা ভারতবর্ষের স্ব-নির্ভর ও সমবায় আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। স্থানীয় প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে মেটাবার নীতি অনুসারে বিশ্বাসী হ্যামিল্টন স্ব-নির্ভর ও আদর্শ্য লোকহিতকর উপনিবেশ রূপে গোসাবাকে গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।[১৮] তাঁর এই সমবায় প্রণালীতে এখানকার জনগন আপন শক্তিকে ধনে পরিনত করে স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল নিঃসন্দেহে তা বলা যেতে পারে। হ্যামিল্টন মনে করতেন ঋণদানের উর্ধে উঠে সমস্ত জনগণের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করাই সমবায় সমিতির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই ঘটনা প্রবাহ কেবলমাত্র আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের আঙ্গিকে নয় আঞ্চলিক ইতিহাসের আলোচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসকে এক স্বতন্ত্রতা দান করেছে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে হ্যামিল্টন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে তার সমবায় আন্দোলন ও স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে কৃষি গবেষণাগার হিসেবে তার কর্ম প্রণালীকে সচল রাখলেও হ্যামিল্টনের গোসাবা সমবায় সম্ভাবনার লুপ্ত ইতিহাস হয়ে গেছে।

সূত্র নির্দেশ:

১। সৌমেন দত্ত, স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবার আখ্যান, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৯
২। তদৈব, পৃষ্ঠা- ২২
৩। অময় কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুন্দরবনের সংরক্ষিত অঞ্চলের প্রশাসনিক ইতিহাস (ব্রিটিশ পর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা ১৪০৬, পৃষ্ঠা- ১১২
৪। সন্তোষ বর্মন, স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা, কথা প্রকাশনী, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৮১
৫। প্রসিত কুমার রায় চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, হ্যামিল্টন ও সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা ১৪০৬, পৃষ্ঠা- ৪৩৫
৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায় নীতি, বিশ্বভারতী, ১৩৬০, পৃষ্ঠা- ১২
৭। অশোক কুমার রায়, ভারতের প্রথম সমবায় পদক্ষেপ- সুন্দরবনে, অতিথি পত্রিকা, ১৩৯০, পৃষ্ঠা- ৩২

৮। Sutapa Chatterjee Sarkar, The Sundarbans, Folk Deities, Monsters and Mortals, Orient Blackswan, 2010, P.P- 124
৯। সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সম্পাঃ গোকুলচন্দ্র দাস, পৃষ্ঠা- ২৪
১০। শ্রী রমণী মোহন বিদ্যার্থী, সমবায় সমিতির কথা, দ্য টেম্পল প্রেস, ১৯১৭, পৃষ্ঠা- ৩
১১। সুভাষ মিস্ত্রি, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক প্রকাশনী, সোনারপুর, ২০১২, পৃষ্ঠা- ২৪১
১২। সন্তোষ বর্মন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৮
১৩। সুভাষ মিস্ত্রি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৬
১৪। সন্তোষ বর্মন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০১
১৫। সৌমেন দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০০
১৬। শশাঙ্ক মণ্ডল, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন, পুনশ্চ, পৃষ্ঠা- ৮১
১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশী সমাজ, রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০০, পৃষ্ঠা- ৫২৬
১৮। সুভাষ মিস্ত্রি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৯।

বাংলার আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার চিহ্ন : প্রেক্ষিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য

গণেশ যোদ্দার
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাস্তবতা নিঃসন্দেহে বস্তু নির্ভর। সাহিত্যে বস্তুরই কারবার। তবে সেখানে নিত্যবস্তুর কারবার। অবশ্য বস্তুর নিত্যতা নির্ভর করে তার সত্যতার উপর। সত্যবস্তু রসবস্তুই। যা সমকাল থেকে উদ্ভূত হলেও সহৃদয়-সামাজিকের আবেদনে হয়ে ওঠে চিরকালীন। সেবিচারে রসবস্তুর সত্যতা কিংবা নিত্যতার সঙ্গে কাল বা সময়-ভাবনার সংযোগ সুনিবিড়। তাই সাহিত্যে দু'ধরনের বাস্তবের অস্তিত্ব অনুভব করি। একটি সমকালীন বাস্তব বা বহির্বাস্তব; অপরটি সুদূরপ্রসারী বাস্তব বা অন্তর্বাস্তব। সুদূরপ্রসারী বাস্তবের সঙ্গে জড়িত থাকে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা, মগ্নচেতন বাস্তবতা ও দার্শনিক বাস্তবতা। অন্যদিকে সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত থাকে সামাজিক বাস্তবতা, অর্থনৈতিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা। আর অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের যে বাস্তবতা, তা পুরোপুরিভাবে এই সমকালীন বা বহির্বাস্তবতাই। অবশ্য কোনো কালখণ্ডকে বিস্তৃত কালসমুদ্র থেকে তুলে এনে সংশ্লিষ্ট কালখণ্ডের সাহিত্যিক প্রয়াসকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা বৈজ্ঞানিক প্রণালী নয়। তবে এই আলাদা যুগপ্রসঙ্গের যৌক্তিকতাও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। এক্ষেত্রে সমস্যা হল, ইতিহাসের কোনো ঘটনাপ্রবাহ বা সন-তারিখকে পর্যায়ক্রমে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করাও যায় না যথাযথভাবে। তবে এই আলাদা যুগপ্রসঙ্গের মূল যৌক্তিকতা হল সংশ্লিষ্ট কালপর্বের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলি শনাক্ত করা। কিংবা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সূচককে চিহ্নায়িত করা। আর এই প্রেক্ষিতে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার চিহ্ন অন্বেষণে প্রবৃত্ত হব।
সূচক শব্দ: আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, সাংস্কৃতিক বাস্তবতা, অষ্টাদশ শতক, বাংলা সাহিত্য, বর্গী হাঙ্গামা, হিন্দু-মুসলিম ধর্ম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

মূল আলোচনা:

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার যুগগত প্রেক্ষিত:

দেশ-কাল-পাত্রের উদ্বাহবন্ধনে গড়ে ওঠে সাহিত্যের বনিয়াদ। সাহিত্যবিচারে তাই কালগত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। অষ্টাদশ শতাব্দী হল অবক্ষয়ের শতাব্দী। অস্থিরতার কাল। সে এক বেদনার ইতিহাস। গোটা শতাব্দী জুড়ে চলেছে ষড়যন্ত্র, লালসা, ক্ষমতার লড়াই আর নির্বিচার শোষণ ও পীড়ন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু, উত্তরাধিকারগণের অপারঙ্গমতা ও সেই সুযোগে বাংলার নবাবদের স্বাধীন শাসক হিসেবে আচরণ এবং এই বিশৃঙ্খলতার সুযোগে ইংরেজদের চক্রান্ত ও পরে আধিপত্য স্থাপন— এই হল অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়টা সন্ধিক্ষণের সময়। রাষ্ট্রবিপ্লব আর পরিবর্তনজনিত পালাবদলের সাক্ষী। সেই শঙ্কাদোদুল

শতাব্দীর রাষ্ট্রিক উত্থান-পতনের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান নিরূপণ করাই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

মূলত, মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙনকালেই সেই দুর্বল বঙ্গভূমিতে নবাবী আমলের প্রতিষ্ঠা। নেতৃত্বে মুর্শিদকুলি খাঁ। এই মুর্শিদকুলি থেকে জিনুদ্দিন আলি খাঁ পর্যন্ত মোট চৌদ্দজন নবাব বাংলার মসনদে বসেছেন। কিন্তু মুর্শিদকুলির মতো বিচক্ষণতা কোনোও নবাবের মধ্যে দেখা যায়নি। আলিবর্দির মধ্যেও না। ফলত স্নেহের বশীকরণই ছিল তাঁদের সিংহাসনে বসার নেপথ্য কারণ। তা নাহলে সিরাজউদ্দৌলার মতো হঠকারী বিপথগামী ব্যক্তি নবাবের সিংহাসনে বসতে পারতেন না। সকল অর্থে এই শতাব্দী অবক্ষয়ের শতাব্দী। কেননা, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, বহির্বাণিজ্য, অন্তর্দেশীয় অর্থনীতি তথা বাজার অর্থনীতির ফলে বাংলার অর্থনীতিতে ধ্বস নেমেছিল। তেমনি বাণিজ্যের ফলে এ-দেশীয় অনেক শিল্প ধ্বংস হয়েছিল। তার প্রমাণ মেলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *অমাবস্যার গান* উপন্যাসে। যেখানে বাংলার তাঁত শিল্পের ধ্বংসের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্যই এই 'ক্ষয়' বা 'অবক্ষয়'-এর বিপরীতে আছে 'সমৃদ্ধি'। তাইতো নবাবদের ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্রের অন্তরালে প্রভুত্ব আদায়ের পরিকল্পিত কাঠামো অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমির ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল, অবক্ষয়ের সম্মুখীন করে তুলেছিল; তেমনি সমৃদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ ইতিহাসকে।

তবে সতেরো শতকের শেষ দিকেই মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষয় দেখা গিয়েছিল। আমরা সতেরো শতকের অন্তিম পর্ব থেকেই আলোচনা শুরু করব। অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভ থেকে শাসকদের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবে সেই আলোচনার পূর্বপাঠ—

১৬৫৮	: শাহ সুজাকে পরাস্ত করে ঔরঙ্গজেবের দিল্লির মসনদে অধিষ্ঠান।
১৬৬০	: ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হওয়া।
১৬৬০-১৬৬৪	: মীরজুমলার শাসনকাল। একচেটিয়া বাণিজ্যনীতি প্রচলন এবং নিমক বা নুনের ব্যবসা প্রচলন করা।
১৬৬৪	: মীরজুমলার মৃত্যু ও ঔরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খাঁর সুবেদারের পদ গ্রহণ। শায়েস্তা খাঁ বাইশ বছর রাজত্ব করে। তিনি দক্ষিণবঙ্গের মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেছিলেন। শায়েস্তা খাঁর পর খান-ই-জাহা সিংহাসনে বসেন এবং তারপর ইব্রাহিম খাঁ। সেই সময় বাংলার নবাব হন শোভা সিংহ ও ভাই হিম্মৎ সিংহ এবং উড়িষ্যার আফগান রহিম খাঁ।
১৬৯৭	: ইব্রাহিম খাঁর পুত্র আজিবুর শাহ বাংলার সুবেদার হন।
১৬৯৭-১৭১২	: শাহজাদা আজিম উদ্দিন বাংলার সুবেদার হন।
১৭০০	: ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার দেওয়ান হন মুর্শিদকুলি খাঁ।
১৭০৩	: মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ান পদের অতিরিক্ত সহকারী সুবেদারের দায়িত্ব পান।
১৭০৭	: ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু। মুঘল সাম্রাজ্যের সুলতানি শাসন শিথিল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে সুবেদারি শাসনের পতন হয়। নবাবী আমলের পত্তন ঘটে। বাংলার প্রথম নবাব হয়ে আসেন মুর্শিদকুলি খাঁ। এই সময়ে মারাঠা শক্তির উত্থান ঘটে। কেন্দ্রীয়

শাসন শক্তির দুর্বলতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ প্রকাশ পায়।

১৭১৩ : বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হন মুর্শিদকুলি খাঁ।

১৭১৩ : দেওয়ান হলেন রেজা খাঁ। রেজা খাঁ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগনায় ভাগ করেন।

১৭১৭-১৭২৮ : মুর্শিদকুলির রাজত্বকাল ও তার মৃত্যু। জামাতা সুজাউদ্দিন সিংহাসনে বসেন। তার শাসনকালে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, জমিদারদের অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে।

১৭৩৯ : সুজাউদ্দিনের মৃত্যু।

১৭৩৯-১৭৪০ : সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁর শাসনকাল। কিন্তু তাঁর শাসনকার্যে অক্ষমতা, বিলাস-ব্যসনে আসক্তি ইত্যাদির কারণে আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়। এই সুযোগে মির্জা মহম্মদ আলী পাটনা থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে সরফরাজকে আক্রমণ ও হত্যা করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হয়ে ওঠেন। দিল্লির বাদশাহ মোঃ শাহকে ঘুষ দিয়ে সুবেদারি ফরমান পান।

১৭৪০ : মির্জা মহম্মদ নবাব হন। তিনিই আলিবর্দি খাঁ উপাধি পান।

১৭৪০-১৭৫৬ : আলিবর্দি খাঁর রাজত্বকাল। মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেও স্বস্তি পাননি তিনি। ষড়যন্ত্রকারী শত্রুপক্ষ এবং মারাঠা বর্গীদের দমনের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার তাঁর *বঙ্গে বর্গী* গ্রন্থে লিখেছেন—

> “আলিবর্দি খাঁ চারিদিকে বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিপ্লাবিত হইয়াছিলেন। এই সময়, এই মাহেন্দ্রযোগে মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িষ্যার পার্বত্য প্রদেশ ভেদ করিয়া এবং পাচেত ও ময়ূরভঞ্জের দিকে অগ্রসর হইয়া সহসা মেদিনীপুরে উপস্থিত হয়।”[১]

বর্গী হাঙ্গামার ফলে বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়। প্রভূত বিত্ত সম্পদ নষ্ট হয়। আলিবর্দি সর্বশান্ত হন। রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি জমিদার, ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশি বণিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ‘আবওয়াব’ দাবি করেন। এর ফলে তারা ক্ষুব্ধ হন। ঐতিহাসিক রামেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *বাংলাদেশের ইতিহাস* গ্রন্থে আলিবর্দির বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> “বিগত দশ বছর যাবত আলিবর্দিকে মীর হাবিব ও মারাঠাদের সঙ্গে যে অবিশ্রাম যুদ্ধ করিতে হয় তাহা তাঁহার পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বলা যাইতে পারে।”[২]

১৭৫৬ : ১৭৫৬-র ১০ এপ্রিল আলিবর্দির মৃত্যু হয়। মসনদে বসেন তাঁর মনোনীত প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন ইংরেজদের সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটে। সিরাজউদ্দৌলার হত্যার পর মুহূর্তেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

অর্থের বিনিময়ে বাংলার মসনদে 'পুতুল-নবাব' কেনা-বেচার খেলা শুরু করে। প্রথমে নবাব হন মীরজাফর, তারপর মীরকাশিম প্রমুখ।

১৭৬৫-১৭৭২ : দ্বৈত শাসন প্রচলিত হয়। প্রশাসনিক কাজের দায়িত্বে থাকে বাংলার নবাবগণ, অথচ রাজস্ব আদায়ের ভার পায় ইংরেজ।

১৭৬৯ : ভয়াবহ মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) নামে পরিচিত। দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নেয় ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই প্রেক্ষাপটে রচিত বাংলা সাহিত্যে সেই সমস্ত অবক্ষয়ের চিত্র বর্ণনা আমাদের আলোচনার পরবর্তী অভিমুখ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে আর্থসামাজিক বাস্তবতা:

সমাজ আর অর্থনীতি একটা দেশের উন্নতি আর অবনতির প্রধান মানদণ্ড। আর সামাজিকতা ও অর্থনৈতিকতার এই অভিঘাত লাগে শিল্প-সাহিত্যের জগতেও। আবার যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দী আমাদের প্রধান কেন্দ্র সেখানে এই শতকের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রে সমাজ ও অর্থনীতির প্রভাব যে আলোচনার নাভিকেন্দ্রে অবস্থান করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী অরাজকতা ও অবক্ষয়ের শতক পূর্বেই বলেছি। সমাজে যেমন নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে; রাষ্ট্রে তেমনি অর্থনৈতিক অবক্ষয় প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েছে। অবশ্য অষ্টাদশ শতকের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক ও কৃষিনির্ভর। উৎপাদন সামগ্রী, উৎপাদিত দ্রব্য ও মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক ছিল শিথিল। তবে একথা স্বীকার্য যে, অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক ইতিহাস বলছে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ছিল চাহিদা তুলনায় অধিক। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের 'মানসিংহ' অংশে আমরা দেখতে পাই সমসাময়িক কৃষি-অর্থনীতির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি —

"ধান চাল মাষ মুগ ঝোলা অরহড়।
মসূরাদি বরবটি বাটুলা মটর।।
দে-ধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা ঘর।
জনার প্রকৃতি গম আদি আর সার।।"[৩]

আবার কৃষিজীবী বাঙালির জীবনের যাপনচিত্র পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিবায়ন* (১৭১১ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যে। শিব এই কাব্যে আর দেবতা নন; তিনি কৃষক। সংসারের অনটনে তাঁকে লাঙল পর্যন্ত ধরতে হল। স্ত্রী পার্বতীর কথা মতো লাঙল নিয়ে চাষের কাজে মন দিল। আর শিবের এই মানবায়নে সাধারণ বাঙালির সাংসারিক জীবনের জলছবি দেখতে পাই। তাইতো কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন।
চাষ চষ বারেক বর্ত্তুক পরিজন।।"[৪]

পার্বতীর এহেন কৃষিমনস্কতা তথা সংসারাভিজ্ঞতার তাবৎ প্রশ্নের সঙ্গে মিলেমিশে যায় অষ্টাদশ শতকের বাঙালি গৃহিনীর প্রতিদিনকার বিলাপ বা খেদোক্তি। পাশাপাশি আমরা সমসাময়িক কৃষক পরিবার তথা গোটা কৃষি-অর্থনীতির অবক্ষয় অর্থাৎ কৃষিকর্মের আর্থিক দুর্গতির কথা ও কাহিনির ভাব ও তাপ অনুভব করি উক্ত কাব্যে শিবের প্রত্যুত্তরে—

"গরিবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বার করা সকল বেচিয়া লয় রাজা।।"[৫]

আসলে কৃষকদের জমির কোনো মালিকানা বা সত্ত্ব ছিল না; ফলত জমির মালিকানা যাদের ছিল সেই ভূস্বামীগণ খেয়াল খুশির মতো প্রজা নির্বাচন করতেন। আর বারবার প্রজা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে মালিক শ্রেণি অধিক মুনাফা অর্জন করত এবং রায়তেরা তখন গভীর দুর্দশায় ভুগতেন। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র এবং কৃষক সমাজের যে দুরবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ মেলে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিবায়ন*-এ এবং গঙ্গারাম দত্তের *মহারাষ্ট্র পুরাণ* -এর পাতায় পাতায়।

তবে এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য *আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালি* গ্রন্থে ডঃ অতুল সুর অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্গী হাঙ্গামার মতো আর্থিক বিপর্যয়মূলক এক অবক্ষয়িত মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনার প্রামাণিক নিদর্শন হিসেবে সমসাময়িক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন। সেটি হল গুপ্ত পল্লীর প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রচিত 'চিত্রচম্পূ' নামক কাব্যগ্রন্থ। রচনাকাল ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং গ্রন্থখানি যে বর্গী হাঙ্গামার সমসাময়িক সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। ডঃ অতুল সুর উক্ত গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয় সম্পর্কে জানিয়েছেন—

> "বর্গীদের অতর্কিত আগমনের সংবাদে বাংলার লোক বড়ই বিপণ্ণ ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। শকটে, শিবিকায়, উষ্ট্রে, অশ্বে, নৌকায় ও পদব্রজে সকলে পালাতে আরম্ভ করে। পলায়মান ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধোপরি 'লম্বালক' শিশু, গলদেশে দোদুল্যমান শালগ্রাম শিলা, মনের মধ্যে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর 'দুর্বহ মহাভার' সঞ্চিত শাস্ত্র গ্রন্থাদির বিনাসের আশঙ্কা, গর্বভারালস পলায়মান রমনীগণের নিদাঘ সূর্যের অসহনীয় অপক্লেশ, যথাসময় পানাহারলাভে বঞ্চিত ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল শিশুগণের করুণ চিৎকারে ব্যথিত জননীগণের আর্তনাদ ও অসহ্য বেদনায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত।"[৬]

আর বর্গী হাঙ্গামার বিবরণের এই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে দেখি নবাব-বিরোধী কবি ভারতচন্দ্র রায়ের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে–

"লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।।"[৭]

আর গভীর পরিতাপের সঙ্গে জানাতে হয়, এই বর্গী হাঙ্গামা থেকেই বঙ্গ অর্থনীতি ধ্বস নামতে শুরু করে। সবথেকে বড়ো কথা সাধারণ লোকের মনে বর্গীর হাঙ্গামা এমন এক উৎকট ভীতি জাগিয়েছিল যে তা পরবর্তীকালে লোকছড়ায় 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে' এই গানে প্রতিধ্বনিত হল।

আবার রাঢ়বঙ্গের বর্গী হাঙ্গামার সবিস্তার তথ্য ও সত্য ধরা পড়ে থাকে কবি গঙ্গারাম দত্তের *মহারাষ্ট্র পুরাণ*-এ। ইতিহাসের সঙ্গে পৌরাণিক সাহিত্যের মেলবন্ধনে রচিত এই গাথাকাব্যটির রচনাকাল ১৭৫১ সাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে বর্গী হাঙ্গামা ও তাদের নারকীয় হত্যালীলা, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের রক্তাক্ত কাহিনিই আলোচ্য কাব্যের প্রধান

উপজীব্য বিষয়। উল্লেখ্য, সমগ্র *মহারাষ্ট্র পুরাণ*-এর মধ্যে 'ভাস্কর পরাভব' নামক প্রথম খণ্ডটি একমাত্র সংগৃহীত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে আর্থসামাজিক বাস্তবতার চিহ্ন রূপায়ণে গ্রন্থখানির বিশিষ্টতা হল—

১. অষ্টাদশ শতকের বর্গী আক্রমণ এবং সমসাময়িক রাজকীয় ঘনঘটার এক ঐতিহাসিক দলিল গঙ্গারাম দত্তের *মহারাষ্ট্র পুরাণ।*

২. সাহিত্য আর ইতিহাস যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আলোচ্য কাব্যখানি আমাদের সেকথাই প্রমাণ করে।

৩. কাব্যগত নৈপুণ্য না থাকলেও বিষয়গত নৈপুন্যের জন্য এই গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণায় পাঠক, গবেষক ও সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

৪. গঙ্গারাম দত্ত মৌলিক প্রতিভাবলে বর্গী আক্রমণের মর্মান্তিক অত্যাচারের কাহিনিকে সম্পূর্ণ খোলসের মোড়কে ঢেকে দিলেন; কিন্তু আবরণের ভিতরে রাখলেন এক জলজ্যান্ত ইতিহাস— জনজীবনের ইতিহাস। সেদিক থেকে কাব্যটি হয়ে উঠেছে আর্থসামাজিক ইতিহাসের দর্পণ।

৫. তৎকালীন বঙ্গদেশে সামন্তপ্রভুরা দরিদ্র প্রজাদের উপর যে কী পরিমাণ অত্যাচার করত কবি গঙ্গারাম সেদিকেও অঙ্গুলিসংকেত করেছেন তাঁর কাব্যে।

৬. আলোচ্য কাব্যে কোথাও কোনো ভাবের বিকৃতি নেই। কবি একের পর এক কাহিনি কাব্যের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি যেন এক সৎ নির্ভীক সাংবাদিকের ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর এই নিখুঁত নির্ভেজাল বিবরণের মধ্যে প্রতিবেদনের ঢঙ পরিলক্ষিত হয়। সেকারণে এই কাব্যকে অনেকে বলে থাকেন 'Journalism in Poetry'।

সর্বোপরি, গঙ্গারামের ঐতিহাসিক তথ্যদৃষ্টি বাস্তবজীবনবোধ, মানবিক সহমর্মিতার গুণে তাঁর সৃষ্ট কাব্য *মহারাষ্ট্র পুরাণ* হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের অবসানকালে নবজীবনচেতনার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা— যেন 'New wine in old bottle'।

তবে যেহেতু সমাজ ছিল ধর্মকেন্দ্রিক; ফলত পরিবর্তন তেমন লক্ষিত হয়নি। স্মৃতিশাস্ত্রের শাসন ও আধিপত্য যেমন হিন্দুসমাজে অক্ষুণ্ণ ছিল, তেমনি পীর, মোল্লা কিংবা মৌলবী সাহেবদের নির্দেশ মাফিক পরিচালিত হত মুসলমান সমাজ। অবশ্য হিন্দুসমাজ বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব— এই তিন সম্প্রদায়ে ছিল বিভক্ত। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বিষ্ণুভক্ত ব্যাসকে স্বয়ং বিষ্ণু তিরস্কার করেছিলেন শিবনিন্দার কারণে—

"যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
....
শিবের যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবের যে পূজা করে, আমি তারে তুষ্ট।।"[৮]

আবার হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত *সত্যপীরের পাঁচালী।* যা কিনা ভারতচন্দ্রেরই লেখা। আবার রামেশ্বর ভট্টাচার্যও তিনি তাঁর *শিবায়ন* কাব্যে তুলে ধরেছেন রাম ও রহিমের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানী চিত্র— "মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।"

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি গ্রন্থে গ্রন্থকার অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতকের সামাজিক বাস্তবতার যে চিহ্নায়ণ তুলে ধরেছেন তা হল—

> "শাস্ত্রের অনুশাসন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী জাতি এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল এবং তাদের সামাজিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার রঘুনন্দনের বিধানের আওতার বাইরে ছিল।... মুসলমানদের মধ্যে সুন্নীদের সংখ্যা ছিল বেশি, কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর পরবর্তী নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিয়াদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"[৯]

আবার আঠারো শতক 'মসিল দিয়ে তসিল করা'র যুগ; যার প্রমাণ মেলে *শাক্ত পদাবলী*-তে। শাক্ত পদাকর্তার ভাষায়—

> "মাগো তারা ও শঙ্করি,
> কোন্ অবিচারে আমার 'পরে করলে দুঃখের ডিক্রি জারী,
> এক আসামি ছয়টা প্যাদা, বল্মা কিসে সামাই করি।"[১০]

রামপ্রসাদের এই গানের মধ্য দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে অধ্যাত্মচেতনার অন্তঃসলিলার স্রোতধারা প্রবাহিত হলেও রাজশক্তির নিপীড়ণে সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার ভাব ও তাপ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। মা বা তারা বা শঙ্করী যেন এখানে শাসক বা বিচারকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির মতো কবি যেন 'আসামী' জগজ্জননী মা ভক্তকবির প্রতি নিরন্তর দুঃখভোগের ডিক্রি জারি করে চলেছেন। এমনকি শ্রমিক শ্রেণির যে প্রতিবাদ তাও আমরা রামপ্রসাদের গানের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হতে শুনি। যেখানে নিম্নশ্রেণির মানুষদের বঞ্চনার কথা ব্যক্ত হয়েছে—

> "নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
> আমি দিন-মজুরি নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।।
> পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহালেটে।"[১১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতিক বাস্তবতা:

> "বাঙালীর ঐতিহ্য, যে সে কথা নয়। তাকে ভুললে চলবে না, তাকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। তাকে ধরে রাখতে হবে।"[১২]

পরশপাথর ছবিতে পরেশবাবু অর্থাৎ তুলসী চক্রবর্তীর ভাষণে পরিচালক সত্যজিৎ রায় বাঙালি ও বাংলার ঐতিহ্য-প্রীতি তথা সংস্কৃতিমনস্কতার ভাবাবেগসর্বস্বতাকে মোক্ষমভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। অবশ্য 'সংস্কৃতি'র ধারণার সঙ্গে কিংবা 'সংস্কৃতি' শব্দটি উচ্চারণ মাত্র আমাদের সামনে এসে হাজির হয় সাহিত্য, দর্শন, সংগীত, অভিনয়, নৃত্য ও চারুকলার প্রসঙ্গ। তবেই এই সংস্কৃতি-অনুসঙ্গ বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজন হয় সমসাময়িক সমাজ-রাষ্ট্র-দেশ-কাল-স্থানের বাস্তবতা। কেননা সাহিত্য বলি আর চিত্রকলা যে-কোনো সৃজনশীল কর্মের আধার তো সংস্কৃতি তথা সংস্কৃতিবান মানুষ। সেকারণে সাহিত্যের পাতায় উঠে আসে সাংস্কৃতিক বাস্তবতার চিহ্ন ও চিহ্নায়কগুলি।

বস্তুত, বাংলার হিন্দু-সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য; আর মুসলিম-সংস্কৃতির মূল উৎস আরবি ভষায় লেখা কোরান এবং ফারসি ভাষায় লেখা কিছু কাব্য। হিন্দুরা জীবিকার তাগিদে ফারসি শিখল। কিন্তু মুসলিমকে সংস্কৃত ভাষা শেখার প্রয়োজন পড়ল না সেদিন। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, সকল সত্যের আকর ইসলাম ধর্ম, অন্য সকল ধর্মই মিথ্যা। ফলত দুই সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকৃত মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব

সম্ভব ছিল না। তবে এ-প্রসঙ্গে অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে খাটো করে দেখিয়েছেন তাঁর *মধ্যযুগের বাংলা বাঙালী* গ্রন্থে—

> "হিন্দুরা পীর-ফকিরকে শ্রদ্ধা করত তাঁদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার জন্য, কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট অন্ন বা পানীয় গ্রহণ করত না। প্রবাদে আছে, মীরজাফরের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করানো হয়েছিল— সম্ভবতঃ তাঁর বিশ্বাসভজন নন্দকুমারের পরামর্শে। এটা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মৃত্যু পথযাত্রীর যে-কোনো উপায়ে বেঁচে থাকার জন্য শেষ চেষ্টা, হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ নয়।"[১৩]

শাস্ত্র অনুশীলন, সাহিত্য সাধনা ও সংগীত চর্চার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থান খুব কম নয়। যে-সকল পণ্ডিতবর্গের নাম আমরা পাই তাঁদের মধ্যে নামী হলেন পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম (১৭৭৫ – ১৮৪০)। যিনি নাকি শারদীয়া পূজার নবমীর দিনেই দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের বিধান দিয়েছিলেন। আবার ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম পাওয়া যায় ডঃ অতুল সুরের *আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী* গ্রন্থে। যেখানে ডঃ সুর বলছেন যে, জগন্নাথ পণ্ডিত মারা যাওয়ার পূর্বে গঙ্গাঞ্জলী করবার সময় তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি তো দীর্ঘকাল ধরে শাস্ত্রানুশীলন ও ঈশ্বর সাধনা করলেন, এখন আমাদের বলে যান ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? জগন্নাথ উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঈশ্বর নিরাকার।"[১৪] এই হল আঠারো শতকের টোল-সংস্কৃতি।

তবে সংস্কৃতির স্বরূপ বহুধাবিচিত্র। অধ্যাপক মানস মজুমদার তাঁর *লোকঐতিহ্যের দর্পণে* গ্রন্থে সংস্কৃতিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা, ১. বস্তু-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি ২. বাক্-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি ৩. অঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ৪. খেলাধুলাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ৫. অঙ্কন-কেন্দ্রিক বা লিখনকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ৬. বিশ্বাস-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক সংস্কৃতি। আমরা এই বিভাগের মধ্যে থেকে আঠারো শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। খাদ্য-পানীয়, বাসস্থান, পরিধান-প্রসাধন দ্রব্য, যানবাহন, নেশাদ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি হল বস্তু-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির অনুসঙ্গ। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ভারতচন্দ্র রায় 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে বর্ধমানরাজের গড় নির্মাণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। আবার *মৈমনসিংহ গীতিকা*-এর 'দেওয়ান ভাবনার পালা'য় আছে বাংলার ঘরের প্রসঙ্গ। আছে জলটুঙ্গী ঘরের কথা। তাছাড়া ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে 'শালেভর পালা'য় আছে রানি রঞ্জাবতীর অঙ্গসজ্জা, 'আখড়া পালা'য় আছে দেবী পার্বতীর প্রসাধন কলার প্রসঙ্গ ইত্যাদি; যা কিছু সব বস্তু-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত। তবে 'ছড়া' হল বাক্-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির অন্যতম উদাহৃতি। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টানা নয় বছর জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলেছিল বর্গী হাঙ্গামা। মারাঠা-বর্গী সৈন্যদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল একের পর এক গ্রাম। গণমানসে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেই আতঙ্কের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ছড়ায়—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।।"[১৫]

আবার ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দরের কৌতুরারম্ভ' অংশে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম মিলনকে সার্থক করে তুলতে কবি সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেছেন—

"সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।

মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা।।
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন।।"[১৬]

সংস্কৃতিক বাস্তবতার অন্যতম চিহ্ন হল নৃত্য, বাদ্য, গীত, নাটক ও যাত্রা। *অন্নদামঙ্গল*-এ 'অন্নপূর্ণার শিবকে অন্নদান' অংশে ভোজনান্তে শিবের যে তাণ্ডবনৃত্য বর্ণিত হয়েছে তা আসলে বঙ্গসংস্কৃতির উদরপূর্তির উল্লাস আমার *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে ঘনরাম চক্রবর্তী দেবনর্তকী অম্বুবতীকে দিয়ে ইন্দ্রের সভায় লাস্যনৃত্য পরিবেশন করিয়েছেন। যা আসলে বঙ্গসংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ।

উপসংহার:

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অষ্টাদশ শতকীয় যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছিল তা কখনোই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ছন্দানুসারী নয়। কেননা, ইউরোপে অষ্টাদশ শতক ছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ। সাহিত্যে তখন এলিযাবেথীয় যুগের অবসান ও ভিক্টোরীয় যুগের উদ্বোধনকাল। স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজতন্ত্রের ক্ষীয়মান সংস্কৃতির সমাধির উপর যুক্তিবাদ নির্ভর বাস্তবভিত্তিক এক নতুন জীবনবোধের শিল্পীসদন নির্মিত হয়েছিল। যদিও সেদিনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ঝড় মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলি যেমন বিনষ্ট করেছিল তেমনি মনোভাবকে করেছিল উগ্রস্বভাবের। অপরদিকে বহির্বাণিজ্যকেও করে দিয়েছিল ম্লান। তবুও অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের ভাবাকাশ নতুন চেতনায় রঙিন হয়ে উঠেছিল। আর সাহিত্যে পড়ে সেই ভাবনার ছাপ। সেই বিচারে বাংলাদেশের সমাজচেতনায় তেমন কোনও মৌলিক রূপান্তর লক্ষিত হয়নি। তা সত্ত্বেও বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারা কালস্রোতে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। ফলত, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে কিছুটা হলেও নতুন আকর্ষণ অনুভূত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

১. বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), বিহারীলাল সরকার রচিত, *বঙ্গে বর্গী*, কলকাতা: কারিগর, ২০১৬, পৃ. ৭৫
২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ)*, পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা: জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৩, পৃ. ১৫৪
৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৯, পৃ. ৩৫২ – ৩৫৩
৪. পঞ্চানন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *রামেশ্বর রচনাবলী*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪০০, পৃ. ৪৪৬
৫. তদেব
৬. ড. অতুল সুর, *আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৩৬৪, পৃ. ৪৮
৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৯, পৃ. ১৪
৮. তদেব, পৃ. ১৩৩
৯. অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬, পৃ. ২৩৪ – ২৩৫

১০. শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়, *শাক্ত পদাবলী (চয়ন),* নবম সং, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ১১৩

১১. তদেব, পৃ. ১১৫

১২. সত্যজিৎ রায় (পরিচালিত), *পরশপাথর* (চলচিত্র), অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর সংলাপ

১৩. অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০ – ২৪১

১৪. ড. অতুল সুর, *আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

১৫. মানস মজুমদার, *লোক ঐতিহ্যের দর্পণে,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৪

১৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গোপাল হালদার। *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খণ্ড) প্রাচীন ও মধ্যযুগ।* দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: এ মুখার্জি এণ্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৩

২. ড. রঞ্জিত কুমার সমাদ্দার। *বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব (সন্ন্যাসী থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত)।* কলকাতা: বনমালী বিশ্বনাথ প্রকাশন, ১৩৮৯

৩. ড. জয়িতা দত্ত। *সমকালের প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য।* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০২

৪. ড. ভূদেব চৌধুরী। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়)।* সম্মার্জিত নতুন সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫

৫. ড. এম. এ. রহিম রচিত, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাবিব কর্তৃক অনূদিত। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস।* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩৮৯

৬. শ্রীসুকুমার সেন। *বাংলা সাহিত্যের কথা।* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯

৭. হারাধন দত্ত (সম্পাদিত), গঙ্গারাম দত্ত বিরচিত। *মহারাষ্ট্র পুরাণ।* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭৩।

জীবন ও শিল্পের দর্পণে প্রতিবিম্বিত নির্মল অধিকারীর 'দুটি কুঁড়ি' : পাঠকের অনুভবে

জীবনকৃষ্ণ পাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ
আগরতলা, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: লেখক নির্মল অধিকারী ত্রিপুরা রাজ্যের বাংলা সাহিত্য জগতের একটি উজ্জ্বল নাম। প্রবন্ধ-নিবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা রচনায় তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হতে পারেননি-- এটি তাঁর দুঃখ, বাঁধা পড়েছিলেন রসায়নশাস্ত্রে। এখন ত্রিপুরা সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'দুটি কুঁড়ি' গ্রন্থ পাঠকসমাজে বিপুল সাড়া ফেলেছে। 'দুটিকুঁড়ি' আসলে এক মলাটে দুটি আখ্যান অর্থাৎ একটি উপন্যাসিকা 'প্রত্যয়ী কর্তা' এবং একটি উপন্যাস 'আমি সুবর্ণলতা'-র গ্রন্থিত রূপ। দুটি আখ্যানেই রয়েছে মানব জীবনবোধ, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের সম্মিলন। জীবন ও শিল্পের যুগপৎ সমন্বয়ে 'দুটি কুঁড়ি'-র দুটি আখ্যান নির্মল অধিকারীর লেখনীর পরশে যে শিল্পসম্মত মেলবন্ধন রচনা করেছে, তা একে একে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকাশ করা হল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।
সূচক শব্দ: জীবনবোধ, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি, মনস্তত্ত্ব।

মূল আলোচনা:
সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রশ্নে খ্রিস্টজন্মের পূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁরা স্ব-স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র শৈল্পিক হবে, না সামাজিক হবে, কিংবা দুই-ই হবে - এ বিষয়ে তাঁরা তেমনভাবে মাথা ঘামানোর চেষ্টা করেননি। দার্শনিক প্লেটো কবিকে তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে স্থান দেননি, কারণ তিনি সাফ জানিয়েছেন, কবি সত্য-শিব নিরপেক্ষ সুন্দরের সাধনা করেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মহামতি অ্যারিস্টটল রসোত্তীর্ণতা, আনন্দময়তা ও শৈল্পিক সুষমা দানকে সাহিত্য-শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করলেও 'improvement of morals and progress of mind'- এর বিষয়টি পরোক্ষে উল্লেখ করেছেন।তাঁর পরে সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে দুটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে – 'Art for art's sake' এবং 'Art for life's sake'. এই মতবাদ দুটি কালে কালে সর্পিল ভঙ্গিমায় বহু তাত্ত্বিকের চিন্তার স্রোতে ভেসে এসে একাত্মরূপ লাভ করেছে 'আনন্দ রস বিরচনে' এবং 'গীতিরসধারা সিঞ্চিত ধূলিজাল'- এর মধ্যে।

প্রসঙ্গ বহির্ভূত এই ধরনের ভণিতাটি টেনে আনতে হল এই কারণে যে, সদ্য একটি বই আমার হাতে এসেছে, নাম --'দুটি কুঁড়ি', লেখক-- নির্মল অধিকারী। আগরতলা বইমেলায় বইটি এবছর (২০২৪) প্রকাশ পেয়েছে, ফলস্বরূপ বইটি নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রভাতী পত্রিকায় পাঠক-গুণীজনদের অনুভূতির সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। এতে আমি কৌতূহলী হয়েছি। 'দুটি কুঁড়ি'র নিটোল মলাটসহ সুচারু প্রচ্ছদময় কলেবর হাতে আসা মুহূর্তে বেশ তৃপ্তি অনুভব করি। 'দুটি

কুঁড়ি' আসলে দুটি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের যুগ্ম সংকলন গ্রন্থ। তিনশো তেষট্টি পৃষ্ঠার সুদৃশ্য গ্রন্থনার মধ্যে প্রথম বিরানব্বই পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে 'প্রত্যয়ী কর্তা' শীর্ষনামের উপন্যাসিকা বা নভেলেট এবং পরের দুশো ষাট পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে একটি উপন্যাস বা নভেল, আকার- আয়তন,স্থান- কালের পরিসরে অনেক বৃহৎ এই উপন্যাসটির নাম 'আমি সুবর্ণলতা'। লেখকের মতে 'প্রত্যয়ী কর্তা' উপন্যাসটি প্রথমে মুদ্রিত হয়েছিল একটি সংবাদপত্র প্রকাশনার পুজো সংখ্যায়। 'আমি সুবর্ণলতা' উপন্যাসটিও একটি সংবাদপত্রের রবিবাসরীয়তে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এখন পাঠকমহল পেলেন প্রায় অর্ধাবয়ব আখ্যান দুটির পূর্ণাবয়বিত রূপ গ্রন্থ—'দুটি কুঁড়ি'।

দুটি উপন্যাসের আখ্যানবৃত্ত আবৃত্ত হয়েছে আমাদের চেনাজানা চোখে দেখা আটপৌরে জীবন কাটানো আগরতলা শহর, শহরতলী, গ্রাম-ত্রিপুরা, জনপদ-ত্রিপুরা, পাহাড়-ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে। কখনো কখনো কলকাতা সহ বিস্তৃত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের অনুষঙ্গ এসেছে প্রসঙ্গ সূত্রে, সবশেষে আমেরিকা- আটলান্টা যাত্রা (আমি সুবর্ণলতা) 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাবনায় সমাপ্তি সত্যিকার অর্থে পাঠকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

'প্রত্যয়ী কর্তা' উপন্যাসিকার আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ মন ও মননশীলতায় প্রত্যয়ী পুরুষ সুরেশবাবু। তাঁকে ঘিরে আবর্তিত সাতচল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের সঙ্গিনী ঘরোয়া, সংসারী, প্রতিব্রতা চারুদেবী এবং তাঁদের তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, দুই নাতি এবং এক নাতনি। পরিবারটি মধ্যবিত্ত, যেখানে মূল্যবোধের দোদুল্যমানতা নেই বললেই চলে,কারণ-- রয়েছেন প্রত্যয়ী কর্তা সুরেশবাবু, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, তিনি আধুনিক নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির আদর্শ পুরুষ নন, তাঁর আদর্শ সমন্বয়ে, বন্ধনে, সংযমে ও অধ্যাত্মভাবনায় সম্পৃক্ত। তাই তাঁর পরিবার হল একটি ঈর্ষণীয় সুখী পরিবার। এই পরিবারের কয়েকজন সদস্যের কর্মজীবন আগরতলা শহরের অনতি দূরে কিংবা অতি দূরে অতিবাহিত হলেও তাঁদের মন পড়ে থাকে আগরতলার রামনগরে তাঁদেরই শান্তিকুঞ্জে-- সেখানে ঋষিপ্রবর সুরেশবাবু রয়েছেন। 'প্রত্যয়ীকর্তা'র আখ্যানে পঁয়ত্রিশটি শিরোনামের পরিচ্ছেদ রয়েছে-- 'শুভ অশ্বমেধ' থেকে 'স্বর্গ ও নরক'। স্বর্গ ও নরকের মধ্যে কোনটি শ্রেয় আর কোনটি অশ্রেয় তার নির্দেশিকার কথাটি বলতে লোভ হয় – "প্রেম ভালোবাসা নিয়ে দিক নির্ণীত পালতোলা নৌকোর সঠিক কান্ডারী সুরেশবাবু। উনি স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করে নরকের দ্বার বন্ধ করেছেন। একটা শান্তির বাণী-লালিত পরিবার উনাকে নির্ভর করে শাখা-প্রশাখা মেলেছে। প্রতিটা মেলায়, উদ্বোধনে স্পষ্ট শৃঙ্খলার ছাপ।"- এ এক অসাধারণ আখ্যান সমাপণী উচ্চারণ!

প্রকৃত অর্থে 'আমি সুবর্ণলতা' একটি আধুনিক উপন্যাস। উত্তম পুরুষে বর্ণিত দিনলিপির ঢঙ্গে লেখা উপন্যাসটি বিদগ্ধ পাঠকের হৃদয় কেড়ে নেবে। সচরাচর উপন্যাসগুলোতে যে ঘটনা- বর্ণনাধর্ম থাকে-- সে ধর্ম 'আমি সুবর্ণলতা'-তে নেই। আছে নায়িকা সুবর্ণলতার জীবনে চলার পথে দেখা জগতের ছবি। তাঁর জীবনে বড় হয়ে ওঠা এবং পূর্ণ-নারীত্বে উপনীত হওয়ার পেছনে আছেন বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা, স্বামী আশীষবাবু সহ শ্বশুরালয়ের সকলে। সুবর্ণলতার জীবনে চলার পথের পাথেয় সংযম, ব্রহ্মচর্য,অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সততা এবং কর্মে অবিচলতা - এসমস্ত কিছু তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনা ও আধ্যাত্মিক জীবন-দর্শনের উপকরণ মাত্র। আর এসব কিছুই তাঁকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া থেকে সফল আইএফএস অফিসার বানিয়েছে, দান করেছে জনকল্যাণকামী মননশক্তিতে ভরপুর এক তেজস্বিনী জীবনীশক্তি। এই শক্তি সমন্বিত হয়েছে পরাশক্তির সাথে। লেখক নির্মল অধিকারী সুকৌশলে সুবর্ণলতার চরিত্রের

উজ্জ্বলতাকে প্রতিভাসিত করার জন্য তাঁর বিপ্রতীপে কলু (কমলিকা)-কে নির্মাণ করেছেন। কলু উদ্ভিন্ন যৌবনে কামনার পঙ্ক-স্নান করে যে শাস্তি পেয়েছে, তা কার্যকারণ সম্পর্কিত হলেও তার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি কিছুটা পরিমাণে বর্ষিত হয়। 'আমি সুবর্ণলতা' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে পঁচিশ বছর বয়সি পূর্ণ আদর্শবতী নারীর অতীত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ পথে চলার অঙ্গীকার নিয়ে। সাতান্নটি পরিচ্ছেদে আলাদা আলাদা শিরোনাম দিয়ে লেখক নির্মলবাবু সুবর্ণলতার চরিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর মনের মানসী করে। এই মানসপ্রতিমার অভ্যুত্থান 'দাও ফিরে সে অরণ্য' দিয়ে, আর তার পরিপূর্ণ শিল্পরূপের বিকাশ ঘটেছে 'সোনালী ভবিষ্যৎ' -এর যাত্রাপথে। জীবন ও শিল্পের যুগপৎ সম্মিলনের মন্ময় ভাবনার চিন্ময় রূপ সুবর্ণলতা। কন্যা-জায়া-জননী সুবর্ণলতা সামাজিক দায়িত্ববোধে এক পরিপূর্ণা নারী। বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে আশাপূর্ণাদেবীর 'সুবর্ণলতা' আর একুশ শতকের কথাসাহিত্যে নির্মল অধিকারীর 'আমি সুবর্ণলতা'-য় স্থান-কাল-পাত্রভেদে নারী স্বাধীনতার যে স্বর্ণরেখা অঙ্কিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে-- এই আশা অকপটে ব্যক্ত করতে হয়।

লেখক নির্মল অধিকারী নীতির মানদণ্ডে 'দুটি কুঁড়ি'র দুটি আখ্যান রচনা করেছেন জীবন ও শিল্পের সমন্বয় সাধন করে। লেখকের মানবতাবাদী জীবনদর্শন আখ্যান দুটির প্রধান চরিত্রগুলোর মনোজগৎ নির্মাণে সহযোগিতা করেছে। তাই চরিত্রগুলোর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ও ভাবনায় উঠে এসেছে সমকালের অসঙ্গতি, কদাচার ও নীতিহীনতার পরিপন্থী স্পষ্ট চিন্তা এবং আবেগ। আখ্যান দুটির পরতে পরতে স্পষ্ট চিন্তা ও আবেগ উজ্জ্বল মণিখণ্ডের মত ঝিকমিক করে আলোর কণার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে। কখনো লেখক চরিত্রগুলোর বক্তব্যে নিয়ে এসেছেন satire, আবার কখনো wit, নির্দ্বিধায়, অকুতোভয়ে যে বাচনভঙ্গি লেখক চরিত্রোপযোগী করে পাঠক সমাজে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, সেগুলোর জন্য তিনি কী সমাজনীতি, কী রাজনীতি, কী শিক্ষানীতি, কী চারিত্র্যধর্ম - সব ক্ষেত্রে কোথাও খাতির রেখে কথা বলেননি। বিপথগামী সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এমন স্পষ্টবাক্‌ হওয়াটাই উত্তর আধুনিক শিল্প-সাহিত্য সাধকের কাজ। অধিকারী মহাশয় সেই কাজটি করেছেন।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও এই নিবন্ধে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার চেষ্টা করা যেতে পারে, যেগুলি লেখক নির্মল অধিকারীর সমাজ-সচেতন শিল্পীমনকে বুঝে উঠতে সাহায্য করবে।

বর্তমান সামাজিক জীবন থেকে জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরি মুছে যায়নি। ভবিষ্যতে মুছে যাবে --এ বিষয়ে সম্ভাবনা রয়েছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। বহুকাল আগের থেকে এই ব্যাধি সমাজদেহে আশ্রয় নিয়েছে, সৃষ্টি করেছে গভীর ক্ষত। আসলে সামাজিক মানুষের এ বিষয়ে রয়েছে অজ্ঞতা। বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথা যে এক নয়, তা লেখক সরলভাষ্যে বিবৃত করেছেন, কিন্তু এতে তাঁর নিজস্ব ভাবনাকে আরোপিত করেননি। তিনি ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’র আশ্রয় নিয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ঔদার্য ও মহানুভবতাকে পুরিস্ফুট করেছেন। যেমন –

অ) “ছেলে পছন্দ করে বিয়ে করাতে অসবর্ণেও মত দিতে হয়েছে। আজকাল এতটা না মানলেও, গীতা মানলে এ বিধি বিজ্ঞানসম্মত। এর মধ্যে শাস্ত্রীয় কোন সংঘাত নেই।” (অতীত ছাপ/ প্রত্যয়ী কর্তা, পৃষ্ঠা - ১০)

আ) “আমাদের বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল সে সহজাত গুণের পরিপূরক। ওটা কখনো জাতিভেদ প্রথা নয়।” (দাও ফিরে সে অরণ্য! / আমি সুবর্ণলতা, পৃষ্ঠা - ১০৫)

লেখক নির্মল অধিকারী আখ্যান দুটির পরতে পরতে ঠাস বুনোটে আধুনিক মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর নিরাবেগ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে অকুতোভয়ে উচ্চারণ করেছেন

বর্তমান সমাজে নারীদের অবস্থান এবং নারী-স্বাধীনতার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে। রাজনীতিবিদদের খেলন প্রক্রিয়ায় বর্তমান সামাজিক জীবনে নারীরা যে খেলনায় রূপান্তরিত এবং তাঁদের স্বাধীনতা যে আপ্তবাক্য মাত্র, তা লেখক অকপটে বলতে বিন্দুমাত্র সংকুচিত হননি। এছাড়া এই বিষয়টি বুঝেও বর্তমানে এক শ্রেণির নারী তাঁদের স্বাধীনতার নামে যেভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করার চেষ্টা করছেন, তা যে সুস্থ সমাজের পক্ষে একেবারে কাঙ্ক্ষিত নয়--লেখক এ বিষয়টিও উল্লেখ করতে ভোলেননি। যেমন -

অ) "মেয়েরা এখনো রিস্ক জোনে থাকে। নারী- স্বাধীনতা তো পলিটিশিয়ানদের নাকের নথ্। পরালে কিম্ভূতকিমাকার লাগবে।" (অতীত ছাপ / প্রত্যয়ী কর্তা, পৃষ্ঠা- ১১)

আ) "আজকের নারীদের স্বাধীনতার নামে, সতীত্ব বালাইহীন, সংযম নেই, শৃঙ্খলা পদদলিত। যে যন্ত্রীর হাতে ওরা চালিত হচ্ছে, যন্ত্র বেসুরো বাজছে।" (তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র / আমি সুবর্ণলতা, পৃষ্ঠা- ১৪১)

মানব সভ্যতা বর্তমানে রাজনীতির রঙে রঞ্জিত। মানুষের পরিচয় রাজনীতির মানদণ্ডে মাপামাপি করে প্রকাশ করার চেষ্টা কিংবা গ্রহণ করার চেষ্টা যাই হোক না কেন পৃথিবীর গভীরতর এই অসুখ ক্রমশ বেড়েই চলছে। তাই রাজনীতিক কলা-কুশলীদের ভন্ডামি, চতুরতা ও কৌশলী চালের বিষয়ও ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে শিখেছে। আবার রাজনীতিকদের আশ্রয়ে একশ্রেণির মাফিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে, এদের বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম থাকলেও এরা এই মাফিয়া শ্রেণিকে প্রতিভাত করে। লেখক নির্মল অধিকারীর কলমে উঠে এসেছে এ বিষয়ে হতাশার সুর। যেমন -

অ) "সব আমলেই জাহাজ আনার সুড়সুড়ি ছিল। এবার একটু বেশি হল। গোমতী, হাওড়াতে নয়।" (হাওড়া দূষণ / প্রত্যয়ী কর্তা, পৃষ্ঠা- ৩০)

আ) "'জমি মাফিয়া' - মানুষ জানে, নতুন আমদানি 'সিন্ডিকেট মাফিয়া', 'এডু মাফিয়া'- এ দেশটা বোধহয় ডুবন্ত একটা তরীর চেহারা নিচ্ছে।" (এডুকেশন মাফিয়া / প্রত্যয়ী কর্তা,পৃষ্ঠা- ৭১)

বর্তমান সময়ে শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে লেখক নিরাবেগ, নিরপেক্ষ, বিচার-বিশ্লেষণী দৃষ্টিজাগর মন্তব্য রাখার চেষ্টা করেছেন। একালে অনলাইন-এ পঠন-পাঠন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে মোটেই সক্ষম নয় - এ কথা লেখক দৃঢ়তার সাথে তাঁর আদর্শ চরিত্রের ভাবনায় উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া শিক্ষকদের সাথে শিক্ষিকারাও সমানতালে, সমান ছন্দে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নতির সোপানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন - এখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়, কিন্তু জননেতারা সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এই সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। লেখক অসন্তোষের সুরে একথা জানিয়েছেন যে, এটা কখনোই মঙ্গলকর হতে পারেনা। যেমন -

অ) "আসলে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্রদের উত্তর-জীবনকে প্রভাবিত করে, তাদের উন্নতি অবনতির নিয়ামক শিক্ষক শিক্ষিকা। তাই তাদের দায়িত্ব ভাবা যায়। অনলাইনে ওইটার অভাব হয়।" (অনলাইন শিক্ষা / প্রত্যয়ীকর্তা, পৃষ্ঠা -৩৯)

আ) "মন্ত্রী মশাই নাকি শহর থেকে মফস্বলে দূরের স্কুলে কোন শিক্ষিকার পোস্টিং পছন্দ করেন না। কিন্তু হায়! সীমান্ত পারে বা দুর্গম এলাকার ছাত্রীরা কার থেকে সব শিক্ষা পাবে? ভাবলে মনে হয় যেন, এই এলাকায় মেয়ে বাচ্চার জন্মই নেই।" (নারীর সতীত্ব / আমি সুবর্ণলতা, পৃষ্ঠা-১২২)

উচ্চশিক্ষার নামে যেভাবে দেশজুড়ে ঢ্যাঁড়া পেটানো চলছে, বলাই বাহুল্য তাতে যে অন্তঃসার শূন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে লালন করা হচ্ছে --এ বিষয়টি লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। যেমন –

অ) “অ,আ, ক, খ... শিখে বিশাল ডিগ্রি নেওয়া 'লিটারেশন', আর তা মজ্জাগত, চরিত্রগত করা হল-- 'এডুকেশন', আজকাল যে মেধাবী পণ্ডিতদের কথা হয়,ওরা এডুকেটেড কিনা, তা ওদের অ্যাক্টিভিটিতে সূচিত হয়।” (এডুকেশন মাফিয়া / প্রত্যয়ী কর্তা,পৃষ্ঠা -৬৯)

আ) “উচ্চশিক্ষা দপ্তর কলেজ খুলছে, বহু গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে, কলেজের অ্যালামনি নিয়ে সবাই ব্যস্ত, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের ফিডব্যাক কোথায়?” (শ্রান্তির স্তর / আমি সুবর্ণলতা, পৃষ্ঠা-২৮০)

আদর্শ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে নিহিত আছে পারিবারিক জীবনে সুস্থতা,সুন্দরতা ও স্বর্গীয় সুষমা। আদর্শ দাম্পত্য জীবন কীভাবে নারী ও পুরুষকে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে --এ বিষয়টি লেখক তাঁর সৃষ্ট আদর্শ চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লেখকের ভাষায়--

আ) “মিলনাগ্রহ তখন সদর্থক রূপ নেয়, যখন দুটি প্রাণ শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় রূপময়তায় জীবনীয় হয়।” (প্রণয় মন্থন / আমি সুবর্ণলতা, পৃষ্ঠা- ১৩২)

আ) “স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর আদর্শবোধ বা একাত্ম হওয়ার সম্মিলিত প্রচেষ্টা, দুটো মনের আলাদা হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। উভয়কে উভয়ে প্রীত করার অভ্যেস, বন্ধনের মূল রহস্য।” (জন্মগত সম্পদ / আমি সুবর্ণলতা, পৃষ্ঠা- ১৮৭)

নির্মল অধিকারী ত্রিপুরা রাজ্যের বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। এ রাজ্যের দৈনিক প্রভাতী পত্রিকার পাতায় পাতায় তাঁর গল্প-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নানা বিষয়ের নির্ঝর আমরা প্রত্যক্ষ করি। ইতিপূর্বে দু'একটি মুদ্রিত গ্রন্থও তিনি ভূমিষ্ঠ করেছেন। সেগুলোর সাথে 'দুটি কুঁড়ি' গ্রন্থটি সংযোজিত হল, আর এই সুচারু সংযোজনার দায়িত্ব নীহারিকা প্রকাশনীর কান্ডারী তীর্থঙ্কর দাস মহাশয় যথাযথভাবে পালন করেছেন, তাঁকে সাধুবাদ জানাই। গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের সময় সামান্য কয়েকটি প্রমাদ বিষয়ে শ্রীদাস মহাশয় যথেষ্ট যত্নবান হবেন, এই আশা রাখি। লেখক নির্মল অধিকারী মহাশয়ের কাছে আশা করব যে, তিনি আরও আরও এই ধরনের লেখা আমাদের জন্য লিখবেন, ভবিষ্যৎ-পাঠকের চাহিদাও মিটিয়ে যাবেন, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য-সম্পদের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ করে যাবেন।

আকর গ্রন্থ:

১. ‘দুটি কুঁড়ি’ - নির্মল অধিকারী, নীহারিকা প্রকাশনী, আগরতলা, ২০২৪

২. অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স তথ্যে ও তত্ত্বে - ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০২১।

প্রান্তজনের ধারায় মতুয়া সঙ্গীত : শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন

টোটন বিশ্বাস
অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
পি. আর. ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজ, ঠাকুরনগর

সারসংক্ষেপ: মতুয়ারা সনাতন হিন্দু ধর্মের একটি সম্প্রদায়, যারা মূলত নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত; এক প্রান্তিক জনসমাজ। মতুয়াদের গান তথা সংগীত, মতুয়া সঙ্গীত হিসেবে পরিচিত। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'কীর্তন দল' হরিনাম সংকীর্তন ও ভক্তি প্রেমে মত্ত হয়ে ঈশ্বর সাধনার সহজ সরল মত ও পথ, স্বল্প সময়ে স্থানীয় নমঃশূদ্রদের আকৃষ্ট করে। হরির নামে কীর্তনে মেতে থাকা ভক্তিবাদী মানুষগুলি যারা বেদ-বিধি বা ব্রাহ্মণদের ধর্মগুরু হিসেবে মান্য না করে, শুধুমাত্র হরিনাম ভক্তি প্রেমের মধ্যে সমস্ত রকম আধ্যাত্মিক ও জাগতিক আনন্দ খুঁজে পায় তাঁরাই 'মতুয়া'। মতুয়া সংগীতে যেমন আধ্যাত্মিক চেতনার কথা বলা হয়েছে, তেমনি বাস্তব জগতে চলার পথকে সুগম করতে দেওয়া হয়েছে পথ নির্দেশও। বলা হয়েছে এক নারী ব্রহ্মচারীর কথা, পর সুখে সুখী হবার কথা বলা হয়েছে। ষড়-রিপুর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা, পিতা-মাতা তথা গুরুজনদেরকে মান্যতা দেওয়া তথা শ্রদ্ধা প্রদানের শিক্ষাও দেয় মতুয়া সংগীত।
সূচক শব্দ: মতুয়া, নমঃশূদ্র, সঙ্গীত, শিক্ষা, সমাজ।

মূল আলোচনা:
মতুয়ারা সনাতন হিন্দু ধর্মের একটি সম্প্রদায়, যারা মূলত নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত; এক প্রান্তিক জনসমাজ। মতুয়াদের গান তথা সংগীত, মতুয়া সঙ্গীত হিসেবে পরিচিত। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'কীর্তন দল' হরিনাম সংকীর্তন ও ভক্তি প্রেমে মত্ত হয়ে ঈশ্বর সাধনার সহজ সরল মত ও পথ, স্বল্প সময়ে স্থানীয় নমঃশূদ্রদের আকৃষ্ট করে।[1] হরির নামে কীর্তনে মেতে থাকা ভক্তিবাদী মানুষগুলি যারা বেদ-বিধি বা ব্রাহ্মণদের ধর্মগুরু হিসেবে মান্য না করে শুধুমাত্র হরিনাম ভক্তি প্রেমের মধ্যে সমস্ত রকম আধ্যাত্মিক ও জাগতিক আনন্দ খুঁজে পায় তাঁরাই 'মতুয়া'।[2] মতুয়া সাহিত্য সংস্কৃতির অন্যতম শাখা হল মতুয়া সংগীত ও মতুয়া পদগীতি।[3] মতুয়া সংগীত তথা মতুয়াদের গানের মূল তিনটি গ্রন্থ তথা বই রয়েছে; যথা- শ্রীমৎ অশ্বিনী কুমার সরকার প্রণীত 'শ্রীশ্রী হরি সংগীত'; কবি রসরাজ শ্রীমত তারক সরকার প্রণীত 'শ্রীশ্রী মহাসংকীর্তন' এবং 'মতুয়া সংগীত' যা মতুয়া ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রণীত। সুতারাং "মতুয়া ভক্তরা যে গান লিখেছেন, তাকেই মতুয়া সংগীত বলে।"[4]

এখন যে প্রশ্ন হল - মতুদের গান তথা সংগীতের মাধ্যমে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে কি? যদি হয়ে থাকে তবে তা কতটা? শ্রীমৎ অশ্বিনী কুমার সরকার প্রণীত 'শ্রী শ্রীহরি সংগীত' এর ২৩ নং পৃষ্ঠায় তথা ৩২ নং গানে রয়েছে যে,-

"কামিনী কালনাগিনী ফনীনির বিশাল বিষ।
ও যার নিঃশ্বাসে ব্রহ্মান্ড নাশে, না জেনে কেন হস্ত দিস।।"[5]

এখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, না জেনে বুঝে কাম কামনার জন্য নারীর পিছনে ছুটলে, তার পতন অনিবার্য। উক্ত বিষয়টির সু সমাধানের পথ বলে দেওয়া হয়েছে, ওই গানের চতুর্থ কলিতে। যথা-

"সে ফনির মন্ত্রগুণ ভাই, শ্রীগুরুর দোহাই,
হরির নামটি মহামন্ত্র, তা বিনে আর নাই।
গুরুর বাক্য করে ঐক্য, মা বলে ধুলি পরা দিস্।।[6]

উক্ত কলির মাধ্যমে নারীর মোহপাশ থেকে মুক্তি পেতে হলে, গুরুচাঁদ ঠাকুরের দেওয়া 'মা' বলা ধূলি অর্থাৎ মাতৃ সম্মোধনে তার সমাধান করতে হবে। মাতৃজাতি মা ডাকে তুষ্ট হন, ঠাকুর তার ভক্তদের বলেছেন, নারী জাতিকে মাতৃরূপে দেখতে, নারীর মোহপাশ থেকে মুক্ত থাকতে।
শ্রীশ্রী হরি সংগীত -এর ২৮ তম পৃষ্ঠায়, ৩৮ নং গানে রয়েছে যে-

"মতুয়াপাড়া উঠেছে সাড়া , শুনলেম তাদের আইনকড়া
কারুর কুলের গৌরব থাকলে পরে,
এ দলে কেউ হ'সনে খাড়া।।[7]

এই অংশের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে, মতুয়া আইন ভীষণ কড়া। তাদের মতে কুলমানের গৌরব থাকলে, তাদের এই দলে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

শ্রীশ্রীহরি সংগীতের ৬৫ নং গানে তথা ৪৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে যে,

"দেবের দুর্লভ প্রেম ভক্তি, লয়ে অগতির গতি।
সদয় হয়ে জীবের প্রতি, এসেছে দিতে।।[8]

সাধক ভক্ত শ্রীঅশ্বিনী গানের মধ্য দিয়ে মানুষকে চেতনামুখী করেছেন। গানটিতে আরো বলা হয়েছে,-

"গুরু-নিষ্ঠা নামে রুচি, এই ধর্ম হয় সর্বশুচি।
এবার প্রাপ্ত হয়ে হাঁড়ি, মুচি, গিয়াছে মেতে ।।"[9]

প্রেম ভক্তি, নিষ্ঠা, নামে রুচি থাকলে, জাতপাতের উর্ধ্বে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। শ্রীশ্রীহরি সংগীতের ৪৮ নং পৃষ্ঠায়, ৬৬ নং গানে রয়েছে যে,

"কেন কর ভাই দ্বেষাদ্বেষী,. . . "[10]

এই অংশের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে,মানুষ জাত পাতের উর্ধ্বে; সর্বোপরি সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে সকলেই রক্তমাংসের মানুষ; তাই দ্বেষাদ্বেষী, দলাদলি না করাই শ্রেয়।
'শ্রী শ্রী হরি সংগীত'- এর ৬৫ নং পৃষ্ঠায় তথা ৯১ নং গানে বলা হয়েছে যে,-

"নিষ্কাম সুখ বড় আনন্দ, তাতে নাই কামের গন্ধ,
যে জন ভবে করেছে, সেই মদন কে বন্ধ।
ও তার হৃদয় দোলে প্রেমানন্দ, নিরানন্দ নাই কখন।।"[11]

এ যেন স্পষ্ট ব্যাখ্যা, নিষ্কাম প্রেমের মধ্যে কোন কামের ভাবনা থাকে না। পথ নিজেকে বেছে নিতে হয়। সংযমকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে; ক্রমে কাম কামনা পরিত্যাগ করতে হবে; তবেই আসবে প্রেমানন্দ। একই সূত্র ধরে এক নারী ব্রক্ষচারীর কথা বলা হয়েছে।
"শ্রী শ্রী হরি সঙ্গীতের ৬৮ নং পাতায় তথা ৯৪ নং গানে বলা হয়েছে যে, -

"মান অপমান যাহার সমান তার মতো আর মানি কে।
শুভ-অশুভ সমজ্ঞান, তার তুল্য নাই ত্রিলোকে।।"[12]

মান অপমানকে সত্য বলার জন্য সমদৃষ্টিতে দেখে, সুখ-দুখে কখনোই ভেঙে না পড়ে, সুখ দুঃখ কাটিয়ে উঠে জীবনে এগিয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। হরির নামে, কীর্তন মেতে থাকা মানুষগুলি, যারা বেদবিধি বা ব্রাহ্মণদের ধর্মগুরু হিসাবে মান্য না করে, শুধুমাত্র হরিনাম ভক্তি প্রেমের মধ্যে সমস্ত রকম আধ্যাত্মিক ও জাগতিক আনন্দ খুঁজে পায় তাঁরাই মতুয়া। সুতরাং

"হরিনাম সংকীর্তনকারী একটি ভক্তিবাদী সম্প্রদায় হল মতুয়া সম্প্রদায়"।[13] হরিনামে যাদের নিষ্ঠা ভক্তি আছে, তাঁরাই মতুয়া। হরিচাঁদ-কে মনে করে দুঃখহারি মানব প্রেমিক। এরা সংকীর্তনে হরিবোল হরিবোল বলে; ডংকা, কাশি, খোল, শিঙা বাজায়; উদ্দাম নাচে, ধুলায় গড়াগড়ি দেয়। আবেগে বয়সের ব্যবধান ভুলে, নারী পুরুষের ফারাক ভুলে, হরিবল বলে। নিজেকে হিন্দু-মুসলিম খ্রিস্টান মনে করে না, জাত পাতের অবসান চায়।[14]

বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে, মতুয়া সম্প্রদায় শুধুমাত্র ভারত ও বাংলাদেশই নয়, রয়েছে আরও বিভিন্ন স্থানেও। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. গবেষক এবং গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক তন্ময় মালাকার মহাশয় বলেন, "মতুয়ারা ওড়াকান্দিতে ১৯৪৭ এর পূর্বে ব্রিটিশ শাসনকালে একটি সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে ওঠে। বেদের চতু:বর্ণ ব্যবস্থা শূদ্রদের থেকেই নমঃশূদ্রদের উদ্ভব; নমঃশূদ্রদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তৎসঙ্গে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে, মতুয়ারা এবং তাদের সংগীত বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করলেও, তারগতি ছিল শ্লথ। তবে শিক্ষার বিকাশের মধ্য দিয়ে জাতির মেরুদন্ড শক্ত করতে চেয়েছিল। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গবেষণার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই সম্প্রদায় তথা সমাজের মধ্যে শিক্ষার উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নও ঘটেছিল। যা ক্রমে পশ্চিমবঙ্গে, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের হাত ধরে অগ্রগামী হয়েছে বলে মনে করা হয়।"[15] মতুয়াচার্য স্বপন কুমার মন্ডলের মতে,- মতুয়া সঙ্গীত, মতুয়া ভক্তদের ভাব জগতের এক মহা মূল্যবান সম্পদ। গ্রাম বাংলার নমঃশূদ্র সমাজ মতুয়া ভক্ত। তারা, তাদের আরাধ্য দেবতা শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদের প্রতি নিজেদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি অর্ঘ, এই গান গুলির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেন; মতুয়া সঙ্গীত তারই ফসল। ভগবানের প্রতি ভক্ত হৃদয়ের নৈবেদ্য মতুয়া সঙ্গীত। নাম সংকীর্তন ও মহোৎসব মতুয়া ধর্মের একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সঙ্গীতের মাধ্যমে হরিচাঁদ ঠাকুরের সাম্য মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শে ভক্তরা উদ্বুদ্ধ হয়। জাত-পাতে শতধাবিভক্ত মানুষদের মহোৎসবে মহাপ্রসাদ গ্রহণে এক সারিতে সামিল করতে সমর্থ্য হয়েছিলেন।[16]

শ্রীমৎ তারকচন্দ্র সরকার রচিত, 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন'-এ বলা হয়েছে যে,-

"হিংসা, দ্বেশ,লেশ, শূন্য কলুসি করিতে ধন্য একাচারী
ব্রাহ্মণ, চড়াল, তাঁতি, জোলা, মুচি হাড়ি জাতি গো
সব মিলছে বলছে হরি হরি গো।"[17]

হরিচাঁদের প্রেমনামে, কীর্তনে মত্ত ভাববাদী শাসকগণ হরিনামকেই জীবন মরণের সঙ্গী করে নেয়। তারা সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে, মহাসংকীর্ত্তনে মত্ত হয়ে প্রেমরস আস্বাদন করে। আসলে একত্রিত হয়ে রচনা করে আনন্দমেলার; যেখানে প্রেম, ভালোবাসা, ভাতৃত্বের ভাবনায় তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। মতুয়াদের নাম গান ও কীর্তনের বিশেষ স্বতন্ত্রতা আছে। হরিনাম সংকীর্তন এ সব সময় আধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদী সংগীতে আবদ্ধ না থেকে, হিন্দু সমাজের সংকীর্তন, জাত পাতের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে সমাজকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়াস ফুটে উঠেছে মতুয়া সংগীত গুলির মধ্যে।"[18] বিশিষ্ট লেখক হরিবর বালা ঠাকুরের মতে, মতুয়া সংগীতে আছে আবেগ, এই আবেগকে গানে, সুর-লয়ের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়। হরি ঠাকুর কে ভালবেসে, নিপীড়িত লাঞ্ছিত অবহেলিত মানুষ, যারা পরের দর গ্রস্থ হয়ে ঘুরে বেড়াত; ঠাকুর তাদেরকে পথ দেখান। যারা আত্মানুভূতি লাভ করেছিল; তারা গান রচনা করেছিল; তাই হল মতুয়া সংগীত।[19]

ডঃ বিরাট বৈরাগ্য লোক কবিগনের স্মৃতিচারণা করে বলেন, লোক কবিদের কবিগান নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণার মধ্যে উঠে এসেছে, সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি আন্দোলনে, নারী জাগরণে, স্বাস্থ্য সচেতনতায়, মাদকদ্রব্য বর্জন, পণ-প্রথার বিরুদ্ধে মানব মনে চেতনার উন্মেষ ঘটানো। লোক কবিগণ লোক শিক্ষক সমাজ সংস্কারক ও প্রকৃত মানব ধর্মের পূজারী।[20] সুনীল কুমার হালদার নামে একজন মতুয়া ভক্ত কিছুটা অভিমানের সুরে বলেন যে, "নম:শূদ্র তথা এসসি অর্থাৎ তপশসিলভুক্ত মানুষজন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ঠিকই, মতুয়া সংগীতের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে। তবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিভিন্ন পদে থেকে এই ব্যক্তিরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ভুলে যাচ্ছে; ভুলে যাচ্ছে মতুয়া সম্প্রদায়ের কথা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা; তথা দায়িত্ব কর্তব্যের কথা।"[21] প্রকাশ বিশ্বাস নামক একজন শিক্ষা বন্ধু তথা কো- অর্ডিনেটর সি. আর. সি. (মালীপোতা সি. আর. সি.) বলেন যে, বর্তমান বাংলায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে, বিশেষ ভাবে চৈতন্যদেবের হরিনাম সংকীর্তন এবং মতুয়া ভক্তবৃন্দের যে সংগীত অর্থাৎ মতুয়া সঙ্গীতের (শ্রী শ্রী হরি সংগীত, শ্রী শ্রী মহাসংকীর্তন ও মতুয়া সংগীত) প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মূলত মতুয়াদের আরাধ্য দেবতা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর সমস্ত মানুষকে ডঙ্কা, কাশি, সিঙ্গা বাজিয়ে হরিবল বলে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে সঙ্গীত প্রিয় মানুষদের কাছে আজ হরি সংগীত, মহা সংকীর্তন দুটি বইয়ের গানগুলি না থাকলে হয়তো মতুয়াদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে যেত।[22] তাই তিনি মনে করেন যে, হরি সংগীত মহাসংকীত্তন এবং মতুয়াসংগীত মতুয়া ভক্তদের কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা লিখে ব্যক্ত করা প্রায় অসম্ভব; খানিকটা উপলব্ধির বিষয়। মতুয়া ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে মতুয়া কাব্য, মতুয়া প্রবন্ধ, হরি যাত্রা, মতুয়া নাটক, মতুয়া পদগীতি রচনায় মহিলারা ও পিছিয়ে থাকেননি। তারাও পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে সক্রিয় থেকেছেন, সৃজনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।[23] গবেষক বিরাট বৈরাগ্য তার 'মতুয়া পদগীতি সাহিত্য : মহিলা গীতিকার' শীর্ষক বইটিতে ৪১ জন মহিলা পদকর্তার কথা বলেছেন। উসারানী সমাজপতি, রবি প্রভা সরকার, ছবি বালা, মনমোহিনী বিশ্বাস, লিলি হালদার, পাপিয়া রায় হালদার, সরস্বতী বিশ্বাস, বিথীকা বিশ্বাস, আরতি ঠাকুর, স্মৃতিকণা নাগ, ঝরনা সরকার, সুলতা মালি প্রমূখদের কথা জানা যায়।[24] এছাড়াও ড. পুষ্প বৈরাগ্য, নিরুপমা বিশ্বাস, শান্তিলতা রায়, তন্দ্রা কর (সরকার), চপলা মজুমদার, কৃষ্ণা মিত্র, সুস্মিতা ঠিকাদার, মায়ারানী মল্লিক, পূর্বাশা মন্ডল, ময়নামতি ঠাকুর, কেয়া মন্ডল মহলাদার প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।[25] বাংলায় উনিশ শতকীয় কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণ যেমন নারী জাগরণের বার্তা বহন করে এনেছিল, (যদিও এই নবজাগরণ ছিল শহরকেন্দ্রিক, উচ্চ বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এর প্রভাব গ্রাম বাংলার অন্ত যে সমাজে পড়েনি) তেমনি মতুয়া রেনেশাঁ তত অধিক নারী জাগরণ ঘটিয়েছিল; এই জাগরণের ফল পরিণাম এত নারী দ্বারা রচিত পদগীতি রচনার ঘটনা।[26] মহিলা পদগীতি রচনায় বেশ কয়েকজন মহিলা কবি সহস্রাধিক মতুয়া গীতি রচনা করেছেন। কেউ কেউ তাতে সুরারোপ করে সংগীত আকারে পরিবেশন করে চলেছেন। মহিলা কবিরা দস্তর মত শিক্ষিতা, অনেকেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত, অনেকেই সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে চাকুরীরতা, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অধ্যাপিকাও।[27] নমঃশূদ্র আন্দোলন ও মত আন্দোলনের পশ্চাতে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির ভূমিকা লক্ষণীয়। কবি রসরাজ তারক চন্দ্র সরকার ছিলেন, পূর্ব বাংলার প্রখ্যাত কবিয়াল ও শ্রী শ্রী হরি লীলামৃত গ্রন্থের রচয়িতাও। তার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে কবি গানের সংস্কার সাধিত হয়েছিল। কবি গানকে অশ্লীলতার পঙ্খিল থেকে মুক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে

প্রতিষ্ঠা করেন। মতুয়া প্রভাবিত কবি গানের ধারার তিনি সার্থক প্রবর্তক।[28] কবি গানের বিষয়ক নানা তথ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করত।[29] হরিসভায়, শান্তিসভায়, মতুয়া মহোৎসবে, মতুয়া সংগঠনের সর্বোপরি মতুয়া ধর্ম আন্দোলনে, নারীরা আজ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন।[30] মতুয়া সংগীত তথা মতুয়াদের গান যে শুধুমাত্র শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের কাজ করেছে এমন নয়, এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১০০ জন মানুষের সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তারা প্রায় সকলেই মনে করেন যে, সমাজ মতো সংগীত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তথা সামাজিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে যুবসমাজের উপরে কোন প্রভাব আছে কি? -এই প্রশ্নটির প্রেক্ষিতে বেশিরভাগ মানুষই বলেছেন প্রভাব আছে, তবে কম। ফুলসরা-পাঁচপোতা, চাঁদপাড়া নিবাসীশম্ভু সরকার বলেন, -"যুবসমাজ মতুয়াদের গানের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত। শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্নের যুবকেরা একত্রিত হচ্ছে।"[31] তবে সৌমি বিশ্বাস নামে এক গৃহবধূ (পাঁচপোতা নিবাসী) পরোক্ষ প্রভাবের কথা বলেছেন।[32] তবে ভাদুড়িয়া নিবাসী অমিত বিশ্বাসের মতে, "যুব সমাজে মতুয়া সংগীতের প্রভাব নেই।"[33] উত্তর ২৪ পরগনার রামচন্দ্রপুরের অধিবাসী রূপালী বাইন মনে করেন যে, "গান শুনলেও সবাই গানের সঠিক অর্থ বুঝতে পারে না। যদি ১০০ জন লোক থাকে; হয়তো ১০ জন বোঝে। তাই সামাজিক উন্নয়ন হলেও, তার মাত্রা কম বলে মনে হয়।"[34] বসিরহাট নিবাসী বামন দাশ কুন্ডুর মতে, "প্রভাব আছে বলেই মতুয়া সমাজ আজ এগিয়ে চলেছে।"[35] তবে মহিষাকাটি, উত্তর 24 পরগনার আধিবাসী বাপি ভক্ত, যুব সমাজ বা সাধারণ সমাজের প্রেক্ষিতে মতুয়াদের গান তথা সংগীতের প্রভাবে বিষয়টিকে নস্যাৎ করেছেন।[36] অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনার ভাদুড়িয়া গ্রামের অধিবাসী পরিমল মন্ডলের মতে, "সামাজিক উন্নয়নে মতুয়াদের সংগীত কাজ করেছে এবং তা পরবর্তীতে আরও প্রসারিত হবে।"[37] বাংলার দলিত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সরব হয়েছিল। মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তার পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় উনবিংশ শতকে শেষে, উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের শোষণবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পূর্ববঙ্গ উচ্চবর্ণের মধ্যে কংগ্রেসের ভিত্তি শক্ত হলে, নমঃশূদ্র মতুয়াদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে নমশূদ্রদের এই সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে, সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদের ভাষাই লুকিয়ে ছিল। এমনই উল্লেখ করা হয়েছে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ সেন সম্পাদিত 'জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ' বইটিতে।[38] তবে এই কথা অনস্বীকার্য যে, মতুয়াদের আন্দোলন এবং শিক্ষা-সামাজিক তথা সামগ্রিক বিকাশে মতুয়া সংগীতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

মতুয়া সংগীতে যেমন আধ্যাত্মিক চেতনার কথা বলা হয়েছে, তেমনি বাস্তব জগতে চলার পথকে সুগম করতে দেওয়া হয়েছে পথ নির্দেশও। বলা হয়েছে এক নারী ব্রহ্মচারীর কথা, পর সুখে সুখী হবার কথা বলা হয়েছে। ষড়োর উপর নিয়ন্ত্রণে রাখা, পিতা মাতা তথা গুরুজনদেরকে মান্যতা দেওয়া তথা শ্রদ্ধা প্রদানের শিক্ষা ও দেয় মতুয়া সংগীত। এইভাবে ভাব-আধ্যাত্মিক ও বাস্তবিক চিন্তার সংমিশ্রণে, মতুয়া সংগীত নমঃশূদ্র সমাজের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। বর্তমানে বিশ্বের দরবারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে; যা নম:শূদ্র সমাজ ও সংস্কৃতি রাজনীতি অর্থনীতি ও উন্নয়নের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

1. মনোশান্ত বিশ্বাস, বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৪০
2. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১
3. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১১
4. উৎপল বিশ্বাস, মহামানব হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দর্শন, শ্রীহরি যুগদিশা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৭
5. অশ্বিনী কুমার সরকার, শ্রীশ্রীহরি সংগীত, মতুয়া বার্তা প্রেস, ২০২২, পৃষ্ঠা- ২৩ (৩২ নং সংগীত)
6. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪ (৩২ নং সংগীত)
7. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮ (৩৮ নং সংগীত)
8. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৮ (৬৫ নং সংগীত)
9. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৮ (৬৫ নং সংগীত)
10. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৮ (৬৬ নং সংগীত)
11. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৫ (৯১ নং সংগীত)
12. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৮ (৯৪নং সংগীত)
13. মনোশান্ত বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৮
14. হরপ্রসাদ সরকার, শুধু বাঙালিরাই মতুয়া সম্প্রদায় নয়, শ্রী হরি যুগদিশা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৩৪
15. সাক্ষাৎকার : তন্ময় মালাকার, স্থান- গোবরডাঙ্গা, ১৩.১২.২২
16. সাক্ষাৎকার : স্বপন কুমার মন্ডল, স্থান- শিমুলপুর, ০৭/০৬/২০২৩
17. তারকচন্দ্র সরকার, শ্রী শ্রী মহা সংকীর্তন, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০৫, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পৃষ্ঠা - ৩৬ (৩৬ নং সংগীত)
18. প্রমোদবরণ বিশ্বাস, মতুয়া সংগীতে জাতীয় ঐক্য চিন্তা, মতুয়া বান্ধব পত্রিকা, পুনর্বাসন কলোনি, নিউ দিল্লি, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৩
19. সাক্ষাৎকার : হরিবর বালা ঠাকুর, স্থান- ঠাকুরনগর, ২০/০৬/২০২৩
20. শ্রীহরি যুগদিশা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ২০১২ (এপ্রিল-জুন), পৃষ্ঠা- ২৩
21. সাক্ষাৎকার : সুনীল কুমার হালদার, স্থান- হুগলি চন্ডীতলা, ০৮. ১২. ২২
22. সাক্ষাৎকার : প্রকাশ বিশ্বাস, স্থান- মালিপোঁতা, ১৬. ১২. ২২
23. বিরাট বৈরাগ্য, মহিলা পদগীতি সাহিত্য : মহিলা গীতিকার, গবেষণা পরিষদ, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০২২, পৃষ্ঠা - ৪৩
24. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৪, ৪৫
25. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৭, ৪৮, ৪৯
26. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭১
27. তদেব, পৃষ্ঠা - ৮২
28. বিরাট বৈরাগ্য, নমঃশূদ্র জাতির প্রথম পত্রিকা নমঃশূদ্র সুহৃদ, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর (সম্পাদিত), বাংলার নমঃশূদ্র,কলকাতা নমশূদ্র থিংকার্স অ্যান্ড অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, ২০২১, পৃষ্ঠা- ২৪৮
29. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬২, ২৬৪
30. বিরাট বৈরাগ্য, মহিলা পদগীতি সাহিত্য : মহিলা গীতিকার, গবেষণা পরিষদ, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০২২, পৃষ্ঠা - ৫৩৫
31. সাক্ষাৎকার : সম্ভু সরকার, স্থান- ঠাকুরনগর, ১৫. ০৩. ২৩
32. সাক্ষাৎকার : সৌমি বিশ্বাস, স্থান- পাঁচপোতা, ১৫. ০৩. ২৩
33. সাক্ষাৎকার : অমিত বিশ্বাস, স্থান- ভাদুরিয়া, ১৬. ০৩. ২৩

34. সাক্ষাৎকার : রূপালী বাইন, স্থান- রামচন্দ্রপুর, ১৬. ০৩. ২৩
35. সাক্ষাৎকার : বামনদাস কুন্ডু, স্থান- বসিরহাট, ১৭. ০৩. ২৩
36. সাক্ষাৎকার : বাপি ভক্ত, স্থান- মহিষাকাটি, ২২. ০৩. ২৩
37. সাক্ষাৎকার : পরিমল মন্ডল, স্থান- রামচন্দ্রপুর, ২২. ০৩. ২৩
38. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিস, দিল্লি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ১২৭, ১২৮।

কবি মণীন্দ্র গুপ্তের অক্ষয় মালবেরি : কবির সৃজন প্রেক্ষিত ও দেশকাল

তাপস ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চুনারাম গোবিন্দ মেমোরিয়াল সরকারী মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী নামক সাহিত্য সংরূপটির সূচনা উনিশ শতকে। এই কালপর্ব থেকে বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা এই আত্মজীবনী লিখে চলেছেন। এই সাহিত্য সংরূপটির মাধ্যমে একদিকে যেমন সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত জানতে পারি তেমনি তাঁর সমকালীন দেশ-কালের কথা জানতে পারি। বিশ শতকের কবি মণীন্দ্র গুপ্তের আত্মজীবনীতেও তাঁর কবি সত্তা নির্মাণের ইতিবৃত্ত এবং সমকালীন দেশ-কালের কথা জানতে পারি। গ্রামীন জীবনের প্রকৃতি, একান্নবর্তী পরিবারের সংস্কৃতি, ঔপনিবেশিক রাজনীতি, দেশভাগের কূটনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মণ্বন্তর ও তৎকালীন নগর কলকাতার প্রেক্ষাপট তা উঠে আসে। একজন সৃজনশীল মানুষের জীবন কীভাবে নির্মিত হয় তারও যেন দলিল হয়ে ওঠে এই আত্মজীবনী।
সূচক শব্দ: আত্মজীবনী, উপনিবেশবাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, প্রকৃতি, কবি জীবন।

মূল আলোচনা:
বাংলা সাহিত্যে জীবনীসাহিত্য নামক সংরূপটি নতুন নয়। জীবনিসাহিত্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায় – জীবনীমূলক রচনা, আত্মজীবনী এবং সন্তজীবনী। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের চরিত শাখায় অসংখ্য জীবনীর উল্লেখ রয়েছে। উনিশ শতকেও বিভিন্ন মননশীল ব্যক্তিকে নিয়ে জীবনী লেখা হয়েছে। উনিশ শতকেই এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে আত্মজীবনী মূলক সংরূপটির উদ্ভব রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' নামক রচনাটি দিয়ে। আত্মজীবনী শব্দটি থেকে বোঝা যায়, লেখক তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন নির্দিষ্ট কালসীমায় পাঠককে উদ্দেশ্য করে।

বিশ শতকের কবি মণীন্দ্র গুপ্ত 'অক্ষয় মালবেরি' নামে একটি আত্মজীবনী লিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন- লেখকের সমস্ত লেখার মধ্যেই তিনি তাঁর আত্মকথা বলেন : "কবি, ঔপন্যাসিক ও সৃজনধর্মী প্রবন্ধকারেরা, যাই লিখুন না কেন, আসলে সারা জীবন ধরে তাঁরা একটিই লেখা লেখেন সে লেখাটি হল আত্মকথা – নানা আকারে, নানা ভঙ্গিতে নিজেরই কথা, অথবা নিজেরেই চেনাজানাদের কথা। নিজের চেতনার বাইরে আমাদের তো কোনো পৃথিবী নেই।"[১] ঠিক এরকম সুর শোনা যায় এক ইংরেজি সমালোচকের কণ্ঠে – "Autobiography is indeed everywhere one cares to find it...........if the writer is always, in the broadest sense, implicated in the work, any writing may be judged to be autobiographical"[২] তবু তিনি আত্মজীবনী লেখার কথা স্বতন্ত্রভাবে ভেবেছেন। তার কারণ হিসাবে তাঁর মনে হয়েছে, কবিতার মধ্য দিয়ে যে কবিকে পাঠক খোঁজার চেষ্টা করেন, যে মূর্তি নির্মাণ করে, তা আসলে সত্য মিথ্যায় জড়ানো। তাই তিনি আত্মকথা লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাছাড়া তিনি মনে করেন কবিদের আত্মকথা থাকলে পাঠকদের কবিতা আস্বাদ করার পক্ষে খুবই সহায়ক হবে। 'পরমা' পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন কবিদের

দিয়ে আত্মকথা লেখান এবং তিনি নিজেও *অক্ষয় মালবেরি* নামে আত্মকথা লেখেন। এই আত্মজীবনীর তিনটি খণ্ড। 'পরমা'র শরৎ সংখ্যায় ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়। এই বইটির দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত ১৯৯৮ সালে। তৃতীয় পর্বের প্রথমার্ধ ২০০২ সালে জলার্ক পত্রিকায় ও শেষার্ধ প্রকাশিত হয় বিষয়মুখ পত্রিকা থেকে। তিনটি পর্ব একসঙ্গে প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। এই আত্মজীবনীটিও তাঁর সমগ্রজীবনের ছবি নেই। শৈশব থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত জীবনের স্মৃতিগুলি সাজিয়েছেন।

"সৃজনশীল মানুষের ছেলেবেলার কাহিনীতে লুকিয়ে আছে তার প্রবণতা, আছে তার মুছে যাওয়া যাত্রাপথের সন্ধান।"[৩]- এই ভাবনা থেকে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন *অক্ষয় মালবেরি* । কোনও মানুষ যখন তাঁর আত্মজীবনী লেখেন তখন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের এক ছবি পরিলক্ষিত হয়। সেই সঙ্গে মিশে থাকে তাঁর সামাজিক জীবন, আবেগময় ঘটনাবলি, পারিবারিক সংস্কার ও তাঁর বিশ্বাস – অবিশ্বাসের জায়গাগুলি যেগুলো সাধারণত মানুষের মনে গোপন থেকে যায় কিংবা স্মৃতি হয়ে মিশে থাকে অবচেতনের কোনও গভীর অন্ধকারে। তবে সব কিছু তুলে ধরা আত্মজীবনীকারের কাজ নয়। তিনি জীবনের কিছু কিছু ঘটনা নির্মাণ করেন কিংবা বলা যায় ঘটনাগুলি নির্বাচনের পিছনে কাজ করে লেখকের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। এই কারণে লরা মার্কাস (Laura Marcus) লক্ষ্য করেছিলেন যে, ১৯৩০–১৯৪০ কালের 'নিউ ক্রিটিক' নামক সমালোচকরা লেখকের এই 'intentionality' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং লেখকের কর্তৃত্বকে খর্ব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লেখককে বিশ্বাস না করলে বা লেখকের কথাকে স্বীকার না করলে আত্মজীবনী নামক সংরূপটি দিশাহীন হয়ে পড়ে। সমালোচক লিন্ডা আন্ডারসন (Linda Anderson) বলেন: "intention has had a necessary and often unquestion role in providing the crucial link between author, narrator and protagonist. Intention, however, is further defined as a particular kind of honest intention which than guarantees the truth of the writing. Trust the author, this rather circular argument goes, is s/he seems to be trustworthy"[৪] লেখকের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতার কথা মণীন্দ্র গুপ্তও বলেছেন : "সমস্ত আত্মকথার পাঠকদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। আপনারা লেখকের ব্যক্তিগত সুযশ কুযশের দিকে মন দেবেন না। যে লোকটা আপনাদের কাছে নিজের গল্প খুলে বলতে চাইছে তাকে বন্ধুর মতোই গ্রহণ করুন"[৫] লেখকের এই বিশ্বাসযোগ্যতাকে ও তাঁর সততাকে মেনে নিলে আত্মকথার মধ্যে আমরা অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পাই, তেমনি কাল ও সময়ের বিশেষ মাত্রাটিকে পাঠক ছুঁতে পারবে। তবে লেখকে কোন দিকে গুরুত্ব দিতে চায়সে সেটাই বিবেচনার বিষয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ আত্মকথা লিখতে পারে, যেমন – রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড়, সাহিত্যিক বা অন্য কেউ। কবি বা সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে আমরা আশা করি : "His life story is the story of how his imagination is kindled by occurrence or personalities that may intrinsically be quite insignificant"[৬] ইংরেজি সাহিত্যে গ্যটে ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছি কীভাবে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা, ঘটনাবলি কবিতার প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি' থেকেও আমরা জানতে পারি কীভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার বিকাশ ঘটেছিল ঠাকুর পরিবারের আবহে ও কোন কোন ব্যক্তি তাঁর কবিজীবনকে প্রভাবিত করেছিল।

মণীন্দ্র গুপ্তের এই আত্মজীবনী আসলে একজন কবির আত্মজীবনী – যেখানে তিনি একজন সাধারণ যুবক; কীভাবে তিনি কবি হয়ে উঠেছেন তার ইতিবৃত্ত নয়, বরং তিনি যে জীবনকে অতিবাহিত করেছেন, যে সব মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, যে প্রকৃতি তাঁর একাকিত্বে আশ্রয় দিয়েছে তার কথা তুলে ধরেছেন। তাই আত্মকথা কখনও কখনও ব্যক্তির বদলে সময় যেন 'protagonist' হয়ে উঠেছে। এই আত্মকথাটি একটি সময়েরও জীবনী: "এই আত্মকথা লিখবার সময়, আমি যে একটা কেউকেটা নই, অতি সাধারণ লোকমাত্র সেকথা সবসময় মনে ছিল। সেই জন্য নিজের বদলে পরিপার্শ্ব, সময়, লোকজন অর্থাৎ স্থানকালপাত্র যেমনটি দেখেছিলাম তেমনি বর্ণনা করবার দিকে জোর দিয়েছি। এটা আত্মজীবনীও বটে, সময়ের জীবনীও বটে।"[৭] বলা যায়, এই আত্মকথাটি যেন পঞ্চান্ন বছর বয়সে লেখা এক কবির যাপিত কালের অতীতভাষ্য – এটাও তো আত্মজীবনীর একটা বড় বৈশিষ্ট্য – "Autobiography is not just reconstruction of the past, but interpretation; the significant thing is what the man can remember of his past. It is a Judgment on thepast within the framework of the present, a document in the case as well as a sentence"[৮]

'অক্ষয় মালবেরি'র প্রথম পর্বে বালক মণীন্দ্র গুপ্তকে দেখা যায় তাঁর সাত বছর পর্যন্ত। বরিশালের গৈলা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। সামান্য পরিবারের সন্তান ছিলেন। মাটির ভিত,বাঁশের খুঁটি, কাঠের পাটাতন, টিনের চাল দিয়ে তাদের বাসস্থান নির্মিত হয়েছিল। সমস্ত বাড়িটি ছিল খুবই পলকা। তাঁর আত্মকথাটি শুরু হয়েছে জন্মদিন থেকেই – যে জন্মতিথিতে মিশে রয়েছে গ্রামবাংলার সেই আর্কেটাইপ, যেখানে ডাক্তার নেই, দাই নেই, ছুরি কাঁচি নেই। হেমন্তের প্রারম্ভে সবুজ গাছপালা, স্বচ্ছ খালের জল, কার্তিকের হিম ও শিশিরের ভেজা হাওয়া যেন তাঁকে আহ্বান জানায়। মাতৃজঠর থেকে বাঁশের চোঁচ দিয়ে তাঁর নাড়ি কাটা হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর শরীরে মিশে যায় প্রাকৃতিক অস্তিত্ব। দশ মাস বয়সে মাতৃহারা হন। তাঁকে প্রতিপালন করেন ঠাকুমা ও দাদু। তাঁর ঠাকুমা ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী। তাঁর জন্মস্থান বরিশালের গৈলা গ্রামেই তিনি দেখেছেন দারিদ্র্য, অভাব সংকট ও অসাম্প্রদায়িকতার আবহ। তিনি দেখেছিলেন বাবুরালি- আমরালি শেখের মায়ের সঙ্গে তার ঠাকুমার সখ্য। ঠাকুমার সঙ্গে তিনি কামারবাড়ি, গয়ালবাড়ি গেছেন, সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। সেই গ্রাম্য অঞ্চলের বিভিন্ন রীতিনীতি তাঁড় বালকমনকে প্রভাবিত করে। এমনই একটি ছিল মেয়েরা ঋতুমতী হলে তখন তাকে ঘিরে নানা রকম মেয়েলি উৎসব হত আর বলত অমুক ফল ধরেছে। এই কথাটির মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনা খুঁজে পেয়েছেন।

কবি মণীন্দ্র গুপ্তের কাব্য জুড়ে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিতের উপস্থিতি। মানুষ ছাড়াও গাছ পালা পশু প্রকৃতির এক জীবন্ত অস্তিত্ব তাঁর কাব্যজুড়ে দেখা যায়। বালক বয়সে তাঁর গ্রামেই বিভিন্ন উদ্ভিতের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর দাদুর চোখ দিয়ে। তার পরিবারের চারবেলা খাবারের জন্য চারপাশের পুকুর, বন ও গাছগাছালি ভরসা ছিল। এই বিশাল প্রকৃতি আর বই ছিল তাঁর একাকিত্বের সঙ্গী। তাই তিনি বলেন- "প্রকৃতি আর বই আর দুই সঙ্গী হয়ে উঠল। দিনে দিনে প্রকৃতি আমার অবচেতনে ঢুকতে থাকল আর বই আমার চেতনাকে বহু দূর দূর অনিদের্শ্য দেশে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল। এই দুই টানই এত সুখের যে কাছের সমস্যার দিকে আমার চোখ আর কোনোদিন ফুটল না।"[৯] সেই গ্রামেই বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর

পরিচয় হয়। তখনকার দিনে বাংলার নৌকার মাঝিরা, কাঠুরেরা, সাপুড়েরা তাঁর মনকে আকৃষ্ট করত। এই জন্মভূমি ছেড়ে তাকে চলে যেতে হয় মামাবাড়ি বরাক উপত্যকা।

অক্ষয় মালবেরি'র দ্বিতীয় পর্বের প্রেক্ষাপট ত্রিশের দশকের বরাক উপত্যকা, অধুনা আসামের শিলচর। কৈশোরের সাত আট বছর এখানেই তাঁর কাটে। সেই সময়ের বরাক উপত্যকা ছিল ইংরেজ উপনিবেশের একটি ছোট শহর। কবি মণীন্দ্র গুপ্ত যাপনের যে দর্শন, যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা তিনি অর্জন করেছিলেন, বরাক উপত্যাকার সেই সাত বছরের জীবন সেদিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর দিদিমার হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের মূল পাঠ্যবইয়ের তাঁর পরিচয় হয়।প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বিচিত্রা প্রভৃতি মূলধারার পত্রিকা তিনি পড়তেন। তখনকার বিভিন্ন সাহিত্যিকিদের লেখা পড়তেনে এই পত্রিকাতে। এইখানে এসে তিনি অনেক সাধু ও সন্ন্যাসীদের দেখতে পান। তাঁদের কাছ থেকে তিনি ভোগহীন জীবনের আদর্শের সন্ধান পান। এই শহরে দরিদ্র ও অসহায় নাগা অধিবাসীদের দেখেছিলেন। মণিপুরীরাও ছিল সেখানে তবে তারা বাঙ্গালিদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এই সময়ে তিনি বিচিত্র পেশার মানুষের দেখা পান – ম্যাজিশিয়ান, কথকঠাকুর, পালাগায়ক ও সার্কাসের দল। বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজের রাজনীতি বক্তৃতা করতেন। ঔপনিবেশক ইংরেজরা সেখান নিজেদের স্বার্থের জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়ে দেন। এই সময় থেকেই রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বিরূপ ধারণা জন্ম নেয়।

'অক্ষয় মালবেরি'র তৃতীয় পর্বে কবি মণীন্দ্র গুপ্তের কর্মজীবনের পরিচয় চিত্রিত হয়েছে; সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর ও দেশভাগের যে ষড়যন্ত্র সমকালীন আবহে রচিত হয়েছিল তাঁরি প্রেক্ষিতে তাঁর কাল বাহিত হয়। ১৯৪১ সালে তিনি কলকাতা এলেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও তিনি দেখেন আসাম বা পুব বাংলায় সেভাবে এই যুদ্ধের প্রভাব পড়েনি। তবে কলকাতায় এসে তিনি যুদ্ধের আঁচ দেখতে পান। বিমানহানার ভয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কলকাতার অনেকে গ্রামে ফিরে চলে যাচ্ছে। এই সময়ে তিনি কলকাতার বুকে ঘুরে বেড়ান। রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে নতুন ভাবে পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে তিনি কবিতার অলৌকিক শক্তি টের পান এবং ভবিষ্যতে যে কবিতা লিখবেন তার যেন একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে। কিন্তু কলকাতাতে ঘটতে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক বা সাহিত্যক আন্দোলন – কোনও কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন না। বরং সেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যুবকদের জন্য নানা চাকরির সুযোগ এসেছিল এবং তিনি সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে একটা চাকরিতে ঢুকে ছিলেন। সেই দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে তিনি দেখেন গ্রাম-বাংলা থেকে মানুষ খাদ্যের অভাবে কলকাতার পথে নেমে পড়েছে। সেই চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন মর্মান্তিক ভাষাতে "দিনের পর দিন গেঁড়ি, গুগলি, গাছের পাতা সেদ্ধ, মূল সেদ্ধ, ঘাসের দানা সেদ্ধ খেয়ে জীর্ণ শীর্ণ মেয়ে পুরুষ শিশুরা বাঁচার শেষ চেষ্টায় দলে দলে এসে কলকাতার রাস্তা ছেয়ে ফেলল। রাস্তাই তাদের বাসা, রাস্তাই তাদের শ্মশান। কয়েকটা দিন তারা নিঃসাড় গলায় একটু ফ্যান দাও মা বলে ভিক্ষা করেছিল। তার পরে নিঃশব্দেই মারা গেল। এতগুলি লোককে না খাইয়ে মেরে কার কী লাভ হল কিছু বোঝা গেল না।"[১০] বি.ই কলেজ ছেড়ে তিনি ফৌজের এঞ্জিনিয়ারিং করে যান। সেখানে চাকরি ও শিক্ষা একসঙ্গে চলে। এই আর্মি জীবনে প্রবেশ করার কারণ ছিল নিরাপত্তা। থাকা, পরা, খাওয়া, যানবাহন, আমোদপ্রমোদ সবই বিনামূল্যে তিনি এখানে পেয়েছেন। একবার আর্মি হাসপাতালে গিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই আর্মিই ট্রেনিং-এ তিনি দেখেন পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানেরা

কীভাবে বাঙালি মুসলমানদের পৃথক করেন হিন্দুদের থেকে। এরাই ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের হোতা। ফৌজি স্কুলে তিনি দেখেছিলেন এক পাঞ্জাবী মুসলমানকে যিনি পড়ানোর বদলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও নৈতিক হকের কথা উল্লেখ করতেন। তাঁর মনে হয়েছিল ইংরেজ সরকার পরিকল্পনা করে এই শিক্ষককে রেখেছিলেন: "এতদিন পরে, এখন সন্দেহ হয়, হ্যাঁ ওকে বোধ হয় ইংরেজরা মাইনে দিয়ে ঐ জন্যই রেখেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে, এখন পৃথিবী যদি শান্তির মুখ দ্যাখে এই ভয়ে শ্বেতাঙ্গরা পৃথিবীর নানা জায়গায় মাইন পুঁতে রাখার দেশভাগের ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল।"[১১] এই আর্মি জীবনে জীবনের শৃঙ্খলার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অনেককে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ফৌজি জীবন ছেড়ে দেওয়ার। তিনিও ফৌজি জীবন ছেড়ে চলে আসেন এবং 'অক্ষয় মালবেরি'র আখ্যানবৃত্ত শেষ হয়ে যায়।

এইভাবে আত্মজীবনী পড়তে পড়তে আমরা আসলে কবিমন, চেতনা ও তাঁর পারিপার্শ্বিককে চিনতে পারলাম সময় ও প্রেক্ষিতের আবহ কীভাবে তিনি অর্জন করেছিলেন বেঁচে থাকার দর্শনকে, বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য পাঠে কীভাবে নিজেকে ঋদ্ধ করেছিলেন, মানবপ্রবাহের স্পন্দনকে অনভূত করে তিনি কীভাবে পরবর্তী কালে কবি হয়ে উঠলেন – তার যেন কিছু রুশো কথিত 'feeling of chain' –কে আমরা চিনতে পারব বলে আশা করি। আত্মজীবনী হিসেবও যেন সার্থক। যদিও তাঁর কবিতা ভাবনা বা কবিতা সম্পর্কিত কোন সরাসরি মত প্রকাশিত হয়নি, শুধু কবিমন নির্মাণকে আমরা চিনতে পারব।

তথ্যসূত্র:

১. গুপ্ত, মণীন্দ্র। "আত্মজীবনী লেখার সংকট" (প্রবন্ধ)। *গদ্যসংগ্রহ ২* । অবভাস, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.১৫০

২. Anderson, Linda. *Autobiography*. Routledge, London, 2001, PP. 2

৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র। "আত্মজীবনী লেখার সংকট" (প্রবন্ধ)। *গদ্যসংগ্রহ ২* । অবভাস, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.১৫০

৪. Anderson, Linda. *Autobiography*. Routledge, London, 2001, PP. 4

৫. গুপ্ত, মণীন্দ্র। "আত্মজীবনী লেখার সংকট" (প্রবন্ধ)। *গদ্যসংগ্রহ ২* । অবভাস, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.১৫৩

৬. Roy, Pascal. *Design and Truth in Autobiography*. Routledge, London, 2017, PP. 140

৭. গুপ্ত, মণীন্দ্র। "আত্মজীবনী লেখার সংকট" (প্রবন্ধ)। *গদ্যসংগ্রহ ২* । অবভাস, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.১৫৩

৮. Roy, Pascal. *Design and Truth in Autobiography*. Routledge, London, 2017, PP. 140

৯. গুপ্ত, মণীন্দ্র।*অক্ষয়মালবেরি* । অবভাস, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১১

১০. গুপ্ত, মণীন্দ্র।*অক্ষয়মালবেরি* । অবভাস, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৩৪

১১. গুপ্ত, মণীন্দ্র।*অক্ষয়মালবেরি* । অবভাস, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৬৭।

একুশ শতকের বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গ সমাজচিত্র : আমি ‘ওরা’ ও বেলপাহাড়ি

প্রিয়াংকা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: অপূর্ব মজুমদারের লেখা উপন্যাস ‘আমি ‘ওরা’ ও বেলপাহাড়ি’ ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়। একুশ শতকে লেখা এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট এক অখ্যাত গ্রাম বেলপাহাড়ি। জঙ্গলমহলের এমন গ্রামে তেমন ভাবে বাইরের কেউ যেতে চায় না। যদি বা কেউ যায় হয়তো কর্মসূত্রে বা ঘোরার জন্য। লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে লেখা এই উপন্যাস। তিনিও চাকরি সূত্রে আসেন বেলপাহাড়ি। উপন্যাসে সমাজের নিম্নবর্গ মানুষদের কথা এসেছে। অর্থাৎ যারা শোষিত, বঞ্চিত। উপন্যাসে সাঁওতাল, মুর্মু সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রতিমুহূর্তে অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। মূলত জঙ্গল নির্ভর জীবন। অর্থনৈতিক দুর্দশা ছাড়াও যখন নিম্নবর্গের মানুষ সামাজিক চিরাচরিত প্রথাকে ভাঙতে চেয়েছে তখনই দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও কেউ কেউ সমাজের বঞ্চনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। প্রথাগত ভাবনা থেকে সরে এসে সামাজিক উত্তরণের পথ খুঁজেছে। বেলপাহাড়ির নিম্নবর্গীয়দের জীবনেও রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব পড়েছে। নিম্নবর্গদের সামাজিক জীবনের একাধিক বিষয় উঠে এসেছে উপন্যাসে। যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, নারী।
সূচক শব্দ: নিম্নবর্গ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ, নারী।

মূল আলোচনা:
লেখক অপূর্ব মজুমদার বেলপাহাড়ির জীবনযাত্রা তুলে ধরতে গিয়ে জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বলেছেন। ভৌগোলিক অবস্থান জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু ঘন বন, ছোটো ছোটো পাহাড় দিয়ে ঘেরা বেলপাহাড়িতে জঙ্গলের জন্য এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। উপন্যাসে নিম্নবর্গ মানুষদের সামাজিক অবস্থানের সাথে সাথে অর্থনৈতিক অবস্থাও দেখানো হয়েছে। এসেছে নিম্নবর্গ মানুষদের নিজস্ব সামাজিক বিশ্বাস, সংস্কার। এই বিশ্বাস, সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন পরব, উৎসবও। আর এই উৎসব, পরবের কথা দিয়েই উপন্যাসের শুরু এবং দেখব কিভাবে পুজো সমাজের মানুষের বিশ্বাসের সাথে জড়িয়ে গেছে। ব্যস্ততা, সমাজজীবনে নানা কাজের ফাঁকে মানুষের আনন্দ বিনোদনের উপায় এই উৎসব গুলি। উৎসবের মধ্যে আছে করম পরব, ইন্দ মেলা। এছাড়াও ফাল্গুন মাসে পালন করা হয় সারুল উৎসব, পৌষ মাসে টুসু উৎসব। শরৎকালে সোনার ফসল পাকার সময় পালন করা হয় ভুয়াং। ভুয়াং উৎসবের সময় নাচের তালে সবাই নিজেদের কোমর দোলায়। শীতের সময় মকর সংক্রান্তি ঘরে ঘরে পালন করা হয়। পৌষ সংক্রান্তির বিকালে হয় টুসু নাচ। টুসুর আদলে গড়া হয় লক্ষী দেবীকে। সুতরাং উপন্যাসের প্রথম থেকে উৎসবের প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায় উৎসব সমাজে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে বেলপাহাড়ির নিম্নবর্গীয় জীবনে। পরবে কোনো ভেদাভেদ নেই সেখানে। সব

জাতি, বর্ণের লোক উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এখানকার যে উৎসবের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন লেখক –

> "এখানে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী ছাড়াও বর্ণ হিন্দু ও তপশিলী এবং মুসলমান সমাজের লোকজনও বসবাস করে। সব জাতি সব সমাজ উৎসবে অংশগ্রহণ করে।"[১]

পাহাড় পুজো বেলপাহাড়ির বিখ্যাত পুজো। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বাস, সামাজিক নিয়ম। মানত করে অনেকে পাহাড়ে পূজা দিতে আসে। মানত পূর্ণ হয়। সামাজিক বিবাহের একরকম প্রথাও হল এই পাহাড় পুজো। পুজোতে মায়ের সঙ্গে যুবতীরা আসলে সেখানে কোনো পুরুষকে পছন্দ হলে পরের দিন আবার আসবে এবং সংসার করতে চলে যাবে তার সাথে। উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় একাধিক জনজাতির কথা লেখক এনেছেন। সেখানে এসেছে দরিদ্র আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর জনজাতির ইতিকথা। যারা হল শবর। সরল জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে তারা ইতিহাসের ধারাকে বজায় রেখেছে। জানে না তারা আতিথেয়তা, জানে না তারা নিজেদের নাম। সমাজের একধারে এরা বসবাস করে। না তাদের জীবনযাত্রার মানে কোনো উন্নতি দেখা যায়, না সামাজিক অবস্থানে। অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত –

> "টিলার গায়ে এদের ঘর। বনে শিকার করে সাপ, বুনোশুয়ার, পাখি ইত্যাদি যা কিছু পায়, তা নামমাত্র মশলা দিয়ে রান্না করে।"[২]

আদিবাসী মানুষদের কষ্ট করে জঙ্গলের মধ্যে বাস করতে হয়। লেখক মূলত বেলপাহাড়ি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সাঁওতাল সমাজের জীবনযাত্রা ধরতে চেয়েছেন। উপন্যাসে তার মধ্যে প্রধান চরিত্র বুধু। বুধুর সাথে লেখক তাদের বাড়ি যায়। সেখান থেকেও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। বাসস্থানের জায়গা বলতে বাবুই ঘাস দিয়ে ছাওয়া ঘরের চাল। মাটির দেওয়ালে লতা-পাতার ছবি আঁকা। সংসার চলে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনা পাতা নিমের শিস দিয়ে সেলাই করে মহাজনের কাছে বিক্রি করে যা উপার্জন হয় তাই দিয়ে। এছাড়াও মহুয়ার সময়ে অনেকে মহুয়ার ফুল সংগ্রহ করে শুকিয়ে মহাজনের কাছে বিক্রি করে। যাদের জমি আছে তারা চাষ করে। মোটামুটি নিম্নবর্গ বেশিরভাগ মানুষের উপার্জনের স্থল জঙ্গল। এরকম অর্থনৈতিক অবস্থার প্রসঙ্গের সাথে সাথে মুর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রাও দেখানো হয়েছে। যেখানে প্রতিমুহূর্তে তাদের সংসার চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সেখানেও অর্থনৈতিক সংকট। যেমন খেরওয়ালের মাকে বনের কাঠ, পাতা, ফল-মূল সংগ্রহ করে শিলদা, বিনপুরে বিক্রি করতে যেতে হয় কারণ সেখানে একটু দাম বেশি পাওয়া যায় অন্য বাজারের তুলনায়। কম দাম পেলে সংসার চালানো আরো মুশকিল হয়ে যায়। গ্রামের নিয়ম, গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা বনে গেলেও হাটে যায় না। কিন্তু খেরওয়ালকে জঙ্গলে যেতে হয়। তাকে পড়ানোর জন্য মায়ের কষ্ট খেরওয়ালকে জীবনের কঠিন বাস্তবতা শিখিয়েছে। জঙ্গলে গিয়ে সে যা পায় তাই সেও বিক্রি করে উপার্জনের জন্য, তার বাবা বেঁচে না থাকার জন্য। খেরওয়ালের মা ভাবে –

> "সে যা আয় করে তাদের বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়।"[৩]

নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা থাকার জন্য সমাজ তাকে দমিয়ে রাখার সবসময় চেষ্টা করে। সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল মানুষদের বরাবরই দমিয়ে রাখার প্রয়াস করে। সমাজের কেউ যখন চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাকেও বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। আদিবাসী সমাজে মেয়ের পড়াশুনাকে ভালো চোখে দেখা হয় না। বুধু যখন মেয়ে পরিতাকে পড়ানোর চেষ্টা করে তখন সমাজ তাকে দমিয়ে রাখার জন্য নানা পন্থা খোঁজে।

মেয়ে পরিতা মঙ্গল নামে একজন মাস্টারের কাছে পড়তে গেলে তাদের সম্পর্কে সমাজে কুৎসা রটানো হয়। বলা হয় মেয়ের বিয়ে হবে না। সমাজের এমন ব্যবহার অবদমনের কাছে বুধু কোনো ভাবেই হারতে রাজি নয়। আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও তার মনে আত্মসন্মান বোধ আছে। স্ত্রী ফুলমণি ভয়ে মেয়েকে পড়ানো বন্ধ করে দেওয়ার কথা বললেও বুধু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে –

> "আমরা গরিব বটে। তা বলে মিথ্যা লোকাচার, অনাচার। এইসব আমি সইব নাই। তাতে যা হয় হবেক।"[৪]

বুধু কেবল মাত্র নিজের জন্য নয় সমাজের কোনোরকম অনাচার মানতে রাজি নয় সে। মেয়ের শিক্ষা এবং মেয়ের বিরুদ্ধে রটানো কুৎসা গ্রামের বিচারক, মাতব্বর জগ-মাঁঝির কানে গেলে গ্রাম থেকে তাড়িয়েও দিতে পারে জেনেও এবং জগ মাঝির বিচারের কাছেও মাথা নোয়ায় না। সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারেরও প্রতিবাদ করেছে। উপন্যাসে দেখা যায় বংশীর ছেলের জ্বর না সারার জন্য কানাইয়ের মাকে ডাইনি সন্দেহ করা হয়। একুশ শতকের উপন্যাসেও দেখা যাচ্ছে ডাইনি সন্দেহে কারো উপর অত্যাচার করে মেরে ফেলার মতো ঘটনা। কানাইয়ের মাকে যারা ডাইনি সন্দেহে মারে তাদের বুধু মারধর করে। শেষপর্যন্ত পুলিশ এসে অপরাধীদের ধরে নিয়ে যায়। একজন সাঁওতাল নিম্নবর্গীয় মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল থেকেও চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে অন্যায়ের সাথে আপোষ না করে সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা ভাবতে পেরেছে। এখনও সমাজে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আছে। সেই বিষয় গুলি বর্তমান শতকের লেখাতেও উঠে আসছে। বেলপাহাড়ির সমাজ জীবনে এসেছে একুশ শতকের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক সমস্যা অতিবিপ্লবী শক্তির বিকাশ। জঙ্গলমহলের পরিবেশের উপর প্রভাব পড়েছে এই রাজনৈতিক সমস্যা। অতিবিপ্লবী শক্তির মূল লক্ষ্য, তাদের মতে তারা সমাজে সমতা আনতে চায়। তাই সরকারের বিরুদ্ধে তারা লড়বে। জঙ্গলমহলে ক্ষমতা দখলের লড়াই, এই লড়াই করতে গিয়ে শাসক দলের নেতা-কর্মীকে খুন করতেও পিছপা হয় না। একুশ শতকের রাজনীতির অন্যতম আর এক বিষয় ভোটের রাজনীতি। বেলপাহাড়িও তার থেকে বাদ যায়নি। যুবকদেরও তাদের দলে নিয়ে যায় অতিবিপ্লবী শক্তিরা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে খেরওয়ালকেও দলে নিয়ে যোগদান করানো হয়। তার মা বারণ করলেও তখন সে মায়ের কথা শোনেনি। তার মা তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে সশস্ত্র বিপ্লবীরা মায়ের মর্মবেদনাকে কোনো জায়গা দেয়নি। সহকারী বনমালি বলে –

> "দ্যাখ, উ আমার কোথাও শুনবেক নাই। উ যে বৃহত্তর জীবনের স্বাদ পেয়েছে, তাতে করে এই জীবনের স্বাদ উয়ার ভালো লাগবেক নাই।"[৫]

একুশ শতকের নিম্নবর্গের সমাজ জীবন প্রতিফলিত হওয়া 'আমি 'ওরা' ও বেলপাহাড়ি' উপন্যাসে নিম্নবর্গের নারীও সামাজিক ভূমিকায় কোনো দিক থেকে কম যায় না। সংসার সামলানোয় সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। সে জঙ্গল থেকে কাঠ, পাতা কুড়িয়ে আনা হোক বা অন্য কোথাও কাজ করে হোক। শুধুমাত্র খেরওয়ালের মাকে নিয়ে আলোচনা করা হলেও বুধুর স্ত্রী ফুলমণিকেও জঙ্গল থেকে পাতা কুড়িয়ে আনতে হয়। একদিকে সংসারের উপার্জনের চিন্তা ও অপর দিকে স্বামী ও মেয়ের চিন্তা। সমাজ মেয়ের পড়াশুনায় বাধা সৃষ্টি করতে চাইলে প্রথমে ফুলমণিও ভয় পেয়ে যায়। মেয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে বলে স্বামীকে কিন্তু পরে মেয়েকে পড়াতে চেয়েছে সে। অপর এক নারী ডোম সমাজের গৃহবধূ জবা, সংসারে তার ভূমিকা একমাত্র। একদিকে স্বামী ও ছেলে নেশা করে পড়ে থাকে। আর স্বামীর ও ছেলের

নেশার খরচও জোগাতে হয় জবা ও তার শাশুড়িকে। জবাকে এক অসহায় নারী হিসাবে দেখতে পাই উপন্যাসে। কাজের মধ্যে যেদিন ফাঁকা পায় সেদিন বনের পাতা, কাঠ, ফল সংগ্রহ করে সংসার চালায়। জবার জবানীতে –

> "আমার স্বামী সারাদিন, ন্যাশা খায়ে বেড়াবেক। আর ঘরে আসে আমার কাছে টাকা খুঁজবেক। না দিলে লেয়াই করবেক।"[৬]

'আমি 'ওরা' ও বেলপাহাড়ি' উপন্যাসে দেখানো নিম্নবর্গ সমাজে অর্থনৈতিক দুর্দশা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, নারী এসব কিছু নিয়ে আলোচনায় একুশ শতকের সব বিষয় ধরা পড়েছে। একুশ শতক হল বিশ্বায়ন ও চেতনার সময়। বিশ শতকের শেষ দিক থেকে যে সামাজিক পরিবর্তনের শুরু হয়েছিল তার প্রভাব আজও বর্তমান। প্রযুক্তির বিকাশ তার মধ্যে অন্যতম। যার ফলে আজ সারা বিশ্ব হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বিশ্বের সব খবর যেমন জানতে পারছি, কারো খবর নিতে চাইলে নিতেও পারছি। উপন্যাসেও একুশ শতকের প্রযুক্তির কথাও উঠে এসেছে। বুধু যোগাযোগের জন্য মোবাইল কেনে। লেখককে সে কথাও জানায়। পরিবর্তমান এই সমাজে স্বাভাবিকভাবে নিম্নবর্গদের জীবনে পরিবর্তনের প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। সভ্যতার অগ্রগতি সংস্কৃতিকেও গ্রাস করতে উদ্যত। একুশ শতকের উপন্যাসে বর্তমান শতকের সামাজিক বিষয় স্বাভাবিক ভাবে আসবে লেখকদের লেখায়। কারণ লেখক সমকালকে অগ্রাহ্য করে সাহিত্য রচনা করতে পারে না। সাহিত্যিক প্রকৃত শিল্পী। আর একজন শিল্পীর সমাজের প্রতি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। মজুমদার অপূর্ব, আমি 'ওরা' ও বেলপাহাড়ি, প্রতিভাস, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪
২। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩
৩। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৭
৪। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৭
৫। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৭
৬। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৫।

মৃৎশিল্পে কৃষ্ণনগর : কয়েকটি সূত্র

সমীর মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, নাকাশীপাড়া

সারসংক্ষেপ: মৃৎশিল্পে কৃষ্ণনগরের সুনাম চিরকালের। কৃষ্ণনগরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এগুলি হল: ঘূর্ণি, কুমোরপাড়া-ষষ্ঠীতলা এবং আনন্দময়ীতলা-রথতলা-নতুনবাজার। তবে কৃষ্ণনগর শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে জলঙ্গী নদীর তীরবর্তী ঘূর্ণি মৃৎশিল্পের মূল কেন্দ্র। মৃৎশিল্পীদের কয়েকশ বছরের অভিজ্ঞতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালন করে তাদের হাতে সৃষ্ট বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, বিভিন্ন জীবিকায় কর্মরত মানুষ, সাধু-সন্যাসী, জননেতা, পশু-পাখি প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের সৃষ্টি তাদের সুনিপুণ দক্ষতার প্রমাণ দেয়। তাদের সৃষ্ট মৃৎশিল্প সামগ্রী দেশে-বিদেশে আজও যথেষ্ট সমাদৃত। অবশ্য ধীরে ধীরে এই শিল্পে শ্রম-প্রবণতা এবং নিষ্ঠা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এর প্রধান কারণ হল শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্ট শিল্পের উপযুক্ত মূল্য পান না। এই শিল্পকর্মে যে পরিশ্রম করতে হয় এবং যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, সেই তুলনায় আয় হয় না। অতিসম্প্রতি মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে শিল্পীদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানা যায়। শিল্পীদের বক্তব্যের মূল বিষয় হল মাটির মূর্তিগুলো তৈরি করতে যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়, বিক্রি করে তা ওঠে না।
সূচক শব্দ: মৃৎশিল্প, মৃৎশিল্পী, কৃষ্ণনগর, জীবিকা, দক্ষতা, পরিশ্রম।

মূল আলোচনা:
মৃৎশিল্পে কৃষ্ণনগরের সুনাম চিরকালের। কৃষ্ণনগরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এগুলি হল: ঘূর্ণি, কুমোরপাড়া-ষষ্ঠীতলা এবং আনন্দময়ীতলা-রথতলা-নতুনবাজার। তবে কৃষ্ণনগর শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে জলঙ্গী নদীর তীরবর্তী ঘূর্ণি মৃৎশিল্পের মূল কেন্দ্র। এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা দীর্ঘকাল ধরে এই শিল্পের চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। ঘূর্ণির মৃৎশিল্পীদের সৃজনশীলতা মনোমুগ্ধকর। কৃষ্ণনগর ছাড়াও বাংলার আরও কয়েকটি অঞ্চলে মৃৎশিল্প বিখ্যাত। যেমন কলকাতার কুমোরটুলি, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, বীরভূম, বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া, শ্রীরামপুর, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চল মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। তবে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের বস্তুনিষ্ঠ রীতি এবং বাস্তবানুগ রূপায়ন অনন্য। কয়েকশ বছরের অভিজ্ঞতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালন করে তাদের হাতে সৃষ্ট বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, বিভিন্ন জীবিকায় কর্মরত মানুষ, সাধু-সন্যাসী, জননেতা, পশু-পাখি প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের সৃষ্টি তাদের সুনিপুণ দক্ষতার প্রমাণ দেয়। তাদের সৃষ্ট মৃৎশিল্প সামগ্রী দেশে-বিদেশে আজও যথেষ্ট সমাদৃত। প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, "কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা ছিলেন যথার্থ আর্টিস্ট"।[১] এই প্রবন্ধে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের কয়েকটি দিক এবং এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের তথা মৃৎশিল্পীদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

মৃৎশিল্পের মূল উপাদান হল মাটি। জলঙ্গী নদীর মাটি মৃৎশিল্পের বিশেষ উপযোগী উপাদান। ঘূর্ণির কাছাকাছি পানিনালা এবং কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী হাঁসখালি অঞ্চলে মৃৎশিল্পের উপযোগী মাটি পাওয়া যায়। এঁটেল মাটি, বেলে মাটি এবং ছাঁচের কাজের প্রয়োজনীয় দোআঁশ

মাটি মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আবশ্যক। কৃষ্ণনগরে প্রাপ্ত মাটিতে বেলে মাটি ও দোআঁশ মাটির চমৎকার মিশ্রণ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় পরিমাণমতো এঁটেল মাটি। মৃৎশিল্পের উপযোগী করার জন্য এই মাটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঢেঁকিভাঙা চালের তুঁষ মেশাতে হয়। এই ধরণের তুঁষ সব সময়, বিশেষত বর্তমান সময়ে পাওয়া যায় না। তখন মাটিতে কাঠের গুঁড়ো মেশানো হয়। কোন মূর্তি দো-মেটে করার প্রয়োজন হলে বেলে মাটিতে গোবর মেশানোর প্রয়োজন হয়। মূর্তি নির্মাণে হাতের বা পায়ের আঙুল গঠনে মাটির সঙ্গে মেশানো হয় পাটের কুচি।[২] আবার তৈরি হওয়া মূর্তিতে যাতে ফাটল না ধরে, সেই জন্য কাদা ভেজানো কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন মৃৎশিল্পীদের শিল্পবোধ, কারিগরি দক্ষতা এবং অতুলনীয় প্রতিভা। এই সব গুণ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে বিদ্যমান।

যে সকল যন্ত্রপাতি এই শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয়, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পীরা নিজেরাই তৈরি করে নেন। শিল্পীরা চিয়াড়ি বা চেয়াড়ি ব্যবহার করেন। এগুলি বাঁশের তৈরি চ্যাপ্টা, ডগার দিকটা সরু। আবার বোসুয়া নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এটি বাঁশের তৈরি। এর ডগা সরু নয়, ভোঁতা। অনেক সময় এই যন্ত্রগুলি বাঁশের ব্যবহার না করে স্টিলের ব্যবহার করা হয়। আবার বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ ও তুলি ব্যবহার করা হয়।

প্রথমদিকে মৃৎশিল্পীরা মূর্তির গায়ে রঙ দেওয়ার জন্য পাউডার রঙ কিম্বা গুঁড়ো রঙ ব্যবহার করতেন। একটি পাত্র নিয়ে তাতে ঠান্ডা জলে পাউডার রঙ গুলে তার সঙ্গে তেতুল বীজের আঠা মেশানো হত। এই রঙ দিয়ে মূর্তি রাঙানো হত। বেশি চকচকে করার জন্য রঙ দেওয়ার পর রঙ দেওয়ার পদ্ধতির মতো একই পদ্ধতিতে মূর্তির গায়ে তুলি দিয়ে অ্যারারুট মাখানো হত। সব শেষে তার উপর বার্নিশের সঙ্গে কিছু কেরোসিন তেল মিশিয়ে প্রলেপ দিয়ে বেশি চকচকে ও আকর্ষণীয় করা হত।[৩] তবে বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক জলীয় রঙ পাওয়া যায়। ফলে এই ধরণের রঙও এখনকার সময় ব্যবহার করা হয়।[৪] আর শিল্পের প্রতি মৃৎশিল্পীদের গভীর অনুরাগ, নিষ্ঠা, অসীম ধৈর্য, সর্বোপরি অভিজ্ঞতার সুসমন্বয়ে এই সমস্ত কাজ পরিপূর্ণ রূপ পায়।

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২)-এর আন্তরিক ইচ্ছায় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল।[৫] তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, ধর্মপরায়ণ, শিল্প-সচেতন এবং শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্টপোষক। মনে করা হয়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুজোর প্রতিমা নির্মাণের জন্য নাটোর রাজশাহী থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট মৃৎশিল্পীকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে এসেছিলেন। কৃষ্ণনগরের সেই সময়ের মৃৎশিল্পীগণ এবং নাটোর থেকে আগত শিল্পীগণ সম্মিলিতভাবে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের এই ধারার সূচনা করেছিলেন।[৬]

অবশ্য কুমুদ নাথ মল্লিক তাঁর *নদীয়া কাহিনী*-তে বলেছেন, উপরোক্ত বিষয়ের যথার্থতা নিয়ে কোন তথ্য প্রমাণ নেই। তিনি বলেছেন, "কৃষ্ণনগরের কোনও মৃৎশিল্পী পরিবারই নদীয়ারাজদের দানভাজন নন।"[৭] তাঁর মতে, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা কুম্ভকার। প্রথমে তাঁরা দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করতেন এবং কুমোরের কাজ করতেন। এরপর কৃষ্ণনগরে আগত শিল্পপ্রাণ কিছু খ্রিস্টান মিশনারীগণ এবং কিছু শিল্প-সমাজদার ইংরেজ প্রশাসকদের পৃষ্টপোষকতায় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। রাজবাড়ির দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর বিখ্যাত *ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত* গ্রন্থে বলেছেন যে কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের পূর্বপুরুষেরা নদিয়ারাজদের উৎসাহ পেয়েছিলেন। অবশ্য নদিয়ারাজদের পৃষ্টপোষকতার কথা এখানে

উল্লেখিত হয়নি। তাই আমরা বলতে পারি যে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উদ্ভব এবং বিকাশে নদিয়ারাজদের ভূমিকা থাকলেও তাঁদের পৃষ্টপোষকতায় এই শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল, তা বলা যায় না।[৮]

এই মৃৎশিল্পের উদ্ভবের পশ্চাতে একদিকে এদেশের মানুষের চিন্তাধারা ও উৎসাহ, অন্যদিকে কিছু সহৃদয় ইংরেজদের বাস্তবধর্মী শিল্পকর্মের প্রভাবের সংমিশ্রণে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উদ্ভব ঘটেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্থানীয় রাজা-মহারাজাদের উৎসাহ। এই সবের সমন্বয়ে এই শিল্পধারার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

কৃষ্ণনগরে চারটি শিল্পধারা একইসঙ্গে চলেছে।[৯] প্রথম ধারাটি হল ট্র্যাডিশনাল ফিগারেটিভ ক্লে মডেলস। এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন এই ধারার পৃষ্টপোষক। যেমন বীরেন পাল এবং তাঁর পুত্র সুবীর পাল, গনেশ পাল ও তাঁর পুত্র তড়িৎ পাল, করুণা প্রসাদ পাল ও তাঁর পুত্র অমল পাল প্রমুখ। দ্বিতীয় ধারাটি হল ছাঁচের তৈরি সস্তার মাটির ও প্লাস্টারের ছোট মূর্তি এবং বিভিন্ন ধরণের পুতুল। এই ধারার কাজের সঙ্গে মৃৎশিল্পীদের বাড়ির প্রায় সকলেই যুক্ত থাকেন। বাড়ির মহিলারাও অনেক সময় এই কাজ করেন। তুলনায় সস্তা হওয়ায় এই শিল্পকর্মগুলি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। তৃতীয় ধারাটি হল মাটি, প্লাস্টার, সিমেন্ট, পাথর, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি সকল ধরণের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তির আবক্ষ মূর্তি বা পূর্ণায়ব মূর্তি তৈরি করা। কার্তিকচন্দ্র পাল এবং তাঁর পুত্র গৌতম পাল প্রমুখ এই ধরণের শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত। চতুর্থ ধারা হিসাবে যে শিল্পকর্মের নাম পাওয়া যায়, তা হল সৃষ্টিধর্মী ভাস্কর্যের কাজ। এই ধরণের কাজ প্রথম শুরু করেন কার্তিকচন্দ্র পালের পুত্র গৌতম পাল। তিনি কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট-এ প্রিন্সিপল চিন্তামণি কর ও প্রফেসর সুনীল পালের কাছে ভাস্কর্যের নতুন ভাবনা শেখেন। এরপর তিনি ইতালির মিলান শহরের ইউরোপীয় ভাস্কর্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মাটি, পাথর, ব্রোঞ্জ, সিমেন্ট, প্লাস্টার প্রভৃতি সব মাধ্যমেই কোন ব্যক্তির আবক্ষ মূর্তি বা পূর্ণায়ব মূর্তি গড়ার দক্ষতা অর্জন করেন।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে *ওয়েস্টবেঙ্গল ডিসট্রিক্ট সেন্সার হ্যান্ড বুকঃ নদিয়া, ১৯৬১* তে। এখানে কৃষ্ণনগরের সবচেয়ে পুরাতন মৃৎশিল্পী হিসাবে মোহন পালের কথা বলা হয়েছে।[১০] তিনি নিজ দক্ষতায় নতুন নতুন শিল্পকর্ম উপহার দিয়েছিলেন। আবার যদুনাথ পাল (১৮২২-১৯২৯)[১১] এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পী সমাজে একজন বিখ্যাত মানুষ হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। শিল্পী পরাণচন্দ্র পালের পৌত্র কার্তিকচন্দ্র পাল (জন্ম ১৯২৫) কৃষ্ণনগরের একজন বিখ্যাত মৃৎশিল্পী ছিলেন। তিনি যে কোন ব্যক্তিকে সামনে বসিয়ে খুব কম সময়ে মাটি দিয়ে তার নিখুঁত প্রতিমূর্তি গড়ে দিতে পারতেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৫ বছর বয়সে কালিংকালিংপঙ-এ তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক মূর্তি গড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দিত হয়ে তাঁকে লিখেছিলেন, “কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র পাল আমার যে মূর্তি গঠন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহার দ্রুতহস্তের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। যুরোপে আমেরিকায় যে শিল্পীরা আমার মূর্তি গড়িয়াছেন তাঁহারা আমাকে ক্লান্তিতে পীড়িত করিয়াছিলেন – ইহার হাতে সে দুঃখ পাই নাই।”[১২] এই ঘটনা থেকে কার্তিকচন্দ্র পালের আশ্চর্য শিল্প প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কার্তিকচন্দ্র পালের এক অনন্য কীর্তি হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কলকাতার রবীন্দ্রসদনের সামনে স্থাপিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তি। আবার নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসুর এক অপূর্ব ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরি করার জন্য তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির কাছ থেকে এক স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন।[১৩] কার্তিকচন্দ্র পালের দ্বিতীয় পুত্র গৌতম পাল (জন্ম ১৯৪৯) শিল্পোৎসাহী স্বচ্ছল পিতার সাহায্যে অঙ্কনবিদ্যা, ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প, পুঁথিগতবিদ্যা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাস্কর্যকলা শেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং প্রাপ্ত শিক্ষা বাস্তবে অসাধারণভাবে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট নানা ধরণের ভাস্কর্য দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য নির্মিত ডাণ্ডি অভিযানরত মহাত্মা গান্ধির নয় ফুট উচ্চতার মূর্তি, কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্রভবনের সামনে স্থাপিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪] অন্যদিকে শিল্পী পরাণচন্দ্র পালের বংশের একজন বিখ্যাত শিল্পী হলেন তাঁর দৌহিত্র গোপেশ্বর পাল। তাঁর শৈল্পিক সৃষ্টি বিশেষ প্রশংসনীয়।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান ও পদক লাভ করেছিলেন মোহন পালের প্রপৌত্র শ্রীরাম পাল (১৮১৮-১৮৮৫)। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের হিউড পার্কে অনুষ্ঠিত 'এক্সিবিশন অব দ্য ওয়ার্কস অব ইন্ডাস্ট্রি অব অল নেশনস' প্রদর্শনীতে।[১৫] এই প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল পাঠিয়েছিলেন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তাই শ্রীরাম পালের সৃষ্ট মাটির পুতুল পুরস্কৃত হলেও অভিজ্ঞানপত্রটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে দেওয়া হয়েছিল।[১৬] এছাড়া কৃষ্ণনগরের বহু মৃৎশিল্পী তাঁদের অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার জন্য অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছেন।

অবশ্য ধীরে ধীরে এই শিল্পে শ্রম-প্রবণতা এবং নিষ্ঠা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এর প্রধান কারণ হল শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্ট শিল্পের উপযুক্ত মূল্য পান না। এই শিল্পকর্মে যে পরিশ্রম করতে হয় এবং যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, সেই তুলনায় আয় হয় না। সুধীর চক্রবর্তী তাঁর *কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ* –এ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালিন প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত মৃৎশিল্পীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন[১৭] যে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের উত্তরাধিকারীগণের অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে পারিবারিক শিল্পকর্মের প্রতি উৎসাহী নন। যেমন কার্তিকচন্দ্র পালের দ্বিতীয় পুত্র গৌতম পাল স্বনিযুক্ত সকল সময়ের ভাস্কর্য শিল্পী। কিন্তু তাঁর অন্যান্য সন্তানেরা এই পারিবারিক বৃত্তিতে অগ্রহী নন। তার কারণ হল এই শিল্পকর্মে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব, এই পেশায় নিরাপত্তার অভাব, এই শিল্পসৃষ্টির আর্থিক মূল্যমান যথেষ্ট নয় প্রভৃতি নানা সমস্যা রয়েছে। আবার শিল্পী বীরেন পাল অসাধারণ হিউম্যান ফিগার ও ছাঁচের কাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেও উপযুক্ত আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারেননি। আরও একজন মৃৎশিল্পী স্বপন ভট্টাচার্য বলেছেন যে, এই শিল্পে পরিশ্রম অত্যাধিক, কিন্তু আয় কম। শিল্পী বিষ্ণুপদ পাল নিজে শিল্পকর্মে উৎসাহী হলেও তাঁর সন্তানেরা আর্থিক নিরাপত্তার অভাবে এই পেশায় আসেননি। শিল্পী বিনয়চন্দ্র পাল তাঁর সৃষ্ট মৃৎশিল্পদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য পাননি। তাই তিনি এই বৃত্তিতে খুশি হতে পারেননি। শিল্পী শ্যামাপদ পাল কঠোর পরিশ্রম করে সব ধরণের মাটির কাজ করলেও আর্থিক লাভের দিক থেকে হতাশ হয়েছেন। আবার মৃৎশিল্পী পশুপতি পাল তাঁর চার পুত্র নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মাটির কাজ করলেও উপযুক্ত মজুরীর অভাবে তাঁর পুত্রেরা এই কাজ আর করতে চান না। এই প্রবণতা পরবর্তীকালে আরও বেড়েছে।

কৃষ্ণনগরের কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নারী মৃৎশিল্পী হলেন কমলা পাল, রেনুকা পাল, গীতা পাল, রেখারানী পাল, প্রতিমা পাল, লক্ষ্মী রানী পাল প্রমুখ। এই সকল নারী শিল্পীগণ কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারের সঙ্গে এই শিল্পধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকা ১৯৭৯-এ 'কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প – তার ভবিষ্যৎ' নামে এক নিবন্ধে প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী নিবারণ পালের বংশধর নির্মল কুমার পাল বঞ্চিত মৃৎশিল্পীদের বহু যন্ত্রণা ও বেদনা তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় না। সরকারি সাহায্য যদি কিছু আসে, তা শো-রুমের মালিকদের কাছে আসে; সাধারণ এবং প্রকৃত শিল্পীদের কাছে তা পৌঁছায় না। প্রকৃত শিল্পী অথচ অর্থনৈতিকভাবে যারা দুর্বল, তারা অনেক সময় তাদের সাধের সৃষ্ট শিল্পসামগ্রী সামান্য মূল্যে শো-রুমের মালিকদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। শো-রুমের মালিকেরাও সুযোগ পেয়ে সেই মৃৎশিল্পীদের শোষণ করে।

সাম্প্রতিককালে এই ধরণের সমস্যা আরও বেড়েছে, বেড়েছে শিল্পীদের আর্থিক অনিশ্চয়তা। আবার মাটি মাখার কাজে এখনকার অনেক মানুষের যেন ঘেন্না করে। এর সবচেয়ে বড় কারণ এই কাজে যতটা পরিশ্রম করতে হয়, সেই হিসাবে মূল্য পাওয়া যায় না। এই মৃৎশিল্পে বাজার অনিশ্চিত। সরকার এই বিষয়ে যেন উদাসীন। শিল্পীদের মহাজনী ঋণের উপর বাধ্য হয়ে ভরসা করতে হয়। এই ঋণের জটিলতায় শিল্পীদের বহু সমস্যায় পড়তে হয়। নদিয়া জেলা ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্টারের সরকারি অফিসারেরা অনেক কথা বললেও তাদের কাজে মৃৎশিল্পীরা হতাশ, বিরক্ত এবং নিরুদ্যম। অর্থাৎ প্রকৃত মৃৎশিল্পীদের সমস্যা সমাধান করা বা তাদের পাশে দাঁড়ানোর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

অতিসম্প্রতি মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে শিল্পীদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানা যায়। শিল্পী সনাতন পাল দীর্ঘদিন মৃৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত।[১৮] তাঁর অধীনে ১২ জন এই শিল্পের কাজ করেন। তাঁর মতে, মৃৎশিল্প দ্রব্যের চাহিদা নিয়ে বিশেষ সমস্যা না হলেও কাঁচামালের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শিল্পে তিনি আগের মতো লাভ দেখতে পান না। তাঁর অধীনে কৃষ্ণ পালসহ বহু ব্যক্তি কাজ করেন, যাঁদের তিনি সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। আবার মৃৎশিল্পী মিলন পালের মালিকানায় লক্ষ্মণ পাল, সুমন পাল, দীপ পালসহ ৮ জন শিল্পী কাজ করেন। তাঁরা অধিকাংশই স্থানীয়। তাঁরও কথায়, "এই শিল্পের এখন আর বিশেষ লাভ নেই। কারণ মাটির মূর্তিগুলো তৈরি করতে যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়, বিক্রি করে তা ওঠে না।"[১৯] তবে তাঁদের দীর্ঘ দিনের এই পেশা তিনি চালিয়ে নিয়ে যেতে চান। শিল্পী সুভাষ পাল ও শিল্পী বাপ্পা পাল মাটির বড় বড় মূর্তি তৈরি করেন। তাদের বক্তব্য, "লকডাউনের পর এখানকার অনেক শিল্পীর বাইরের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁদের লাভ অনেক কমে গিয়েছে।"[২০] অর্থাৎ মৃৎশিল্প থেকে যে লাভ তাঁরা পাওয়ার আশা করেন, তা তাঁরা এখন আর পান না।

মৃৎশিল্পীদের প্রায় সকলের দাবি হল যে এই শিল্পের সঠিক ধারাবাহিকতার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত এবং প্রকৃত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আবার কাঁচামালের সুবন্দোবস্ত করা, সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো প্রভৃতি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। মৃৎশিল্পীরা আরও দাবি যে সরকারের পক্ষ থেকে ভালো ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা এবং মডেল মিউজিয়াম গঠন করা, প্যাকেজিং সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি জেলায় জেলায় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে এই অনন্য মৃৎশিল্প সামগ্রী সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। আবার সেই সঙ্গে ঐতিহ্য ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে মৃৎশিল্পীদেরও নতুন নতুন শিল্পসৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি আরও গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে পূরণ হলে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প তার গৌরব আরও বৃদ্ধি করবে। এই অনন্য সৃষ্টি জগতের নান্দনিক চাহিদা পূরণে আরও কার্যকরী হবে।

তথ্যসূত্র:

১. মল্লিক, কুমুদনাথ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪ই ভাদ্র, ১৩৯৩, ইংরেজি ৩১শে আগস্ট, ১৯৮৬, *নদীয়া-কাহিনী,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃ: ৩৭২।

২. চক্রবর্তী, সুধীর, ১৯৮৫, *কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ,* কলকাতা, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, পৃ: ৮০।

৩. তদেব, পৃ: ৮০।

৪. মল্লিক, কুমুদনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭২।

৫. পাল, গৌতম, ১৪০৪, ‘কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্যের কথা’, *পশ্চিমবঙ্গ,* নদিয়া জেলা সংখ্যা, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ: ১৮৩।

৬. তদেব, পৃ: ১৮৩।

৭. মল্লিক, কুমুদনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭২।

৮. মল্লিক, কুমুদনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭৩।

৯. পাল, গৌতম, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৬।

১০. *ওয়েস্টবেঙ্গল ডিসট্রিক্ট সেন্সার হ্যান্ড বুকঃ নদিয়া, ১৯৬১,* ১৬ই এপ্রিল, ১৯৬১।

১১. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২।

১২. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮।

১৩. দে সরকার, শুভেন্দু, জুন, ২০১৫, *নদীয়ার কথা,* কলকাতা, পাণ্ডুলিপি, পৃ: ৩৪৯।

১৪. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১।

১৫. ঘোষ, নিতাই, ২০০৮, *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নদীয়া,* পৃ: ৬৭।

১৬. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।

১৭. চক্রবর্তী, সুধীর, পৃ: ৮৩-৮৯।

১৮. লেখকের এই সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ হল ২৭.১২.২০২৪।

১৯. এই সাক্ষাৎকার লেখক গ্রহণ করেছেন ০২.০১.২০২৫-এ।

২০. লেখকের এই সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ হল ২১.০৪.২০২৫।

রাজা রামমোহন রায় : ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত বিচার

স্বস্তিকা বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রেই হোক বা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রেই হোক, শিক্ষিত বাঙালী কখনো এর সমর্থন করেছে, কখনো বিরোধিতা করেছে। রামমোহনই বাংলায় প্রথম বেদান্তের একব্রহ্ম উপাসনার কথা প্রচার করেন। তাঁর বিচারে এই ব্রহ্মই বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের মূল প্রত্যয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের আদিসূত্র। পরবর্তীকালে হিন্দুদের মধ্যে বহু দেব-দেবীর পূজা ইত্যাদি আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অপজাত্যের ফল। এই যুক্তি দ্বারা তিনি মিশনারিদের আক্রমণ, উপযোগবাদীদের উপেক্ষা এবং রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিতদের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের একটি ভাবরূপ কল্পনা করেছিলেন। রামমোহনের উপাস্য নিরাকার অথচ সগুণ ব্রহ্ম। বলাবাহুল্য, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ যে ভক্তি ধর্মের প্রাবল্য, তার উৎপত্তি এখান থেকেই। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের প্রতি ভারতীয় হিন্দুদের একরকমের মনোভাব, কিন্তু রামমোহনের তথা ব্রাহ্ম মতের চিন্তাধারা একটু আলাদা। তাঁর নিরাকার অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার পরই 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অযৌক্তিকতা ও এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীচৈতন্যের জ্ঞানমার্গ বিরোধী ভক্তি ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন, যা বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: সংস্কার আন্দোলন, একব্রহ্ম উপাসনা, মিশনারি, উপযোগবাদী, নিরাকার, জ্ঞানমার্গ, ভক্তি ধর্ম।

মূল আলোচনা:

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই রাজা রামমোহন রায়-এর ক্ষুরধার মনীষা ও বুদ্ধিগত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা এদেশে তুলনামূলক ধর্মচিন্তার সূচনা করে। সমগ্র শতাব্দী জুড়ে শিক্ষিত বাঙালী তাদের নবচেতনাকে যে সব পথে ব্যক্ত করেছেন, তার অন্যতম প্রধান হল সংস্কার আন্দোলন। ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রেই হোক বা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রেই হোক, শিক্ষিত বাঙালী কখনো এর সমর্থন করেছে, কখনো বিরোধিতা করেছে। একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যে রামমোহনই বাংলায় প্রথম বেদান্তকে ধর্ম-সত্য ও জীবন-সত্য করবার পক্ষে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দর্শন চিন্তার শুভ সূচনা রূপে রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), ঈশ, কেন, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ বিশেষ মূল্যবান উপকরণ।

একদিকে ইসলাম শাস্ত্রের একেশ্বরবাদী ধারণা এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের কথা মনে রেখেই রামমোহনের অন্তরে বেদান্তের একব্রহ্ম উপাসনার কথা জেগেছিল। এই ভাবরুপের উৎস হল বেদের ব্রাহ্মণভাগের শেষ অংশ অর্থাৎ উপনিষদ। তাঁর বিচারে এই ব্রহ্মই বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের মূল প্রত্যয় এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের আদিসূত্র।

পরবর্তীকালে হিন্দুদের মধ্যে বহু দেব-দেবীর পূজা ইত্যাদি আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অপজাত্যের ফল। এই যুক্তি দ্বারা তিনি মিশনারিদের আক্রমণ, উপযোগবাদীদের উপেক্ষা এবং রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিতদের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের একটি ভাবরূপ কল্পনা করেছিলেন, ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টাও যার থেকে প্রেরণা পেয়েছে।[১]

একথা মনে রাখা ভালো যে, রামমোহনের একেশ্বরবাদ ঠিক অদ্বৈতবাদ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শঙ্করের মায়াবাদকে একেবারে অস্বীকার করেননি, বরং এর দ্বারাই পৌরাণিক বহুদেববাদকে খণ্ডন করেন। অবশ্য এনিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। রামমোহন শঙ্করকে আচার্যরূপে স্বীকার করেও অদ্বৈতবাদের মায়া-অংশকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। যদি গ্রহণ করে থাকেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন নির্বাহের জন্য একেশ্বরবাদকে সুবিধাজনক পত্তন বলে বরণ করেছিলেন।[২] রামমোহনের উপাস্য নিরাকার অথচ সগুণ ব্রহ্ম। বলাবাহুল্য, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ যে ভক্তি ধর্মের প্রাবল্য, তার উৎপত্তি এখান থেকেই। ভারতীয় সাধনার বহু বিচিত্র ধারা অবলম্বনে যে দার্শনিক পদ্ধতিগুলি গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগ – অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈত। রামমোহন উপনিষদ কেন্দ্রিক যে ব্রাহ্ম আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা অদ্বৈতবাদেরই কাছাকাছি। কিন্তু পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ চিন্তা অনেকটা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ায়, যা ছিল মূলত জ্ঞানপথের সাধনা, তাই হয়ে দাঁড়াল ভক্তের ব্যাকুলতা। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ব্রাহ্মদের সম্বোধন করেই বলেছিলেন, ‘তোমরা জ্ঞানী নও, ভক্ত’।[৩]

ঈশ্বরের উপাসনা সাকার না নিরাকার, বাহ্য প্রতীক না মানসিক প্রতীক, কিভাবে উপাসনা নির্বাহ হতে পারে, ব্রাহ্ম সমাজের জন্মের আগে থেকেই ভারতীয় সমাজে সে ব্যাপার নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন – সর্বত্রই এই নিয়ে নানা আলোচনা তর্ক বিতর্ক। কিন্তু সুচিরস্থায়ী কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষ কোনো একটার উপর জোর দেয়নি। যাই হোক, এ নিয়ে ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের যে দ্বন্দ্ব আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই, তার সূচনা রামমোহনের রচনাবলীতে। রামমোহনের বুদ্ধিগত মতাদর্শ ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের পূজা, উৎসব, শিল্প, পুরাণ সাহিত্য – এ সব কিছুকে নাকচ করতে চেয়েছিল। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ছাড়া আর সবই যে দুর্বলতর অধিকারীর জন্য উপাসনা পদ্ধতি – এ কথা মানলে রামানুজ, মাধ্ব, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাই, রাম্প্রসাদ প্রভৃতির ভাবাদর্শ ও সাধন পদ্ধতি সব কিছুই নিম্নপর্যায়ে পড়ে যায়। যতটা উচ্চস্তরে উঠলে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সাধনা হিসাবে বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতবাদকে দেখা যায়, রামমোহনের সিদ্ধান্তও ততটা কেবলাদ্বৈতবাদী নয়। তিনিও মূলত সগুণ ব্রাহ্ম উপাসক।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের প্রতি ভারতীয় হিন্দুদের একরকমের মনোভাব, কিন্তু রামমোহনের তথা ব্রাহ্ম মতের চিন্তাধারা স্বতন্ত্র খাতে বহমান। ভারতীয় পৌরানিক সাহিত্যকে রামমোহন নিজের মত করেই গ্রহণ করেছেন, সেই সঙ্গে কৃষ্ণকেও। সেকালের যাত্রা, পাঁচালী, কবিগানে যেভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হত, তাতেও রামমোহনের মন ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার প্রতি প্রতিকূল হয়ে পড়েছিল। তাঁর ‘ডিফেন্স অফ হিন্দু থীইজম’ এর প্রথমভাগে তিনি লিখেছেন যে, কৃষ্ণ ভক্তরা কৃষ্ণ এবং গোপী সেজে অশ্লীলভাবে নাচগান করে এবং কৃষ্ণের প্রেম ও লাম্পট্যের অভিনয় করে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আদর্শে রামমোহন বিশ্বাস করতেন না। তবে শ্রীচৈতন্যের আবেগপ্রবণ ভক্তিধর্মের বিরোধী এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার তীব্র সমালোচক রামমোহনের উপর বৈষ্ণব ধর্মের ও ভক্তিভাবের প্রভাব না পড়লেও সমকালীন সমাজে ও

বাঙালীর ধর্মচেতনায় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাই 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে তিনি ব্রহ্মের সাকার সত্তার পিছনে ভট্টাচার্য্যের যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করে তাঁর নিরাকার অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার পরই 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অযৌক্তিকতা ও এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীচৈতন্যের জ্ঞানমার্গ বিরোধী ভক্তি ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

রামমোহনের প্রতিপক্ষ গোস্বামী একজন চৈতন্যভক্ত। গোস্বামীর গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। কিন্তু রামমোহনের উত্তর আমাদের সামনে আছে। রামানুজ থেকে শুরু করে জীব গোস্বামী পর্যন্ত সমস্ত বৈষ্ণব আচার্যগণ প্রত্যেকেই পুরাণের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেছেন। জীব গোস্বামী বৈষ্ণব পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবত পুরাণকেই সাত্ত্বিকতম ও প্রমাণ হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন; এর স্থান বেদ বেদান্তের উর্দ্ধে। গোস্বামী এই সাম্প্রদায়িক মতগুলি নিয়েই রামমোহনের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

রামমোহনের পুরাণ অনুশীলনের সমীক্ষার ফলে, জানা যায় – বিচার প্রসঙ্গে ভাগবত পুরাণের ব্যবহারই তিনি বেশি করেছেন। অনুমান করা যায়, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান হিসাবে এই গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রথম থেকেই ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রতিপক্ষের কাছে অর্থাৎ বৈষ্ণব গোস্বামীর কাছে ভাগবতের মর্যাদা ছিল উচ্চ। সুত্রাং বিতর্কে এই গ্রন্থের প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। রামমোহনের 'গোস্বামীর সহিত বিচার' রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি বিশেষভাবে খণ্ডন করেছেন – ১) বেদ, বেদান্ত আলোচনা করা নিষ্ফল, কেন না তা এত দূরহ যে মানববুদ্ধির অগম্য, বেদার্থ নির্ণায়ক ঋষিদের বাক্য পরস্পর বিরোধী; সুতরাং পুরাণ ইতিহাসকেই বেদগণ্য করা উচিত। ২) পুরাণগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পুরাণগুলি সাত্ত্বিক। ৩) এর মধ্যে ভাগবত পুরাণ সর্বশ্রেষ্ঠ; তা একাধারে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থস্বরূপ। ৪) ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি এবং সেই আকার মায়িক নয়, আনন্দ স্বরূপ, তা ভক্তজনের দৃষ্টিগোচর। সিদ্ধান্ত গুলিতে স্পষ্টত জীব গোস্বামীর মত প্রতিফলিত।

এগুলির বিরুদ্ধে রামমোহন যে প্রতিযুক্তি দিয়েছেন তা সংক্ষেপে এই রকম :

১) বৈদিক ঋষিদের বা বেদ ব্যাখ্যাদাতাদের বাক্য পরস্পর বিরোধী, এ যুক্তি পুরাণ-ইতিহাস সম্পর্কেও খাটে; কে না বিভিন্ন পুরাণের মধ্যেও প্রচুর পরস্পর বিরোধী উক্তি আছে।

২) পুরাণ মাত্রকেই যদি ব্যাসবাক্য বলে স্বীকার করতে হয় তাহ্লে বৈষ্ণব পুরাণ উচ্চ এবং শৈবপুরাণ নিম্ন, একথা বললে ব্যাসবাক্যের একরুপতা রক্ষা হয় না। দেখা যাচ্ছে শৈবপুরাণে ও মহাভারতের অনেক স্থলে শিবকে সর্বোচ্চ দেবতা বলা হয়েছে এবং বিষ্ণুর মুখে শিবস্তুতি বসানো হয়েছে।

৩) ভাগবত পুরাণকে কোন যুক্তিতেই বেদান্ত ভাষ্য হিসাবে গণ্য করা চলে না। ব্রহ্মসূত্রের সাড়ে পাঁচশ সূত্রের মধ্যে একটিও সূত্রের ব্যাখ্যা বা উল্লেখ ভাগবতে কোথাও নেই। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ভাগবতে আছে, সেই সব লোকবিরুদ্ধ আচরণের সঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের সংস্রবমাত্রও কল্পনা করা যায় না। বৃন্দাবন লীলা সম্পর্কে তাঁর নৈতিক প্রশ্ন –

> "শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ পূর্বক বৃক্ষারোহন করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্যবদনে আমার নিকট ঐরুপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর।

বেদান্তের কোন শ্রুতির এবং কোন সূত্রের অর্থ এই সকল সর্বলোক বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞ লোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন”।[৪]

৪) ব্রহ্ম সাকার আনন্দরূপ কৃষ্ণ মূর্তি যা কেবলমাত্র ভক্তদের দৃষ্টিগোচর, বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রামমোহনের বক্তব্য, রূপক বা কল্পনার মাধ্যমে বিমূর্ত আনন্দের ধারণা করা যেতে পারে; কিন্তু আনন্দের মূর্ত্তিমান মনুষ্যাকৃতি হস্তপদ বিশিষ্ট রূপ শাস্ত্র, অনুভব, প্রত্যক্ষ – সব প্রকার প্রমাণের বিরোধী। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মনোগত এবং কোন বিষয়গত ভিত্তি নেই। পুরাণে তো নিম্নাধিকারীর উপাসনার জন্য সূর্য, বায়ু, অগ্নি, অন্ন, শিব, কালিকা প্রভৃতি নানা শক্তি, বস্তু বা দেবদেবীকে বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, কৃষ্ণকে ব্রহ্মস্বরূপ ও আনন্দমূর্ত্তি স্বীকার করলে, এদের ভক্তদের দৃষ্টিতে এদেরও সাবয়ব আনন্দমূর্ত্তি স্বীকার করতে হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত হল এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ, এই ব্রহ্মানন্দের কোনও মূর্ত বিগ্রহ শ্রুতি স্বীকার করেন না।[৫]

রামমোহন ভাগবতের আলোচনায় জানিয়েছেন, ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৫৯ অধ্যায়ে দেখা যায়, কৃষ্ণ কখনও সন্ধ্যা করেছেন, কখনও বা ব্রহ্মমন্ত্র জপ করেছেন; আবার কখনও পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন আছেন। ভাগবতের অন্যত্র উপদেশ দেওয়া হয়েছে কেবল কৃষ্ণকে নয়, তাবৎ বিশ্ব চরাচরকে ব্রহ্ম বলে জানবে। ১০ম স্কন্ধের ৮৫ অধ্যায়ে পিতা বাসুদেবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি – আমি তুমি বলদেব, দ্বারকাবাসী সকল নরনারী, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম এই সব কিছুকেই ব্রহ্ম বলে জান। সুতরাং ভাগবতের কৃষ্ণ এক ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ, তিনি বা তাঁর বিগ্রহ একমাত্র ব্রহ্ম নন।[৬]

কৃষ্ণকাহিনী বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যেভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর মধ্যে কৃষ্ণের দুটি স্বতন্ত্র রূপ আমরা দেখতে পাই; একদিকে উপনিষদে ও মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্র, যেখানে কৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ, ধর্মপ্রবক্তা, রণপণ্ডিত; অন্যদিকে হরিবংশ – ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণ, যিনি প্রেমিক, ভক্ত সখা ও গোপীজন বল্লভ। রামমোহন স্পষ্টত ব্রহ্মজ্ঞ ও ধর্মপ্রবক্তা মানব কৃষ্ণের পক্ষপাতী। লক্ষ্য করার বিষয়, গীতা রামমোহনের অতি শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়। তিনি এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এবং বহুবার বিভিন্ন স্থানে গীতার কৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বৃন্দাবন লীলার নায়ক ব্রজের কৃষ্ণকে তাঁর আধুনিক যুক্তিবাদী মন প্রত্যাখ্যান করেছিল। আলোচনায় দেখা যায়, ভাগবতের কৃষ্ণকেও তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ রূপেই গ্রহণ করেছেন। এইভাবে রামমোহন সম্ভবত নিজের অলক্ষ্যে আধুনিক কৃষ্ণ গবেষণার আর একটি ধারার সূত্রপাত করেছেন। বর্তমানের অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন উপনিষদ-মহাভারত বর্ণিতকৃষ্ণ জীবনের কাঠামোটির অতিরঞ্জন সত্ত্বেও একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে; সে তুলনায় বৃন্দাবনের কাহিনী অর্বাচীন, উত্তরকালের সংযোজন।[৭] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকে অনৈতিহাসিক জ্ঞানে বর্জন করেছেন।

ভাগবত পুরাণের আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন – চৈতন্যদেব কেন্দ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব-পরম্পরা বিষয়ক। উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত পরমানন্দ সেন (কবি কর্ণপুর ষোড়শ) বা বলদেব বিদ্যাভূষণের (অষ্টাদশ) মতে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের দ্বৈতবাদী সাধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই শাখা।[৮] কিন্তু আশ্চর্য হল প্রাচীনতম ঐতিহ্য অনুযায়ী চৈতন্য সম্প্রদায়ের পূর্বসূরীরা সকলেই শংকর পন্থী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী এবং এই পরম্পরার আদি পুরুষ স্বয়ং শঙ্করাচার্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আলোচোকদের মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম এই তথ্যের দিকে উৎসাহী শিক্ষিত ও জ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রামমোহন এখানে দুজন শঙ্কর পন্থী সন্ন্যাসী কেশবভারতী ও শ্রীধরস্বামীকে চৈতন্য সম্প্রদায়ের উর্ধবতন গুরু পরম্পরার অন্তর্গত গণ্য করে চৈতন্যকে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।[৯] শ্রীধর (চতুর্দশ), বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর তাঁর সুবিখ্যাত টীকাত্রয়ে শঙ্করের সমস্ত সিদ্ধান্ত মান্য করেও এই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে ভক্তিই মুক্তি লাভের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপায়। অধ্যাপক সুশীল কুমার দে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ঐতিহ্যের অতি নিপুন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চৈতন্যদেব ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে যতই বিরূপতা দেখান না কেন চৈতন্য মূলত শঙ্করপন্থী দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন এবং তাঁর গুরুপরম্পরার মধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী এবং কেশবভারতীও পূর্বোক্ত শ্রীধরের মত ভক্তিবাদী সত্ত্বেও শঙ্করপন্থী ছিলেন এমন মনে করার কারণ আছে।[১০] এই মত সর্বস্বীকৃত হোক বা না হোক রামমোহনই এই মত প্রথম প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১। রায়শিবনারায়ণ, (১৯৮৪), ‘*স্রোতের বিরুদ্ধেঃ ভারতীয় ঐক্যের সন্ধানে*, কলকাতা, নভনা, পৃঃ ৭৪-৭৫

২। বসুশঙ্করী প্রসাদ, (১৩৮৭ বঃ),‘*বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস,পৃঃ ১৭৩

৩। ঘোষডঃ প্রণব রঞ্জন, (১৩৩২ বঃ), ‘*শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, পৃঃ ২৩০

৪। ঘোষঅজিত (সঃ), (১৩৮০ বঃ), ‘*রামমোহন রচনাবলীঃ গোস্বামীর সহিত বিচার*, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ১৬০

৫। তদেব; পৃঃ ১৫৫-১৫৮

৬। তদেব; পৃঃ ১৫৫-১৬৮

৭। De Sushil Kumar, (1942), ‘*Early History of The Vaisnava Faith and Movement in Bengal*’, Calcutta, General Printers and Publishers Limited, p. 6

৮। বিদ্যাভূষণবলদেব, (১৯১২), ‘*গোবিন্দভাষ্য*, এলাহাবাদ, পানিনি অফিস, পৃঃ ১-২

৯। ঘোষঅজিত (সঃ), (১৩৮০ বঃ), ‘*রামমোহন রচনাবলীঃ গোস্বামীর সহিত বিচার*, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ১৬২-১৯৩

১০। De Sushil Kumar, (1942), ‘*Early History of The Vaisnava Faith and Movement in Bengal*’, Calcutta, General Printers and Publishers Limited, pp. 10-18।

মধ্যযুগে ইউরোপের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ‘ঈশ্বর প্রবঞ্চক’ (‘God as a deceiver’) -রূপ সংশয়বাদী প্রকল্প

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য্য
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
পাঁচুড় কলেজ

সারসংক্ষেপ (Abstract): পাশ্চাত্য দর্শনে প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিককাল অবধি সংশয়বাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও ইউরোপে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ঐশ্বরিক উদ্ভাসনের বিরোধিতা করে ‘ঈশ্বর প্রবঞ্চক’ রূপ যে অভিনব সংশয়বাদী পদ্ধতিটির অবতারণা করা হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে বাহ্য জগতের জ্ঞান সম্পর্কে সংশয়বাদের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই প্রসঙ্গে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রতারণা করতে পারেন - এরূপ সম্ভাবনার পক্ষে John Duns Scotus -এর প্রদত্ত যুক্তি দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিছক প্রতারণার সম্ভাবনার স্বীকৃতি চতুর্দশ শতকের মধ্যযুগীয় দর্শনকে চূড়ান্ত সংশয়বাদে পরিণত করবার যে প্রয়াস, তা শেষ পর্যন্ত তিনটি কারণে কার্যকর হয়নি। যদিও ‘ঈশ্বর প্রবঞ্চক’ -এরূপ সংশয়বাদীর প্রকল্পটির প্রভাব আধুনিক যুগে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব বিষয়ক সংশয়বাদের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

সূচকশব্দ (Key words): ‘ঈশ্বর প্রবঞ্চক’ (‘Divine Deception’), নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, নির্ধারিত ক্ষমতা, সর্বোচ্চ সাক্ষ্য, সাধারণ সাক্ষ্য।

মূল আলোচনা:

সংশয়বাদ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলির মধ্যে অন্যতম। পারিভাষিক অর্থে সংশয়বাদ হলো এমন এক ধরনের মতবাদ যেখানে যে কোনো প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বা মতের সম্ভাবনা বিষয়ে সংশয় পোষণ করা হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনে সংশয়বাদের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। তবে মধ্যযুগে (আনুমানিক ৫২৯ খ্রিঃ-১৪০০খ্রিঃ) ইউরোপে সংশয়বাদী কোন চিন্তাধারার অস্তিত্ব আদৌ ছিল কিনা এবং সেই সময় সংশয়বাদের অবস্থান ঠিক কিরূপ ছিল - এটা অতি বিতর্কিত একটি বিষয়। বহুকাল যাবৎ গবেষকদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, পাশ্চাত্য সংশয়বাদের ইতিহাস চর্চায় মধ্যযুগের আলোচনা সেইভাবে প্রাধান্য পায়নি। এর পশ্চাতে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, Aristotle (384B.C-322B.C)-এর দর্শনের আধিপত্যের কারণে মধ্যযুগের সংশয়বাদ কোন গুরুতর সমস্যা বলে বিবেচিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগকে পরবর্তীকালে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছিল, যার অন্যতম কারণ ছিল মধ্যযুগে ধর্মীয় গোড়ামি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারার পথ রুদ্ধ করে এবং দর্শন চিন্তার পরিবর্তে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় চিন্তার আবহ সৃষ্টি হয়। এমনকি মধ্যযুগের দার্শনিক আলোচনায় মূলতঃ ধর্মভিত্তিক ও নৈতিক আলোচনা এবং সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, ঐশ্বরিক উদ্ভাসন ('Divine Illumination') ইত্যাদি বিষয় আলোচনা সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছিল। তবে পরবর্তী সময় নানা গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে, মধ্যযুগের ক্ষেত্রেও সংশয়বাদের প্রসঙ্গ অনেকবার উত্থাপিত হয়েছে। যদিও মধ্যযুগের দার্শনিকরা সংশয়বাদ বলতে কেবলমাত্র প্রাচীন

গ্রীসের একাডেমিক সংশয়বাদী চিন্তাধারা বিশেষতঃ নব্য অ্যাকাডেমিক সংশয়বাদের সাথে পরিচিত ছিলেন। কারণ 1562 সালের আগে পর্যন্ত Sextus Empiricus - এর পাইরোবাদ সংক্রান্ত কোনো লেখা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়নি। তবে মধ্যযুগে ইউরোপে প্রকৃত সংশয়বাদী বলে বিশেষ কেউ না থাকলেও মাত্র ঘোষিত সংশয়বাদী রূপে John of Salisbury (c.1115-1180) -র নামই পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদরা নিজেরা সংশয়বাদী না হলেও কোন মত খণ্ডনের ক্ষেত্রে সংশয়বাদকে পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মীয় প্রসঙ্গে যখন কোন বিশ্বাস বা যে কোন মত বা স্বীকৃতিকে মধ্যযুগীয় দার্শনিকরা প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, তখন বিরুদ্ধ অসিদ্ধি ('reductio ad absurdum) পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে প্রাকল্পিকভাবে সেই স্বীকৃতির নিষেধকে গ্রহণ করে তার পরিণাম স্বরূপ যে সংশয়বাদ অবলম্বন করতে হয় যা গ্রহণযোগ্য অবস্থান নয় - এমনটা তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত যখন মধ্যযুগীয় দার্শনিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্কগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই সময়ে এক নতুন সংশয়বাদী যুক্তির অবতারণা হয়েছিল, যা সমগ্র মধ্যযুগীয় দর্শনকে এক সংশয়বাদী ভাবধারায় পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। মধ্যযুগের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ঐশ্বরিক উদ্ভাসন ('Divine Illumination') -রূপ ধারণার বিরোধিতা করে কয়েকজন মধ্যযুগীয় দার্শনিক 'ঈশ্বর প্রতারক' ('God as a deceiver') - এরূপ সংশয়বাদী প্রকল্পটির মাধ্যমে বাহ্যজগতের বস্তু সম্পর্কে যে সংশয়বাদের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে আধুনিক যুগের সংশয়বাদে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

'God as a deceiver' - মধ্যযুগের ইউরোপের সংশয়বাদের পক্ষে এমন এক অভিনব পদ্ধতি, যে পদ্ধতির কথা প্রাচীন গ্রীক সংশয়বাদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় না। ঐশ্বরিক উদ্ভাসন ('Divine Illumination') - এর বিরোধিতা করে ঐশ্বরিক প্রতারণা ('Divine Deception') - রূপ প্রকল্পের অবতারণা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় চিন্তার জগতে ব্যাঘাত ঘটায়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে প্রতারক হওয়ার সম্ভাবনারূপ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে যে এক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, তা দার্শনিক এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রসঙ্গে John Duns Scotus (c.1265/66-1308)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Scotus ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার প্রেক্ষিতে ঈশ্বরের প্রতারক হওয়ার সম্ভাবনা বিষয়ে দুটি যুক্তি প্রদান করেছেন। প্রথমত, Scotus দুই ধরনের ঐশ্বরিক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন - নিরঙ্কুশ ক্ষমতা (absolute power) এবং নির্ধারিত ক্ষমতা (ordained power)। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হলো এমন যা যৌক্তিক সম্ভাবনার বিরোধী নয়, সেটা ব্যতীত বাকি সব কিছু করতে পারার ক্ষমতা। অপরদিকে ঈশ্বরের নির্ধারিত ক্ষমতা হল এমন যেখানে ঈশ্বর ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কর্ম করেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁর নির্ধারিত ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে নির্ধারিত ক্ষমতা বিরুদ্ধ কর্ম করতে পারেন। Scotus - এর মতে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলে নানা কৌশল প্রয়োগ করে মানুষকে প্রতারণা করা সম্ভব। যদিও এই প্রতারণার সঙ্গে করুণা বা অনুগ্রহের কোন বিরোধ নেই বলে Scotus মনে করেছেন। দ্বিতীয়ত, Scotus বলেছেন যে, ঈশ্বর হলেন জগতের সকল কিছুর আদি কারণ স্বরূপ। কিন্তু এমন কিছু কার্য লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারা সৃষ্ট নয়, কোন গৌণ কারণ দ্বারা সৃষ্ট। যদিও গৌণ কারণ কর্তৃক উৎপাদিত কার্যের কারিকাশক্তি, আদি কারণরূপে ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তেমনি

ঈশ্বর আদি কারণ রূপে যে জগতকে সৃষ্টি করেছেন সেই জগত প্রকৃতপক্ষে যেমন, তেমনটি না হয়ে অন্যরকমও হতে পারতো। আবার ঈশ্বর আমার মনে কোন ভ্রান্ত ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারতেন। এই দুটি যুক্তির মাধ্যমে Scotus কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি সম্পর্কেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, এমন নয়। তিনি বাহ্য জগতের জ্ঞান সম্পর্কেও সংশয় করেছিলেন।

চতুর্দশ শতকের প্রথম থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত Ockham (c.1287-1347), Robert Holkot (c.1290-1349), Adam Wodeham (c.1298-1358) প্রমুখ দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিকগণ ঈশ্বরের পক্ষে প্রতারক হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব, উভয় ক্ষেত্রেই 'ঈশ্বর প্রবঞ্চক' এরূপ সংশয়বাদী যুক্তির একটি বিশেষ প্রভাব ছিল, সেটা সম্বন্ধেও এই সকল দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিকগণ অবগত ছিলেন। Holkot বলেছেন যে, ঈশ্বর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে দুইভাবে প্রতারণা করতে পারেন - সাক্ষাৎ ভাবে এবং পরোক্ষভাবে অর্থাৎ ভালো মানুষ এবং দেবদূতের মাধ্যমে। আবার Woodham - এর মতে, ঈশ্বর আমাদের প্রতারণা করলে তার পরিণতি স্বরূপ নিজের মনের অস্তিত্ব ব্যতীত কোন বাহ্যবস্তুকে জানা যায় না। এছাড়াও মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদরা মনে করেন যে, ঈশ্বর এতটাই ক্ষমতাশালী যে তাঁর নিছক প্রতারণার সম্ভাবনা চতুর্দশ শতকের মধ্যযুগীয় দর্শনকে চূড়ান্ত সংশয়বাদে পরিণত করার ক্ষমতা রেখেছিল। কিন্তু তিনটি কারণে তা পরিণতি লাভ করে নি।

প্রথমত, গ্রেগরি-র Rimini (c.1300-1358), Gabriel Biel (c.1420-1495) এবং Francisco Suarez (c.1558-1617) বলেছেন যে, ঈশ্বর প্রতারক হতে পারেন না, কারণ এটি তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ঈশ্বর যেহেতু করুণাময়, ঈশ্বর কখনোই মানুষকে প্রতারণা করতে পারেন না। কারণ ঈশ্বরের করুণাময় হওয়ার সঙ্গে প্রবঞ্চনা যেটা নাকি অভিসন্ধিমূলকভাবে কাউকে বিপথগামী করা, তা একেবারেই সংগতিপূর্ণ নয়। Rimini-র মতে, ঈশ্বর নিজে কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না বা কাউকে দিয়ে মিথ্যা বলাতে পারেন না। এমনকি ঈশ্বর তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলেও মিথ্যা বলতে পারেন না। Rimini এভাবে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তাকে সীমিত করে বলেছেন যে, ঈশ্বর যেহেতু করুণাময়, তাই ঈশ্বর প্রতারণা করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট ধর্মে, বিশেষতঃ ক্যাথলিক খ্রিষ্টীয় ধর্মে বলা হয় যে, সৃষ্টির সময় ঈশ্বর এবং মানবজাতির মধ্যে যে চুক্তি স্থাপিত হয়েছিল, সেই চুক্তির কারণে ঈশ্বর প্রতারণা করতে পারলেও তা করতে পারেন না। সৃষ্টিকালে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত হলেও কোনটাই চূড়ান্ত নয়। ঈশ্বর এই নিয়মাবলী দ্বারা সীমাবদ্ধ না হলেও চুক্তির কারণে তিনি সেগুলিকে মেনে চলবেন। মানুষ হিসেবে আমরা তাই বিশ্বাস করতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের প্রতারণা করবেন না এবং কোনরকম পরিবর্তন করবেন না।

তৃতীয়ত, John Buridan (c.1300-1361) বলেছিলেন যে, আমরা বুদ্ধির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়জনিত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (sensory illusion)-কে সংশোধন করতে পারি। ইন্দ্রিয় যে নির্ভরযোগ্য - এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি। কোন্ অবস্থায় ইন্দ্রিয় আমাকে প্রতারণা করতে পারে, এটাও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে কখন প্রতারণা করছেন - এটা জানার কোন উপায় আমাদের নেই। তবে Buridan-এর জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগীয় সংশয়বাদী ভাবনাকে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। Buridan বলেছেন যে, ঐশ্বরিক প্রতারণার সম্ভাবনা থাকলে কোন জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলে গণ্য করা যাবে না। যদি জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে সংশয়বাদ অনিবার্য। Buridan, এর সমাধানকল্পে আমাদের বিশ্বাসকে ভ্রম সম্ভাবনাযুক্ত বলে স্বীকার করার কথা বলেছেন। সাক্ষ্যের ধারণাটিকে অকাট্য অর্থে

গ্রহণ না করে দুর্বল অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কোন বিশ্বাসের পক্ষে কী বা কী কী সাক্ষ্য হতে পারে, এই বিষয়টাও আধুনিক এবং সাম্প্রতিক যুগের খুবই আলোচ্য একটি বিষয়। Buridan-এর মতে, ঐশ্বরিক প্রবঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানকে ভ্রমসম্ভাবনামুক্ত (infallible) রূপে গণ্য করা যাবে না। কারণ জ্ঞানকে ভ্রমসম্ভাবনামুক্ত বলা হলে কোন জ্ঞানই সম্ভবপর হবে না। সেই কারণে Buridan জ্ঞান বলতে ভ্রমসম্ভাবনাযুক্ত জ্ঞান (fallible knowledge)-র কথা বলেছেন এবং আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনুযায়ী সাক্ষ্য (evidence)-এর ধারণাটির আপেক্ষিকীকরণের কথা বলেছেন। ধরা যাক, আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়টি যদি কোন গাণিতিক সত্য বা কোন পূর্বতঃসিদ্ধ সত্য হয়, সেক্ষেত্রে সেই বিষয়টির সত্যতার পক্ষে একমাত্র সাক্ষ্য হবে প্রদর্শনমূলক প্রমাণ। কিন্তু অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটি যদি জাগতিক কোন বিষয় হয়, সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যের ধারণাটির আপেক্ষিকীকরণ করতে হবে। সুতরাং সাক্ষ্যের ধারণা কোন চূড়ান্ত বা অপরিবর্তনীয় ধারণা নয়। এই প্রসঙ্গে Buridan দুই ধরনের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন – সর্বোচ্চ সাক্ষ্য (maximal evidence) এবং সাধারণ সাক্ষ্য (natural evidence)। যখন কোন বচন স্বরূপতঃ এমন হয় যে আমাদের বুদ্ধি সেই বচনটির সত্যতাকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারে না, তখন সেই বচনের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্যটি হবে সর্বোচ্চ সাক্ষ্য। এই অর্থে বিরোধবাধক নিয়মের (principle of non-contradiction) পক্ষে সাক্ষ্য হল সর্বোচ্চ সাক্ষ্য। 'আমি অস্তিত্বশীল' -এই বচনটির সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্যও সর্বোচ্চ সাক্ষ্য। কারণ আমাদের স্বাভাবিক বোধশক্তি দ্বারা সচেতনভাবে চিন্তন কর্তারূপে আমি যে আছি – এই সত্যকে আমরা কোনভাবেই সংশয় বা অস্বীকার করতে পারি না। অপরদিকে, যখন কোন বচনের বিরুদ্ধ বচন স্বাভাবিক বুদ্ধির মাধ্যমে কল্পনা না করে কেবলমাত্র কূটতর্ক দ্বারা কল্পনা করা হয়, তখন সেই মূল বচনটির সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্যটি হবে প্রাকৃতিক সাক্ষ্য। যেমন, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী এবং সেগুলি থেকে নিঃসৃত সিদ্ধান্তসমূহের পক্ষে সাক্ষ্য হল সাধারণ সাক্ষ্য। এক্ষেত্রে অলৌকিক কোন শক্তির প্রবঞ্চক হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা হলে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী এবং সেগুলি থেকে নিঃসৃত সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধ কল্পনা করা যেতে পারে, যা কখনোই স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়।

সুতরাং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের এই প্রতারণার ধারণাটিকে সংশয়বাদী প্রকল্পরূপে গ্রহণ করে মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদরা একদিকে যেমন ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ঐশ্বরিক উদ্ভাসনের বিরোধিতা করেছিলেন, অপরদিকে তাঁরা বাহ্যজগতের জ্ঞানের সম্ভাবনা সম্পর্কে, বাহ্যজগতের বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় করার প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করেছিলেন। চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে 'ঈশ্বর প্রবঞ্চক' ('God as a deceiver') যুক্তিটি বাহ্যজগৎ সংক্রান্ত সংশয়বাদের পক্ষে একটি চূড়ান্ত যুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যুক্তির মূল কথা ছিল ঈশ্বর যদি প্রতারক হন, তাহলে আমরা 'বাহ্যজগৎ আছে' বলে দাবি করতে পারি না। এই বাহ্যজগৎ সংক্রান্ত সংশয়বাদ পরবর্তীকালে আধুনিক যুগের সংশয়বাদ বিষয়ক আলোচনায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

পাদটীকা:

1. Lagerlund, Henrik, (2018), "Divine Deception" in *Skepticism: From Antiquity to the Present* (edited by Diego, Machuca & Jonathan, Barnes), London, Bloomsburry, pp.223-226.

2. Lagerlund, Henrik, (2018), "Divine Deception" in *Skepticism: From Antiquity to the Present* (edited by Diego, Machuca & Jonathan, Barnes), London, Bloomsburry, pp.227.
3. Lagerlund, Henrik, (2018), "Divine Deception" in *Skepticism: From Antiquity to the Present* (edited by Diego, Machuca & Jonathan, Barnes), London, Bloomsburry pp.228.
4. Lagerlund, Henrik. (2018), "Divine Deception" in *Skepticism: From Antiquity to the Present* (edited by Diego, Machuca & Jonathan, Barnes), London, Bloomsburry, pp.228.
5. Lagerlund, Henrik, (2018), "Divine Deception" in *Skepticism: From Antiquity to the Present* (edited by Diego, Machuca & Jonathan, Barnes), London, Bloomsburry, pp.229-230; Lagerlund, Henrik, (2020), "God as a Deceiver: External World Skepticism in Later Medieval Times" in *Skepticism in Philosophy: A Comprehensive, Historical Introduction,* New York, Routledge, pp. 95-99.

তথ্যসূত্র (References):

- Lagerlund, Henrik (ed.), (2010), *Rethinking the History of Skepticism: The Missing Medieval Background,* Leiden, Brill, pp. 171-192.
- Lagerlund, Henrik, (2020), *Skepticism in Philosophy: A Comprehensive, Historical Introduction,* New York, Routledge, pp.78-100.
- Machuca, Diego and Barnes, Jonathan (eds.), (2018), *Skepticism: From Antiquity to the Present*, London, Bloomsburry, pp. 222-231.

কৃষিক্ষেত্রে অবহেলিত নারী শ্রমিক : একটি পর্যালোচনা

সুকান্ত নস্কর
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভারত উন্নয়নশীল দেশ। প্রধান পেশা কৃষি, কারণ জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই এই পেশার সাথে জড়িত। উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো ভারতেও অনেক নারী কৃষিতে নিযুক্ত। এশিয়ার নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে কৃষিতে নারীর পেশা ৬০-৮০ শতাংশের মধ্যে। প্রায় এশিয়ার দেশগুলিতে, অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে কৃষিতে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা বেশি। এই গবেষণাপত্রে দেখা গেছে যে কৃষিক্ষেত্রে নারীদের জন্য অনেক কর্মসংস্থান তৈরি করে। যেসব চাকরি অনেক গৃহস্থালি সম্পদকে নারীর নিয়ন্ত্রণে আনে, তা পরিবারে বেশি আয়ের দিকে পরিচালিত করে। যদিও, নারীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি নিযুক্ত, নারী এবং পুরুষদের দ্বারা অর্জিত মজুরির পার্থক্য সমস্ত দেশে বিদ্যমান। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারীদের উৎপাদনশীল সম্পদে কম অ্যাক্সেস রয়েছে। এই কারণগুলির কারণে এবং নারীদের নিম্ন শিক্ষার স্তরের কারণে নারীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজে থাকার প্রবণতা বেশি। পেশাদার নারীরা নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। নারীদের উপর উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের প্রভাব কেবল এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তারা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, বরং তারা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখিও হচ্ছে, যা তাদের উদারীকরণ থেকে কম উপকৃত করে। একবার বিভিন্ন প্রভাব নির্ণয় করা হলে, সুপরিকল্পিত নীতিগত প্রতিক্রিয়া কৃষিতে বৃহত্তর উন্মুক্ততার সুবিধা নিতে নারীদের সহায়তা করতে পারে। ১৯৯১ সালের সেন্সাস অনুসারে গ্রামীন কর্মীদের ৮০ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রের সাথে যুক্ত, যে কৃষিক্ষেত্র থেকে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশ আসে। ২০০১ সালেও এর বিশেষ কোন তারতম্য ঘটেনি। আর এই কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গেই নারীকর্মীদের অধিকাংশ যুক্ত আছেন। কিন্তু বিস্ময় হলো এই যে কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হয়নি।

সূচক শব্দ: নারী শ্রমিক, কৃষিকাজ, অসংগঠিত ক্ষেত্র, নিম্নবর্গের নারী, কৃষি শ্রমিক।

কৃষিকাজ ও নারী শ্রমিক: ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যেটা দেখা যায় সেটা হল, ‘অবশিল্পায়নের’ ধাক্কায় গ্রামের কৃষি অর্থনীতির উপর প্রচন্ড চাপ এসে পড়েছিল। এর ফলে গ্রামের পুরুষরা শহরে এসে কলকারখানা ও অন্যত্র কাজ নিয়েছিলেন। গ্রামের কৃষি অর্থনীতির মূল বোঝাটা তখন গ্রামের মহিলাদের উপরই এসে পড়েছিল। পারিবারিক চাষ ও কৃষি বহির্ভূত কাজ তাদেরই প্রধানত করতে হতো। এই ধরনের কাজ গৃহভিত্তিক ছিল এবং মহিলারা ঘরে বসেই তা করতেন। সে কারণেই উনিশ ও বিশ শতকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষিশ্রম প্রক্রিয়ায় মহিলাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে নজর করা গেছে। তারাই পরিবারের অর্ধেক অর্থনীতির দায়িত্বভার বহন করতেন। ঔপনিবেশিক আমলে ‘ঝুম’ প্রথায় চাষের ক্ষেত্রে আদিবাসী রমণীদের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। আদিবাসী সমাজে পুরুষ-নারী সমানভাবেই চাষের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। ঝুম চাষের জন্য আগাছা পরিষ্কার করা, জমি পরিষ্কার ও সমান করার কাজ ছাড়াও আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলির মহিলারা বীজ বোনা থেকে শুরু করে ফসল কাটা, ঝাড়া

ও ঘরে তোলার কাজ সমস্তটাই নিজেরা করতেন, এমনকি তারা কখনো কখনো চাষের জমিতে লাঙল দেবার কাজেও যোগ দিতেন।[১]

ভারতীয় অর্থনীতিতে মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দু নারীর অংশগ্রহণ ও স্বাধীন জীবিকার ইতিহাস বেশি দিনের পুরানো নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটই গত ৫০-৬০ বছরে কিছু উচ্চ ও মধ্যবর্গের নারীকে বিভিন্ন অর্থকরী পেশাতে টেনে এনেছে। দেশের স্বাধীনতাও সে সুযোগ এবং পরিবেশ তৈরি করতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। কিন্তু নিম্নবর্গের নারীরা বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে এবং নানা অর্থকরী পেশায় নিযুক্ত আছেন সেই প্রাচীনকাল থেকে। প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত গড়ে ওঠার সময় থেকে চতুর্বর্ণ প্রথাকে কেন্দ্র করে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ তৈরি হয়। আর তখন থেকেই শূদ্র নারীরা কৃষি, হস্তশিল্প এবং নানাবিধ সেবাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত আছেন। প্রাচীন ভারতে শূদ্র নারীরা যে পশুপালন ও কৃষিকাজ সমেত অনেক রকমের অর্থকরী কাজে ব্যাপৃত থেকে পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে বহন করতেন, এমনকি অনেক সময় স্বামীর ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্বও স্ত্রীর উপর পড়তো, তার প্রমান কৌটিলের অর্থশাস্ত্রে আছে।[২]

ভারতবর্ষে অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সবথেকে বেশি নারী কাজ করেন কৃষিক্ষেত্রে। ভারত সরকারের প্রতিবেদন 'Towards Equality' (১৯৭৪) বলা হয়েছে, ভারতে নারী কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ১৮.৩ লক্ষ এবং ১৯৭১ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৯.২ লক্ষ, অন্যদিকে নারী ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ১৯৫১ সালে যেখানে ছিল ১২.৬ লক্ষ, তা ১৯৭১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫.৭ লক্ষ। ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে আদমশুমারি অনুসারে গ্রামীন কর্মীদের আশি শতাংশ কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখনো ভারতীয় জনসমষ্টির দুই- তৃতীয়াংশ কৃষির উপরে নির্ভরশীল। এদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন নারী। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজে নিযুক্ত নারী শ্রমিকের শতকরা হার পুরুষের শতকরা হারের তুলনায় অনেক বেশি এবং ১৯৯১ সালে তা দ্বিগুণের বেশি ছিল। আদমশুমারির প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, ১৯৯১ সালে কৃষিতে নারী কর্মীর ৩৮.৫৮ শতাংশ ছিলেন চাষি এবং ৪৮.৪৩ শতাংশ ছিল কৃষি শ্রমিক। আর পুরুষ কর্মীদের মধ্যে ৫১.৬১ শতাংশ চাষি এবং মাত্র ২৬.৪৮ শতাংশ কৃষিশ্রমিক। অতএব ১৯৮১, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে দেখা যাচ্ছে, কৃষিতে নারীর অবস্থান মূলত ছিল কৃষিশ্রমিক হিসেবে, চাষি হিসেবে নয়। বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক গবেষণার ফলে কৃষিশ্রমিকের যে শতকরা হার পাওয়া গেছে তা থেকেও স্পষ্ট, সমস্ত রাজ্যগুলিতেই নারী কৃষিশ্রমিকের হার ১৯৮১ থেকে ২০০১- এই কুড়ি বছরে পুরুষ শ্রমিকের হারের তুলনায় অনেকাংশে বেশি ছিল। তবে এইসব নারী শ্রমিকরা আদমশুমারির সংজ্ঞানুযায়ী অনেকেই প্রান্তিক কৃষিশ্রমিক হিসেবে গণ্য হয়েছে। আদমশুমারির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যারা বছরে ১৮৩ দিন অথবা ৬ মাসের কম সময় ধরে কাজে নিযুক্ত থাকেন তারাই 'প্রান্তিক' কর্মীর পর্যায়ভুক্ত হবেন।

নারী কর্মীদের অধিকাংশই কৃষিক্ষেত্রে 'ঠিকা' বা অস্থায়ী বা ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করেন। এরা শুধুমাত্র চাষের মরসুমে অর্থাৎ সাধারণত এপ্রিল থেকে জুলাই এই তিন-চার মাস কাজ পান। অন্যসময় হয় তারা বেকার থাকেন অথবা বিকল্প কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যান। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে নারী চাষি শ্রমিকদের মধ্যে প্রান্তিক কর্মীর সংখ্যাটা অনেকটাই বেশি, কারণ মহিলারা অধিকাংশই কেবলমাত্র চাষের মরসুমে কাজ পান। ফলে

আদমশুমারির সংজ্ঞানুসারে পশ্চিমবঙ্গে এরা বছরে ১৮৩ দিন অথবা ৬ মাসের কম সময়ে কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে 'প্রান্তিক' শ্রমিক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই দেখা গেছে ভারতবর্ষে চাষের কাজে নিযুক্ত মহিলাদের প্রায় সকলেই নিম্নবর্ণের ও নিম্নজাতের পরিবারগুলো থেকে উদ্ভূত। প্রাচীন ভারতের শূদ্র নারীরা কৃষিকাজ ও পশুপালনসহ বিভিন্ন ধরনের অর্থকরী কাজ করে পরিবারের রোজগারে অংশ নিতেন। কৃষিতে তপশিলি জাতি-উপজাতির নারীরা অনেকবছর ধরেই বড়ো ভূমিকা পালন করে চলেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কৃষিক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কৃষিতে ২০০১ সালে সারা ভারতের তপশিলি পুরুষ ও নারী কর্মীদের শতকরা হার বিচার করলে দেখা যায়, পুরুষের শতকরা হার যেখানে ৬০.২ শতাংশ, সেখানে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ৭৫.৭ শতাংশ। তবে এই মহিলাদের মধ্যে মাত্র ১৮.১ শতাংশ চাষী এবং ৫৭ শতাংশেরও বেশি কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুর। এই নারী কর্মীদের বিশাল অংশই তপশিলি জাতি-উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত। 'শ্রমশক্তি'র (১৯৮৮) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদিও অন্যান্য জাতের তুলনায় কৃষিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতির মহিলাদের কাজে অংশগ্রহণের হার অনেকটা বেশি, তথাপি এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে যে, এই মহিলাদের একটা মোটা অংশ কাজ করতেন অস্থায়ী বা ঠিকা শ্রমিক হিসেবে।[৩]

১৯৫১-৯১ সাল পর্যন্ত ভারতে কর্মক্ষম জনসংখ্যার খাতভিত্তিক গঠন এবং কর্মসংস্থানের অবস্থা অনুসারে তাদের বন্টন নীচের সারণি ১ এবং ২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সারণিগুলি নারীর কাজের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উন্নয়নের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল এবং পূর্বে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মতো, ভারতের জনসংখ্যা মূলত জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। এটা সুপরিচিত যে একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চ পর্যায়ে উত্তরণের অন্যতম লক্ষণ হল কৃষি/প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে জনসংখ্যার ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতা এবং শিল্প ও পরিষেবা সহ মাধ্যমিক ও উচ্চতর ক্ষেত্রগুলিতে কর্মসংস্থানের সমান্তরাল সম্প্রসারণ। আজ বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশে আমরা দেখতে পাবো মহিলা শ্রমশক্তির এক দশমাংশেরও কম কৃষিতে পাওয়া যাবে, প্রায় এক পঞ্চমাংশ শিল্পে থাকবে এবং অবশিষ্টাংশের প্রায় ৬০ শতাংশ পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকবে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে আমরা তার উল্টোটা দেখতে পাই।[8]

Table- 1: Distribution of workers in India by agricultural sector 1951-91

	1951		1961		1991	
	F	M	F	M	F	M
Cultivators	45.4	51.9	55.7	51.5	34.2	39.6
Agricultural labour	31.4	15.0	23.9	13.4	44.9	21.1
Livestock, forestry, fishing, hunting, plantations and allied activities	3.4	2.8	2.0	3.1	1.6	2.0
Mining and quarrying						
Primary sector	80.2	69.7	81.6	68.0	80.7	62.7

Sources: A. Mitra, Status of Women: Literacy and Employment, 1979, Table 19; Govt. of India, Central Statistical Organisation (CSO), Men and Women in India-1995, Table 24.

যখন আমরা কাঠামোগত পরিবর্তনের এই লক্ষণগুলি খুঁজছি, পুরুষ কর্মশক্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতা রয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে কৃষক এবং কৃষিশ্রমিক হিসেবে পুরুষ শ্রমিকের অনুপাত ৬৭ শতাংশ থেকে কমে প্রায় ৬১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিপরীতে, এই সময়কালে প্রাথমিক খাত প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা কর্মী বাহিনীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে চলেছে এবং কৃষি শ্রমিক হিসেবে গণ্য নারীদের অনুপাত ৭৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে, ১৯৫১ এবং ১৯৯১ সালের আদমশুমারি থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান সম্পূর্ণরূপে তুলনাযোগ্য নাও হতে পারে। এটি সাধারণত গৃহীত হয় যে বৈধ তুলনা ১৯৬১ এবং ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত আদমশুমারির তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা যেতে পারে এবং এই সময়কালে কৃষির উপর নির্ভরশীল নারীদের অনুপাতের একটি নামমাত্র হ্রাস ঘটেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারায় প্রত্যাশিতভাবে কৃষি থেকে দূরে থাকা নারী শ্রমিকদের এই ধারণাগত পরিবর্তন কি স্থায়ীভাবে বিকশিত হয় তা এখনও দেখার বিষয়।[৫]

Table 2: Percentage distribution of usually employed men and women by employment status, All-India

Period	Employment status	Rural		Urban	
		W	M	W	M
NSS 32nd Round (1977-78)	Self-employed	62.1	62.8	49.5	40.4
	Regular employee	2.8	10.6	24.9	46.4
	Casual labour	35.1	26.6	25.6	13.2
NSS 50th Round (1993-94)	Self-employed	58.5	57.9	45.4	41.7
	Regular employee	2.8	8.3	28.6	42.1
	Casual labour	38.7	33.8	26.0	16.2

Source: NSSO, Revised Report No. 406, June 1996, Table 4.4.

উপরে যা বলা হয়েছে তারই ফলস্বরূপ, স্বাধীন ভারতে শিল্প ও পরিষেবায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরের দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক উন্নতি দেখা যায়নি। এর কারণ হল, পুরনো এবং প্রায়শই ক্ষয়িষ্ণু শিল্প বা জীবিকা থেকে নারীদের ক্রমাগত স্থানচ্যুতির ফলে আধুনিক শিল্প ও পরিষেবায় তাদের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।

কৃষিকাজের প্রাধান্য ছাড়াও, নারী শ্রমশক্তির একটি হতাশাজনক বৈশিষ্ট্য হল স্ব-কর্মসংস্থানকারী কৃষকের পরিবর্তে মজুরি শ্রমিক হিসেবে তাদের ক্রমবর্ধমান নিয়োজন। ১৯৬১-৯১ সালে, নারী কর্মশক্তিতে কৃষি শ্রমিকের অনুপাত ২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৪৪ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৯১ সালে, পুরুষ কর্মশক্তিতে কৃষি শ্রমিকদের অংশ ছিল অনেক কম (২১ শতাংশ)। বেশ কয়েকটি রাজ্যে নারী কৃষি শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা অত্যন্ত লক্ষণীয়: অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা এবং তামিলনাড়ুতে ১৯৮১ এবং ১৯৯১ সালে অর্ধেকেরও বেশি নারী

শ্রমিক কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। এর কারণগুলি খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা স্থবির জমি এবং জলের উপর চাপ সৃষ্টি করে চাষাবাদ এবং স্ব-কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের সুযোগকে নষ্ট করে দিয়েছে। একই সাথে, ক্রমবর্ধমান মূল্য এবং চাষের ক্রমবর্ধমান খরচ কৃষক পরিবারগুলিকে মজুরি শ্রমের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। ফলস্বরূপ, এই পরিবারের পাশাপাশি কারিগর পরিবারের বিপুল সংখ্যক মহিলা কৃষিতে মজুরি কাজে আকৃষ্ট হয়েছেন।

শ্রমের অস্থায়ীকরণের ক্ষেত্রেও একই রকম এবং একই রকম বিরক্তিকর প্রবণতা রয়েছে। গ্রামীণ পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে, অস্থায়ী শ্রমের অংশটি ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে প্রায় ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে, এই অনুপাত ৩১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। টেবিল ২ স্ব-নিযুক্ত থেকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ অস্থায়ী শ্রমের মর্যাদায় এই রূপান্তরের দিকে ইঙ্গিত করে, বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে যারা কেবল অস্থায়ী শ্রম হিসাবে অস্থায়ী কাজ করেন, দারিদ্র্যসীমার নীচের জনসংখ্যার মধ্যে মহিলা অস্থায়ী শ্রমিকরা স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ। কৃষিতে স্বল্প বেতনের, মৌসুমীভাবে ওঠানামাকারী মজুরির কাজে এবং নির্মাণ কাজ বা সাধারণ শ্রমের মতো অকৃষি জীবিকা নির্বাহে নারীর উপস্থিতি সম্পদহীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সীমিত বিকল্পগুলির একটি অভদ্র স্মারক।[৬]

Table 3: Population and Agricultural Workers (in Millions)

Year	Rural Population	Cultivators	Agricultural Labourers	Other Workers	Total Rural
1951	298.6 (82.7)	69.9 (49.9)	27.3 (19.5)	42.8 (30.6)	140 (100.0)
1961	360.3 (82.0)	99.6 (52.8)	31.5 (16.7)	56.6 (30.5)	188.7 (100.0)
1981	523.9 (76.7)	92.5 (37.8)	55.5 (22.7)	96.6 (39.5)	244.6 (100.0)
1991	628.7 (74.3)	110.7 (35.2)	74.6 (23.8)	128.8 (41.0)	314.1 (100.0)
2001	741.7 (72.22)	127.6 (31.7)	107.5 (26.7)	167.4 (41.6)	402.5 (100.0)

Source: Register General of India, New Delhi, 2001.

জাতীয় নমুনা জরিপের ৫৫তম (এনএসএসও, ২০০১) অনুসারে, মোট গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ৩২.২ শতাংশ কৃষি শ্রমিক পরিবার। কৃষিতে স্ব-কর্মসংস্থানকারী পরিবারগুলি মোট গ্রামীণ পরিবারের ৩২.২ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে, কৃষি শ্রমিক পরিবারের অনুপাত ১৯৯৩-৯৪ সালে ৩০.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩২.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে কৃষিজীবী (স্ব-কর্মসংস্থানকারী) পরিবারের অনুপাত ১৯৯৩-৯৪ সালে ৩৭.৮ শতাংশ থেকে কমে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩২.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মহিলা-প্রধান পরিবারের অনুপাত ১৯৯৩-৯৪ সালে ৯.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে ১০.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ৬২.৬ শতাংশ ৪৭০ টাকার কম মাসিক মাথাপিছু ব্যয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। প্রায় ৪.৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের রিপোর্ট অনুসারে, পরিবারের কেউই কোনও কাজ করেন না, ২৭.৭ শতাংশ জানিয়েছেন যে কেবলমাত্র একজন পুরুষ সদস্য সাধারণত কাজ করেন, যেখানে ২৭.৮ শতাংশ জানিয়েছেন যে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা সদস্য সাধারণত কর্মরত।

২২.৮ শতাংশ মহিলা পরিবারের রিপোর্ট অনুসারে, তাদের কোনও সদস্য সাধারণত কর্মরত ছিলেন না এবং ৩৯.৬ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে কেবল একজন মহিলা সদস্য

সাধারণত কাজ করেন। এনএসএসওর তথ্য অনুসারে, ৭.২ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোনও জমি ছিল না এবং ৫১ শতাংশ পরিবারের ০.৪ হেক্টরের কম জমি ছিল। প্রায় ১৯.১ শতাংশ পরিবারের ০.৪১ থেকে ১ হেক্টরের মধ্যে এবং ১১.৫ শতাংশ পরিবারের ১.০১ থেকে ২ হেক্টরের মধ্যে জমি ছিল। মাত্র ১১.২ শতাংশের ২ হেক্টরের বেশি জমি ছিল। এইভাবে, ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে মূলত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আধিপত্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বিহার, গোয়া, মহারাষ্ট্র, সিকিম এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে গ্রামীণ পরিবারের কোনও জমি নেই বা যাদের ০.৪ হেক্টরের কম জমি আছে তাদের অনুপাত বেশ বেশি ছিল। এছাড়াও এই রাজ্যগুলির কয়েকটিতে কৃষি শ্রমিক পরিবারের অনুপাত বেশ বেশি ছিল। বিহারে এটি ছিল ৩৮ শতাংশ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে ৪১.৭ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুতে ৪৫.২ শতাংশ।[৭]

১৯৯১ সালে গ্রামাঞ্চলে নারী কর্মীদের ৮৭.০১ শতাংশ কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর পুরুষ কর্মীদের ৭৮.০৯ শতাংশ যুক্ত আছেন কৃষি ক্ষেত্রে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে পুরুষ কর্মীদের কৃষিতে নিযুক্তির হার অপেক্ষা নারী কর্মীদের নিযুক্তির হার অনেক বেশি। কিন্তু কৃষিকাজে নিযুক্ত নারী কর্মীর ৩৮.৫৮ শতাংশ চাষি এবং ৪৮.৪৩ শতাংশ কৃষি শ্রমিক। আর পুরুষ কর্মীদের মধ্যে ৫১.৬১ শতাংশ চাষি আর মাত্র ২৬.৪৮ শতাংশ শ্রমিক। অর্থাৎ কৃষিকাজে নিযুক্ত নারী শ্রমিকের হার (৪৮.৪৩) পুরুষ শ্রমিকের শতকরা হারের (২৬.৪৮) দ্বিগুণের কাছাকাছি। আর ২০০১ সালেও পুরুষ চাষির শতাংশ (৪৫.২) থেকে নারী চাষীর শতাংশ (৪১.৫) কম। পুরুষ কৃষি শ্রমিকের শতাংশ (২৩.১) অপেক্ষা নারী কৃষি শ্রমিকের শতাংশ (৩৫.৬) অনেক বেশি। এখানে উল্লেখ্য যে কোন ব্যক্তি ভূমিহীন ভাগচাষী অথবা কোনো রকম চাষ না করে চাষের তদারকি করলেও সেন্সাস রিপোর্টে তাকে চাষি রূপে গণ্য করা হয়েছে। অনেক জমিতে শুধু মজুরির বিনিময়ে কাজ করলে তাকে কৃষি শ্রমিক রূপে ধরা হয়েছে। অনেক সময় গ্রামাঞ্চলের পুরুষরা যখন নানা বিকল্প কাজে শহরাঞ্চলে নিযুক্ত থাকেন, তখন নারীরাই শ্রমিকের সাহায্যে চাষা-আবাদ তদারকি করে পারিবারিক জমিতে ফসল ফলান। সংজ্ঞা অনুযায়ী এসব নারীরাও মজুরি চাষির পর্যায়ে পড়েন।[৮]

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮১ আর ১৯৯১ সালে নারী শ্রমিকের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৪৮.৪৪ এবং ৪৫.৪৮ শতাংশ। আর ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নারী চাষির শতাংশ ১৪.৩ এবং শ্রমিকের শতাংশ ৩০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানে নারী চাষি ও শ্রমিকের শতাংশ মাঝামাঝি স্তরের। তবে এই নারী শ্রমিকের মধ্যে অনেকেই প্রান্তিক শ্রমিক, যারা বছরে ১৮৩ দিন অথবা ৬ মাসের কম কাজে নিযুক্ত থাকার সুযোগ পেয়েছেন। নারী কর্মীরা বেশিরভাগই শুধু চাষের মরসুমে, সাধারনত এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত তিন চার মাস কাজ পান। অন্য সময় তাদের বিকল্প কাজের সন্ধান করতে হয়। আর এই উদ্দেশ্যে অনেক সময় তাদের শহরাঞ্চলে চলে আসতে হয়।[৯]

এছাড়া নারীরা কৃষি সংক্রান্ত বহু কাজই করেন যেগুলো গৃহভিত্তিক সাধারণ গৃহস্থালির কাজের মধ্যে পড়ে। নারীদের গৃহভিত্তিক কৃষি সংক্রান্ত কাজগুলি ধরলে নারী শ্রমিকের শতাংশ সেন্সাস রিপোর্টে যা দেখানো হয় তা ছাড়া অনেক বেশি হতে বাধ্য। সুতরাং বলা যায় যে সেন্সাসে কৃষিশ্রমিক রূপে নারীর কাজের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। কৃষি সংক্রান্ত নারীদের অনেক কাজই গৃহভিত্তিক হয় (যে কাজগুলিতে পুরুষরা সাধারণত কোন অংশগ্রহণ করেন না)। উদাহরণস্বরূপ ফসল ঝাড়া, শুকানো, গুদামজাত করা, খড় শুকানো এবং সেই সঙ্গে চাষি পরিবারে মজুরি শ্রমিকদের (যদি নিযুক্ত থাকে) জন্য রান্না করা প্রভৃতি কাজগুলি নারীরা

সাধারণত গৃহের মধ্যেই করে থাকেন। অর্থাৎ চাষী পরিবারে চাষ সংক্রান্ত অনেক কাজই নারীর গৃহস্থালির অন্তর্গত থাকে। কিন্তু কৃষিকাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত গৃহস্থালির এসব কাজকে সেন্সাসে উৎপাদনশীল কাজ বলে ধরা হয় না এবং এসব কর্মীকে 'অ-কর্মী' বলা হয়। অথচ একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসব 'অ-কর্মী' অথবা অবৈতনিক নারীদের বিশেষ অবদান আছে।[১০]

পশ্চিমবঙ্গে পারিবারিক চাষের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু নারীরা ফসল ঝাড়া, বাছা, শুকানো ও গুদামজাত করা, খড় শুকানো ও কাটা, হাল-বলদ, গরু-বাছুর প্রভৃতিকে খাওয়ানো গৃহভিত্তিক কাজে অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করেন, কিন্তু সাধারণত মাঠের বাইরে কাজে যান না। বর্ণহিন্দু নারীরা, বিশেষত মধ্য ও উচ্চবিত্তের নারীরা মাঠের কাজে না যাওয়ার ফলে অনেক সময় চাষের মরশুমে অন্য রাজ্য থেকেও তপশিলি জাতি উপজাতি নারীরা পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকের যোগান দেন। আর এই রাজ্যের নিম্নবর্গের নারীরা তো আছেনই।[১১] শ্রীমতি নির্মলা ব্যানার্জীর মতে, "Even when women working in their own farms, they remain engaged in manual work. They are not intrusted with tasks involving decision-making, field marketing etc."[১২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পারিবারিক চাষ এবং চাষ সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত সব 'অ-কর্মী' এবং অবৈতনিক নারীরাই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। শ্রীমতি রাজ মোহিনি শেঠিও তার সমীক্ষায় দেখেছেন যে, "although women are...... integrated into agricultural production, their social role as a decision-maker in this production and the distribution of its products....... has not changed over time"।[১৩]

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, অমল, ২০১৩, ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, পৃ ৩৮।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, ২০০৯, নারী শেণী ও বর্ণ:নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান, কলকাতা, মিত্রম প্রকাশক, পৃ ৪৫।
৩. দাশ, অমল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭-৩৯।
৪. Ray, Bharati and Basu, Aparna, (ed). 1999, From Independence Towards Freedom: Indian Women Since 1947, New Delhi, Oxford University Press, p 64-65.
৫. Ray, Bharati and Basu, Aparna, (ed). op. cit., p 66.
৬. Ray, Bharati and Basu, Aparna, (ed). op. cit., p 66-68.
৭. Dr. Lal, Roshan, and Dr. Khurana Ashok, 2011, Gender Issues: The Role of Women in Agriculture Sector, Zenith, International Journal of Business Economics & Management Research Vol.1 Issue 1, p 34.
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০।
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২।
১১. Chakraborty, Kumaresh and Tiwari G.C, 1979, Regional variations in Women's Employment: A case Study of Five Villages in three States, New Delhi, ICSSR, Mimeograph, p 18-20.
১২. Banerjee, Nirmala, 1995, "Women's Employment and All That" in the Administration, Special Issue on Gender and Development, Mussouri, p 57.
১৩. Sethi, Raj Mohini, 1991, Women in Agriculture, Jaipur, Rowat Publishing, p 97.

গল্পকার প্রচেত গুপ্তের ‘বাইশে শ্রাবণের গল্প’ : ফিরে দেখা রবি ঠাকুর

শুভময় কোনার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract): বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী হয়ে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু বিশিষ্ট গল্পকার ছোটগল্প রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। আজ একবিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম জনপ্রিয় ছোটগল্পকার প্রচেত গুপ্ত। বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা গল্পকার প্রচেত গুপ্তের ‘বাইশে শ্রাবণের গল্প’টির মাঝে মাঝে আমরা রবি ঠাকুরের ছায়াময় প্রতিরূপ দেখতে পায়। শুধুমাত্র গল্পটির নামকরণই যে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবসকে সামনে রেখে করা হয়েছে তা নয়; তার সঙ্গে গল্পটির সূচনা অংশটিও রাবীন্দ্রিক প্রেমের অনুসারী। গল্পকাহিনির একদিকে আছে রবীন্দ্র অনুরাগী ভূপতি হালদারের রবি ঠাকুরের প্রতি আত্মশ্লাঘা এবং অন্যদিকে আছে নিখিলেশ ও তুলির প্রেম-মনস্তত্ত্ব। একজন বাঙালি হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভূপতিবাবুর আলাদাই আবেগ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়ে তিনি যেমন তার ছেলে ও মেয়ের নাম রেখেছেন নিখিলেশ ও কুমুদিনী; তেমনই রবীন্দ্র পাগল এই মানুষটি পাড়ার লোকজন নিয়ে নিজের বাড়িতেই পঁচিশে বৈশাখ ও বাইশে শ্রাবণ পালন করে থাকেন। এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিনগুলিতে বাড়ির লোকজনের বাইরে যাওয়া একপ্রকার নিষেধ। কিন্তু গল্পে বর্ণিত এবারের বাইশে শ্রাবণের দিন নিখিলেশকে তুলির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়েছে। পাঁচ বছর প্রেম করার পর নিখিলেশ ও তুলি যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছে, তখন তুলির বাবাকে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে নিখিলেশের বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়েছে। সেখানে তাঁদের কথোপকথনের সময় ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভূপতিবাবুর অতি উৎসাহ দেখানোর জন্যই বোধহয় নিখিলেশ ও তুলির বিয়ে ভেঙে গেছে। এমতাবস্থায় তুলি হয়ে ওঠে প্রতিশোধ পরায়ণ। অন্যদিকে নিখিলেশ তো বিয়ে ভেঙে যাওয়ার জন্য সরাসরি ভূপতিবাবু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই দায়ী করেছে। এরপর গল্পকার গল্পটিকে রোমহর্ষক করে তোলার জন্য, বাইশে শ্রাবণের দিন নিখিলেশকে তুলির সামনে হাজির করেছেন। তুলি অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিখিলেশের সঙ্গে আইন সম্মত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সোজা ভূপতিবাবুর সামনে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে তুলি, ভূপতিবাবুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে সুমিষ্ট কণ্ঠে শুনিয়েছে রবীন্দ্র সংগীত। এটাই তুলির প্রতিশোধ। এভাবেই গল্পকার ভূপতিবাবুর রবীন্দ্রপ্রীতি এবং নিখিলেশ ও তুলির প্রেম-মনস্তত্ত্বকে রাবীন্দ্রিক সুরে বাঁধতে চেয়েছেন।

সূচক শব্দ (Key words): বাইশে শ্রাবণের গল্প, প্রেম-মনস্তত্ত্ব, রোমহর্ষক, রবীন্দ্রানুরাগী, প্রেমের আকুতি, মিলনান্তিক।

মূল আলোচনা (Discussion):

ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য ও রীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২২), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকবর্গের রচনায় ছোটগল্পের একটা প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু সমাজচিন্তার যে

বিশেষ অবস্থার মধ্যে বহির্বিশ্বের লেখকচিত্তে ছোটগল্পের বুনন শুরু হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে সেই অবস্থা তখনও আসেনি। তবে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সূচনা লগ্ন নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য আছে। তাঁদের প্রত্যেকের মতাদর্শকে সম্মান জানিয়ে আমরা বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগ, রবীন্দ্র পরবর্তী কল্লোল যুগ এবং উত্তর কল্লোল যুগেও বহু বিশিষ্ট গল্পকার (প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ) ছোটগল্প রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সেকাল থেকে নানা তাত্ত্বিক মতাদর্শ ও ধারা-উপধারা পেরিয়ে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মানব সম্পর্কের চোরাস্রোত এমনকী দেশ-কালের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট আজ ছোটগল্পের বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী হয়ে আজ একবিংশ শতাব্দীতেও বাংলা সাহিত্যের একটা বৃহত্তম অংশ জুড়ে রয়েছে ছোটগল্প। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পও তার বিষয়-ভাবনা, আঙ্গিক ও স্বাদ বদল করতে করতে এগিয়েছে। আজ একবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত গল্পকার ছোটগল্পকে নতুন ভঙ্গিমায় অভিনব রূপদানে নিবিষ্ট, তাঁদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় প্রচেত গুপ্ত। তিনি একাধারে সাংবাদিক এবং প্রথিতযশা সাহিত্যিক তথা কথাকারও বটে। সময়ের দাবিকে পূরণ করতে গিয়ে প্রচেত গুপ্তের ছোটগল্প সম্পর্কের জটিলতা, জাদুবাস্তবতা, প্রেম-মনস্তত্ত্ব, হাস্যরস তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

লেখক প্রচেত গুপ্তের জন্ম ১৯৬২ সালের ১৪ অক্টোবর, কলকাতার বাঙ্গুর এভিনিউতে; বাঙ্গুর বয়েজ স্কুলে পঠন-পাঠন শেষ করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক হন। তাঁর পিতৃদেব ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ক্ষেত্র গুপ্ত। মাতৃদেবী জ্যোৎস্না গুপ্ত ছিলেন রামমোহন কলেজের অধ্যাপিকা। প্রচেত গুপ্ত একজন বিদগ্ধ, রুচিশীল ও সাহিত্যমোদী পরিবারের সন্তান। তিনি শৈশব থেকে প্রচুর গল্প বই পড়েছেন এবং তখন থেকেই ধীরে ধীরে গল্প লেখার প্রতি তাঁর একটা নেশা জন্মায়। এইরূপ নেশা বশত মাত্র ১২ বছর বয়সে 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় ছোটদের একটি গল্প লিখেছিলেন। অর্থাৎ শিশুসাহিত্যে রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর গল্প লেখার হাতেখড়ি। তখন তিনি একেবারেই বালক। এরপর থেকে প্রায় এক দশক পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকটি বড়দের গল্প ছাড়া বেশিরভাগই ছোটদের গল্প লিখেছেন। সেগুলির মধ্যে কিছু প্রকাশিত ও কিছু অপ্রকাশিত। তারপর প্রায় এক দশক গল্প লেখার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিয়েছেন। দেশ-বিদেশের নানা সাহিত্য পড়াশোনা করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। কেন লিখতে হয়? কীভাবে লিখতে হয়?- এইরূপ নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। রীতিমতো অধ্যাবশায়ের পর একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে এসে লিখলেন 'রসগোল্লা' গল্পটি। গল্পটি শ্রী রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। এরপর ধাপে ধাপে 'আনন্দমেলা', 'উনিশ-কুড়ি', 'দেশ', 'সানন্দা', 'শারদীয় আজকাল', 'শারদীয় দ্বিপবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় রীতিমতো লিখতে শুরু করলেন এবং দক্ষতার সঙ্গে আজও লিখে যাচ্ছেন। এক সময়ের পত্রিকার লেখক প্রচেত গুপ্ত আজ বহু গল্পগ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে 'নীল আলোর ফুল', 'পঞ্চাশটি গল্প', 'প্রচেত গুপ্তর গল্প', 'রাতে পড়বেন না', 'প্রিয় বান্ধবীকে', 'আশ্চর্য পুকুর', 'দেরি হয়ে গেছে', 'চাঁদ পড়ে আছে', 'আগুন বাড়ির কথা', 'রূপোর খাঁচা', 'এই

গল্পটা বলা ঠিক হল না', 'আমি একজন মেয়ে', 'মলাট খুললে বিপদ', 'ফেরত আসা গল্প' ইত্যাদি পাঠক সমাজে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।

পূর্বে উল্লিখিত গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে ২০১১ সালে প্রকাশিত 'প্রচেত গুপ্তর গল্প' গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য 'বাইশে শ্রাবণের গল্প'টি প্রথম গল্প হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। গল্পের নামকরণ শুনেই একজন বাঙালি পাঠক হিসেবে গল্পটির সঙ্গে রবি ঠাকুরের সংযোগ স্থাপনে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। হওয়ার কথাও নয়। কারণ আমরা জানি বাইশে শ্রাবণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। দিনটি বাঙালির কাছে একদিকে যেমন শোক তথা বেদনার, অন্যদিকে তেমনই আবেগ ও শ্রদ্ধার। গল্পটিতে গল্পকার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব দিবস (পঁচিশে বৈশাখ), রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি বাঙালির শ্লাঘা এবং রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবস (বাইশে শ্রাবণ) কে সামনে রেখে একটি সুন্দর বৈচিত্র্যময় প্রেম-মনস্তত্ত্বের কথা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যে প্রেমের মধ্যে হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা সব যেন রাবীন্দ্রিক সুরে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যদিওবা গল্পটির সূচনা পর্ব একটু বৈপরীত্যধর্মী ও রোমহর্ষক- "প্রেম হলেই যে বিয়ে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই।"[১] গল্পকার গল্পের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রেমের তথাকথিত পরিণতি বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে না ওঠার কতগুলি কারণ তুলে ধরেছেন- "কখনো ছেলে-মেয়ের তুমুল ঝগড়া হয়। কখনো ছেলে আরও সুন্দরী প্রেমিকা জুটিয়ে ফেলে। কখনো আবার মেয়ের জন্য বাবা দুম করে মোটা মাইনের পাত্র পাকড়ে ফেলে।"[২] এছাড়াও বিয়ে বাড়িতে রূপসী মেয়ে দেখে প্রেমিকের বিয়ে করার সিদ্ধান্ত, এমনকি 'মৃত্যুপথযাত্রী ঠাকুমা'র কথা রাখতেও অনেক সময় প্রেমিক প্রেমিকার বিবাহের বন্ধন আর গড়ে ওঠে না। এইরূপ তথাকথিত ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকার করুণ পরিণতি দেখে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা'র অমিতকে মনে পড়ে যায়। যতি ও অমিতর কথোপকথন থেকে অমিতর একটা উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হবে- "সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা, তাহলেও আর-একটা কথায় গিয়ে পড়ব। ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যান্ত।"[৩] এই নিরিখে আমাদের গল্পের ভূমিকা প্রসঙ্গটি ভাবগত দিক থেকে অবশ্যই রাবীন্দ্রিকময়। লেখক প্রচেত গুপ্ত এখানে রাবীন্দ্রিক প্রেমকেই যেন প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছেন। যেখানে প্রেম ও বিবাহ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত নয়, বরং একে অপরের থেকে স্বাধীন।

এরপর আসাযাক গল্পটির মূল কাহিনি ও চরিত্র প্রসঙ্গে। গল্পটিতে বেশ কয়েকটি চরিত্র থাকলেও একদিকে ভূপতি হালদারের রবীন্দ্রপ্রীতি এবং অন্যদিকে ভূপতি হালদারের ছেলে নিখিলেশ ও তুলির প্রেম-মনস্তত্ত্ব গল্পটিকে অন্য মাত্র এনে দিয়েছে। ভূপতিবাবুর রবীন্দ্রপ্রীতির প্রথম নমুনা হিসেবে তার ছেলের নামকরণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে- "আমার নাম নিখিলেশ। নরমাল নিখিলেশ নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিখিলেশ। আমার বাবা এই নাম রেখেছেন।"[৪] গল্পকার প্রচেত গুপ্ত হালকা চালে ভূপতিবাবুর রবীন্দ্র অনুরাগের যে নমুনা দিয়েছেন তা সত্যি সত্যিই অভিনব ও অভিবাদন যোগ্য। তিনি (ভূপতিবাবু) কতটা রবীন্দ্র পাগল মানুষ তার বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার তাঁর ছেলে নিখিলেশকে দিয়ে বলিয়েছেন, "পুত্রের জন্মের খবর পেয়ে বাবা একটুও সময় নষ্ট করেননি। আলমারি থেকে রবীন্দ্র রচনাবলীর সেট নামিয়ে নিলেন। নামিয়ে ফরফর করে গল্প, উপন্যাস, গান, কবিতা, নাটক এমনকী প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের পাতাও উলটোতে থাকেন। যেখানেই কোন নাম পান, থমকে যান। মনে ধরলে নোট রাখেন। না-ধরলে বাদ। শেষ পর্যন্ত নাম চূড়ান্ত হয় নক আউট সিস্টেমে। কোয়ার্টার ফাইনাল,

সেমিফাইনাল, ফাইনাল। ফাইনাল লড়াই হয় ঘরে বাইরের নিখিলেশ আর নষ্টনীড়ের অমলের মধ্যে। টাফ ফাইট। শেষ পর্যন্ত 'নিখিলেশ' জেতে এবং আমার ঘাড়ে চেপে বসে।"[৫] এখানেই শেষ না। ছেলের এই নিখিলেশ নাম প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে স্ত্রীর সামনে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শেষমেশ অবশ্য নিখিলেশ নামেই শিলমোহর পড়েছে। পরবর্তীকালে ছেলের মতো করে মেয়েরও নাম রেখেছেন কুমুদিনী। এই নামটিও তিনি রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস থেকে একরকম ধার নিয়েছেন বলা যেতে পারে। ছেলে মেয়ের এইরূপ নামকরণের মধ্যে আমরা ভূপতিবাবুর রবীন্দ্র পাগলামি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না।

ভূপতিবাবুকে একজন আদ্যন্ত রবীন্দ্রানুরাগী মানুষ বলা যেতে পারে। এই রবীন্দ্র পাগল মানুষটি পঁচিশে বৈশাখ ও বাইশে শ্রাবণ বাড়িতেই পাড়ার লোকজন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও বক্তৃতার আসর বসান। রবীন্দ্র চর্চার সঙ্গে সঙ্গে থাকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। স্বভাবতই এই দিনগুলিতে বাড়িতে সবার কিছু না কিছু দায়িত্ব থাকে; বাইরে যাওয়া একপ্রকার নিষিদ্ধ। এটা গুরুগম্ভীর, রাশভারী স্বভাবের মানুষ ভূপতিবাবুর আদেশ। তাঁর রাশভারী স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিখিলেশের একবার অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়াকে কেন্দ্র করে গল্পকার যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তা এইরূপ- "আমি মাথা চুলকে বলেছিলাম, 'অনেক সময় অফিসের কাজে দেরি হয়ে যায়।' 'দেরি। সরকারি অফিসে আবার দেরি কিসের হে? করো তো কনিষ্ঠ করণিকের কাজ।' আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'অনেক সময় আউটডোরের কাজ থাকে তো।' 'আউটডোর! তুমি কি ফিল্মস্টার নাকি যে আউটডোরে গিয়ে শুটিং করবে! এর পর যেদিন আউটডোর থাকবে, আমাকে খবর দেবে। আমিও যাব।'..."[৬] তিনি একদিকে যেমন প্রচণ্ড গুরুগম্ভীর স্বভাবের মানুষ, অন্যদিকে তেমনই তাঁর হৃদয় বেশ প্রসারিত। অর্থাৎ রবীন্দ্রপ্রেমী এই মানুষটির কড়া অনুশাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত ভালোবাসারও অন্ত্য নেই। তাই তো তাঁর বাড়িতে রবীন্দ্র উৎসবের দিন ছেলেমেয়েরা কবিতা পাঠ করতে করতে ভুলে গেলে ভূপতিবাবু মধুর হেসে বলে ওঠেন- "এতেই হবে, এতেই হবে। মুখস্থ করা বড়ো কথা নয় বাবা, মনীষীকে স্মরণ করাটাই বড়ো কথা।"[৭]

প্রত্যেক বারের মতো এবারও ভূপতিবাবুর বাড়িতে মহাসমারোহে বাইশে শ্রাবণ পালিত হচ্ছে। সুতরাং সবার মতো নিখিলেশেরও বাড়িতে থাকার কথা। কিন্তু শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এইবার বাইশে শ্রাবণ নিখিলেশকে সকাল সকাল তার প্রেমিকা তুলির সঙ্গে দেখা করতে যেতেই হবে তাদের বাড়ির সামনে। এর কারণ জানতে গেলে একটা ঘটনার অবতারণা করতে হয়। নিখিলেশ ও তুলির মধ্যে রয়েছে নির্ভেজাল প্রেমের সম্পর্ক। কলেজ ছাড়ার পর থেকেই তাদের প্রেমের সূচনা। এখন তাদের প্রেমের বয়স পাঁচ বছর। স্বভাবতই তারা প্রেমকে তথাকথিত পরিণতি দেওয়ার লক্ষ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের দিকে এগোবে এটাই স্বাভাবিক। সেই উদ্দেশ্যে তুলনামূলক ভিতু স্বভাবের মানুষ নিখিলেশ তুলির বাবার কাছে গিয়ে কোনরকমে মাথা চুলকে, ঘেমে, বিষম খেয়ে তাদের ভালোবাসার কথা উপস্থাপন করলে; পরম্পরা অনুযায়ী কিছু দিনের মধ্যেই তুলির বাবা কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে ভূপতিবাবুর নিকট উপস্থিত হন। প্রাথমিক আলোচনার পর রবীন্দ্র পাগল ভূপতিবাবু তুলির বাবাকে কয়েকটি প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলে, তুলির বাবা তাতে সম্মতি জানান। প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ভূপতিবাবু প্রশ্ন করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চতা কেমন ছিল? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোব্বা বানাতেন যে দর্জি। তার নাম কি? বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা গানটা কোন তালের উপর আছে? হে ধরণী, কেন প্রতিদিন/ তৃপ্তিহীন/ একই লিপি পড় ফিরে ফিরে- কবিতাটি কোন জাহাজে

বসে লেখা? ভূপতিবাবু নিজেকে একজন রবীন্দ্র অনুরাগী আদর্শ বাঙালি মনে করেন। তার সঙ্গে তিনি একথাও মনে করেন, এইসব প্রশ্নের উত্তর নাকি সব বাঙালিকেই জানতে হবে। আসলে এটা তাঁর রবি ঠাকুরের প্রতি অতি উৎসাহ ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে তুলির বাবা একজন প্রাক্তন মিলিটারি ম্যান। তাঁর কাছে এইসব প্রশ্ন অবান্তর, উদ্ভট ও বেমানান ঠেকেছে। এমতাবস্থায় তিনি (তুলির বাবা) চিৎকার করে বলে উঠেন, "শাট আপ। ইউ আর ইনসাল্টিং মি। আমাকে অপমান করছেন। এক মুহূর্ত আমি আর এ-বাড়িতে থাকব না। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের কথা এখানেই ফিনিশ। গুড বাই।"[৮] নিখিলেশ অনতি দূরে দাড়িয়ে সমস্ত ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে, কানে শুনেছে এবং নিজেকে অসহায় অনুভব করেছে। শেষমেশ নিরপরাধ নিখিলেশ তাদের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কারণ হিসেবে রবীন্দ্র পাগল ভূপতি হালদার অর্থাৎ তার বাবা ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই দায়ী করেছে- "অন্যায় করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমার বাবা। রবীন্দ্রনাথ যদি আজ এত বড়ো একটা ব্যাপার না-হতেন তাকে নিয়ে জানাজানিরও কিছু থাকত না। বাবা প্রশ্নও করতে পারতেন না। আমাদের বিয়েটা হয়ে যেত।"[৯] এভাবে গল্পকার গল্পের করুণ দৃশ্যেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যথাযথ শৈল্পিক মর্যাদায় অবতরণ করিয়েছেন।

এরপরই গল্পকার গল্পটিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে (climax) নিয়ে গেছেন। একদিকে বাবকে অযথা আপমান করা এবং আন্যদিকে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে তুলির চোখে মুখে তখন প্রতিশোধের আগুন। সে একপ্রকার পণ করেছে, এর প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। সে কারণেই নিখিলেশকে তার বাড়ির সামনে ডেকে পাঠানো। অসহায় নিখিলেশ বেচারা নিরুপায়। একদিকে আজ বাইশে শ্রাবণ বাড়ি থেকে বাইরে যাওয়া নিষেধ। অন্যদিকে প্রতিশোধ পরায়ণ রাগান্বিত প্রেমিকার ডাক। তার (নিখিলেশের) এখন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা। কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত তাকে নিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে না থাকলেও, তাকে বাবার নিষেধ উপেক্ষা করে চোরের মতো চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে তুলির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়েছে। গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়ে তুলির সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত তুলি কীভাবে তার সঙ্গে প্রতিশোধ নেবে? কেন তুলির সঙ্গে দেখা করতে গেছে? এখন সেখান থেকে চলে গেলে কী হতে পারে?- ইত্যাদি স্বগত প্রশ্নে যখন নিখিলেশ একপ্রকার জর্জরিত; তুলি ঠিক তখনই বাড়ির গেট খুলে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এসে নিখিলেশকে গাড়িতে চাপতে বলেছে। একরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গাড়িতে চেপে নিখিলেশ দেখেছে- "তুলিকে দারুন লাগছে। সে পড়েছে শাড়ি। সেই শাড়ির রং শ্রাবণের আকাশের মত। শুকনো খটখটে শ্রাবণ নয়, জলে মেঘে মাখামাখি হওয়া শ্রাবণ।"[১০] গল্পকার নিখিলেশের মনের এইরূপ প্রেমের আকুতিকে প্রকাশ করেছেন রবি ঠাকুরের প্রিয়তম ঋতু বর্ষাকাল অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণের রূপের মধ্যে। এদিকে গাড়িও হুড়মুড় করে এগিয়ে চলেছে নিউটাউনের ঝকঝকে রাস্তা ধরে। গাড়ি যত এগিয়েছে ভীত, সন্ত্রস্ত নিখিলেশের ভয়ার্ত কৌতূহল ততই বেড়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিখিলেশকে অবাক করে দিয়ে তুলি গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেছে ম্যারেজ রেজিস্টারের বাড়িতে। তারপর তারা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে নিখিলেশের বাড়ি পৌঁছেছে। সেখানে পৌঁছে তুলি প্রথমে ভক্তিভরে শ্বশুরমশাই অর্থাৎ ভূপতিবাবুকে প্রণাম করেছে। পরক্ষনেই কঠিন গলায় বলেছে "বাবা, আমি, আপনার রবীন্দ্রনাথের হাইট জানি না, জোব্বার টেলরের নাম জানি না, গানের তাল জানি না, কিন্তু আমার রবীন্দ্রনাথের গান জানি। আমি একখানা গান গাইব।"[১১] তারপর তুলি সুমিষ্ট ও সুমধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠেছে, "এই শ্রাবণবেলা বাদলঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা।"[১২]

তুলির এমন সুন্দর রবীন্দ্র সংগীত একদিকে যেমন তার বাবার সম্মান বাড়িয়েছে; অন্যদিকে ভূপতিবাবুর মতো রবীন্দ্র পাগল ও রবীন্দ্র অনুরাগী মানুষ পেয়েছেন তার মনের মতো রবীন্দ্র সংগীত প্রেমী পুত্রবধূ তুলিকে। এটাই তুলির প্রতিশোধ। যে প্রতিশোধে যুদ্ধ নয়, আছে সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা। গল্পের এইরূপ পরিণতিতে নিখিলেশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাঠককুলও একেবারে চমকে উঠি। গল্পকার তুলির কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত সংযোজন করে সেই চমকের মিলনান্তিক সমাপতন ঘটিয়েছেন। এভাবেই গল্পটির নামকরণ, সূচনা পর্ব, কাহিনি কথন ও পরিসমাপ্তি রাবীন্দ্রিক ঢং ও ছন্দে গ্রথিত। অর্থাৎ একসময় যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সার্থক বাংলা ছোটগল্পের সূচনা হয়েছিল; তার কয়েক দশক পর আজ একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও সেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য তথা সাহিত্যিকদের লেখনীতে স্বমহিমায় বারে বারে ফিরে আসেন।

তথ্যসূত্র (References):

১. গুপ্ত, প্রচেত, চতুর্থ মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২৮, প্রচেত গুপ্তর গল্প, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, পৃষ্ঠা- ১৩
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১০, রবীন্দ্র-রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৫২১
৪. গুপ্ত, প্রচেত, চতুর্থ মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২৮, প্রচেত গুপ্তর গল্প, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, পৃষ্ঠা- ১৪
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪
১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫
১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬
১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬।

ছবির কবিতা : ইমপ্রেশনিস্ট চিত্র শিল্পের আলোকে কবি জীবনানন্দ

অজয় কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: ছবি কবিতার অবয়বকে শ্রীমন্ডিত করে তোলে। ছবির ভাষা কবিতার ভাষাকে পুষ্ট করে। কবি জীবনানন্দ ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের ছবির জমিকে আলো-ছায়া, মেঘ-রোদ্দুরের খেলাঘরের মতোই তার কবিতায় চিত্রিত করেছেন। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের মতই কবির কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে আকাশ, সমুদ্র, প্রান্তর, ভোরের আলো, রাত্রির নক্ষত্র, বিকেলবেলার ধূসরতা - এসব চিত্রকল্প। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের ছবি কবির কবিতায় নানা রঙের সুষমায় অপূর্ব সৌন্দর্য মূর্তি লাভ করেছে। কবির ‘ধূসর পান্ডুলিপি’, ‘রূপসী বাংলা’, ‘বনলতা সেন’ প্রভৃতি কাব্যে কবি শিল্পীর রঙ তুলিকে অনায়াসে সাবলীলভাবে গ্রহণ করেছেন। ‘ধূসর পান্ডুলিপি’ কাব্যগ্রন্থের ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতায় কবি ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের মতই ধূসর বর্ণকে রূপময় করে তুলেছেন। জীবনানন্দের কবিতা শুধু দৃশ্যের নয়, তা গন্ধের এবং স্পর্শের। কবিতা পড়তে পড়তে মন ডুবে যায় আমন্ত্রিত সৌন্দর্য রাজ্যে।
সূচক শব্দ: জীবনানন্দ, ছবি ও কবিতা, ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পী, ধূসর, বিবর্ণ, ধূসর পান্ডুলিপি, রূপসী বাংলা, মৃত্যুর আগে।

মূল আলোচনা:

।। এক ।।

“The people build a store of images which the artist uses to form his own system”[১]

ছবি এবং কবিতা – দুই শিল্পের শরীর পৃথক। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের প্রণয়ে ধন্য। ছবি কবিতার অবয়বকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলে। আর কবিতা ছবির রঙের শরীরে তীর্থস্নান করে। কবিতার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হয় নানা রঙের প্রভাতী বর্ণমালা। পৃথক দু’টি শিল্প পৃথকভাবে শিল্পীর আঙুলের স্পর্শে অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। ভোরের আলোয় রূপনারায়ণের কূলে জেগে থাকে ঠিক যেন সৌন্দর্যমথিত উর্বশী মূর্তি। কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর ‘পারাপার’ কাব্যের ‘শিল্প’ কবিতায় লিখেছেন –

“তাঁতে এনে বসালেম বুক থেকে রোদ্দুরের সুতো,
নীহারিকা পাড় বোনা, বিদ্যুতি জরির উদ্ভবেঃ
তোমার পায়ের প্রান্তে লুটোবে যখন যাবে দ্রুত
প্রাণের বসন্তদিনে কত কী উৎসবে।
কত তুলো, কত রঙ, কত কল্পনায়, মায়াময়

তোমার সে বেনারসি বোনা হয় ;
তুমি তো জানো না,
প'রে শুধু আশ্চর্যের লগ্নে তুমি হও অন্যমনা।
....
মর্ত্যে এসে মাঙ্গলিক রেখে যাই,
অনামী শিল্পের গায়ে বাসনার ধেয়ান মেশাই;
তাঁতির আঙুল জানে কত সুতো গেঁথে-গেঁথে শেষে
প্রাণে-প্রাণে কত দানে তোমার অর্ঘ্যের দান মেশে।।"[২]

কবি ছবির শরীরে প্রবেশ করে ছবিকে করে তোলেন কবিতা। যুদ্ধের পরিণাম কি? যুদ্ধের ছবি এঁকেছেন Vasily vereshchagin. 'Apotheosis of War' – [৩]যুদ্ধের পরম বিকাশ, পূর্ণাবয়ব রূপ-যুদ্ধের সারাংশ-পর্বতের শিখর সদৃশ করোটির স্তূপ। পুশকিন (Pushkin) যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন কবিতায়। 'Poltava' কবিতায় লিখেছেন –

"All stand together to a man.
A living wall a hail repelling
Of searing lead! Fresh ranks link steel
Above the fallen. Horsemen winging
Like dark clouds o'er the plain.
Their singing
Swords clash ...... Swedes Russians heel to heel ;
They cut and smite slash. The beating
Of drums, a call to arms repeating.
Guns roar. Steeds neigh. Men moan. Hoofs pound.
A hell on earth, death all around."[৪]

যুদ্ধে মানুষ ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু পরাজিত হয়নি। বরং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে খুঁজেছে নিজের অস্তিত্বের দ্বীপ।

টলস্টয় (Leo Tolstoy) তাঁর 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' ('War and Peace') উপন্যাসে যুদ্ধক্ষেত্রকে মৃত্যুর পঙ্কিল নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শুনিয়েছেন আহত সৈনিকদের আর্তনাদ ও যন্ত্রণাদগ্ধ কণ্ঠস্বর। উপন্যাসে লিখেছেন – "In the darkness, it seemed as though a gloomy unseen river was flowing always in one direction, humming with whispers and talk and the sound of hoofs and wheels."[৫] যুদ্ধে মৃতদেহের সংখ্যা অনির্ণীত। মৃত্যুর নরক। মাংস এবং দেহ কামানের খাদ্য – "Flesh, bodies, cannon fodder !"[৬] পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাই ছবিকে তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে অন্বিত করেছিলেন। কবিতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, রবীন্দ্রনাথ, পাউণ্ড, কার্লোস আর আমাদের জীবনানন্দ তাঁদের কবিতায় হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন করেছিলেন ছবিকে অন্বিত করে। ঠিক অমিয় চক্রবর্তীর 'শিল্প' কবিতায় তাঁতির তাঁত বোনার মত, বেনারসির মত শিল্প বোনেন স্বয়ং কবি। কিংবা ব্রাত্য লোকশিল্পী রমণীর নিপুণ আঙুলে কাঁথার নক্সা বুননের মত শিল্পকথা বোনা হয়। ছবির ব্যঞ্জনা

কবিতার সবুজ পাতায় পাতায় রঙ তুলিতে পেলব অনুভূতির আলপনা আঁকে। ছবির ভাষা সৌন্দর্যের ভাষা, কবিতার ভাষাও তাই। মানুষের সাধনা ও তপস্যা উর্দ্ধতর সীমা ছোঁয়। ছবি ও কবিতার সাধনা মঙ্গল ও কল্যাণের সাধনা। সৌন্দর্যের দূরতম দিকচক্রবালের অসীম নীলিমায় তার ধেয়ানী প্রকাশ। ছবি ও কবিতা উভয়েই ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। পল্লবিত শাখায় ফুল ফোঁটায়, ফল ধরে, আবার বাস্তবের মাটিতে শেকড় চারিয়ে দেয়। সুতরাং ছবি ও কবিতার অভিমুখ একমুখী।

কবিকে যেমন নিয়তই কবিতার পঠন-পাঠনে ব্যস্ত থাকতে হয়, তেমনি শিল্পী চিত্রকরকে নিয়তই চর্চার মধ্য দিয়ে ছবির ভাষা অর্জন করতে হয়। সমগ্র চোখে দেখার জগৎই চিত্রকর শিল্পীর পড়ার জগৎ। বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে শিল্পী ধেয়ানী উপলব্ধিতে পৌঁছান। অবিরাম চর্চায় কবির কবিতা এবং চিত্রকরের চিত্রে জন্ম নেয় নিজস্ব স্টাইল। নিরন্তর সাধনা কবিতা এবং ছবির সাধককে পেয়ে বসে। অনেক চড়াই-উৎরাই ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে শিল্পের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছাতে হয়।

কবিতায় ছবি হয়ে ওঠে স্রষ্টার জীবনবেদ। হাজারও সৃষ্টির উঠোনে উঠোনে তাঁর বর্ণময় আমন্ত্রণ। অনেক কবিই এঁকেছেন ছবি। আবার অনেক চিত্রশিল্পী একটানা তুলির রেখা রঙের অক্লান্ত টান দিতে দিতে সামান্য দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে অলস আয়াসে লিখেছেন কবিতা। অল্প হলেও এ দৃষ্টান্ত আছে। আসলে কবিতা ও চিত্রকলা যেন যমজ ভাই। একই মালী একই বাগানে পরিচর্যা করে বড় করে তোলেন। তাই উভয়ের জড়োয়া সংশ্লেষে কলমের গাছ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং কবির কবিতায় থেকে যায় ছবির অস্তিত্বের উপপাদ্য। সম্পর্কের আত্মিক আত্মীয়তা। ছবি আর কবিতা পরস্পর পরস্পরকে দিয়েছে প্রেরণাশক্তির প্রাচুর্য। কবিতা ছবি থেকে আহরণ করে অফুরন্ত বৈচিত্র্যময় প্রাণশক্তি। অর্থাৎ ছবি কবিতার প্রাণবন্ত আধার হয়ে ওঠে। ছবির ভাষা কবিতার ভাষাকে পুষ্ট করে। ছবি কবিতার ব্যঞ্জনাকে প্রাঞ্জল করে তোলে। ছবির অবয়বে কবিতা শিল্প হয়ে ওঠে বির্নিমিত আর্ট। ছবিতে ডুব দিয়ে কবি যখন তাঁর কবিতার খাতা ভরিয়ে তোলেন, তখন সমস্ত রাত জাগা ক্লান্তি অবসন্নতা ঝেড়ে ফেলে ভোরের পাখির ডাক শোনান কবি। প্রত্যাসন্ন সূর্যোদয়ের সবুজ আভা দিগন্ত বিস্তৃত হয়। Jean Francois Millet যথার্থই লিখেছেন – “Art is not a pleasant trip, it is a mill that grinds.”[৭]

।। দুই ।।

ইমপ্রেশনিস্ট শিল্প ছবি এবং কবিতা দুই মাধ্যমেই গতায়াত করেছে সমান সাবলীলতায়। ইমপ্রেশনিজ্‌ম ধ্রুপদি শিল্পের যাবতীয় দেওয়ালকে সমূলে উৎপাটিত করেছে। ‘The Concise Oxford Dictionary’- গ্রন্থে ‘Impressionism’ সম্পর্কে বলা হয়েছে – “a style or movement in painting characterized by a concern with depicting the visual impression of the moment, especially in terms of the shifting effect of light.”[৮] Oxford Dictionary – তে ‘movement in painting’, ‘Visual Impression’ এবং ‘Shifting effect of light’ – এর কথা বলা হয়েছে। স্পন্দন এবং গতি, প্রত্যক্ষ গোচর চাক্ষুষ বিষয়কে মুহূর্তে হুবহু মুদ্রিত করা, আলোর স্থান বদলকে ফুটিয়ে তোলার যে স্বতন্ত্র রীতি তাইই ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের ছবিতে ধরা পড়েছে। Encyclopaedia Britannica – তে ‘Impressionisme’ সম্পর্কে বলা হয়েছে – “Impressionisme ; a major movement,

first painting and Later in music, that developed chiefly in France during the late 19^{th} and early 20^{th} centuries.

Impressionist Painting Comprises the work produced between about 1867 and 1886 by a group of artists who Shared a set of related approches and techniques. The most Conspicuous characteristic of impressionism in painting was an attempt to accurately and objectively record visual reality in terms of transient effects of light and colour."[৯]

শিল্প সংস্কৃতির শহর হল প্যারিস। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে একদল চিত্রশিল্পী 'ইমপ্রেশনিজম'কে আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ক্লেড মোনেট (Claude Monet), আলফ্রেড সিস্‌লে (Alfred Sisley), পেরিয়ার – অগাস্টে রেনিয়র (Pierre – Auguste Renoir), এবং আমেরিকান আর্টিস্ট উইলিয়াম জেমস গ্ল্যাকেন্স (William James Glackens, 1870 -1938), ফ্রান্সের প্যারিসের চিত্রশিল্পী আরমাণ্ড গুইলাউমিন (Armand Guillaumin, 1841 -1927), এবং ফ্রান্সের ফ্রেডেরিক বাজিল্লে (Frederic Bazille, 1841-1870), এবং জার্মান পেইন্টার লোভিস কোরিন্থ (Lovis Corinth, 1858 – 1925), এছাড়া ইতালির মিলানের শিল্পী মেডারডো রসো (Medardo Rossa, 1858 – 1928), এবং অস্ট্রেলিয়ান পেইন্টার টম রবার্টস (Tom Roberts) (1856 – 1931) পল সিজান (Paul Cezanne), এডগার ডেগাস (Edgar Degas), কামিল্লে পিসারো (Camille Pissarro), ব্রেথ মরিসট (Berthe Morisot), ইজেন বাউডিন (Eugene Boudin) এবং থিওডোর রোসিও (Theodore Rousseau), জিন ফ্র্যাঙ্কোন মিলেট (Jean Francoin Millet), জোহান বার্থোল্ড জোকাইণ্ড (Jongkind) প্রভৃতি ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে পেরিয়ার অগাস্টে রেনিয়র (Pierre – Auguste Renoir, 1841 -1919) এই আন্দোলনের শুরু থেকেই নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। এই আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তুলির টানে আলোকের রঙ – বে-রঙের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত সুদৃশ্য ছবি এঁকেছেন। তাঁর প্রতিকৃতি ছবি শিশিরসিক্ত আশাবাদে ভরপুর। তাঁর ছবি বাস্তব জীবনকে যেন কামড়ে ধরে আছে। তাঁর ছবিতে আলো ও রঙের স্ফুলিঙ্গ, আর আছে স্থলদৃশ্য, আর আছে প্রকৃতিকল্প উদ্যান। তাঁর ছবি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও অরণ্যের খেলা, সবুজের আভা, আর আছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছে ঝর্ণা, প্রস্রবণের নির্ঝর। রেনিয়রের ছবি এমন আবেগ ও উৎসের সারাৎসার। প্রকৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতাই ইমপ্রেশনিস্টদের ছবির উপজীব্য বিষয়। ইমিপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীরা সুপক্ক সোনালি ধানশিষের মত পরিণত ছবিভাষার (Pictorial Language) জন্ম দিয়েছে। তাঁদের ছবি যেন ছড়িয়ে পড়া দৃশ্যের পুঞ্জ। ইমপ্রেশনিস্টদের চিত্রকলায় আছে প্রাণোচ্ছল জীবন প্রাচুর্য। রেনিয়রের ছবিকে ঘিরে আছে ফুল, ফল এবং বাগানের নিসর্গচিত্র।

মেডারডো রসো (Medardo Rosso) তাঁর ছবিতে আলো এবং গতির সংবেদনশীল রহস্যময় ছলনাজাল সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ছবির প্রতিকৃতিকে মনে হবে জলের ভেতর থেকে ভেসে আসা আলোছায়ার ঝিলমিলি। ছবিতে ছায়াময়তা বিশেষভাবে গতির সংবেদে চিকচিক করে ওঠে। তাঁর এরকম চিত্রিত ছবি হচ্ছে 'Lady with a Vei'l; (1893) – অবগুণ্ঠিত নারী।

টম রবার্ট্স (Tom Roberts) তাঁর ছবিতে প্রথাগত শিল্পকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তিনি এঁকেছেন অস্ট্রেলিয়ার গ্রামজীবনের ছবি। অনুরূপে উইলিয়াম জেমস গ্ল্যাকেন্স (William James Glackens) রাস্তার ছবি এঁকেছেন। এঁকেছেন শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি। আমেরিকার মধ্যবিত্ত জীবন বাস্তবতা তাঁর ছবিতে সজীব। উনিশ শতকীয় প্রথাগত একাডেমি শিল্পকলাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর বিখ্যাত তৈলচিত্র 'Hammerstein's Roof Garden' (1901) নিউইয়র্কের অ্যালেন গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। ক্লেড মোনেট (Claude Monet) ইমপ্রেশনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সূর্যোদয়ের ছবির (১৮৭২) জন্য তিনি অনবদ্য হয়ে আছেন। ভাঙাভাঙা, টুকরো টুকরো, অসম্পূর্ণ, আধ- খ্যাঁচড়া, রঙের প্রয়োগ তাঁর ছবিকে অনবদ্য করে রেখেছে। ছবিকে নাড়াচাড়া করেন তিনি, ছবি হয়ে ওঠে গতিশীল। ছবির জমিতে তুলি দিয়ে আলতো করে রঙের পোঁচ বুলিয়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি বিশেষভাবে আগ্রহ দেখিয়েছেন, ছবিতে সময় এবং আলোর অতিক্রমণে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর চিত্রিত সূর্যাস্তের চমৎকার রূপকল্প 'Rouen Cathedral : The Facade' (sunset) – কিংবদন্তি হয়ে আছে। শুধু বাস্তবতা নয়, বাস্তবতার বিমূর্ত রূপ ছবিতে তিনি ধরেছিলেন। পুকুরের জলজ লিলির সাদা-লাল-বেগুনে আভা তাঁর ছবিকে চিরন্তন করে রেখেছে। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পে তিনি নিজস্ব শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন। ছবিতে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা তাঁর হাতেই। তাঁর ছবিতে আছে বাস্তব প্রকৃতি। গতানুগতিক শিল্পকলার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছিলেন তিনি। শিল্পে সৌন্দর্য ও নীতির প্রবর্তন করে চিত্রশিল্পের ইতিহাসে তিনি বিবর্তন এনেছিলেন।

মোটামুটিভাবে ইমপ্রেশনিজ্‌ম গতানুগতিক শিল্পের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া শিল্প আন্দোলন। প্রাথমিকভাবে প্যারিসের শিল্পীরাই এই আন্দোলনের উৎসমুখ উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। এই শিল্পীদের ছবিতে মানুষের বাসযোগ্য এই পৃথিবীই উদ্ভাসিত। ইমপ্রেশনিস্টদের শিল্পমুখ ছিল সুনির্দিষ্ট মুহূর্ত এবং সময়। আর রঙ ও আলোর খেলার উদ্ভাস। ছবিতে বাতাসের ঢেউকে রঙ তুলিতে ফুটিয়ে তোলা তত সহজ কাজ নয়। পাশ্চাত্যের জনপ্রিয় শিল্প আন্দোলনের শরিক রূপে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীরা চিরকাল বরণীয় হয়ে থাকবেন। ইমপ্রেশনিস্টরা তাঁদের ছবিকে সমষ্টিগত শিল্প আন্দোলন হিসেবেই তুলে ধরেছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ জন শিল্পী একত্রে মিলিতভাবে প্যারিস ফটোগ্রাফির স্টুডিওতে তাঁদের চিত্রকলা প্রদর্শন করেছিলেন। সেটি ছিল চিত্রকলার ইতিহাসে আদর্শ উপস্থাপন। শিল্পীরা গতানুগতিক চিত্রকলাকে বর্জন করে তাঁদের শিল্পে নতুন সৌন্দর্য সন্ধানের কল্পলোককে প্রতিফলিত করলেন। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের কৌশলী তুলির টানে ছবির রঙ (Colour), স্বর (Tone), বুনোনের জমি (Texture) নতুন বিন্যাসে উজ্জ্বলন্ত হয়ে ওঠে। রঙের খেলায় সমুদ্র এবং আকাশকে অভিনব প্রায়োগিক বিন্যাসে বিন্যস্ত করেন চিত্রশিল্পী। স্থলদৃশ্য, নিসর্গ চিত্র এবং নদীর স্রোতকে বর্ণময় করেন। ছবি যেন বর্ণময় আলোর খেলা। শিল্পীরা রঙের চাবি দিয়েই শিল্পের দরজা খোলেন। প্রকৃতিকল্প দৃশ্যচিত্র অঙ্কন করেন, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ছবিকে এমন নির্বাক, অশ্রুত, বিস্ময় আপ্লুত সবুজের সমারোহে ব্যঞ্জিত করেন। ছোট ছোট ছবিকে সবুজ-বাদামি ধূসর, হালকা ফিকে রঙ, সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল, রোদ ঝলমলে রঙের চাবি দিয়েই বিস্ময় ভরা জানালা খোলেন। ইমপ্রেশনিস্টরা জলের ওপর আলো-ছায়ার খেলা খেলতে ভালবাসেন। আলোর বিচ্ছুরণে শিল্পীর ছবি হয়ে ওঠে পুনঃসৃষ্টি। রঙের বৈপরীত্যে শিল্প হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। রঙের বৈচিত্র্য

আনয়ন করেন শিল্পে। এককথায় ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের সাধনা সামঞ্জস্যের সাধনা। এছাড়াও ইমপ্রেশনিস্টদের ছবির ফ্রেমে ধরা পড়েছে গাছ-গাছালি, বাড়ি ঘর-দোর, শহরের রাস্তাঘাট এমনকি রেলওয়ে স্টেশন। তবুও নির্জন, লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন এলাকাই শিল্পীরা তাঁদের ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া আছে জলে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন। ইমপ্রেশনিস্টদের ছবিতে সমুদ্রে অলস পড়ন্ত সূর্যের আভা খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি শিল্পকলার এক বিশেষ শৈলী, যা গড়ে উঠেছিল ১৯ শতকের মধ্য-সমাপ্তি পর্যায়ে (during the mid-to-late-19th century), যা আয়তনগত দিক থেকে ছোট, যা তুলির আচঁড়ে উৎপাটিত করে প্রথাগত শিল্পশৈলীকে। পরিপার্শ্ব ও প্রকৃতি বিম্বিত হয় যথাস্থিতরূপে, বিশেষভাবে রঙ ও আলোর মধ্যে থাকে আশ্চর্য সংহতি। মিশ্র রঙের বৈচিত্র্য নির্ভর প্রকৃতির অবিকৃত এমন শিল্পরূপই ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকলা।

ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের তুলিতে ফুটে ওঠে আলোর বহুবিধ খেলা, নানা রঙের বর্ণালি। ছবিতে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয় সকাল, দুপুর, সন্ধে, এবং ভোরের পটভূমি। মুহূর্তে মুহূর্তে ঘটে যায় রঙের বৈচিত্র্যময় বিপর্যাস। অনুভূতি আর ব্যঞ্জনার রহস্যমেদুর রূপ – ঠিক যেন মেঘ রোদ্দুর ও আলো-ছায়ার লুকোচুরি। ছবি দেখে চট করে অর্থ বোঝা কঠিন। ধীরে ধীরে ছবির গভীরে প্রবেশ করতে হয়, তখন বিশেষ অর্থ-তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সমুদ্র-আকাশ-দিকচক্রবাল, দূরবর্তী প্রান্তর ইমপ্রেশনিস্টদের রঙের তুলিতে বারবার ওঠানামা করেছে। রঙের চমৎকার বৈপ্যরীত্য ছবিকে স্ফুটমান করেছে। আলোর স্বল্পস্থায়ী মুদ্রিত রূপ (to Capture the fleeting impression of light) ও আলোর স্থানান্তর ইমপ্রেশনিস্টদের ছবির উপজীব্য। বিষয়ের সামগ্রিকতা (to Capture the overall impression of their subject), রঙের বৈপরীত্য (Paired Complementary Colors), ধূসর রঙে আবছায়ার সৃষ্টি (gray point to depict shadows), রঙের আস্তরণ (New layers of paint), যার মধ্য দিয়ে আলো সহজে যাতায়াত করতে পারে (transparent) এবং রঙের মাত্রা (dimensions of Colour) ইমপ্রেশনিস্টদের ছবিকে পৃথকরূপে শিল্পচিহ্নিত করেছে। ছবিতে একটি মুহূর্তের প্রতিকৃতি জীবন্ত হয়ে ওঠে (to be Captured in a single moment)। সময়ের একটি মুহূর্তই (moment in time on the canvas) ছবিতে প্রতিভাত হয়। ইমপ্রেশনিস্টরা ছবিতে দৈনন্দিন রূপকেই (landscapes and scenes of everyday life) প্রতিফলিত করেন। শিল্পীরা সূর্যোদয় ও নির্মল জলধারাকে ছবির বিষয় করেছেন। ইমপ্রেশনিস্টরা কালো রঙকে পরিহার করার পাশাপাশি ধূসর এবং অন্ধকারের মিশ্রণে রঙের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে ছবিকে উজ্জ্বল করেছেন। এছাড়া শিল্পীরা বাড়ির বাইরের খোলা জায়গাকে ছবির বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ইমপ্রেশনিস্টরা যেমন ভাবনায় নতুনত্বের সন্ধানী ছিলেন, ঠিক তেমনি জীবনানন্দও কবিতায় প্রবহমান আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন। ছবি এবং কবিতার স্রষ্টারা উভয়েই তাঁদের সৃষ্টিকর্মে একটা ভাবনা রাখেন, যা তাঁদের চিন্তার অভিমুখকে সার্থকতার পথে নিয়ে যায় – "....does not seek beauty. All that artist can do is to drive towards his purpose."[৯ক]

।। তিন ।।

"কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায় ; জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মূষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মতো স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের শাদা রৌদ্রের মতো-সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।"[১০] কবি জীবনানন্দ (১৮৯৯-১৯৫৪) তাঁর 'কবিতার কথা' – গ্রন্থে একথা লিখেছেন।

কবির কবিতায় আছে ছবি। কবির সমস্ত কাব্যভুবন জুড়ে আছে ছবি। আসলে সে ছবি হল 'ইমপ্রেশনিস্ট' চিত্রশিল্প। ইমপ্রেশনিস্টরা যেমন তুলি দিয়ে রঙের খেলা খেলেন, ছবির জমিকে আলো-ছায়া, মেঘ-রোদ্দুরের খেলাঘর বানিয়ে তোলেন, ঠিক কবি জীবনানন্দও কবিতায় 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি'র[১১] খেলাকে চিত্রিত করেছেন। অনুভূতি দিয়ে শব্দ গেঁথে গেঁথে আঙুলে জড়োয়া শিল্পের বীজ বোনেন। জীবনানন্দ হয়ে ওঠেন সার্থক ইমপ্রেশনিস্ট কবি।

ইমপ্রেশনিস্টদের মতই জীবনানন্দের কবিতায় আছে টুকরো টুকরো রেখার বিন্যাস। জীবনানন্দের কবিতা ধীরে ধীরে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। কবির কবিতায় আকাশ, সমুদ্র, প্রান্তর, খোলা মাঠ ঘুরে ফিরে বারবার এসেছে। আর ভিজে মেঘের দুপুর, ভোরের আলো, রাত্রির নক্ষত্র, সবুজ পাতা, বিকালবেলার ধূসরতা, কাঁচা রোদ – এসব চিত্রকল্পে টইটুম্বুর কবির কবিতা। ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি ঠিক এরকম। কবির কবিতা জীবনের সাধারণ বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছে একেবারে সহজ, স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতই। ঠিক যেন ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে পাঠক। নানা লোকজ-দেশজ ও তুচ্ছ গদ্যগন্ধী শব্দে ভরপুর কবির কবিতা। ন্যাকড়া, কুষ্ঠরোগী, হাইড্র্যান্ট, হাড়, খুলি, রামছাগল, রুখু দাড়ি, শাঁখচুন্নি – এই কথ্য শব্দ দিয়ে ইমপ্রেশনিস্টদের মত কবি ছবি এঁকেছেন – এঁকেছেন ছবির শিল্প কবিতা। ব্যঞ্জনাবহ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে কবির কবিতা। ছবি ও কবিতা বিমিশ্র বর্ণ সুষমার নৈকট্যে বিনির্মিত রামধনুর সৌন্দর্য মূর্তি লাভ করেছে। অপরপক্ষে জীবনানন্দের কবিতা সমকালের বাংলা কবিতার ঘরানাকে ভেঙে ফেলেছে। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের শিল্পে যেমন রঙের বৈপরীত্যে ছবি অনবদ্য হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি জীবনানন্দ রবীন্দ্র রোমান্টিকতার শীলিত শৈলীকে ভেঙে কাব্য ও কথ্য ফর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য এনেছেন। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের মত কবির কবিতাও হয়ে উঠেছে বৈপরীত্যের পুনর্নির্মাণ। ইঁদুর শীতের রাতে রোমে খুদ মাখে, আবার চড়ুইয়ের ডিম নীল হয়ে যায় – এরকম বৈপরীত্য কবির কবিতায় নানাভাবে ঘুরে ফিরে আসে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল' – গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন – "জীবনান্দের কাব্যে দেখা যায় যে চিত্ররচনার অজস্রতা, তার বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য।"[১২] 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থ (১৯৩৬) 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় আছে সবুজ লোকাত্মিকতা। কবিতায় প্রকৃতির অরণ্যে হাঁটতে হাঁটতে 'আমরা' পৌঁছে যাই মৃত্যুর আগের ঠিক উঠোনে। তারপরে আছে সিঁড়ি পাতা। কবি লিখেছেন—

ক) "আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ।"[১৩]----মৃত্যুর মুখ ধূসর। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের প্রিয় রঙ। এই কবিতাতেই জীবনানন্দ হয়ে উঠলেন ইমপ্রেশনিস্ট কবি। শুধু একবারই নয়, বারবার ধূসর বর্ণকে ফিরিয়ে এনেছেন কবিতায়—

খ) "চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু-বেলার"।[১৪]

গ) "আরো এক আলো আছেঃ দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা"।[১৫]

প্রকৃতির রূপ শান্ত স্নিগ্ধ। কবিতার পটভূমি – ঘরের বাইরের মুক্ত পৃথিবী। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীরা 'প্রান্তর'কে শিল্পের জমি হিসেবে দেখেছেন। জীবনানন্দ লিখেছেন—

"বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ-বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;"[১৬]

কবিতায় জীবনানন্দ নিয়ে এসেছেন ভোর-বিকেল-সন্ধ্যা ও রাত্রির রূপ। অফুরন্ত প্রাণবন্ত জীবনের প্রেক্ষিত উন্মোচিত করলেন কবি। উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের মধ্যে কবি রেখে যাচ্ছেন সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় সংযোজনা। ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবির জমি হয় সবুজ। কবি লিখলেন—

"আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ।"[১৭]

ইমপ্রেশনিস্টদের কবিতায় উন্মোচিত হয় পারিপার্শ্বিক দিগ্‌বলয়। এঁদের শিল্পকলা উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা বৈচিত্র্যে টইটুম্বুর। এছাড়াও নিসর্গ প্রকৃতিতে পূর্ণ এঁদের কলাশিল্প।

জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কবিতায় নির্জন খড়ের মাঠ, ফুল, কুয়াশা, আকন্দ, ধানের গুচ্ছ, হিজল, খড়ের চাল, বট, ধুন্দুল, সুপুরির সারি, অশথ—এসব বৃক্ষলতা, গুল্ম এবং উদ্ভিদ কবিতায় বহুবর্ণ রঙ রূপকে ধারণ করে আছে। আর আট স্তবকের এই কবিতাটিতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের নানা প্রাণীর উল্লেখও রয়েছে। কবিতায় এসেছে জোনাকি, পেঁচা, বুনোহাঁস, কাক, পাখি-পাখালি, মাছরাঙা, বুলবুলি, ইঁদুর, মাছ, ঝিঁঝিঁ পোকা, হাঁস, চিল, চড়ুই এসব প্রাণী। নিসর্গ চিত্রের মধ্যে রয়েছে পউষসন্ধ্যা, কুয়াশা, চাঁদ, 'দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্না', সবুজ পাতা, অঘ্রানের অন্ধকার, সন্ধ্যার আঁধার, ভোর, বিকালবেলার ধূসরতা, নিভে যাওয়া রোদ, নদী, পথ-ঘাট-মাঠ, প্রান্তরের কুয়াশা। নিসর্গ প্রকৃতিতে ভরপুর বাংলাদেশের বারোমাসের মুগ্ধতা পাঠককে আস্বাদন করিয়েছেন ইমপ্রেশনিস্ট কবি জীবনানন্দ। আর ইমপ্রেশনিস্টদের প্রিয় দুটি রঙ ধূসর ও বিবর্ণ। জীবনানন্দও তুলির চামরে ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিতার স্তবকে স্তবকে-সোনালি সোনাঝুরির জমিতে জমিতে। চিত্রকল্প নির্ভর ব্যঞ্জিত বাক্যবিন্যাস হয়ে ওঠে বাস্তব সংরাগ, জীবনের রঙ ও আলোর তরঙ্গে তা গতিশীল হয়ে ওঠে। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের আশ্চর্য বৈপরীত্য কবিতায় স্ফুটমান—পৌষ সন্ধ্যার নির্জন খড়ের মাঠের পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বৈপরীত্যসূচক চিত্রকল্প—নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার। 'অন্ধকার দীর্ঘ শীত রাত্রি'র বিপরীতে 'মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার'—এসব চিত্রকল্প কবিতার রঙের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। আবার 'বুনো হাঁস' শিকারির গুলির আঘাত-এর পাশাপাশি বৈপরীত্য সূচক 'দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভেতরে'। আবার 'শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ'—এর সাথে গাঢ় বৈপরীত্য 'প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ'—জীবনানন্দকে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পী হিসেবে যথার্থই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ম্লানতা এবং সবুজ স্নিগ্ধতার ওঠানামা—রঙের রহস্য মেদুর বিচিত্র আলপনা—মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদল কবিতাটিকে আলোর অভিনব গ্রিনরুমে পরিণত করেছে। কবিতায় আছে মৃত্যুচেতনা। ইমপ্রেশনিস্টদের রঙে মৃত্যুর রঙকে চিত্রিত করেছেন কবিও। 'ম্লান ধূপের শরীর এবং 'ধূসর মৃত্যুর মুখ'—মৃত্যুর সাদা বিষাদকে এমন রঙের ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত করেছেন কবি। ইমপ্রেশনিস্টদের মত কবিতার রঙ হয়ে ওঠে বেশিটাই সবুজ। এছাড়া সোনালি, হলুদ, নীল

এবং ধূসরতা তো আছেই। কবি লিখলেন ‘সবুজ পাতা’, ‘সবুজ বাতাস’ ‘সবুজ সহজ’—কবিতায় ইমপ্রেশনিস্টদের ছবির বিস্তৃত জমি ব্যবহার করেছেন কবি। কবিতায় এসেছে ‘নীল জ্যোৎস্না’ ‘চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হয়ে আছে’, ‘নীল আকাশ’, ‘নীলাভ আকাশের নোনা’, ‘নীল আকাশের তল’,--রঙবদল, রঙের বৈচিত্র্য, রঙের উজ্জ্বলতা, রঙের স্তর—কবিতায় আলোই স্রষ্টার সৃষ্টিতে রঙের বর্ণালি এনে দিয়েছে।

ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবিতে ছায়ার প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন—“খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে।”[১৮] আর ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি প্রকৃতপক্ষে নির্মল জলের বর্ণমালা। জলে প্রতিফলিত বর্ণময় আলো। কবি লেখেন, “নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে”।[১৯] ইমপ্রেশনিস্টদের কবিতা যেমন প্রতীক চিহ্নিত, ঠিক তেমনি জীবনানন্দের কবিতা রঙের এক এক প্রতীকী তাৎপর্য। ধূসর (Grey) রঙের প্রতীকী তাৎপর্য সম্পর্কে ‘Dictionary of Symbols’ গ্রন্থে Jean Chevalier ও Alain Gheerbrant লিখেছেন – “Grey is a Christian symbol of the resurrection of the dead. ... The Grey of misty weather sometimes gives a feeling of sadness, melancholy and boredom”.[২০] আর সবুজ (Green) রঙ সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে – “Green is also lucky: it symbolizes plant life. To give somebody something green, especially in the morning, is to bring that person good luck... Green. Is the colour of nature and of growth.”[২১] অনুরূপে জীবনানন্দের কবিতায় যেমন সবুজ ও ধূসরের প্রতীকী তাৎপর্য আছে, ঠিক তেমনি মৃত্যুর কুয়াশা ঘন রূপ বিয়োগান্ত গূঢ় বার্তা বহন করেছে। নির্জন খড়ের মাঠ, চড়ুইয়ের ডিমের নীল হয়ে যাওয়া, অগ্রহায়ণের অন্ধকারে সবুজ পাতার হলুদ হয়ে যাওয়া, কঙ্কাবতী নারী, ম্লান ধূপের শরীর কবির মৃত্যু চেতনার স্থির প্রতীক। কবি লিখলেন – “পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর”।[২২] রবীন্দ্রনাথই জীবনানন্দের কবিতাকে ‘চিত্ররূপময়’তা’র স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র ‘মৃত্যুর আগে’কবিতাটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুজ কবির কবিতাকে এই আখ্যায় চিহ্নিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞার প্রতিফলন চিরন্তন হয়ে রয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘কালের পুতুল’ গ্রন্থে লিখেছেন – “তাঁর একটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন ‘চিত্ররূপময়’, জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য সম্বন্ধেই এই আখ্যা প্রযোজ্য। ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে, বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের”।[২৩]

।।চার।।

জীবনানন্দের কবিতায় আলো তো আলো – কত রকমের আলো। আলো কবির কবিতায় মহাজাগতিক বিস্ময়। - রোদ ঝলমল আলো, জ্যোৎস্নার আলো, নক্ষত্রের আলো। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র ‘নির্জন স্বাক্ষর’ কবিতায় ইমপ্রেশনিস্ট কবি লেখেন –

“রয়েছি সবুজ মাঠে – ঘাসে –
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হ’য়ে আকাশে আকাশে,”[২৪]

আর জীবনানন্দের কবিতায় পাতা রয়েছে নক্ষত্রের চিরন্তন আসন -

- “নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে”।[২৫]

- "যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত"।[২৬]
- "নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
  নক্ষত্রের মতন হৃদয়"[২৭]
  আবারও সেই আকাশ, সেই আলো -,
  "তোমার আকাশ – আলো-জীবনের ধার,"[২৮]
  'অবসরের গান' – কবিতায় কবি চিত্ররূপময়তার অনবদ্য প্রকাশ ঘটিয়েছেন –
  "তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে ক্ষেতে –
  রোদ গেছে প'ড়ে,
  এসেছে বিকেলবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধরে"।[২৯]
  'ক্যাম্পে' কবিতার জমাট বৈপরীত্য জীবনানন্দকে ইমপ্রেশনিস্ট কবিরূপে জাত চিনিয়ে দেয়। মিলনেচ্ছু হরিণ-হরিণী কামনার রূপক চিত্রকল্প। বিপরীতে সুশিক্ষিত শিকারির হরিণ শিকার। শিকারির ডিসে হরিণের মাংস। ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের মতই কবি লিখলেন –

"কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে – আলোয় তাকে দেখা যাবে –
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তাকে এই সব।
আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাবো"।[৩০]

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ। 'রূপসী বাংলা'র (১৯৫৭) কবিতাগুলি প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছে ছবির ভাষা (Pictorial Language)। বাংলার রূপের মধ্যে নানা রঙের নৈসর্গিক মেলা। 'রূপসী বাংলা'র প্রতিটি কবিতার ছত্রে ছত্রে আছে, তাৎপর্যময় চিত্র সম্ভাবনার ইশারা (pictorial suggestiveness)। প্রকৃতি-নিসর্গ – ঐতিহ্য – নারীরূপকে কবি ধরেছেন ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের মতই। কবিতার বিষণ্ণতা এসেছে ছায়া এবং রঙের আবেশে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপস্থিতিতে কবিতায় এসেছে আকাশ-বাতাস প্রকৃতির আদিগন্ত লীলা। বাংলার নদ-নদী, ভোরের বট, ডুমুরের ফুল, কার্তিকের শিশির আর ভাটফুলে ভরপুর 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলি। নৈসর্গিক ছবিভাষা বলতে যা বোঝায়, 'রূপসী বাংলা' তাইই। নিসর্গপ্রেমিক জীবনানন্দ ইমপ্রেশনিস্টদের মতই চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবিতাকে ব্যঞ্জিত ও অর্থবহ করে তুলেছেন। অজস্র সৌন্দর্যরাশি জোনাকি হয়ে কবিতায় ভিড় করেছে। গাছ-পালা-ফুল ফলের পাশাপাশি কবিতায় এসেছে ঋতু-মাস। এসেছে লক্ষ্মীপেঁচা, জলসিড়ি নদী, ধানসিড়ি নদী, জাম-বট-হিজলের গাছ, ভোরের দোয়েল পাখি, গঙ্গাফড়িংয়ের নীড়, অন্ধকার নক্ষত্র, শাঁখ চিল, নীল কুয়াশা, শামুক গুগলি, শ্যাওলার মলিন সবুজ, ভোরের কাক, একঝাড় জোনাকি, মাছরাঙা, আশশ্যাওড়ার বন, ম্লান সাদা ধুলো, নীলাভ আকাশ, আশ্বিনের আলো, আকাশের রৌদ্র আর মেঘ, নীল রূপের কুয়াশা, সবুজ মৃদু ঘাস, পাখির হৃদয়, 'মৃদু ঘাস রৌদ্রের দেশ', সন্ধ্যার বাতাস, কড়ির মতন সাদা মেঘের পাহাড়, কমলা রঙের পাখা, নীল সোনালি ভোমরা, নদীর জলের গন্ধ, 'রাঙা রৌদ্রে মাছরাঙা', 'ধানের নরম শিষ', অন্ধকার বিছানা, হলুদ পাখি, লাল পেড়ে ভিজে শাড়ি, কমলা রঙের ডানা, কার্তিকের মাঠ, ঘাসের আঁচল – এইসব বাংলার 'চন্দ্রমালা রূপসী'র

মত, ‘সৌন্দর্যের নীল’ স্বপ্নের মত, আলপনায় পদ্মের মত। ইমপ্রেশনিস্টদের ধানের আঘ্রাণের মত চুনে চুনে শিল্পের পাতাবাহারে ভর করে রূপসী বাংলার কবি সহৃদয় পাঠকের অন্তরে অমরতা লাভ করেছেন। কবিতায় লিখেছেন –

“কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস – প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে – নীল বুকে আছে তাহাদের
গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামপোকা ঢের
হিজলের ক্লান্ত পাতা – বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
তাহাদের শ্যাম বুকে – পাড়াগাঁর কিশোরেরা যখন কান্তারে
বেতের নরম ফল, নাটাফল খেতে আসে, ধুন্দুল বীজের
খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে – বক তাহা জানে নাকো, পায় নাকো টের
শালিখ খঞ্জনা তাহা – লক্ষ লক্ষ ঘাস এই নদীর দুধারে”[৩১]

জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে গভীর ঘন আস্বাদে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন ডুবে যায় আমন্ত্রিত সৌন্দর্যরাজ্যে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘কালের পুতুল’ গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন –

“জীবনানন্দের জগৎ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর বর্ণবহুল।”[৩২]

কবিতায় কখনো এঁকেছেন সমুদ্রে হাল পাল ভেঙে দিশাহারা নাবিকের ছবি –

“অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা”[৩৩]

কখনো ধীরগামী সন্ধ্যা আসার চিত্রকল্প –

“সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;”[৩৪]

কোন কবিতায় কচি লেবু পাতার মত সবুজ আলো, সবুজ ঘাসের সুঘ্রাণ নিয়েছেন কবি –

“কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস-তেমনি সুঘ্রাণ”।[৩৫]

কোন কবিতায় বিস্মৃত রূপকথার জগতের শঙ্খমালাকে ফিরিয়ে এনেছেন –

“খুঁজেছি তোমারে সেইখানে –
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে।”[৩৬]

আর ধানসিড়ি নদীর তীরে ভিজে মেঘের দুপুরে, চিলের কান্নার অনুষঙ্গে বিস্মৃতপ্রায় মৃত প্রিয়ার রূপমূর্তিকে ফিরিয়ে আনেন কবি –

“তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!”[৩৭]

।। পাঁচ ।।

Painting is the Portrayal, in two dimensions, of the real world transformed by the artist’s imagination.”[৩৮]

আমৃত্যু কবিতায় ছবি এঁকেছেন জীবনানন্দ। তাঁর কাব্যে ছবিই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়, ছবিই বিশল্যকরণী। কবির কবিতাও কলম জড়িয়ে নিয়েছে ছবির ধুলোর রেণু। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় রঙ আর তুলি দিয়ে সাবলীল স্বচ্ছ জমিতে ছবির অঙ্কুরোদ্গম করেছিলেন। রবীন্দ্রসৃষ্ট সেই কিশলয়কে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকরদের মতই জীবনানন্দ বহন করলেন ভিন্নভাবে বাংলা কবিতার প্রবহমান উত্তরাধিকারের ধরতায়। ইমপ্রেশনিস্টদের চিত্রকলা সময়ের সবুজ উদ্ভাসে রেখাঙ্কিত হল তার কবিতায়। কবির কবিসত্তা আজও ধান কাটে – 'গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং'য়ের[৩৯] দঙ্গলের ম্লান ছায়ায় বসে বসে। কোন সংশয় নেই, বাংলা সাহিত্যের সার্থক ইমপ্রেশনিস্ট কবি জীবনানন্দ দাশ। Yuri Borev তাঁর 'Aesthetics' গ্রন্থের 'Branches of Art' অধ্যায়ের 'Literature' অংশে যথার্থই লিখেছেন – "Literature aesthetically masters the world through artistic use of language."[৪০]

তথ্যসূত্র:

১। Yuri Borev, Aesthetics, Progress Publishers, Moscow, 1985, P. 107

২। অমিয় চক্রবর্তী, শিল্প, পারাপার, কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সম্পা- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৮৩

৩। Yuri Borev, Aesthetics, Progress Publishers, Moscow, 1985, PP. 204-205

৪। ibid P. 61, Translated by Irina Zheleznova – ED.

৫। Leo Tolstoy, War and Peace, Finger Print ! classics, prakash Books India Pvt. Ltd., New Delhi, 2019, P. 190

৬। ibid, P. 694

৭। রবীন মণ্ডল, শিল্পভাবনা, বাণীশিল্প, টেমার লেন, ২০০৭, পৃ. ৩৩ – গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত।

৮। Judy pearsall (Ed.by), The Concise Oxford Dictionary, Tenth Edition, Oxford University Press, New York, 1999, P. 713

৯। Impressionism, Encyclopaedia Britannica, Web page, Dated : 11/10/2021

৯ (ক)। রবীন মণ্ডল, শিল্পভাবনা, বাণীশিল্প, টেমার লেন, ২০০৭, পৃ. ৮৫ – গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত।

১০। জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ৮,৯

১১। জীবনানন্দ দাশ, মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ১৫৭

১২। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩২

১৩। জীবনানন্দ দাশ, মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র, এস. বি. এস পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ১৫৮

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

১৬। পূর্বোক্ত

১৭। পূর্বোক্ত

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

১৯। পূর্বোক্ত

২০। Chevalier, Jeam, Gheerbrant Alain, Grey, Dictionary of symbols, Published by the Penguin Group, New York, USA, 1996, PP. 217, 456
২১। ibid, PP. 217, 220
২২। জীবনানন্দ দাশ, মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, ২৪২৩, পৃ. ১৫৮
২৩। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩২
২৪। জীবনানন্দ দাশ, নির্জন স্বাক্ষর, ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ.৯১
২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২
২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২
২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
২৯। পূর্বোক্ত, অবসরের গান, পৃ. ১২৩
৩০। পূর্বোক্ত, ক্যাম্পে, পৃ. ১২৮
৩১। পূর্বোক্ত, রূপসী বাংলা, ৮ সংখ্যক কবিতা, পৃ. ১৬৮
৩২। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৭
৩৩। জীবনানন্দ দাশ, বনলতা সেন, বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, এস.বি.এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ১৯৯
৩৪। পূর্বোক্ত
৩৫। পূর্বোক্ত, ঘাস, বনলতা সেন, পৃ. ২০৩
৩৬। পূর্বোক্ত, শঙ্খমালা, বনলতা সেন, পৃ. ২০৫
৩৭। পূর্বোক্ত, হায় চিল, বনলতা সেন, পৃ. ২০৪
৩৮। Yuri Borev, Painting and Drawing, Branches of Art, Aesthetics, Progress Publishers, Moscow, 1985, P. 250
৩৯। জীবনানন্দ দাশ, ধান কাটা হয়ে গেছে, বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাসের কাব্য সমগ্র, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ২১৯
৪০। Yuri Borev. Literature, Branches of Art, Aesthetics, Progress Publishers, Moscow, 1985, P. 255।

অগ্নিপুরাণে যোগপ্রসঙ্গ : একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা

রূপম সরকার
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভারতীয়শাস্ত্রে যোগের মাহাত্ম্য অনির্বচনীয়। সংস্কৃতশাস্ত্রে মূলত দর্শন এবং পুরাণে যোগের প্রসঙ্গ সর্বাপেক্ষা আলোচিত। বর্তমান শোধপত্রটিও সেই বিষয়ের ওপর আঁধার করেই রচিত। প্রধানরূপে পাতঞ্জলযোগদর্শন, বেদান্তসার গ্রন্থ এবং অগ্নিপুরাণে যোগের তুলনামূলক আলোচনা প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। যোগ সম্পর্কে কোন গ্রন্থে কীরূপে আলোকপাত হয়েছে, তাই সংক্ষেপে চিত্রিত হল।
সূচক শব্দ: অগ্নিপুরাণ, যোগ, বেদান্তসার, পাতঞ্জলযোগদর্শন।

মূল আলোচনা:

ভারত আমার ভারতবর্ষ / স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো
তোমাতে আমরা লভিয়া জনম / ধন্য হয়েছি ধন্য গো।।
কিরীট ধারিণী তুষার শৃঙ্গে / সবুজে সাজানো তোমার দেশ
তোমার উপমা তুমিই তো মা / তোমার রূপের নাহিতো শেষ।।
সঘন গহন তমসা সহসা / নেমে আসে যদি আকাশে তোর
হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে / আমরা আনিব নতুন ভোর।।
শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি / ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ
আঁধার রজনী ভয় কি জননী / আমরা বাঁচাব এ-মহাদেশ।।
রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ / বীর সুভাষের মহান দেশ
নাহি তো ভাবনা, করি না চিন্তা / হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের লেশ।।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দেশপ্রেমের এই গানেই ভারতের ঐতিহ্য চিত্রিত। ভারতের এই ঐতিহ্য পরম্পরাক্রমে সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রবহমান। পণ্ডিতগণের মতানুসারে প্রাচীন এই জ্ঞানপরম্পরার সর্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান নিদর্শন বেদ। ঋগ্বৈদিককাল থেকেই ঋষিরা জ্ঞানের সাধনায় মত্ত, এই বৈদিক জ্ঞান কেবল জ্ঞান নয়, বরং তা চিরন্তন শাশ্বত জ্ঞান। যে জ্ঞানের পরিবর্তন পরিবর্ধনের ক্ষেত্র নেই, অনাদিকাল থেকেই অক্ষয়রূপেই বিরাজমান। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান প্রযুক্তির জ্ঞানের মত পরিবর্তনশীল নয়। ভারতের ঐতিহ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম তাই সদা সর্বদা উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান, কেননা তাঁর সৃষ্টি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে সমরূপে বিরাজমান। তিনি সেজন্যই ঋষি কবি নামেও খ্যাত। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য –

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে
ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ২য় অধ্যায়, মন্ত্র ৫)

ভারতবর্ষের ভুমিতে এই অমৃতের পুত্রেরা অনাদিকাল থেকেই আবির্ভূত হয়ে ধরণীকে পুণ্যভূমি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত মনিষীরা বন্দনীয়, স্মরণীয়। শ্রবণ,

মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা নিজেদের জ্ঞানকে বর্ধিত করে বিশ্ববন্দিত। বৈদিককাল থেকেই পরম্পরাক্রমে প্রবহমান ধারা। যদিও বেদপাঠ সর্বসাধারণের জন্য নির্ধারিত ছিল না। পরবর্তী সময়ে সেজন্য সর্বসাধারণ পাঠ্যরূপে প্রকাশ হয় পুরাণসমূহের। বেদের দুরূহ তত্ত্বগুলি সরল ভাষায় সর্বসাধারণের বোধগম্যতার দিকে খেয়াল রেখে রচিত হয় পুরাণসমূহ। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রধান উপনিষদ সাহিত্যে মূলত জীবব্রহ্মৈকবাদই সর্বতরূপে চিত্রিত। অপরদিকে পুরাণসমূহে মূলত সৃষ্টি-প্রতিসৃষ্টি-রাজবংশ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এপ্রসঙ্গে আচার্য শংকর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন – "পুরাণম্ অসদ্বা ইদমগ্র আসীত্ ইত্যাদি"। (শাংকরভাষ্য, বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ১১.৪.১০) বেদের সঙ্গে বিষয়সমূহের পূর্ণ সামঞ্জস্যতা না থাকলেও পুরাণ সমাজে পঞ্চম বেদরূপেই প্রসিদ্ধ ছিল। কেননা বেদের সঙ্গে পুরাণও কালক্রমে সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। "ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বর। সর্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্বদর্শনঃ"। (ভাগবদপুরাণ, ৩.১২.৩৯) স্কন্দপুরাণেও সমর্থন মেলে পঞ্চমবেদের সপক্ষে "পুরাণং পঞ্চমো বেদ ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্। যো ন বেদপুরাণং হি ন স বেদাত্র কিঞ্চন"। শাস্ত্রপ্রমাণও উপলব্ধ যে বেদের যথার্থরূপে জ্ঞানের জন্য পুরাণের সম্যকপাঠের প্রয়োজন।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েত্।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।। (বায়ুপুরাণ, ১.২০১)

বেদে বহুদেবতার উপাসনা পরিলক্ষিত হয়, যা আসলে প্রাকৃতিক শক্তিরই উপাসনা। "The Songs of the Ṛgveda prove indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from personifications of the most striking natural phenomena."(A History of Indian Literature by M. Winternitz, Trans. Into English by Mrs. S. Ketkar, Vol. I, Part I, C. U. Pub., P. 65) শুক্লযজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রের প্রতি প্রার্থনায় মন্ত্রে রুদ্রের প্রাকৃতিকস্বরূপ স্পষ্ট। বহুদেবতার আড়ালেও বৈদিকসাহিত্যে একদেবতার সমর্থনে দেখা মেলে-"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। (ঋকসংহিতা, ১.১৬৪.৪৬) দীর্ঘতমা ঋষি প্রোক্ত এই মন্ত্রাংশটি স্মরণীয়। বেদের অন্তভাগে উপনিষদে মূলত ব্রহ্মই প্রধান, নিরাকারব্রহ্মের উপাসনাকেন্দ্রিক তত্ত্ব কাহিনীর আড়ালে সরলরূপে উপস্থাপিত। আচার্য শংকর বৃহদারণ্যকভাষ্যভূমিকায় উদ্ধৃত করেছেন –"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাবসাদনাত্, উপনিপূর্বস্য সদেস্তদর্থত্বাত্"। বেদ উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা থেকে পরবর্তীসময়ে পুরাণে ত্রিদেবপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও পুরাণে প্রচ্ছন্নরূপে একেশ্বরবাদই উপন্যস্ত।

যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে বিকারভেদৈরবিকাররূপঃ।
তথা ভবান্ সর্বগতৈকরূপো রূপান্যশেষান্যনুপুষ্যতীশ।। (বিষ্ণুপুরাণ, ৫.১.৪৪)

শৈবপুরাণসমূহের মধ্যে অন্যতম হল অগ্নিপুরাণ। এই পুরাণের প্রবক্তা হলেন অগ্নি এবং শ্রোতা হলেন বসিষ্ঠ। ৩৮৩ অধ্যায় এবং ১১,৫০০ শ্লোকসমন্বিত এই পুরাণকে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বিদ্যার মহাকোষ বলে মনে করা হয়। অগ্নিপুরাণে শিবলিঙ্গ, দুর্গা, গনেশ, সূর্য, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয় এবং ভূগোল, গনিত, ফলিত জ্যোতিষ, বিবাহ, মৃত্যু, শকুনবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, দিনচর্যা, যুদ্ধবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ছন্দ, কাব্য, বেদ, ব্যাকরণ, কোশনির্মাণ প্রভৃতি নানাবিষয়ে বর্ণনা আছে। সর্বাপেক্ষা ভারতীয় শাস্ত্রের সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত বিষয় যোগসম্পর্কে বর্ণনা উপলব্ধ হয়। পুরাণবর্ণিত এই যোগ পতঞ্জলি প্রোক্ত যোগ এবং বেদান্তসার কথিত যোগের

সাদৃশ্যযুক্ত নাকি বৈসাদৃশ্য বর্তমান- এই আলোচনায় শোধপ্রবন্ধের মুখ্যালোচ্য বিষয়। অধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতির জন্য মানুষ সদা সর্বদা প্রযত্নশীল। মোক্ষেচ্ছু মানুষ তাই বিভিন্ন মার্গে গমন করে বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ করেছেন। এরূপে বিভিন্ন অনুভূতির ওপর নির্ভর করেই ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। কোন কোন সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন, আবার কোন কোন সম্প্রদায় বিরোধী মত পোষণ করে স্বাভিমত প্রকাশ করেছেন নিজেদের সম্প্রদায় মাধ্যমে। বেদবিরোধীরূপে প্রকাশিত দর্শন সম্প্রদায় নিজেদের নাস্তিক দর্শন বলে পরিচয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং বেদপন্থী সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য বিশ্বাস হেতু নিজেদের আস্তিকদর্শন বলে প্রতিষ্ঠা করেন। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সম্প্রদায় নাস্তিক দর্শন বলে পরিচিত এবং সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা এই ছয় সম্প্রদায় আস্তিকদর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। উত্তরমীমাংসাদর্শন বেদান্ত নামেও প্রসিদ্ধ। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন- "বেদান্ত নাম উপনিষৎপ্রমাণং তদুপকারিণী শারীরকশাস্ত্রাদীনি চ"। (বেদান্তসার, ১) প্রত্যেক দর্শনই কোন না কোন অংশে যোগের আবশ্যকতা অনুভব করেছেন। দেহাত্মবাদপ্রধান চার্বাক দর্শন রাজযোগের মহত্ব না বুঝলেও দেহের নিরাময়তার জন্য হঠযোগের আশ্রয়কে অস্বীকার করতে পারেন না। বৌদ্ধদের বিপশ্যনা ধ্যান, জৈনদের সিদ্ধ শীলোপবেশনকে যোগের অঙ্গ বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম যোগাঙ্গ সংযম বৌদ্ধ ও জৈন সাধকদের মধ্যে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। নিয়মপূর্বক স্থির ও সুখকর আসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেব এবং মহাবীরের মূর্তি বহুস্থানেই দৃষ্ট হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনও যুক্ত এবং যুঞ্জান ভেদে যোগজ জ্ঞানের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেছেন, ফলত পরোক্ষরূপে যোগদর্শনের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতিরূপ লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য পুরুষ বা জীবের সঙ্গহীনতা প্রয়োজন, যোগের মাধ্যমেই যা সম্ভব। মীমাংসাদর্শনেও যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়ামের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। উত্তরমীমাংসাদর্শনে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ সাধনপ্রক্রিয়ায় যোগের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

যোগের মূল ধাতু হল যুজ্‌। 'যুজ্‌ সমাধৌ' অর্থাৎ চিত্তকে সমাহিত করা। পাতঞ্জল যোগের বিশেষ লক্ষ্যই হল সমাধি। 'মনকে যুক্ত করা' যাকে মনোযোগ বলা হয়, তাই পতঞ্জলির যোগ। যোগসূত্রের ভাব কিছুটা উপনিষদে এবং গীতায় পাওয়া যায়। বিশেষত কঠোপনিষদ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। গীতাকে তাই যোগশাস্ত্রও বলা হয়। যোগের মূল ধারণার সাক্ষাৎ কঠোপনিষদের "স্থিরাম্‌ ইন্দ্রিয়ধারণাম্‌" (কঠোপনিষদ, ২.৩.১১) মন্ত্রাংশে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়কে মনেতে স্থির করা এবং তারপরে মনকে নিশ্চল করা পাতঞ্জলযোগদর্শনেরও ধারণা। ব্যাস ভাষ্য মতে, সমাধি হল চিত্তের সার্বভৌম ধর্ম। সমাধি শব্দ লক্ষ্য এবং সাধন দুই অর্থেই ব্যবহার করা হয়। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অষ্টম অঙ্গরূপে যে সমাধির উল্লেখ করা হয়েছে, তা সাধনরূপ, কিন্তু যখনই বলা হবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ, তখন তা লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সমাধি চিত্তের সার্বভৌম ধর্ম বলা হয়, কেননা সমাধি চিত্তের সমস্ত ভূমিতেই হতে পারে। মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ- চিত্তের পাঁচ ভূমি। নিরুদ্ধ ভূমিতেই পৌঁছানো হল যোগের লক্ষ্য। সমস্ত ভূমিতেই সমাধি সম্ভব হলেও সমস্ত সমাধিকেই যোগ বলা যায় না। "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" (পাতঞ্জলযোগদর্শন, সমাধিপাদ, ২) – এই সূত্রেও সর্ব শব্দের ব্যবহার করা হয়নি। যোগের দুটি প্রকারভেদ আছে, সম্প্রজ্ঞাতযোগ ও অসম্প্রজ্ঞাতযোগ। সম্প্রজ্ঞাতযোগের পুনরায় বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা – নামে চারটি স্তর বিদ্যমান। সম্প্রজ্ঞাতযোগের এই চারটি স্তর একাগ্রভূমিতেই সিদ্ধ হয়। কোন এক বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করলে ধ্যান হয় আর ধ্যান গম্ভীর হলে সমাধি হয়। কিন্তু যে সমাধি

অবস্থায় আত্মপ্রত্যয়ের অনুভূতির অভাব থাকে, তাকে যোগ বলা হয় না। বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষ পৃথক – এই জ্ঞান আবশ্যক। পুরুষের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্প্রজ্ঞাতযোগে আবশ্যক। যেখানে আত্মজ্ঞান নেই, সেখানে যোগও নেই। পাতঞ্জলযোগদর্শনের দার্শনিক আধার কপিল বিরচিত সাংখ্যদর্শন। সেজন্যই একসাথে সাংখ্য-যোগও বলা হয়। কপিল প্রোক্ত দর্শনে তত্ত্বের জ্ঞানের অংশ হল সাংখ্য এবং জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপলব্ধির উপায়স্বরূপ (সম্প্রজ্ঞাত) ও উপেয়ভূত (অসম্প্রজ্ঞাত) হল যোগ। “বিতর্কবিচারানন্দাহস্মিতানুগমাৎসম্প্রজ্ঞাতঃ” (পাতঞ্জলযোগদর্শন, সমাধিপাদ, ১৭)। সম্প্রজ্ঞাতসমাধি সিদ্ধ হলে প্রকৃতি এবং পুরুষের পৃথক জ্ঞান জন্মায়। এরই নাম বিবেকখ্যাতি। এই বিবেকখ্যাতিই মোক্ষপ্রদ। ক্লেশ কর্মসংস্কার যখন ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন ফলস্বরূপ বিবেকখ্যাতি সুদৃঢ় হয়। মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা অবাধিত হয়ে নিরন্তর বিবেকখ্যাতি হল ধর্মমেঘসমাধি। জীবদ্দশাতেই মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ হয়, যা জীবন্মুক্তি নামে খ্যাত। অপরদিকে অসম্প্রজ্ঞাতযোগে চিত্তের সাত্ত্বিকবৃত্তিরও সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়। “বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ” (পাতঞ্জলযোগদর্শন, সমাধিপাদ, ১৮)। সমস্ত বৃত্তির অস্তাচলে কেবল চিত্তের নিরোধ সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। এই অসম্প্রজ্ঞাতসমাধির উপায় হল পরবৈরাগ্য। যোগসাধনার প্রধান উপায় হল বৈরাগ্য এবং অভ্যাস। বৈরাগ্য দুই প্রকার, পরবৈরাগ্য এবং অপরবৈরাগ্য। পার্থিব বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মালে তা অপরবৈরাগ্য এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানের প্রতি অনীহা হল পরবৈরাগ্য। অপরবৈরাগ্যের উপযোগিতা সম্প্রজ্ঞাতসিদ্ধির জন্য আবশ্যক এবং অসম্প্রজ্ঞাত সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরবৈরাগ্য। চিত্তের স্থির এবং অচঞ্চল পরিস্থিতির জন্য যোগসাধনের চেষ্টাই হল অভ্যাস। যমনিয়মাদি আটটি যোগাঙ্গের মাধ্যমে নিরন্তর অনুষ্ঠানে সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধি তথা কৈবল্য প্রাপ্তি হয়।

সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রণীত বেদান্তসার গ্রন্থটি মূলত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের গ্রন্থ। বেদান্তের মূল লক্ষ্যই হল জীব এবং ব্রহ্মের একাত্মতা। “প্রয়োজনং তু তদৈক্যপ্রমেয়গতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ স্বস্বরূপানন্দবাপ্তিশ্চ”। (বেদান্তসার, ১৭) ‘তত্ত্বমসি’, ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’- এসব মহাবাক্য শ্রবণমাত্রই আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনরূপে বেদান্তসারে নির্দিষ্ট হয়েছে- “এবং স্বস্বরূপচৈতন্যসাক্ষাৎকারপর্যন্তং শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনসমাধ্যনুষ্ঠানস্য অপেক্ষিতত্বাত্ তে অপি প্রদর্শ্যন্তে” (বেদান্তসার, ৯১)। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং সমাধি- এই চতুর্বিধ সাধনের যথাযথ অনুষ্ঠান করলে তবে আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি আত্মাকে দর্শন করতে সমর্থ হন। সদানন্দ যোগীন্দ্র সমাধির কোনপ্রকার লক্ষণ করেননি, কিন্তু টীকাকার নৃসিংহ সরস্বতী উদ্ধৃত করেছেন “বুত্থাননিরোধসংস্কারযোঃ অভিভবপ্রাদুর্ভাবে সতি চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ সমাধিঃ”। অর্থাৎ ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব এবং নিরোধ-সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হলে চিত্তের যে ঐকাগ্র্যরূপ পরিণাম হয়, তাই হল সমাধি। চিত্তের জ্ঞেয়স্বরূপে নিশ্চলভাবে অবস্থিতিই সমাধি। এটিই হল যোগের চরম অবস্থা। সহজ ভাষায় সেই ব্রহ্মই আমি, আমি অসংসারী সদ্ভিন্ন কিছুই নই, এভাবে আত্মাকে ব্রহ্মাভিন্নরূপে জানাই সমাধি। যোগদর্শনে তত্ত্বদর্শনের উপায়কে যোগ বলা হয়েছে। কিন্তু বেদান্তীগণ স্বতন্ত্রভাবে যোগকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উৎপাদক বলে স্বীকার করেন না। “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” (ব্রহ্মসূত্র, ২.১.৩) – এর ব্যাখ্যায় আচার্য বাদরায়ণ এবং ভাষ্যে আচার্য শংকর ঐরূপ আশয় ব্যক্ত করেছেন। ভাষ্যকার শংকর বিচারসাধ্য জ্ঞানকেই মোক্ষকারণ বলেছেন। আচার্য শংকর ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে যোগের অনুষ্ঠানকে আবশ্যক বলেননি। তবে বেদান্তে যোগের স্থান নেই একথাও বলা চলে না। এই সম্পর্কে পণ্ডিত দীননাথ ত্রিপাঠী মহাশয় বলেছেন “যদিও অদ্বৈতবেদান্ততত্ত্বজ্ঞানে

বেদান্তবিচারেরই প্রাধান্য বিবরণানুযায়ীরা প্রতিপাদন করিয়াছেন তথাপি অনেকের মতে তত্ত্বজ্ঞানে যোগ বা সমাধির উপযোগিতা স্বীকৃত হয়। কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদেও ধ্যান, যোগ প্রভৃতির উপযোগিতা স্পষ্টভাবে কীর্তিত হয়েছে। বেদান্তসারে ধ্যান, সমাধি প্রভৃতির উপযোগিতা প্রদর্শিত হওয়ায় অনেকে বেদান্তসারের প্রতি কটাক্ষ করলেও এই বেদান্তে যোগের স্থান অভিপ্রেত নহে, ইহা নিশ্চিতভাবে সাধন করা যায় না"।

৩৮৩ অধ্যায়সমন্বিত অগ্নিপুরাণের ৩৭২তম অধ্যায় থেকে ৩৭৬তম অধ্যায়ে যোগের আলোচনা দৃষ্ট হয়। অগ্নি দেবতার বর্ণনানুযায়ী সংসারের তাপ মোচনের জন্য অষ্টাঙ্গযোগ আবশ্যক। যোগের লক্ষ্মণপ্রসঙ্গে পুরাণে উল্লেখ আছে "ব্রহ্মপ্রকাশকং জ্ঞানং যোগস্তত্রৈকচিত্ততা।।

চিত্তবৃত্তিনিরোধশ্চ জীব-ব্রহ্মাত্মনোঃ পরঃ।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহৌ।। (অগ্নিপুরাণ, ১-২)

অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রকাশক জ্ঞান যোগের দ্বারাই সুলভ হয়। চিত্তকে একজায়গায় স্থাপন করার নামই হল যোগ। চিত্তবৃত্তির নিরোধও যোগ। জীবাত্মা এবং পরমাত্মাতে অন্তঃকরণের বৃত্তিকে স্থাপন করাই হল শ্রেষ্ঠতম যোগ। অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চবিধ যম। নিয়মও পাঁচপ্রকার, যা ভোগ এবং মোক্ষের দাতা। শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান- নিয়ম। পদ্মাদি যেকোনপ্রকার আসনে স্থিত হয়ে পরমাত্মার চিন্তন করতে হবে। আসনে বসে মন এবং ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণে রেখে একাগ্র করে অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাসে সংলগ্ন হতে হয়। জপ এবং ধ্যান বিনা করা প্রাণায়ামকে বলা হয় অগর্ভ এবং জপ ও ধ্যানের সঙ্গে করা প্রাণায়ামকে বলা হয় সগর্ভ। ইন্দ্রিয়ের ওপর বিজয়প্রাপ্তির জন্য সগর্ভ প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়ে সমস্তকিছুর ওপর বিজয়প্রাপ্তি হয়। তত্ত্ববিদযোগীগণ ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় এবং ধ্যানের প্রয়োজন- এই চার বিষয় অবগত হয়ে যোগাভ্যাস করবেন। যোগাভ্যাসের দ্বারা মোক্ষ এবং অণিমাদি আট প্রকারের মহান ঐশ্বর্য প্রাপ্তি হয়। ধ্যানযজ্ঞই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মোক্ষদায়ী, একারণে অশুদ্ধ এবং অনিত্য বাহ্য সাধন যজ্ঞপ্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক যোগের বিশেষরূপে অভ্যাস প্রয়োজন। ধ্যেয় পদারথে মানসের সংস্থিতির নাম ধারণা। ধারণার দ্বারা সাধকগণের ক্লেশের দূরীকরণ হয়। আত্মস্বরূপ, দীপ্তিশীল, স্তিমিত, সমুদ্রবৎ, স্থিতচৈতন্যরূপবৎ যে ধ্যান, তাই হল সমাধি। ধ্যানের সময় নিশ্চল চিত্তে ধ্যেয়ের প্রতি মনোনিবেশ করে বায়ুহীন স্থানে অগ্নিশিখার মত স্থির মনের অধিকারী সমাধিস্থ হতে পারেন। মূলত অগ্নিপুরাণে যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধ্যান-ধারণা-সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে যোগী মুক্তিলাভ করতে পারেন তার উপায় বর্ণিত।

পাতঞ্জল যোগদর্শন মূলত প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে বিবেকজ্ঞানের অনন্তর স্বরূপে অবস্থান করে যোগাঙ্গের মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তির বর্ণনা করে। সাংখ্যের রীতি পুরুষ এবং প্রকৃতির মাঝে বিবেক করা, যোগদর্শনে ভাবনা আরও গভীর। বুদ্ধি এবং পুরুষের সম্পূর্ণ বিবেক না হওয়া পর্যন্ত দুঃখাভাব সিদ্ধ হয় না, প্রকৃতি-বৈরাগ্য হল আবশ্যক। বেদান্তদর্শনে স্বতন্ত্রভাবে যোগকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উৎপাদক বলে স্বীকার করেন না। তবে যোগকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারও করতে পারেনা। তাই আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনরূপে নির্দেশ করা হয়েছে- শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং সমাধিকে। যে সাধনের সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন যোগ। অগ্নিপুরাণে যোগের নির্দেশ হয়েছে সংসারের তাপমোচনার্থ। বেদান্তমতের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য রেখেই এখানেও জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে অভেদে যোগাঙ্গের নির্দেশ। প্রকৃতি এবং পুরুষাতিরিক্ত

পরমেশ্বরের নিরন্তর ধ্যান কর্তব্য। "প্রধানং পুরুষাতীতং স্থিতং পদ্মস্থমীশ্বরম্।। ধ্যায়েজ্জপেচ্চ সততমোঙ্কারং পরমক্ষরম্"। (অগ্নিপুরাণ, ২৫-২৬)

তথ্যসূত্র:

- ঝা, সুরকান্ত, ২০২৩, অগ্নিমহাপুরাণম্, বারাণসী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, পৃষ্ঠা নং- ১১৯৬-১২০৮।
- তর্করত্ন, পঞ্চানন, ১৯৯৯, অগ্নিপুরাণম্, কোলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা নং- ৭৪৭-৭৫৮।
- পাল, বিপদভঞ্জন, ১৪২২, বেদান্তসারঃ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা নং- ৬০-২৬২।
- শ্রীবাস্তব, সুরেশচন্দ্র, ২০১৫, পাতঞ্জলযোগদর্শনম্, বারাণসী, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, পৃষ্ঠা নং- ১-১৫৫।

জেলখানার নাটক রক্তকরবী

মহুয়া খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রচলিত নাট্যধারা বা নাট্য ঐতিহ্যের বাঁক বদলের পথিকৃত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য সৃষ্টির পাশাপাশি নাটকের তত্ত্বেও সংযোজিত করলেন এক নতুন পরিভাষা তা হল সত্যমূলক নাটক। রবীন্দ্রনাথের এমনই এক সত্যমূলক নাটক 'রক্তকরবী' যা বহুলচর্চিত। এই নাটকটিকে এবং সত্যমূলক তত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংশোধনাগারগুলিতে। মকররাজের যক্ষপুরীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধরা পড়েছে সংশোধনাগারের অন্তঃপুরের দৃশ্যগুলি। সোনা খোদাইকর এবং সংশোধনাগারের আবাসিকরা কখন যেন এক হয়ে গেছে। সাধারণ পাঠক পাঠিকার কাছে 'রক্তকরবী'র কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবীর দ্বন্দ্ব, মানবসভ্যতার সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার দ্বন্দ্বের মতো গূঢ় তত্ত্বগুলি অত্যন্ত কঠিনরূপে প্রতিভাত; সেই তত্ত্বের ধার কাছেও না গিয়ে কেবল কাহিনি ও সংলাপের ওপর ভিত্তি করে সংশোধনাগারের আবাসিকদের মধ্যে রক্তকরবী নাটকের সুর তাল লয় ও প্রেমের স্পর্শ এবং মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছেন সংশোধনাগারের নাট্যচর্চায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্দেশকগণ। যদিও এই মুক্তি বন্দিদশা থেকে মুক্তি নয়, এই মুক্তি মনের সর্বাঙ্গীণ কলুষতা থেকে মুক্তি। 'রক্তকরবী' নাটকটি কখন যে চার দেওয়ালে বন্দি থাকা মানুষগুলোর মনের অর্গল ছিন্ন করে জেলখানার নাটক হয়ে উঠেছে তা সম্পূর্ণ প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।
সূচক শব্দ: রক্তকরবী, সত্যমূলক নাটক, মনের মুক্তি, অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা, জেলখানার নাটক।

মূল আলোচনা:

পশ্চিমবঙ্গের চারটি সংশোধনাগারে অভিনয়ের জন্য 'রক্তকরবী' নাটকটিকে নির্বাচন করা হয়। বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, হাওড়া জেলা সংশোধনাগার, দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ও কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নাটকটি বহু স্থানে বহু নাট্যগোষ্ঠী বহুবার মঞ্চস্থ করেছে কিন্তু সেইভাবে জনপ্রিয়তা কোনো দলই পায়নি। এরকম একটি জটিল নাটক যা মঞ্চ সফল হতে প্রায় প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছে সেই নাটকটি সংশোধনাগারের আবাসিকদের জন্য কেন নির্বাচন করা হল? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য নাটকের গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী সৃষ্টি 'রক্তকরবী' (১৯২৩) একটি দৃশ্য সম্বলিত তত্ত্বনাটক। যেখানে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবীর দ্বন্দ্বই মুখ্যভাবে প্রতীয়মান। নাটকের স্থান যক্ষপুরী, সেখানে খোদাইকররা সোনা তোলার কাজে ব্যস্ত। এই যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ নিজেকে জালের আড়ালে রেখেছেন। যক্ষপুরীর ছন্দহীন জীবনে প্রাণের সুর নিয়ে হঠাৎই আগমন ঘটে নন্দিনীর। নন্দিনী ও কিশোরের কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে নাটকের সূচনা হয়। রক্তকরবীর ফুল নন্দিনীর কাঙ্ক্ষিত, কিশোর বহু খুঁজে তা এনে দিয়েছে নন্দিনীকে এবং এর পরবর্তী সময়েও এই দায়িত্ব তার ওপরেই অর্পিত হয়। অধ্যাপকের উপস্থিতি ও সংলাপে নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি

প্রস্ফুটিত হয়। নন্দিনী তাকে চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়, তারা মরা ধনের সাধনা করে, তারা নিরেট নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ; এই মরা ধনের শক্তি যেমন প্রবল, তাদের রাজার ক্ষমতাও তেমন প্রচুর। কিন্তু নন্দিনীকে অধ্যাপকের ভালো লাগে, একটি রক্তকরবীর ফুল দাবী করলে নন্দিনী রঞ্জনের আগমনের খুশিতে একটি ফুল অধ্যাপককে দেয় এবং জানায় রঞ্জনের আগমনে যক্ষপুরীর মরা পাঁজরে প্রাণ দেখা যাবে। এরপর নানা চরিত্রের আগমনে ও সংলাপের ঘনঘটায় নাটকের কাহিনি এবং যক্ষপুরীর ভিতরের রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোকুলের মনে হয়েছে নন্দিনী ভয়ংকরী ও সর্বনাশী। এছাড়া তার ধারণা দিনশেষে কোনো বিপদ নিশ্চয় ঘনিয়ে আসবে। নাটকের রাজা জালের আড়াল থেকেই নন্দিনীর ডাকে সাড়া দেয়, নন্দিনী রাজার কাছে যেতে চায়, রাজাকে ফসল কাটার মাঠের সরল আনন্দের গান শোনাতে চায়। রাজার সময় নেই কথা বলার তবু নন্দিনীর সাহচর্য যেন অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয় রাজার চিত্তে। রাজা তাকে পেতে চায় হাতের মুঠোয়, নন্দিনী একান্তভাবে রঞ্জনের, জেনে ঈর্ষা হয় তার। রাজার হৃদয়বিদারক বক্তব্যে স্তম্ভিত হয় নন্দিনী —

> "আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি- তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।"[১]

রঞ্জন আজ আসবেই সেই খবরকে আরো দীপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে নন্দিনী বিদায় নেয়। এরপরেই নাটকের একটি অন্য অধ্যায় দেখানো হয় যেখানে রয়েছে খোদাইকর ফাগুলাল ও তার স্ত্রী চন্দ্রা। ধ্বজাপূজোর ছুটির দিনে ফাগুলাল মদ খেয়ে মাতাল হতে চায় কিন্তু চন্দ্রা তাতে নারাজ। বিশুপাগলের আগমনে মুখরিত হয় পরিবেশ। চন্দ্রা জানায় বিশুকে নন্দিনীতে পেয়েছে এবং নিজের স্বামীকে নিয়েও তার এই ভয়। এই প্রসঙ্গে বিশু বলে—

> "এক দিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক, তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে, ছুটি ছুটি।"[২]

কিন্তু এখানকার মানুষ কাজ থেকে অবসর পায় না, পায় না ছুটি। দেশে ফেরার ইচ্ছা তাদের মরে গেছে। বিশু প্রথমে যক্ষপুরীর রাজার চর হিসেবে নিযুক্ত হয়, এখন সেও খোদাইকর। চন্দ্রা, বিশু ও ফাগুলালকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে চায় কিন্তু ফেরার উপায় নেই। সর্দারকে চন্দ্রা দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সর্দার জানায় কী পরিমানে আরামে রাখা হয়েছে তাদের, এমনকি ভালো ভালো কথা শোনানোর জন্য কেনারাম গোঁসাইকেও আনানো হয়েছে। গোঁসাই তাদের অন্ধভাবে কাজ করতে ও 'হরি হরি' বলতে উপদেশ দেয়। ফাগুলাল তার ভণ্ডামির প্রতিবাদ করলে সর্দার নিজেই তাদের শেখানোর ভার নেয়—গোঁসাই শুধু ট,ঠ,ন পাড়ায় ও করাতী পাড়ায় শেখাবে। সর্দারনীদের ধ্বজাপূজোর ভোজে যাওয়ার দৃশ্য দেখে চন্দ্রা ও ফাগুলাল বিদায় নেয়। বিশুর মুখোমুখি হয় নন্দিনী। বিশু তাকে গান শোনায়। বিশুর কাছে নন্দিনী 'দুখ জাগানিয়া'। নন্দিনী বিশুকেও যক্ষপুরী থেকে মুক্ত করতে চায়, নন্দিনীর মধ্যে বিশু আলো খুঁজে পায়। রাজা সম্পর্কে সে বিশুকে জানায় রাজা মানুষ কিন্তু প্রকাণ্ড। সর্দারের উপস্থিতি এবং বাক্যবানে প্রকাশিত হয় রঞ্জনের আগমন বার্তা, শুনে খুশি হয়ে নন্দিনী সর্দারকে একটা কুন্দ ফুলের মালা দেয়। এরপর বিশুকে সঙ্গে নিয়েই নন্দিনী রাজার কাছে যায়। তাদের কথপোকথনে রাজার মনের দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে। রাজার হাতের মরা ব্যাঙ, ব্যাঙটি রাজাকে কী করে টিকে থাকতে হয়

তার শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় সে শিক্ষা রাজা পায়নি। নন্দিনীকে ফলের রসের মতো দলবার ও তার চুলের মধ্যে হাত রেখে ঘুমানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে রাজা। নিজের বিছানায় নীলকণ্ঠ পাখির পালকের উপস্থিতি নন্দিনীর মনে রঞ্জনের আগমন ধ্বনিকে আরো দীপ্ত করে।

এরপরের অংশ সর্দার ও মোড়লকে নিয়ে বিস্তৃত। রঞ্জনের যক্ষপুরীতে প্রবেশের বিরুদ্ধে সে, কিন্তু তার সর্ব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। রঞ্জনের দল ভারি হয়ে উঠেছে, মেজো সর্দার রঞ্জনের দলে যোগ দিয়েছে। অধ্যাপক তার বস্তুবিদ্যার জ্ঞানে রাজাকে খুশি করতে পারছে না, তাই পুরাণ কথা শোনানোর জন্য পুরাণবাগীশকে নিয়ে আসা হয়। এইভাবে শ্লথ গতিতে যখন নাট্যকাহিনি এগিয়ে চলেছে তখন দ্রুত বেগে নন্দিনীর প্রবেশ ঘটে। একদল জীর্ণ লোক যাদের 'রাজার এঁটো' বলে সম্বোধন করেছে সর্দার, তাদের দেখে নন্দিনী তাদের দুর্গতির কথা জানতে চায়, কিছু চেনা মুখ অনুপ, উপমন্যু, শকলু, কঙ্কু যারা চিনতে পারে না তাদের ঈশানী পাড়ার নন্দিনীকে। এই কঠিন দৃশ্যে ব্যথিত হয় সে, জগৎ বিখ্যাত পালোয়ান গজ্জুর দুর্দশায় তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। অন্যদিকে বিশুকে হাত বেঁধে বিচারশালায় নিয়ে যাওয়া হয়, চাবুক মারা হয়, বিশু নির্ভীক। কিশোর কাজ কামাই করে রঞ্জনের খোঁজে গেছে বলে তার পিছনে ডালকুত্তা লেলিয়ে দেওয়া হয়। নাট্য ঘটনায় আসে চাঞ্চল্য। চিকিৎসক এসে জানায় অন্য রাজ্য বা নিজের প্রজাদের সঙ্গে রাজার বিবাদ আসন্ন। সর্দার এই আসন্ন বিরোধের জন্য প্রস্তুত। নন্দিনী সকলের সামনে গোঁসাইয়ের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেয়—

> "তোমাদের ঐ ধ্বজাদণ্ডের দেবতা, সে কোনোদিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে? মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।"[৩]

বিশুর অবস্থার জন্য চন্দ্রা নন্দিনীকে দায়ী করে। গোকুল আর চন্দ্রা রাগে ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতি খারাপ আচরণ ও কটু ভাষা প্রয়োগ করে। ফাগুলাল কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে এনে বন্দিশালা চুরমার করে ভেঙে ফেলার পরামর্শ দেয়। এইভাবে পরিস্থিতি যখন চরম সীমায় পোঁছে যায় তখন নন্দিনী ক্রুদ্ধ, ক্ষুদ্ধ, ব্যকুল হয়ে রাজার কাজে ছুটে যায়, অস্থির হয়ে দরজা খুলে দিতে বলে। ঘটনাধারা চরম মুহূর্তে পৌঁছায়, নন্দিনীর বারংবার আহ্ববানে রাজা দরজা খুলতে বাধ্য হয়, দুয়ার উন্মোচিত হতেই দেখতে পায় শায়িত রঞ্জনের মৃতদেহ। কিন্তু রঞ্জন তো মরতে পারে না, তাই তো নন্দিনী বলেছে মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেয়েছে, রঞ্জন বেঁচে উঠবে—

> "বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চুড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি..."[৪]

কিশোরকেও রাজা মেরে ফেলেছে, রাজা অহংকারী, দাম্ভিক তার নিজের ভিতরের দ্বন্দ্ব এই পরিণতির জন্য দায়ী। নন্দিনী রাজাকে লড়াইয়ে আহ্ববান করে, সমস্ত ঘটনার পরিণতি স্বরূপ রাজাও তার উত্তরে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা জানায়, বলে—

> "আজ আমাকে তোমার সাথি করো, নন্দিন!...আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছো না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা। আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক—তাতেই আমার মুক্তি।"[৫]

ফাগুলাল বন্দিশালা ভেঙে বিশুকে উদ্ধার করতে চায়, রাজা জানায় তিনিও আজ ভাঙার দলে। রাজার বিপক্ষে এখন সর্দার। দলবল নিয়ে সর্দার আসছে জেনে ফাগুলাল নন্দিনীকে নিরাপদ স্থানে যেতে বলে কিন্তু নির্ভীক নন্দিনী নিজের বুকের রক্তে সর্দারের বর্শার ফলককে রাঙিয়ে দিতে চায়। নন্দিনী ছুটে যায় সবার আগে। অধ্যাপকও এগিয়ে এসে রাজার পথ ধরে, ফাগুলাল তার কারণ জানতে চাইলে, সে জানায়—

> "কে যে বললে, রাজা এতদিন পড়ে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে—পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।"[৬]

কারিগররা সবাই বন্দিশালা ভেঙে ফেলে, বিশু বেরিয়ে নন্দিনীকে খোঁজে। ফাগুলাল জানায় ধুলোয় লুটোচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। তারা নন্দিনীর জয়গান করে, দূরে শোনা যায় ফসল কাটার গান 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয়।' নাট্য ঘটনা এই পর্যন্ত। নাটকটির পটভূমিকা বিচার করতে গিয়ে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—

> "পশ্চিমের বস্তুসর্বস্ব জড়বাদ যান্ত্রিক শাসন ও সভ্যতা এবং লুব্ধ বহু সংগ্রহী ধনতন্ত্রবাদ 'রক্তকরবী'র পটভূমিকা...রক্তকরবীতে জোর দেওয়া হইয়াছে ইহাদের বহুগ্রাসী উৎকট সংগ্রহশীল ধনতন্ত্রবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপর।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন—

> "আমার নাটক ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতলা খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়—মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"[৮]

পাশাপাশি নাটকের সূচনা অংশে তিনি নাটকটিকে 'সত্যমূলক' আখ্যা দিয়েছেন। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী 'রক্তকরবী' নাটককে 'তত্ত্বমূলক' নাটকের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের রূপক ব্যাখ্যা করে রক্তকরবীর মধ্যে যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব আছে সে কথারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে 'রক্তকরবী'কে অবশ্যই রূপকের আড়ালে বেড়ে ওঠা সাংকেতিক নাটক বলা যায়। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনিকে বাস্তব বলে মনে হলেও যার প্রতিটি পরতে রয়েছে সংকেত। চরিত্র থেকে শুরু করে সংলাপ সবটাই প্রতীকের দ্বারা আবিষ্ট। সাধারণ পাঠকের কাছে এটাই 'রক্তকরবী' কিন্তু সংশোধনাগারের আবাসিকদের কাছেও কী এইভাবে 'রক্তকরবী' প্রতিফলিত হয়েছে? হয়তো না। কারণ এত জটিলতা তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সংশোধনাগারের আবাসিকদের কাছে 'রক্তকরবী' —

যক্ষপুরীর সোনা খোদাইকরদের জীবনে কোনো প্রাণ নেই, তারা জড়পদার্থের মতো। মকররাজ ও সর্দারদের শাসন অনুশাসনে আবদ্ধ, আটক রয়েছে নিয়মের বেড়াজালে। তাদের বাইরে

যাওয়ার হুকুম নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা ওই একই কাজে ব্যস্ত। সংশোধনাগারের আবাসিকদের জীবনটাও এইভাবেই অতিবাহিত হয়। প্রশাসনের নিয়মের বাইরে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা কিছুই করতে পারেন না। যক্ষপুরীর অধিবাসীদের নামকরণ করা হয়েছে ৪৭ফ, ৬৯ঙ। বিশুর মুখেই—

> "আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক্। বুকের ওপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।"[৯]

সংশোধনাগারের আবাসিকদের ও সংখ্যা দ্বারা গুনতি করা হয়, একবার না বহুবার। ধ্বজাপূজা, অস্ত্রপূজা প্রভৃতি উৎসবের দিনগুলি পালন করা হয় যেমন যক্ষপুরীর অধিবাসীদের আনন্দ দান করার জন্য, মনে স্ফূর্তি আনায়নোর জন্য তেমনি সংশোধনাগারের আবাসিকরা খেলাধূলা ও পালাপার্বণ পালনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করেন। নাটকের এই অংশগুলোর সঙ্গে আবাসিকরা নিজেদের অন্বয় সাধন করতে পারবেন। তাই হয়তো পরিচালক প্রদীপ ভট্টাচার্যকে আবাসিকরা প্রশ্ন করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ কি জেলে ছিলেন? তা না হলে জেলের ভিতরের জীবন সম্পর্কে তিনি এত কিছু জানলেন কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ যে সর্বত্র রয়েছেন তারা হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। যক্ষপুরীর অধিবাসীদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবনের মিল পেলেও নন্দিনীর আবির্ভাব তাদের কাছে কীরূপে প্রকাশ পাবে? বস্তুত নন্দিনী হল প্রাণ, সৌন্দর্য এবং প্রেমের প্রতীক। এই ত্রিধারা জেল বন্দিদের জীবনে একেবারেই প্রবাহিত হওয়ার অবকাশ পায় না। তাই নন্দিনীর রূপ নিয়ে 'নাটক' তাদের জীবনের ওই অপূর্ণতার কিছুটা হলেও পূরণ করতে আসে। যক্ষপুরীর প্রাণহীন জগতে নন্দিনীর আবির্ভাবে যেমন প্রাণ এসেছিল, আনন্দ এসেছিল, এসেছিল সৌন্দর্য; নাটক বা সাংস্কৃতিক চর্চাও সংশোধনাগারের আবাসিকদের প্রাণহীন একঘেয়ে জীবনে আনন্দ ও প্রাণের ছোঁয়া লাগায়। তাদের একাকীত্ব, যন্ত্রণাময় বদ্ধ জীবনে প্রাণের সাড়া জাগায় নন্দিনী। সেই কারণেই নন্দিনীকে তারা উপলব্ধি করতে পারেন। সৌন্দর্যকে তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হন, কঠিন পরিবেশেও কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় সেই মন্ত্র দেয় নন্দিনী। আর নন্দিনীর মধ্যে থাকা এই প্রাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের বস্তুনিরপেক্ষ ভাবটি রক্তকরবী ফুলের সংকেতে ব্যক্ত। তাই তারা পারেন রক্তকরবী ফুলের মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে। কিশোর এবং রঞ্জন যথাক্রমে কৈশোর এবং যৌবনের প্রতীক। অনেকেই দীর্ঘদিন সংশোধনাগারের চারদেওয়ালে আবদ্ধ রয়েছেন, তারা উপলব্ধি করতে পারেন কীভাবে তারা তাদের যৌবনকে নষ্ট করেছেন, জীবনের মূল্যবান সময়কে ভুলের বশে শেষ করে ফেলেছেন। ঠিক যক্ষপুরীর রাজার মতো, রাজা যেমন বলে—

> "আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।"[১০]

সুতরাং এই বিষয়টা স্পষ্ট যে সংশোধনাগারের আবাসিকরা সকলেই স্বয়ং মকররাজ। তারা যেমন গারদের আড়ালে বন্দি, মকররাজও নিজেকে জালের আড়ালে বন্দি করে রেখেছে। এই রাজার যেমন ভালো খারাপ দুটি সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে তেমনি সংশোধনাগারের আবাসিকদেরও এই দুই সত্তার দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছে, কেবল পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে তাদের খারাপ সত্তাই বহিঃপ্রকাশিত হয়েছে। যার শাস্তি স্বরূপ তারা বন্দি দীর্ঘদিন যাবত। কেবল শারীরিক ভাবে নয় মানসিক দিক দিয়েও তারা বন্দি। মানসিক বন্দিদশা থেকে নন্দিনী তাদের মুক্ত করে। যেমন ভাবে রাজার ভিতরের দ্বন্দ্ব লাঘব করে ভালো সত্তাকে বাইরে আনা এবং তার মনের মুক্তি ঘটানোর কাজটাই করেছিল নন্দিনী। নন্দিনীর ডাকে কারিগররা যে বন্দিশালা ভেঙে

দিয়েছিল সেটির আক্ষরিক অর্থ যাই থাকুক না কেন অন্তর্নিহিত অর্থ মনের বন্দিদশা ঘুচিয়ে মনকে মুক্ত করা। এই মুক্তির ডাক দিয়েছিল নন্দিনী, সাড়া দিয়েছেন আবাসিকরা। তারা পেরেছেন তাদের মনের অন্ধকারকে দূর করে আলোর পথে যাত্রা করতে। এখানেই নন্দিনীর জয়, এখানেই রক্তকরবীর জয়, এখানেই জয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

তথ্যসূত্র:

১. ‘রক্তকরবী’, ‘রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ’ (দ্বিতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৭৬।
২. তদেব, পৃ. ৭৯।
৩. তদেব, পৃ. ১০১।
৪. তদেব, পৃ. ১০৩।
৫. তদেব, পৃ. ১০৪।
৬. তদেব, পৃ. ১০৫।
৭. ‘রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা’, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ৯ম সং, আষাঢ় ১৪২৬, পৃ. ৩০৯।
৮. ‘গ্রন্থপরিচয়’, ‘রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ’ (দ্বিতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৯৩৪।
৯. ‘রক্তকরবী’, ‘রবীন্দ্রনাট্য সংগ্রহ’ (দ্বিতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬, পৃ. ৮০।
১০. তদেব, পৃ. ১০৩।

স্বদেশী ও বয়কট : গোখলের ভাবনা

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক হোসেন সেখ
অতিথি প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নরমপন্থী নেতা তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬–১৯১৫) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন, বরং এমন একজন চিন্তাবিদ যাঁর বক্তৃতা ও লেখনী তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের অসংখ্য কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ সামগ্রীর বয়কট সম্পর্কে গোখলে অত্যন্ত সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের অন্তর্নিহিত স্বদেশ প্রেম ও অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার প্রবণতাকে স্বাগত জানালেও, বয়কটের কর্মসূচির সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, এই ধরনের বয়কট আন্দোলন সাময়িক আবেগপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে যদি যথাযথ রূপরেখা ছাড়া পরিচালিত হয়, তবে তা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও জনজীবনে অপ্রত্যাশিত ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট সংক্রান্ত বিষয়ে গোপাল কৃষ্ণ গোখলের দৃষ্টিভঙ্গির একটি সংক্ষিপ্ত ও বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপন।
সূচক শব্দ: স্বদেশী, বয়কট, উদ্যোগ, পুঁজি, বিনিয়োগ, আত্মনির্ভরতা।

মূল আলোচনা:
সংবিধান স্বীকৃত পথে আন্দোলন পরিচালনার সমর্থক গোখলে ১৯০৫ সালে ২৭-৩০ ডিসেম্বর বারাণসীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ২১তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণে অন্যান্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি তৎকালীন সময়ে সর্বাধিক চর্চিত স্বদেশী ও বয়কট নিয়েও মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও boycott resolution বিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তবে ১৯০৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি লখনউয়ে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি এই দুটি বিষয় নিয়ে আরও বিস্তারিত ও বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যা গোখলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

জাতীয় কংগ্রেসের ২১তম বার্ষিক অধিবেশনে স্বদেশী ও বয়কট বিষয়ে গোখলের অভিমত

এই অধিবেশনে বিগত কয়েক মাস ধরে কার্যত গোটা দেশ জুড়ে যে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল তা থেকে ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট সংক্রান্ত বিষয়টিকে আলাদা হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন। তাঁর মতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যে বিশেষ ফলপ্রসু হবে না তা অনুমান করতে পেরে হতাশা ও ইংরেজদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই বয়কটের মতো পদক্ষেপ শুরু করেছে। এছাড়া ইংল্যান্ডের সাধারণ নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণও এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। গোখলে মনে করতেন বয়কটের মতো পন্থা গ্রহণ পুরোপুরি রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক। এখানে বয়কট বলতে কেবল ব্রিটিশ দ্রব্যের ব্যবহার থেকে বিরত থাকাকে বলা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য দেশের দ্রব্যের ব্যবহারে কোনোও বাধা নেই, যা

স্বদেশীর বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে স্বদেশী ভাবনা তাঁর কাছে এক নিখাদ দেশপ্রেম এবং অর্থনৈতিক চেতনার সংমিশ্রণ ("The idea of Swadeshi or 'one's own country' is one of the noblest conceptions that have ever stirred the heart of humanity")। তিনি স্পষ্টতই বলেন "The devotion to motherland, which is enshrined in the highest Swadeshi, is an influence so profound and so passionate that its very thought thrills and its actual touch lifts one out of oneself. India needs today above everything else that the gospel of this devotion should be preached to high and low, to prince and to peasant, in town and in hamlet, till the service of motherland becomes with us as overmastering a passion as it is in Japan"।

ভারতের শিল্প সম্ভাবনা নিয়েও তিনি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শিল্প স্থাপনের জন্য অত্যাবশ্যক তিন উপাদান অর্থাৎ মূলধন, উদ্যোগ ও দক্ষতার অপ্রতুলতা যে ভারতের স্বদেশী আন্দোলন রূপায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বার্ষিক প্রায় ২২ মিলিয়ন স্টারলিং (sterling) মূল্যের সুতিবস্ত্র আমদানি হলেও ভারতের হাতে সস্তা শ্রম ও নিজস্ব তুলা থাকায় অদূর ভবিষ্যতে সুতি বস্ত্র শিল্পে উন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। এক সময় ভারত এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই অবস্থান হারিয়েছে।

স্বয়ং গোখলে সুতি বস্ত্র শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ বিষয়ে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ নেন (কারখানা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়াত জামসেদজি টাটার দক্ষিণ হস্ত হিসেবে পরিচিত নাগপুরের বেজানজি, সুতি বস্ত্র শিল্প বিষয়ে গবেষক বিঠলদাস দামোদরদাস এবং পার্সি বংশোদ্ভুত কংগ্রেস নেতা তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দিনশ এদুলজি ওয়াচা, তিনি গোখলের বন্ধুও ছিলেন)। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, মুক্ত বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের উচিত ভারতীয়দের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সংকল্পকে তা ত্বরান্বিত করার জন্য এ দেশেই দ্রব্য প্রস্তুত করা। ভারতে প্রচলিত হস্ত চালিত তন্তু শিল্পের বিশেষ উন্নতি সম্ভব বলে অভিমত প্রকাশ করেন, তবে সেক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতি, প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগে অত্যাবশ্যকভাবে সরকারি সুরক্ষা নীতি প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাঁর মতে, পণ্য তুলনামূলকভাবে কম খরচ হবে এমন স্থানে উৎপাদন এবং উৎপাদিত দ্রব্য সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি হওয়া মুক্ত বাণিজ্যিক বিকাশের ক্ষেত্রে কাম্য। যদি কোনো কারণে এই ভারসাম্য বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সেই বাধা দূর করার চেষ্টা প্রকৃত মুক্ত বাণিজ্যেরই অংশ।

গোখলে বিশ্লেষণ করেন, কৃষির পরে সুতি বস্ত্র শিল্প ভারতে সবচেয়ে বড় শিল্প। তৎকালীন সময়ে ভারতে ২০০টি মিল, প্রায় আড়াই লক্ষ তাঁতি এবং কোটি কোটি গজ কাপড় উৎপাদন হয়। এর এক অংশ রপ্তানি হয়, এক অংশ দেশে ব্যবহৃত হয়। হাতে চালিত তাঁত এখনো মোট উৎপাদনের একটি বড় অংশ সরবরাহ করে এবং দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে গোখলে বলেন, উন্নত মানের কাপড় উৎপাদনে বড় বাধা হলো পুঁজির অভাব ও তুলার নিম্নমান। মিলগুলো মোটা সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করে, দীর্ঘ সময় টিকে থাকার পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। প্রয়োজনে মিশর থেকে নিয়ে আসা উন্নত তুলা গাছের যে উৎপাদন সিন্ধু অঞ্চলে সফলভাবে শুরু হয়েছে তেমনভাবে অন্যান্য স্থানেও উন্নত জাতের তুলা উৎপাদনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলার ধনী ব্যক্তিদেরকে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য আহ্বান

জানান। হাতে চালিত তাঁত শিল্প কৃষকদের জীবিকা নির্বাহ হলেও আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার নিয়েও তিনি যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, যথাযথ পুঁজি, প্রযুক্তি ও সরকারি সহায়তা পেলে দেশীয় শিল্প বিদেশি কাপড়ের বিকল্প হতে পারে। এর ফলে দেশের অর্থনীতি ও সমাজ উভয়ই উপকৃত হবে।

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে Boycott Resolution প্রসঙ্গে গোখলে

তিনি বলেন এই দেশের সাধারণ জনগণ সচরাচর প্রশাসনিক বিষয়ে উদাসীন হলেও বাংলা বিভাজনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্ট বয়কট আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী এবং তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার জনমানসে সঞ্চারিত আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল এই কংগ্রেস নেতা বিশেষভাবে সতর্ক করেন। যেহেতু এটি বাংলা কেন্দ্রিক বিষয়, তাই বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যদি এ আন্দোলন সংগঠিত হয়, তবে তা কংগ্রেসের আন্দোলন হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা না করার আহ্বান জানান, আন্দোলন হলে তা হবে স্বতন্ত্র।

১৯০৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারিতে লখনউ শহরে জনসভায় স্বদেশী ও বয়কট প্রসঙ্গে গোখলে

স্বদেশী সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় এই বক্তব্য অনেক বেশি পরিণত ছিল, কারণ তখন স্বদেশী ভাবধারা তথা আন্দোলনের প্রায় দুই বছর ধরে বাস্তব রূপ দেখেছেন। এই জনসভায় তিনি ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়া স্বদেশী আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন।তাঁর বক্তৃতায় স্বদেশী আন্দোলনকে নিছক শিল্পক্ষেত্রের উদ্যোগ হিসেবে দেখা হয়নি, বরং এটি এমন একটি আন্দোলন যার সঙ্গে সমগ্র ভারতীয়দের কল্যাণ জড়িত। স্বদেশিকতার মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি। এই ভাবধারা সমগ্র দেশবাসীকে আত্মোন্নতিতে উদ্বুদ্ধ করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। বহু আন্দোলনের স্থায়িত্ব ক্ষণস্থায়ী হলেও, স্বদেশী একটি ব্যতিক্রম হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বেশ কিছু বাধা-বিপত্তি থাকলেও, স্বদেশী ভাবধারা তৎকালীন সময়ে শিল্প বিকাশের মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে।

তৎকালীন ভারতে শিল্পের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের প্রাধান্য বিষয়ে বলতে গিয়ে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে অপর বিশিষ্ট নেতা তথা একদা বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি প্রয়াত মহাদেব গোবিন্দ রানাডের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্মরণ করে তিনি মন্তব্য করেন, শিল্প ক্ষেত্রে কে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তার থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রাধান্য সামগ্রিকভাবে অধিক দৃশ্যমান ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। বিশেষত দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করে এমন বিদেশের শিল্প গোষ্ঠীর দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ অবচেতনভাবে হলেও পরোক্ষে অন্যের কর্তৃত্বকে মেনে নিচ্ছে। তিনি সতর্ক করে বলেন ভারতীয়দের উচিত এটা ভুলে না যাওয়ার যে তারা বিদেশি শক্তির অধীনে আছে। তবে ব্রিটিশ শাসনে ভারত শিক্ষা, প্রশাসন ব্যবস্থা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে উপকৃত হলেও সেগুলোতে ভারতীয়দের বিশেষ অংশগ্রহণ না থাকায় ভারতের জাতীয় চরিত্রের পক্ষে তা খুব একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। দেরিতে হলেও মানুষ এর নেতিবাচক দিক সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরেছে, যা খুবই ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে বলেই তিনি আশাবাদী ছিলেন। তা সত্ত্বেও, গোখলে আশা প্রকাশ করেন যে বিলম্বে হলেও ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, যা ভবিষ্যতের জন্য এক ইতিবাচক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে।

তাঁর অভিমত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনভার ভারতীয় শিল্প ও অর্থনীতিতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে, এবং এর নেতিবাচক প্রভাবসমূহ ইতিবাচক দিকগুলির তুলনায় বহুগুণ বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। গোখলে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ব্রিটিশ আগমনের পূর্বেই ভারত অর্থনৈতিকভাবে সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ ছিল। যদিও প্রত্যক্ষ পরিসংখ্যান বা পরিমাপ সেই সময়ে অনুপস্থিত ছিল, তথাপি বিভিন্ন ভ্রমণকারীর বিবরণে ভারতের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, তখনও ভারতের বৃহৎ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত, কিন্তু কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি, উর্বর ভূমি, পরিশ্রমী জনগণ ও মিতব্যয়ী জীবনযাত্রা ভারতের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

গোখলের দৃষ্টিতে, শিল্পবিপ্লব পূর্ব ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যিক সক্ষমতা পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না, বেশ কিছু ক্ষেত্রে তা অগ্রসরও ছিল। মসলিনের মতো বিশ্বখ্যাত ভারতীয় পণ্যের উৎকর্ষতা এ দাবির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। তিনি বলেন, পূর্বতন শাসকেরা এদেশেই বংশপরম্পরায় বসবাস করতেন এবং ফলে দেশের সম্পদ বাইরে চলে যেত না, যা অর্থনীতির সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে এই অবস্থার ব্যাপক বদল ঘটায় দেশ ক্রমে দরিদ্র হয়ে ওঠে। গোখলে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতিকে ভারতের শিল্প বিধ্বংসী পরিস্থিতির জন্য সরাসরি দায়ী করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, ব্রিটিশরা ভারতকে কেবলমাত্র তাদের কলকারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে, যার ফলে দেশীয় শিল্প সম্ভাবনার মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যদিও এই নীতির প্রয়োগ অন্যান্য উপনিবেশ, যেমন আমেরিকা ও আয়ারল্যান্ডেও দেখা গিয়েছে, তথাপি গোখলের মতে ভারত এই নীতির ফলে সর্বাধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

গোখলের মতে, ভারতের অর্থনৈতিক অবনতির দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয় যখন ইংল্যান্ড জোরপূর্বক বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্য চালু করে। ইংল্যান্ড নিজে সুদীর্ঘকাল যাবত সংরক্ষণনীতির মাধ্যমে তার শিল্পব্যবস্থা গড়ে তোলে, এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে তখন মুক্ত বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করে, যাতে বিশ্ববাজারে রপ্তানি সহজ হয় এবং উৎপাদন খরচ কমে, কিন্তু ভারতের মতো একটি যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিহীন দেশে এই নীতির প্রয়োগ ছিল ধ্বংসাত্মক। ভারতীয় পণ্য মূলত হাতে তৈরি, দক্ষতা এবং উদ্যোগের অভাব হেতু এদেশ পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। ফলে হঠাৎ বিদেশি প্রতিযোগিতায় পড়ে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক কারণেই জনগণ ক্রমাগত কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তিনি আশাবাদী ছিলেন সরকার যদি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের পুনরুজীবন ও নতুন শিল্প গড়ে তুলতে সহায়তা করত, তাহলে ক্ষতি কিছুটা হলেও লাঘব করা যেত।

তিনি জার্মান অর্থনীতিবিদ ফ্রিডরিখ লিস্টের (Friedrick List) কথা উল্লেখ করেন, যিনি বলেছিলেন যখন হাতে তৈরি পণ্য যন্ত্রনির্মিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়ে ধ্বংস হয়, তখন রাষ্ট্রের কর্তব্য হয় নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য সুরক্ষা দেওয়া। আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানি এভাবে নিজেদের শিল্পবিকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু ইংল্যান্ড ভারতের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত নীতি গ্রহণ করে। বিদেশি পণ্যের আমদানি সহজ করে এবং দেশটিকে উৎপাদকের পরিবর্তে মূলত ভোক্তা হিসেবে গড়ে তোলে। ভারতের রপ্তানির ৭০ শতাংশ কাঁচামাল, যা বিদেশে প্রক্রিয়াজাত হয়ে দামি প্রস্তুতপণ্যে পরিণত হয়ে ফিরে আসে। তাঁর মতে, এই শিল্পহীনতা ও কৃষিনির্ভরতার সঙ্গে রাজনৈতিক পরাধীনতা মিলিত হয়ে এক অসহনীয় অবস্থা তৈরি করেছে।

বছরে ভারতে ১০০ কোটির পণ্য আমদানি হয় এবং ১৫০ কোটির পণ্য রপ্তানি হলেও, উন্নতি না হয়ে অর্থনৈতিক নিঃস্বতা ও পরনির্ভরতার জন্ম হয়েছে।

গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে "রক্তক্ষরণ" বলে আখ্যা দেন (এ প্রসঙ্গে রক্তক্ষরণ বা Bleeding শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন লর্ড স্যালিসবারি)। গোখলে বলেন, প্রতিবছর ভারত থেকে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার সম্পদ রপ্তানি হয়, অথচ মাত্র ১০০ কোটির মতো পণ্য আমদানি। ব্রিটিশ সরকারের নীতির জন্য ভারতের বার্ষিক ক্ষতি থাকে ৩০-৪০ কোটি টাকা। গোখলে এই রক্তক্ষরণের প্রধান দুটি কারণ দেখান: ১. রাজনৈতিক শোষণ(বার্ষিক গড়ে প্রায় ২০ কোটি টাকা): ব্রিটিশ সরকারের 'হোম চার্জেস' (স্বদেশী আন্দোলনকালীন বার্ষিক ১৮ মিলিয়ন স্টার্লিং বা ২৭ কোটি টাকার দৃষ্টান্তও আছে), ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের আয়, সেনাবাহিনীর খরচ ও প্রভাবশালী অন্যান্য ব্রিটিশদের জন্যও, ২. শিল্পে ব্রিটিশ আধিপত্য (প্রায় ১০ কোটি টাকা): ভারতের শিল্প ও বাজারে ব্রিটেনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। তিনি বলেন, যদিও রেলপথ ও কিছু শিল্পে ইংরেজরা বিনিয়োগ করেছে এবং মুনাফা লাভ করার অধিকার রাখে, কিন্তু সব কিছু হিসাব করে দেখলে এখনো প্রতিবছর অন্তত ৩০ কোটি টাকার ক্ষতি ভারতের। তাঁর মতে, এই অর্থনৈতিক দুর্দশার মূল কারণ ভারতের পরাধীনতা। যদি এই রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়, তবে ভারতের পক্ষে সত্যিকারের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়।

প্রতিবছর ভারত থেকে ব্রিটেনে বিপুল সম্পদ নিষ্কাশিত হওয়াকে গোখলে এক গভীর অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করেন। তিনি সতর্ক করেন যে, কয়েকটি নতুন শিল্প প্রকল্পের সহজে বিশেষ পরিবর্তন আশা করা অনর্থক হবে, কারণ লক্ষ্য বৃহত্তর। তাঁর মতে, এই নিষ্কাশন কমাতে হলে সরকারি কাজে আরও ভারতীয় নিয়োগ ও দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে। তবে, রাতারাতি বিশেষ পরিবর্তন আসবে না বলেই তিনি মনে করেন। তাঁর আশঙ্কা, শিল্পে আত্মনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব হলেও সমস্যার একটা বড় অংশ রয়ে যাবে। গোখলে ভারতের কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং জনগণ ও সরকারের সহায়ক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যা দেশের উন্নতির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

গোখলে মন্তব্য করেন, ভারতের জনগণের প্রায় ৬৫ শতাংশ (লর্ড কার্জনের সময় জনগণনা অনুযায়ী ৮০ শতাংশ) কৃষিনির্ভর হলেও ভারতের মাটি ক্রমাগত অনুর্বর হয়ে যাওয়া এক গভীর চিন্তার বিষয়। গোখলে বিশ্বাস করেন যে, কৃষি উন্নতির জন্য পুরনো পদ্ধতিগুলি পরিত্যাগ করতে হবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা কৃষকদের অধিকাংশই অল্প জমির মালিক, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই এখনো পুরনো পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। তদুপরি, সাধারণ মানুষের মধ্যে কৃষি সম্পর্কিত আধুনিক জ্ঞানের অভাবও একটি বড়ো বাধা। তথাপি, গোখলে তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন বিদেশে কৃষি শিক্ষা গ্রহণ করে, উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির ব্যবহার শিখে দেশে ফিরে এসে কৃষি সংস্কারে উদ্যোগী হন। যদিও সরকার কিছুটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তবে প্রকৃত পরিবর্তন তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উদ্যোগের মাধ্যমে সম্ভব হবে।

গোখলে ভারতের বস্ত্র শিল্পের তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করেন, যেখানে দেশের প্রয়োজনীয় এক চতুর্থাংশ কাপড় তৈরি হয়, এবং অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ আমদানি করতে হয়। তিনি ভারতের তুলনায় ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলের বিশাল পুঁজি বিনিয়োগের কথা উল্লেখ

করে বলেন, দশ বছরে ভারতে বস্ত্র পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ৪০ থেকে ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। যদিও ভারতীয় হস্ত শিল্পের কিছু সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যন্ত্রচালিত উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেশের অধিক উন্নত তুলা উৎপাদনের পক্ষে মতামত দেন এবং এও উল্লেখ করেন মিশরীয় তুলার সাথে ভারতীয় তুলার সংকর জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ হয়েছে।

গোখলে বলেন, এক সময় ভারত চিনি রপ্তানি করত, কিন্তু বর্তমানে চিনি আমদানির পরিমাণ প্রায় বছর প্রতি প্রায় সাত কোটি টাকার। বিদেশি সরকারগুলো তাদের উৎপাদকদের ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদন খরচ কমানোর দিকে ঝুঁকলেও এদেশের বিশেষ উন্নতি নেই বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উৎপাদনে সরকারি উৎসাহ পেলে ভারতও খুব শীঘ্রই চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সক্ষম হবে বলে তিনি অভিমত জানান।

ভারত তৎকালীন সময়ে লবণ, ছাতা, দেশলাই, কাগজ ইত্যাদির উৎপাদন শুরু হলেও পর্যাপ্ত না হওয়ায় ভারতকে মূলত আমদানি নির্ভর থাকতে হচ্ছিল, কিন্তু এইসব শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ ভারতেও ছিল বলে তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন ভারত তৎকালীন বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ (ইংল্যান্ড ধনীতম)। তিনি মনে করেন, কেবল বিদেশি পণ্য বর্জন করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। ভারতের মাথাপিছু উৎপাদন অত্যন্ত কম (ভারতের তুলনায় ইংল্যান্ডের প্রায় ২০ থেকে ৩০ গুন অধিক), ক্রয়ক্ষমতা এবং আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিমা দেশের তুলনায় বিপদজনকভাবে নিম্ন স্তরে রয়েছে। তিনি বলেন "The deposits in English banks are about 1,200 crores of rupees for a population of about 4 crores. We are 30 crores and our deposits are only 50 crores for the whole of India, and these deposits include also the amount held by European merchants and traders in the country"। তিনি চিহ্নিত করেন চারটি মূল কাঠামোগত বাধা: প্রথমত, বিশ্ব শিল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ে ভারতীয়দের ব্যাপক অজ্ঞতা; দ্বিতীয়ত, সীমিত ও ঝুঁকিপূর্ণ মূলধন; তৃতীয়ত, অপর্যাপ্ত বিজ্ঞানসম্মত ও কারিগরি শিক্ষা; এবং চতুর্থত, দেশীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক অসুবিধা।

গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মানুষকে স্বদেশী আন্দোলন সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানান, বিশেষ করে দেশীয় পণ্যগুলি যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে তাই জনগণ এসব দ্রব্য ব্যবহার ও প্রচার করার মাধ্যমে স্বদেশী ভাবনাকে সার্থক করে তুলুক। তিনি বলছেন, সাধারণ নাগরিকরা, যারা ধন-সম্পদ বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানে অতিরিক্ত সমৃদ্ধ নয়, তারা স্থানীয় শিল্পকে রক্ষা করতে বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ স্বীকার করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। গোখলে সহনশীলতা, ঐক্য এবং সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন, সংকীর্ণ বা বিভাজনমূলক মনোভাবের বিপক্ষে দেশবাসীকে সতর্ক করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গে বিদেশি পণ্য বয়কটের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্পষ্ট করেন যে, অধিকাংশ সমর্থক আসলে স্বদেশী পণ্যকে বিদেশি পণ্যের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলছেন। তিনি বয়কট শব্দটির ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেন, কারণ এটি একটি নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ তা তৎকালীন শিল্প পরিস্থিতিতে এটি বাস্তবসম্মত নয়। তাই তিনি শুধুমাত্র স্বদেশী পণ্য প্রচারের উপর মনোযোগ দিতে পরামর্শ দেন।

গোখলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, সামনে দীর্ঘ ও কঠিন পথ অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রাথমিক সফলতা হবে ধীর গতির এবং সীমিত, তবে তিনি অবিচলিত থাকার এবং দৃঢ়

বিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, শিল্প ও রাজনীতি দুটি সমস্যা একে অপরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত, এবং ভারত বর্তমানে ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, নিষ্ঠা ও ত্যাগ দিয়ে ভারত এই বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে সমর্থ হবে।

উপসংহার: স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের ফলাফল হিসেবে গোপাল কৃষ্ণ গোখল ভারতকে আত্মনির্ভর দেশ হিসেবে দেখার জন্য আশাবাদী ছিলেন। তিনি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব স্বীকার করলেও মনে করতেন, একটি স্থায়ী ও ফলপ্রসূ স্বদেশী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন সতর্ক চিন্তাভাবনা ও পদক্ষেপ। তিনি বয়কটের চরমপন্থার চেয়ে শিক্ষার প্রসার, যুক্তিসঙ্গত আলোচনা এবং ধাপে ধাপে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাস্তববাদী ব্যাখায় বিশ্বাসী এই নেতা ব্রিটিশ শাসনের কাঠামোর মধ্যেই ধীরে ধীরে সংস্কারের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার পক্ষে ছিলেন। তাঁর এই সংযত ও চিন্তাশীল মতবাদ কেবল তাঁর রাজনৈতিক শিষ্য মহাত্মা গান্ধী নন, বহু স্বদেশপ্রেমীর চিন্তাধারার অন্যতম পাথেয়।

তথ্যসূত্র :

১. Karve, DG and Ambekar, DV(ed.), Speeches and Writings of Gopal Krishna Gokhale, Vol ii, London: Asia Publishing House, 1966

২. Kibriya, M. Gandhi and Indian Freedom Struggle, APH Publishing Corporation: New Delhi, 1999

৩. Malik, SK & Tomar, A (ed), Revisiting Modern Indian Thought: Themes and Perspectives, Part II, 11, Gopal Krishna Gokhale (by Abha Chauhan Khimta), Oxon and New York: Routledge, 2022

৪. Sharma, JN, Encyclopedia of Eminent Thinkers - Gopal Krishna Gokhale, Concept Publishing Company: New Delhi, 2010

৫. Speeches of Gopal Krishna Gokhale, second edition. Madras: G.A. Natesan & Co., 1916

৬. Talwalkar, G. Gopal Krishna Gokhale: His Life and Times, New Delhi, 2006

৭. The Swadeshi movement, a symposium: Views of representative Indians and Anglo-Indians, Second edition. Madras: G.A. Natesan & Co.

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘পশ্চিমের ডায়েরি’ : সমাজ-গবেষকের ইউরোপ-দর্শন

মো: রাজা মেহেদী আলি সরদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পশ্চিমের দিনলিপি' প্রকাশিত হয়। তিনি এটি উৎসর্গ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। 'পশ্চিমের দিনলিপি'-তে তিনি ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ ১৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। এই গ্রন্থে ইউরোপীয় সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা বিচিত্র দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। সুনীতকুমারের গন্তব্য ছিল লন্ডন। জুলাই ১৯৩৫-এ, তিনি লন্ডন ও সেপ্টেম্বর মাসে রোমে অনুষ্ঠিত দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ‘অর্থ তত্ত্ব’ ও ‘প্রাচ্যতত্ত্ব’ বিষয়ে পরপর বক্তৃতা দেন। তিনি এই সম্মেলনগুলিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রায় ১৩ বছর আগে তিনি জার্মানি ও ইতালি সফর করেছিলেন, কিন্তু তখনও ভিয়েনা, বুদাপেস্ট, প্রাগ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেননি। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার পাশাপাশি ভ্রমণ করাও সুনীতিকুমারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।
সূচক শব্দ: ভ্রমন, জাহাজ, উড়োজাহাজ, ইউরোপ, বার্লিন, লন্ডন, বম্বে।

মূল আলোচনা:
যাত্রা শুরু বোম্বাই হয়ে। দীর্ঘ যাত্রাপথে সুনীতিকুমারকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে স্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী-পুত্র, কন্যারা। লোকজনের ভিড়ে স্টেশনে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। সকলেই প্রিয়জনের জন্য আকুল, কেউ রুমাল নাড়ছেন— এমন সময় চলতে শুরু করল ট্রেন। সেই ট্রেন যেন স্টেশন নামক আলোকিত গুহার ভিতর থেকে অজগরের মতো ফোঁস-ফোঁস করতে করতে, গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে এল। সেটা ১৯৩৫ সাল। তার ১৩ বছর আগে, ১৯২২ সালে প্রথমবার পশ্চিমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন সুনীতিকুমার। মধ্যবর্তী এই সময়ে বিপুল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে ইউরোপ। সুনীতিকুমারবাবু যাত্রার সেই প্রসঙ্গ টেনে শুরুতেই জানিয়েছেন অমোঘ কথাটি—

> “তখন যে আশা-আকাঙ্ক্ষা যে উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিলুম, এখনও তার অনেকটা আছে, কিন্তু জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে, দৃষ্টি-কোণও কোনও-কোনও বিষয়ে কতকটা ব'দলে গিয়েছে। ইউরোপে নানা রকমের উপদ্রব উলট-পালট চ'লেছে, তার দু-একটা জনশ্রুতি খবরের-কাগজে আমাদের কাছে পৌছায়। সত্য-সত্য কি ঘ'টছে তা সেখানে থেকে না দেখলে বুঝতে পারা যাবে না; ...”[১]

পশ্চিমের যাত্রী ১৩৪২ সালের ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ও ১৩৪২-১৩৪৪ সালের (১৯৩৭) ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩৪৫ অর্থাৎ, ১৯৩৮ সালে ‘গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স’ ‘পশ্চিমের যাত্রী’ পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। ‘সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান’ অনুসারে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) প্রথমবার উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন যান ১৯২১ সালে। এক বছর পর দেশে ফেরেন। নিবিড় পর্যবেক্ষণের সঙ্গে বিবরণ— এটাই সুনীতিকুমারের

ভ্রমণের প্রধাণ গুণ। ‘পশ্চিমের ডায়েরি’র কাহিনির শুরুতে জানিয়েছেন মানুষ কেমন অপ্রতিহত ভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। রসিক, পণ্ডিতদের সঙ্গ-সাহচর্য, মিউজিয়ম, আর্ট-গ্যালারি, সংগ্রহশালা ছাড়াও জীবনের প্রবহমান স্রোত বুঝতে চাওয়া থেকেও সুনীতিকুমারের এই ভ্রমণ।

সুনীতিবাবু বোম্বাই থেকে জাহাজে করে গিয়েছিলেন ভেনিসে। সে সময় দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিটের দাম ছিল পঁচিশ পাউন্ড- তিনশো বিয়াল্লিশ টাকা। ওই জাহাজের প্রথম শ্রেণিতে কমলা নেহরু ও তাঁর চিকিৎসক। তিনি চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন। আর ছিলেন ধনকুবের ঘনশ্যাম দাস বিড়লা। পশ্চিমের যাত্রীতে লেখক যেসব দেশের কথা বলেছেন সেগুলি হল ইতালির ভেনিস, তারপর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা, হাঙ্গেরির বুদাপেশত, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ, জার্মানির বের্লিন তারপর প্যারিস হয়ে লন্ডন। সুনীতিকুমার ভিয়েনা ও বুদাপেস্তে গিয়ে জার্মানিদের মধ্যে ইহুদি বিদ্বেষের কথা অকপটে লিখেছেন। ইহুদিদের কাছ থেকে তিনি যে নানা সাহায্য পেয়েছেন তা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি। আমরা দেখি, সুনীতিকুমারবাবু কোথাও ভাষাকে জটাজুটে আবদ্ধ করেননি। তাকে মুক্ত করে সহজ, সরল ভাষায় প্রতিটি জায়গার খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ মননের ছাপ লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে রয়েছে তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য। কবে, কখন কোথায় যাচ্ছেন— রয়েছে সেই খুঁটিনাটিও।

(২)

হাওড়া থেকে ট্রেনে বোম্বাই চলেছেন সুনীতিকুমার। সকালে ট্রেন পৌঁছল রায়গড় স্টেশনে। তখন সকালবেলা। উঠেছে সোনালি রোদ্দুর। ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে সুনীতিকুমারবাবুর মনে হয় তিনি যেন অতীত কোনও সভ্যতার মাঝে এসে পড়েছেন। শহুরে' সভ্যতা যেন তখনও জন্মায়নি। জগৎকে তরুণ বলে মনে হয় তাঁর। কোল জাতিভুক্ত এই এলাকার ছবি এমনভাবে তিনি চিত্ররূপময় করেছেন—

> ‘‘এই যুবকটাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে' গেল--তার চেহারায় এমন সুন্দর একটা চিত্রের সৃষ্টি ক'রেছিল, যে কি আর বলবো! চমৎকার সুঠাম চেহারা, যেন কালো পাথরে কোঁদা; কোমরে লাল রঙের একখানা কাপড়, হাঁটুর অনেকখানি উপরে কাপড়ের শেষ; অজন্তার রাজপুত্রের আর রাজার কোমরে যে কাপড আঁকা আছে, তারই মত বহরের; কোনও কোল-গাঁয়ে তাঁতে হিন্দু তাঁতী বা মুসলমান জোলা, অথবা কোনও কোল মেয়ে, হাতে-কাটা সুতোয় এই মোটা খাদি কাপড় বুনেছে। সুগঠিত পায়ের পেশী, পায়ের দাবনার পেশ-গুলিও সুপুষ্ট, সুপরিস্ফুট; দুই কালো রঙের পায়ের মাঝ দিয়ে কোমরের লাল কাপড়ের একটা ভাগ একটুখানি কোঁচার মতন ঝুলছে হাঁটু পর্যন্ত; মাথা উঁচু ক'রে যুবক দাঁড়িয়ে, দুই হাতে দুই কাঁসার বালা, তাতে তার গায়ের চমৎকার কালো রঙ আরও ফুটে উঠেছে; ডান হাতে একটা লাঠি, গলায় কতকগুলা রঙীন পুঁতির মালা, কাঁধে একখানা কালো হ'লদে আর অন্য রঙে রঙীন চাদর বা গামছার মতন, মুখের ভাব সরলতা মাখানো; মাথায় বাবরী চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে নেমেছে।’’[২]

সরল, সুন্দর বেশে থাকা কোল যুবকের সঙ্গে পশ্চিমে' ঠিকেদারের তুলনা করে লিখেছেন, যুবকটি কত না সুন্দর। তার চেহারায় রয়েছে আদিযুগের সমস্ত রোমান্স। যে কোল জাতির দ্বারা ভারতীয় জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি আর ভারতীয় সভ্যতার পত্তন হয়েছিল, সেই আদিম

জাতির মূর্তিমান্ প্রতীক বলে মনে হয় জনৈক কোল যুবককে। ট্রেন ছাড়তেই মিলিয়ে যায়, লেখকের চোখের সামনে থেকে চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে যায় প্রাচীন যুগের সেই ছবি। কিন্তু বর্ণনার গুণে তা হয়ে ওঠে চিরকালীন।

কাহিনির মাঝে মাঝে সুনীতিকুমার কোথাও সমাজ গবেষক। তাঁর চোখে পড়ে, কলকাতার মতো বোম্বাইয়েও মেয়ের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশি। একই ভাবে ঘরবাসীর চেয়ে পরবাসী লোকই বেশি। সেই ১৯৩৫ সালেই সুনীতিকুমার জানিয়েছেন তখন খাওয়ায় আর জা'ত নেই। আগে ভদ্র বাঙালি হিন্দু বাড়ির মেয়েরা, বাইরের লোকের সামনে খাওয়াটাকে অশিষ্টতা মনে করতেন। ঘরেও নিজেদের মধ্যে না হলে খেতে চাইতেন না। সেই অভ্যাসে পরিবর্তন আসছে। স্বামী বা ভাই বা cousin-এর সঙ্গে চপ-কাটলেটের দোকানে খেতে ঢুক্ছেন অনেকে। সেখানেও টেবিল সব ভরতি। সদলে দাঁড়িয়ে' অপেক্ষা করছেন, লোক উঠে গেলেই খালি টেবিল দখল করবেন বলে।

'ভেনিসের পথে' অংশে লিখেছেন সহযাত্রীদের কথা। তাঁদের জাহাজ যেন একটা ক্ষুদ্র জগৎ। সুনীতিকুমার ছিলেন সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী। নানা জাতের, রকমারি লোকের সহাবস্থান সেখানে। যেমন, ইউরোপীয়দের মধ্যে ইটালিয়ান নারী আর পুরুষ আছে, ইংরেজ, ডাচ, জর্মান, নরউইজীয়, হঙ্গেরিয়ন, ফরাসী, আমেরিকান ছাড়াও আছেন অনেক চীনের নাগরিক। আবার ভারতীয়দের মধ্যে আছেন গুজরাটী, মারহাট্টী, পাঞ্জাবী, তমিল, কানাড়ী, মালয়ালী, বাঙালী, আসামী, হিন্দুস্থানী। ফলে জাহাজে কেউ সাধারণ বৈঠকখানায় বসে। সেখানেই বসে কেউ চুরুট খায়, তাস খেলে, কিছু পান করে, গল্প-গুজব করে, চিঠি লেখে কেউবা বই পড়ে। তিনটে খোলা ডেক্। সেখানে বেড়ালেই কানে আসে নানা ভাষা। আবার কখনও কথা প্রসঙ্গেই জানিয়েছেন কেন ইংরেজদের জাহাজের চেয়ে ইতালিয় জাহাজের প্রতি বাঙালি তথা ভারতবাসীর টান বেশি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নেই। তিনি লিখেছেন—

> "ইতালীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় ব'লে একটু অহমিকা-ভাব থাকলেও, তারা প্রকৃতিতে ইংরেজদের বিপরীত; অর্থাৎ দিল্-খোলা মিশুক জাত ব'লে, তারা প্রায়ই আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে প্রস্তুত থাকে। ইংরেজ ছাড়া, জাপানী, ডচ, ইটালীয়, ফরাসী- এতগুলো জাতের যাত্রী-জাহাজ চলেছে; প্রতিযোগিতার বাজারে মানুষকে ভদ্র করে দেয়। ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে যারা হিন্দু, তাদের অনেকে নিরামিষাশী; তাই এরা ঘটা করে বাইরে প্রচার করে, নিরামিষ-ভোজীদের জন্য এদের ভালো ব্যবস্থা আছে। মোটের উপর, ইটালিয়ান লাইন ভারতবাসীদের কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠেছে ব'লে মনে হ'ল।"[৩]

চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে দ্বন্দ্বমধুর অবস্থায় থেকেছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সেই ভেদ ছাড়াও চীনের সঙ্গে ভারতীয়ের মিল ততটা হয় না, সেটা লিখেছেন সুনীতিকুমারও। তাঁর মতে, চীনের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির ঐক্য নেই। বৌদ্ধধর্মের সূত্রে যে যোগটুকু ছিল, যুগ-ধর্মের ফলে সে যোগ-সূত্র প্রায় ছিঁড়ে গিয়েছে। ভাষা, ঐতিহ্য-বোধ, বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতি আমাদের প্রতিস্পন্দন, সবই আলাদা। তবে চীনের ভাষা, মনোভাব, ঐতিহ্য বুঝে, তার সঙ্গে আলাপ করলে, বন্ধুতা তৈরি করতে পারলে তা গভীর জিনিস হয়ে উঠতে পারে বলে মনে হয়েছিল সুনীতিকুমারের। ভ্রমণ কাহিনিতেও এমন দর্শন সংস্থাপিত করতে পারেন সুনীতিকুমার।

‘ভেনিসের পথে’ অংশে জাহাজে থাকা ভারতীয় যাত্রীদের তিনটি শ্রেণির কথা বলেছেন। প্রথম শ্রেণিতে বৃদ্ধ, মাতব্বর গোছের যাঁরা বিলেত যাচ্ছেন বেড়াতে বা দেখতে, হয়তবা কোনও নতুন বিষয়ে আলোর সন্ধানে। সুনীতিকুমারের মতো আধা বয়সের কিছু মানুষ ‘বিশেষ উদ্দেশ্য’ নিয়ে চলেছেন। আর তৃতীয় শ্রেণি হল ছাত্র— যারা ডিগ্রি, ডিপ্লোমার মতো নানা পরীক্ষা দিতে চলেছে, যাঁদের উদ্দেশ্য হয়তো ‘উচ্চকোটির গবেষণা’। আবার তাঁর নজরে পরে, ইউরোপীয় মেয়েদের সঙ্গে শাড়ি পরা ভারতীয় মেয়েদের কোথাও কোথাও আলাপ, কথা হলেও লম্বা গাউন পরা চীনা মেয়েদের সঙ্গে তেমনটি হতে দেখেননি। এ ভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে খাওয়া, আবহাওয়া থেকে প্রকৃতি বহু বিচিত্র বিবরণে সমৃদ্ধ সুনীতিকুমারের ‘পশ্চিমের যাত্রী’।

সুনীতিকুমারবাবু ভিয়েনায় গিয়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করেন। সেই বিবরণ রয়েছে ‘ভিয়েনা — ফ্রয়েড-এর সঙ্গে দেখা’ অংশে। দুই পণ্ডিতের সাক্ষাৎকারটি বেশ উপভোগ্য। ফ্রয়েড তখন ৯০ অতিক্রান্ত। তাঁর কথা জড়িয়ে যায়। তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। সাক্ষাৎকারে সুনীতিকুমার জানতে চান জগতের সার বস্তুর মধ্যে অক্ষয় বস্তু কী? ফ্রয়েড জানান, শিল্প, রস, আনন্দ এ সমস্ত দেহকে আশ্রয় করে, ফলে দেহান্তে কিছুই থাকে না। এতে সুনীতিবাবুর মনে হয় ফ্রয়েড ছিলেন নিষ্কাম কর্মযোগী। সুনীতিকুমারের মতে, ফ্রয়েড আজকালকার চিন্তাধারায় যুগান্তর এনেছেন। ফ্রয়েড দর্শনের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা ‘সাইকো-এনালিটিকাল সোসাইটি’-র সভাপতি গিরীন্দ্রশেখর বসু ছিলেন সুনীতিকুমারের বন্ধুদের অন্যতম। ইউরোপ ভ্রমণের কথা শুনে এই গিরীন্দ্রকুমারই তাঁকে ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। ভিয়েনায় পৌঁছে হোটেলে উঠে ওঠেন হোটেলে। তবে 'পোর্টিয়ের' বা হোটেলের দ্বারীর কাছে ফ্রয়েডের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন শহরের ভিতরে ফ্রয়েড আর থাকেন না। তিনি বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল। তাই কারো সঙ্গে দেখাও করেন না। তবু অদম্য চেষ্টায় তিনি পৌঁছে যান ফ্রয়েডের কাছে। সুনীতিকুমার বিবরণ দিয়েছেন সেই দিনটার। তার দিকে ঝকঝকে রোদ্দুর, বাগানে রকমারি গাছের সবুজ, আর বড়ো-বড়ো ফুলের রঙের বাহার, নীল আকাশ, শোনা যাচ্ছে পাখির ডাক। প্রতি বাড়ির চারদিকে খানিকটা করে বাগান, গাছপালা। এ অঞ্চলে নতুন বসতি হচ্ছে, জমি মাঝে মাঝে খালি রয়েছে, অনেক জায়গায় নতুন বাড়ি উঠছে। এমনই এক পরিবেশে বাড়ি ফ্রয়েডের। সুনীতিকুমার লিখেছেন —

> “কামরাটীতে বড়ো-বড়ো জানালা-তা দিয়ে বাইরের সবুজ বাগান আর রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে আর সামনে জানালা, এমন একটা কোণে এক টেবিলের পাশে চেয়ারে ফ্রয়েড, ব'সে আছেন। ছবিতে চেহারা জানা ছিল, চিনতে দেরী হ'ল না। অতি শীর্ণকায় জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, মুখখানাতে স্বাস্থ্যের জলুশ নেই, ফেকাসে' বা হ'ল্দে রঙের হ'য়ে গিয়েছে; মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ একটু আছে। তিনি আমাকে দেখেই একটু দাঁড়িয়ে' হাত দিয়ে একখানা চেয়ার দেখিয়ে' দিয়ে ইংরিজিতেই ব'ললেন, "ব'সো, ঐ চেয়ারে বসো; আমার ভারতবর্ষের বন্ধুরা কেমন আছেন?”[৪]

তিনি ফ্রয়েডকে বলেন, “আমার আলোচ্য বিদ্যা অবলম্বিত ব্যবসায় হ'চ্ছে ভাষা-তত্ত্ব, ব্যসন হ'চ্ছে শিল্প কলা; আপনার প্রচারিত তত্ত্ববাদ বা অন্য দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই-বন্ধু-গোষ্ঠীতে চর্চা-কালে একটু-আধটু যা ও বিষয়ে শুনেছি।” কথা বলতে বলতে বাড়ি ঘুরে দেখেন সুনীতিকুমার। গোটা বাড়ি যেন কারুশিল্পের একটা সংগ্রহশালা। এমন শিল্পের রসিক হয়েও সুনীতিকুমারের তখন ‘শাকের ক্ষেতে কাঙাল’ কিংবা ‘বাঁশ-বনে ডোমের অবস্থা’ হয়। নানা যুগের নানা জাতির শিল্পদ্রব্য সেখানে। আছে প্রাচীন মিসরের দেবতাদের ব্রঞ্জে ঢালা

বা নরম মর্মর পাথরের বা পোড়ামাটির ছোটো-ছোটো মূর্তি। ওসিরিস্, ইসিস, হাথোর, বিড়ালমুখী প্রভৃতি দেবতা; প্রাচীন গ্রীসের নানা সম্ভার। আধুনিক পৃথিবীর নানা ছবি, শিল্পসামগ্রীর সম্ভারও বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুনীতিকুমার ভিয়েনায় থাকার সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গেও দেখা করেন। সুভাষচন্দ্র তখন চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় বাস করছিলেন। এই ভ্রমণ কাহিনি যখন প্রকাশিত হয় তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি। কিন্তু আমরা এই দেখি ভ্রমণ কাহিনিতে যুদ্ধের প্রাক আবহাওয়া হিসেবে বিদ্বেষের পূর্বাভাস দিয়ে গিয়েছেন। বের্লিন ভ্রমণের সময় তিনি হিটলারের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তখন পথে-ঘাটে দুই জার্মানের দেখা হলে তারা হাত তুলে পরস্পরের উদ্দেশে বলত 'হাইল হিটলার' অর্থাৎ 'জয় হিটলার'। সাংবাদিক, সমাজ গবেষক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, —

> "যতদূর মনে হয় এরই অনুকরণে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজে জয় হিন্দ অর্থাৎ জয় ভারত শব্দটি চালু করেন। যেটি এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীও গ্রহণ করেছে।"[৫]

(৩)

বিশ শতক বাংলা সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও সাফল্যের শতক। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি নোবেল পুরস্কার লাভে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছড়ায়। বাঙালির বিদেশ যাত্রা গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু হলেও বিশ শতকে তা প্রসার লাভ করে। বিশ শতকের প্রথম দশকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিমান আবিষ্কার করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই আকাশ যাত্রায় বিস্ময়কর অগ্রগতি আসে। অবশ্য ভারতে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল জনপ্রিয়তা লাভ করতে সময় লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিশের দশক থেকে ত্রিশের দশক পর্যন্ত বাঙালি লেখকদের যত ভ্রমণকাহিনি পাওয়া যায় তার সবগুলিই জলপথে ও ট্রেনে ভ্রমণের বিবরণ। আমরা দেখি সুনীতিকুমারবাবুও গিয়েছেন জলপথেই।

জাহাজে নিশ্চিন্ত নীরবকাশ অবসরে লেখক-লেখিকারা ভাববার, ভ্রমণ লিপিবদ্ধ করার অবকাশ পেয়েছেন। অল্প সময়ের বিমানযাত্রায় তা সম্ভব হত না। জাহাজ বা ট্রেনের মতো বিমানযাত্রায় পরিবেশ, প্রকৃতির দীর্ঘ উন্মুক্ত, রঙিন শোভা ধরা দেয় না। আবার সে কালের পুরুষপ্রধান সমাজে সাধারণত বিদেশ ভ্রমণে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। সুনীতিকুমারের ক্ষেত্রেও দেখি তাঁর পরিবার হাওড়া থেকে ট্রেনে বোম্বাই যাওয়ার পথে ট্রেনে ছাড়তে এসেছিল। যদিও তাঁর যাত্রা আক্ষরিক অর্থে ভ্রমণ ছিল না। তা মুখ্যত ছিল আন্তর্জাতিক আলোচনায় বক্তব্য রাখা। তবু সেকালে বহু শিক্ষিত নারী পৃথিবীকে দু'চোখ ভরে দেখতেন। সেই অভিজ্ঞতা লিখে গিয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯) ও প্রিয়ম্বদা দেবীর মতো অনেকে। কেউ ভারতের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন সুদূর পারস্যে, যেমন— শরৎরেণু দেবী (পারস্যে বঙ্গ রমণী, ১৯১৬) ও সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) বর্মা ভ্রমণ করেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে (১৩৪৩) প্রকাশিত হয় দুর্গাবতী ঘোষের 'পশ্চিমযাত্রী' গ্রন্থটি। এরপরেই লেখা সুনীতিকুমারের 'পশ্চিমের যাত্রী'। উভয়ের শিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি, বর্ণনা আলাদা হলেও দু'টি গ্রন্থে বাঙালি পুরুষ ও নারীর দুই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। ১৩৪৩ সালে 'পশ্চিমযাত্রী' প্রকাশিত হলে মোহিতলাল মজুমদার 'প্রবাসী' পত্রিকায় বইয়ের প্রবল প্রশংসা করেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এমন সম্পূর্ণ নতুন ভাবে এর আগে খাঁটি বাঙালি মেয়ের চোখে ইউরোপের লোকযাত্রার নানা দৃশ্য প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি।

আমরা দেখি, 'পশ্চিমের যাত্রী'র মতো 'পশ্চিমযাত্রী'ও শুরু হয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে। তার পরে ট্রেনে মুম্বই। তারপর জাহাজে করে যাত্রা। এডেন বন্দর, কায়রো হয়ে নেপলস ও জেনোয়া। সেখান থেকে মিলান। আবার টেনে করে সুইজারল্যান্ড হয়ে প্যারিস। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ডোভার লন্ডন। লন্ডন থেকে আবার প্যারিস হয়ে জার্মানির কলোন-বার্লিন হয়ে ভিয়েনা। সেখানে সুনীতিকুমারের মতো দুর্গাবতীও ফ্রয়েডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের অবশ্য দীর্ঘ বিবরণ নেই। সেখান থেকে ফ্লোরেন্স হয়ে রোম-ভেনিস। ভেনিস থেকে জাহাজ ধরে বোম্বাই হয়ে আবার কলকাতা। পাঠযোগ্য, অন্তরঙ্গ বিবরণে গ্রন্থটি বিশিষ্ট। এখানেও সুনীতিকুমারের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে ইউরোপের একটি ছবি পাওয়া যায়।

সাদামাটা ভাষায় ডায়েরির ধরনের ভ্রমণকাহিনি 'পশ্চিমযাত্রী'র পাঠককে তরতর করে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্ণনার ঘনঘটা নেই বলে যাত্রা থেকে মন সরে যায় না। আর সুনীতিকুমারবাবু তাঁর লেখায় ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। কোথাও জোর করে ভারতকে বড় বা ইউরোপীয়দের বড় প্রমাণ করতে চাননি। ছোটও নয়। তাঁর এই নিরপেক্ষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও তার শিল্পদৃষ্টি এক মুক্তমনা বিদগ্ধ পর্যটককে প্রতিষ্ঠিত করেছে আপন মহিমায়।

উল্লেখপঞ্জি:

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'পশ্চিমের যাত্রী', প্রথম সংস্করণ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, মিত্র ও ঘোষ, পৃ.১
২। ঐ, পৃ.২১
৩। ঐ, পৃ.৪৯
৪। ঐ, পৃ.৬৩
৫। ঐ, পৃ.৮৪
৬। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে মুক্তচিন্তা', প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ.১৮২)।

কথাসাহিত্যিক ওয়াহিদা খন্দকারের ‘ময়নাবিবির নাও’ উপন্যাসে বর্ণিত পিতৃহৃদয়ের আর্তনাদ : একটি পর্যালোচনা

মাসুদ আলী দেওয়ান
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
পূর্ণিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ওয়াহিদা খন্দকারের লেখা ‘ময়নাবিবির নাও’ উপন্যাসে সমাজ এবং পরিবারের দ্বারা দিকভ্রান্ত এক পিতার আর্তনাদ ফুটে উঠেছে। সালমা এবং হাসমতের মতো স্বার্থপর ও লোভী মানুষরা কিভাবে নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে অল্পবয়সী ময়নার মতো মেয়েদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে, তার এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসে। পিতা কাশিমের চোখের মণি ময়না। বারো বছর বয়সী ময়নার একমাত্র নিরাপদ জায়গা হল পিতা কাশিম, যেখানে সে অবলীলায় তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। মা মজিলা মেয়েকে ভালবাসলেও সমাজ ও পরিবারের কাছে প্রথম থেকেই নিজের বিবেক, বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে বসে। তাই সমাজ ও পরিবারের বাইরে গিয়ে তেমন করে কিছু ভাবতে পারেনা। আধুনিক মনোভাবাপন্ন কাশিম মেয়েকে পড়াশোনা করিয়া শিক্ষিত করতে চাইলে, তার সেই চাওয়ার পথে স্ত্রী মজিলা এবং মা মনোয়ারা যেন বাঁধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সাময়িকভাবে অর্থের জৌলুসের কাছে কাশিম নিজেকে সমর্পণ করে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়। পাত্রপক্ষের সুচতুর কারসাজিতে কাশিম এবং তার পরিবারের কেউ তেমন কিছু ধরতে পারে না। আসলে হাসমত আর পাত্রের মা হাজেরাবিবি যেভাবে তাদের অর্ধপাগল অসুস্থ ছেলেকে সুকৌশলে কাশিম ও তার পরিবারের সামনে তুলে ধরে, তাতে সকলের চোখে ধাঁধা লেগে যায়। অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, বিশেষ করে বাল্যবিবাহ একটা মেয়ের জীবনে কিভাবে বিপর্যয় নিয়ে আসে তার এক জীবন্ত দলিল হিসেবে আলোচ্য উপন্যাসটিকে স্মরণ করা যেতে পারে।
সূচক শব্দ দিকভ্রান্ত, বিসর্জন, চোখের মণি, ছলচাতুরী, ধাঁধা, ধর্মপ্রাণ।

মূল আলোচনা:

একবিংশ শতাব্দীর তরুণ প্রজন্মের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ওয়াহিদা খন্দকার। কাব্য চর্চার মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে আবির্ভাব হলেও কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে এক অন্য পরিচিত লাভ করেন। উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুবাদে সেই অঞ্চলের জনসাধারণকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। তাঁর প্রথম এবং সমাজ কাঁপানো উপন্যাস হলো ‘ময়নাবিবির নাও’। উপন্যাসে মুসলিম সমাজের এক বিশেষ দিক উঠে এসেছে। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কথাসাহিত্যিক ওয়াহিদা খন্দকার তাঁর উপন্যাসে নারী চরিত্রের অসহায় রূপের পাশাপাশি পিতৃ হৃদয়ের হাহাকার এক নতুন আঙ্গিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসে ব্যাক্তিজীবন, সমাজ-সংসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিজ দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীর চিরাচরিত মনোভাবের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। বারো বছর বয়সী ময়না নামক এক বালিকার জীবনের করুন ছবি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। সমাজে বাল্যবিবাহ অর্থাৎ অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়াটা যেন একটা প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। বিয়েতে ময়নার মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা ছিল না, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা সে জানাতে

পারেনা। পরিবার-পরিজনের কথাই শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়। পিতা-মাতার সিদ্ধান্তের ফল অনেক ভয়ানক আকারে ময়নার জীবনে দেখা দেয়।

পিতামাতার পঞ্চম সন্তানের মধ্যে বড় ময়না। পিতা কাশিমের আদরের মেয়ে ময়না। ময়না ছাড়া কাশিম কিছু ভাবতে পারেনা। বাল্য ময়নার চোখে কাজলের স্পষ্ট টান লক্ষ্য করা যায় কিন্তু ঘুমের ঘোরে সেই টান কোথাও যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। সন্ধ্যা এলেই চোখে ঘুম এসে হাজির হয়, রাতে খাওয়ার না খেয়েই ময়না ঘুমের দেশে পাড়ি দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ময়না ঘুমের দেশে পাড়ি দিলে পিতা কাশিম সকলের খাওয়া শেষে মেয়েকে তুলে মুখে খাওয়া গুঁজে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ময়না চোখ বন্ধ করে তা গিলে নেয়। রাতে বাবা মেয়ের এই ভাত খাওয়া দৃশ্য দেখে বাড়ির সকলের মধ্যে এক হাড় জ্বালানো পরিবেশ তৈরি হয়। বাড়ির সকলে কাশিমকে মনে করিয়ে দেয়, মেয়ে বড় হয়ে গেছে। সকলের বলা কথাকে কাশিম বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। মনে মনে ভাবে এই মেয়ে তার বড় আদরের, খোদা যেন তাকে কষ্ট না দেয়। ময়নাকে জড়িয়ে ধরে পিতা কাশিম দীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে----

"তুই মোর মা।"[১]

বাবা মেয়ের এই সরসতা যেন পৃথিবী ছাপিয়ে সাগরের ঢেউয়ের মতো ফেনিয়ে ওঠে।

কাশিম সাধু স্বভাবের খুব ধার্মিক, কথা বেশি না বললেও যা বলে তা দশ কথার এক কথা। ধার্মিক হলেও সে অন্ধ নয়, ধর্মের প্রকৃত সত্য জানে এবং মেনে চলে। ময়না স্বভাবে পিতা কাশিমের মতো, অল্প কথা বলা শান্ত শিষ্ট, দেখতে পিতার মতো কালো গায়ের রং। ময়নার চাহনি এত গভীর যে কালো হলেও তাকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়। বারো বছর বয়সী ময়না তার পরের চার ভাইবোনকে দেখে রাখা, খাওয়ানো, ঘুমানোর সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এতকিছুর মধ্যেও বাবা কাশিম ছিল ময়নার কাছে এক নিরাপদ শান্তির জায়গা। বাবা মেয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসাজস ছিল, অনেক না বলা কথা যেন একে অপরে সহজে বুঝে নিতে পারত। বড়ো মেয়ে বলে নয়, ময়নার স্বভাব গুনে কাশিম একটু বেশিই ভালোবাসতো। স্নানের আগে বাবার শরীরে তেল মাখিয়ে দেওয়া, লুঙ্গি গামছা এগিয়ে দেওয়া, স্নান শেষে পাতে খাবার বেড়ে দেওয়া, খাবার শেষে পান সেজে দেওয়া সবকিছুই ময়না তার কচি হাতে সুচারু ভাবে সম্পন্ন করত। ময়নার এমন কাজ দেখে কাশিম মনে একটা আলাদা ভালো লাগার তৃপ্তি অনুভব করে। বাবার মতো করে তাকে এই সংসারে আর অন্য কেউ এমন করে কখনো বুঝতে পারবে না তা ময়না মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

গ্রামের মক্তবে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে পড়তে যায়। মৌলবি সাহেব খুব যত্ন সহকারে পড়ান। ময়না কথায় কথায় ছড়া কাটতে পারে, যা দেখে কাশিম বিশ্বাস করে মেয়ে তার খুব মেধাবী। সে চায় মেয়ে মক্তবে গিয়ে কিছু শিখুক। স্ত্রী মজিলাকে উদ্দেশ্য করে কাশিম বলে, গ্রামের মৌলবির কাছে গিয়ে ময়না আরবি ফার্সি শিখে এলে খুব ভালো হয়। আর এই কথা শুনা মাত্রই নানি (ঠাকুমা) তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে -

> "কী করেছেন বাপু, উলা ছাড়ো বেহা দিব হবি, জই ঢুঁড়ো। গাঁওটাত ওর ওজনের আর কেউ নাই বেহা হবার।"[২]

কাশিম আর কিছু বলতে পারেনা, মনকে নানা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। আর এখান থেকেই ময়নার পড়ার সব প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে। কাশিমের একমাত্র বোন সালমা। মোল্লাপাড়ার হাসমতের সাথে সালমা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে

হাসমত ভালো না হলেও আর্থিক দিক থেকে অনেক স্বচ্ছল। হাসমতের মধ্যে লোভ লালসা সর্বদা বিরাজমান।

হাসমত আর সালমা কাশিমদের বাড়িতে এসে সকলের সামনে ময়নার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। ছেলের নাম সোবহান। জোরদার পরিবারের একমাত্র সন্তান। বাড়িতে ঝি চাকরে ভর্তি কিছু করতে হবে না, ময়না খুব সুখে থাকবে। আর বড়ো কথা পাত্র সোবহানের মা হাজেরাবিবি সালমার শাশুড়ির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এত কিছু শোনার পরেও মেয়ের বিয়ের জন্য কাশিম মনের দিক থেকে তেমন কোন সাড়া দেয় না। কাশিমের দিক থেকে কোন রকম সাড়া না পেয়ে সালমা কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠে -

> "তোরা ভুলি যায়েননান যে হামার ময়নাক চট করি সবাহে পছন্দ করিবানে। আর যদি বয়স বাড়ে, দেখতে শুনতে খারাপ হই যাবে, তখন আরোও কেহ পছন্দ করিবানে। আর ভালো ঘর বার বার আসে না, মুই কহিদিনু।"[৩]

বোনের মুখ থেকে মেয়ের সম্পর্কে এমন তির্যক কথা শোনার পর সেদিন রাতে কাশিমের আর ঘুম আসে না। মাটির ঘরের ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু কোথাও আলোর ছিটেফোঁটাও দেখতে পায় না। বাড়ি যাওয়ার আগে সালমা নানাভাবে কাশিম আর মজিলাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, ময়নার জন্য এমন ভালো ঘর আর পাওয়া যাবে না। আর সর্বশেষ কথা সে ময়নার পিসি, কোনমতেই ময়নার খারাপ চায় না বা হতে দিতে পারে না। রাতে খাওয়ার পর নিদ্রার আয়োজন করার ফাঁকে মজিলা স্বামী কাশিমকে মেয়ের বিয়ের জন্য পুনরায় ভাবার বিষয়ে কথা বলতে গেলে কাশিম রেগে লাল হয়ে যায়। কাশিম স্ত্রী মজিলাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, দুই বছর পরে মেয়ের বিয়ের বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করবেন, ভালো চাষাবাদ করে মেয়ের বিয়ের আয়োজন করবেন। স্বামীর এহেন কথা মজিলা কোনমতেই সহ্য করতে পারে না, উচ্চস্বরে বলে ওঠেন -

> "ইলা তোরা কী করেছেন, বেটি বড়ো হই গিছে দেখা পায়েননা? বড়ো বাড়িকার ফাতেমা ময়নার থাকি ছোটো, বেহা হই গেল। এর থাকি দেরি হইলে আর বেহা হবি? মানুষ কী কহিবি?"[৪]

মজিলার কণ্ঠে বলা মানুষ কি বলবে, এমত কথা শুনে কাশিম আরো রাগান্বিত হয়ে বলেন, সে মানুষের খায় না, অথেব মানুষের ধার সে ধারে না। কাশিম কিছুতেই মেয়ের বিয়ের বিষয়ে ভাবতে পারে না, তার ভাবনায় মেয়ে ছোটো, এমতো অবস্থায় মেয়ে কোন মতেই স্বামী সংসার করতে পারবে না। মেয়ে যে তার বড়ো আদরের। যেদিন থেকে ময়নার বিয়ের প্রসঙ্গ বাড়িতে উঠেছে, সেদিন থেকে কাশিমের মধ্যে একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে। অন্যরকম ব্যবহার শুরু করেছে। হঠাৎ সেদিন দুপুরে হাটে গিয়ে মেয়ে ময়নার জন্য ফ্রক কিনে এনেছেন। ফ্রক আনা দেখে মজিলা স্বামীর উপর রাগান্বিত গলায় সেই ফ্রক আনার কারণ জানতে চাইলে কাশিম মেয়েকে ডেকে ফ্রক পড়িয়ে মজিলার উদ্দেশ্যে বলে ওঠে -

> "দেখ মজিলা বেটি হামার কত ছোটো আছে।"[৫]

কথাটা শুনেই মজিলা ফ্রক কিনে আনার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। মজিলা স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, ময়নার এখন আর ফ্রক পড়ার বয়স নেই। ফ্রক আনা তার ঠিক হয়নি। ময়নার বিয়ের প্রসঙ্গ যেন কাশিমের কাছে পৃথিবীর একমাত্র দুঃখের কারণে পরিণত হয়। রাতে কোন মতেই যেন তার ঘুম আসতে চায় না, রাত গভীর হয়ে আসে, কালো ছায়া কাশিমের চারিদিকে ঘুরতে শুরু করে। কাশিম অসহায় বোধ করতে লাগে। বাড়ির প্রাণ প্রতিমা অন্যের

হাতে চলে যাচ্ছে। অন্যভাবে অন্যের হাতে মেয়ে ময়না সেজে উঠবে একথা ভাবতে গিয়ে কাশিমের ভেতরটা উষ্ণ হয়ে ওঠে, তার প্রাণ পাখি যেন ছটফট করতে লাগে।

অবশেষে পরিবার ও সমাজের চাপে কাশিম মেয়ের বিয়ের বিষয়ে শর্তসাপেক্ষে সম্মতি প্রকাশ করে। কাশিমের কথা, সে আগে মেয়েকে দেখাবে না, আগে পাত্রকে দেখে তার বিষয়ে খোঁজখবর নিবে। কাশিমের কথায় মা মনোয়ারা মনঃক্ষুন্ন হয়, তার ভাবনায় আসে মেয়ের বাবার এত অহংকার থাকা ভালো নয়। ব্যাঙ্গের সুরে মনোয়ারা বলে ওঠে -

> "তোর বেটির মেলায় ঘর! তোর বেটিও বেজায় পসন। বিনা আলোয় ভাত খাচে।"[৬]

মায়ের মুখ থেকে মেয়ের সম্পর্কে এহেন বিদ্রুপমূলক কথা শুনে কাশিম খুব চটে যায়। মনোয়ারা সুযোগ পেলেই ময়নার শরীরের রং নিয়ে দু'চার কথা শুনিয়ে দেয়। এমত কথা এর আগেও কাশিমের কানে এসেছে। কিন্তু মা বলে কিছু বলতে পারেনি। নানা বাকবিতন্ডার পর কাশিম ময়নাকে দেখার জন্য পাত্রপক্ষকে আসার অনুমতি দেয়। হাসমত দিনক্ষণ ঠিক করে সালমার হাত দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেয়। সকাল সকাল সালমা চলে আসে, প্রথমে আসবেনা ভেবে পড়ে বাবার বাড়ির লোকজন কোন ভুল করে বসে, পাছে লোক নিন্দে করে বসে তাই আসা। গোবর জল আর লাল মাটির রঙে সারা বাড়ি সেজে উঠে। বাড়ির এমন আয়োজন দেখে ময়নার আজ বেশ অসহায় বোধ লাগতে শুরু করে। প্রথমবার পাত্রপক্ষ তাকে দেখতে আসছে, পছন্দ হলে এই মাসেই তার বিয়ে হয়ে যাবে। ময়না এখনো তেমন ভাবে নিজেকে বুঝতে শেখেনি। নিজের বাড়ি, মা ও ভাইবোনকে এখনো ঠিকমতো চিনতে শেখেনি। ময়নার ভাবনায় উঁকি মারে, এ কারণে হয়তো সকলেই বলে থাকে, বাবার বাড়ি মেয়েদের আসল বাড়ি নয়। দুধ দাঁত পড়ে গেলেও শরীরের কৈশোর এখনো ফিসফিস করে কথা বলে। দিনের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত ময়না বাবাকে একবারও দেখতে পায়নি, বাবার চোখের নিবিড় ছায়া দেখার জন্য ময়নার হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। ময়নাকে আজ বড় নিরাশ্রয় লাগে। সালমা এক হাত ঘোমটা টেনে ময়নাকে পাত্রপক্ষের সামনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ময়নার মনে যে ঝড় বইছে তা লক্ষ্য করার কারও সময় নেই। কেঁদে ফেলে ময়না। ময়নাকে নিয়ে হাজির করে পাত্রপক্ষের সামনে।

প্রায় এক সপ্তাহ পর একদিন পড়ন্ত বিকেলে মোল্লাপাড়া থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে সালমা এসে জানায়, পাত্রপক্ষ তাদের সম্মতি জানিয়েছে। সফিউদ্দিন, রফিউদ্দিন, নজিবুদ্দিন চাচা আর সঙ্গে বাড়ির একমাত্র জামাই হাসমত যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। পাত্রের বাড়িঘর, হাল নাঙলের প্রাচুর্য দেখে সকলের চোখে যেন ধাঁধা লেগে যায়, আর এই ধাঁধা চোখে যা হয় আসল বিষয়টায় সকলের অগোচরে থেকে যায়। আলোর পিছনে থাকে অনেক বাস্তব কপটতা। জৌলুসের অন্তরালে পাত্রের মধ্যে থাকা ত্রুটিগুলোকে ছল-চাতুরির দ্বারা লুকিয়ে রাখা হয়। নজিবুউদ্দিন বনেদি মানুষ, খাঁটি সোনার চেনার মানুষ। এমন জহুরী চেনা চোখ দিয়ে দেখা নজিবুদ্দিনের পাত্রকে বেশ পছন্দ হয়। পাত্র দেখতে ভারী সুন্দর, তবে পাত্র সামান্য বোকা। যদিও তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। এত সম্পত্তি যার তার বেশি চালাক বা বুদ্ধিমান হয়ে বিশেষ কাজ নেই। অতএব সকলের সমবেত আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেখানে ময়নার বিয়ে দেওয়া হবে। হাসমত বেশ খুশি, তার স্বার্থসিদ্ধি হতে চলেছে। কার্তিক মাসের ১৪ তারিখে ময়নার বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। পাত্রের মধ্যে থাকা বোকা স্বভাবের কথা শুনে কাশিম বিশেষ পাত্তা দেয় না। পরিবারের সকলে ভেবে দেখে, ময়না কালো হওয়ার শর্তেও পাত্রপক্ষ বিশেষ

কোন আপত্তি করেনি। সেদিক থেকে দেখলে তাদের আপত্তির কারণ থাকা উচিত নয়। বাড়ির সকলে ময়নার জন্য এমন সম্বন্ধ করিয়ে দেওয়ার জন্য হাসমতকে সাময়িকভাবে ফেরেস্তা ভাবতে শুরু করে। কিন্তু হাসমতের মধ্যে থাকা লোভ আর লালসার খবর কেউ জানতে পারেনা।

কাশিমের মনে হঠাৎ করে নতুন জামাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। জামাইকে আলাদা করে কাছে আসতে বা কথা বলতে সে কখনো দেখেনি। তাই বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠে, একটা চাপ অনুভব করে। কাশিম মনে মনে ভাবতে থাকে, জামাই আদো ঠিক আছে কিনা! এইসব আকাশ-পাতাল ভাবতে গিয়ে কোনমতে স্নান সেরে নতুন জামা কাপড় পরিধান করে মুখে কিছু না দিয়েই বোন সালমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। প্রায় এক ঘন্টা পায়ে হাঁটা পথে কাশিম মোল্লাপাড়া সালমাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। কাশিমের চোখে মুখে ফুটে ওঠা উদ্বিগ্নের ছাপ দেখে সালমা সাময়িকভাবে ঘাবড়ে যায়। কাশিম কোনোরকম ভনিতা ছাড়ায় বলে দেয়, সে পাত্র সোবহানকে একবার নিজের চোখে সরাসরি দেখতে চায়। নানা ভাবে সালমা আর হাসমত কাসিমকে বোঝানোর চেষ্টা করে, তারা ছেলেকে দেখেছে, তার দেখার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না। ময়নার হবু শ্বশুরবাড়ি থেকে হাসমত দর কষাকষি করে নগদ ১০০ টাকা আদায় করেছে, পাগল ছেলের সাথে ময়নার বিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কাশিম কোনমতেই নিজের মনকে শান্ত করতে পারে না, সে পাত্রকে দেখার বিষয়ে অনড় থাকে। কাশিম একগুয়ে হয়ে উঠেছে, তাকে আর কোনমতে শান্ত করা সম্ভব নয়। তাই আর কথা না বাড়িয়ে থমথমে মুখে হাসমত কাসিমকে নিয়ে পাত্রের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। হাজেরাবিবি ছেলেকে সাজিয়ে গুছিয়ে অল্প আলোতে প্রায় আঁধার ঘরে যেভাবে উপস্থাপন করেছিল, তাতে কাশিম বিশেষ কিছু লক্ষ্য করতে না পারলেও মনে কিছুটা শান্তি পায়। তবে এও বুঝতে পারে এই ছেলের থেকে আরও ভালো ছেলে কাশিম মেয়ের জন্য পেতেন। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। শুভ কাজে বাধা পরলে আল্লাহ নারাজ হন। আর এই বিয়ে ভেঙে গেলে ময়নার অন্য জায়গায় বিয়ে হতে অসুবিধা হবে। তাছাড়া হাজেরাবিবির দামি গয়না, দামী শাড়ি দেখে পিতার কাশিমের চোখে ভেসে ওঠে ময়নার দামী রূপ। বাড়ির চারিদিকে সাজানো দামি দামি আসবাবপত্র, চার পাঁচটা ঝি-চাকরে ভরা বাড়ি গমগম করছে। ময়না এসব সুখের অধিকারী হবে একথা ভাবতে গিয়েই কাশিমের মনে আহ্লাদের বন্যা বইতে শুরু করে। কাশিমের চোখে সেদিন অর্থের ভেলকি লেগে যায়, যার ফলে আসলকে চিনতে সক্ষম হয় না। বিয়ে ভাঙা দূরের কথা জমিদারি সুস্বাদু খাওয়ার খেয়ে হাজেরাবিবিকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্য মাপ চেয়ে কাশিম সে যাত্রায় বিদায় নেয়।

বিয়ের দিন ভোর থেকেই রান্না শুরু হয়। দুপুরের খাওয়ার ব্যস্ততা আর ভিড়ের মধ্যে বরযাত্রী এসে হাজির হলে চারিদিকে শোরগোল পড়ে যায়। মুখে রুমাল দিয়ে নতুন বর গাড়ি থেকে নামলে চারদিক থেকে বিপুল সংখ্যক বরযাত্রী বরকে ঘিরে ধরে, যাতে আর কেউ দেখতে না পায়। কথায় বলে বাতাসেরও কান আছে, চারিদিক থেকে শব্দ আসতে শুরু করে বর 'আজলা পাগলা'। হাসমতের কানে সেকথা আসতেই সে নানাভাবে চেষ্টা করে যথাশীঘ্র বিয়ের কাজ শেষ করার। পাত্রপক্ষের তাড়ায় আর হাসমতের কৌশলে যথাসময়ে হাজরাবিবির অর্ধ পাগল ছেলের সঙ্গে ময়নার বিয়ে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু বাতাসে ওঠা কথা আর কিছুতেই থামেনা, দ্রুত গতিতে সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে যেতে লাগলো। আর এরই মধ্যে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায়, খেতে বসে বর অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি করে হঠাৎ কাঁপতে শুরু করে। মুখ থেকে লালা

গড়াতে গড়াতে অবশিষ্ট খাওয়ার মুখ থেকে বের হয়ে আসে। এরই মধ্যে খবর পেয়ে কাশিম ছুটে আসে, কি করবে আর কি বলবে তা বুঝতে না পেরে রক্ত শূন্য ঠোঁটে কাঁপতে শুরু করে। দিনের আলোয় নতুন জামাইয়ের অসুস্থ অবস্থা দেখে কাশিম স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কাশিম বুঝতে পারে এই ছেলে সম্পূর্ণ অসুস্থ। কান্নার শব্দে বাড়ি মুখরিত হয়ে উঠে, এই কান্না কন্যা বিদায়ের কান্না নাকি অস্বাভাবিক ছেলের হাতে ঘরের আদরের মেয়েকে বিসর্জন দেওয়ার কান্না তা আর বোঝার অপেক্ষায় রাখেনা। কাশিম দিকশূন্য হয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে বলে ওঠে -

> "আব্বা মুই বেটি পাঠাম না। ওরা হামাক ঠকেইছে। হামাক না কহি অসুখালা ব্যাটাক দি বেহা দিছে। মুই বেটি পাঠাম না।"[৭]

কাশিম আর কাউকে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। সে কোনমতেই মেয়েকে পাঠাতে রাজি হয় না। পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে যাওয়ার আগেই সালমা এগিয়ে এসে কাশিমকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। সালমার কথা কাশিম কোনমতে সহ্য করতে না পেরে -

> "শয়তান্নি মাগী, তুই মোর বেটিটাক নষ্ট কলু!"[৮]

বলে এই গলা ধাক্কা দিয়ে বসে, তারপর চুলের খোপা ধরে পিঠে দু-চারটা কিল বসিয়ে দেয়। লোকমুখে হাসমতের কাছে স্ত্রীকে মারার খবর পৌঁছাতেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে চলে আসে। হাসমত বলে, সকলেই আগে পাত্রকে দেখে এসেছে, কাশিম নিজে গিয়েও দেখে এসেছে। আজ এমন কথা বলার কোন যুক্তি আছে বলে তার মনে হয় না। ঘটনাস্থলে থাকা দু'একজন মুরুব্বী এগিয়ে এসে কাশিমের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে -

> "কাশেম ব্যাটা বেটিক পাঠেই দে। আগে যাউক, দেখুক কিনচে। না মরি ভূত হইলে হবি।"[৯]

বরযাত্রীরা তাড়া দিতে শুরু করে, তারা আর বিশেষ দেরী করতে চায় না। বাইরে তাদের গরুর গাড়ি তৈরি আছে। সন্ধ্যার আগেই তাদের পৌঁছানো দরকার। ময়নাকে নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হতেই পুনরায় পুরো বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। আগে থেকে গুনগুন করে কাঁদতে থাকা ময়না এবার তার কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কাশিম এবার ভেঙে পড়ে, এর আগে রাগে আগুন হয়ে থাকার ফলে কান্না তেমনভাবে আসেনি। এবার সেই রাগ কান্নার রূপ নেয়। কাশিমের কান্নায় আক্ষেপের সুর মিশে গিয়ে দূর থেকে ময়নাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে-

> "তোকে মুই পানিতে ফেলেই দিনু বেটি, মোক মাপ করি দিস।"[১০]

পরিচিত সমাজ ধীরে ধীরে কাশিমের কাছে যেন অপরিচিত হয়ে ওঠে। অর্থের জৌলুসের কাছে কাশিম দিকভ্রান্ত হয়ে প্রাণপ্রিয় মেয়েকে হারিয়ে ফেলে। ময়নাকে অতল সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। পাত্রপক্ষের সুচতুর কারসাজি কাছে কাশিম অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে বসে। কন্যার জন্য মনের মধ্যে নানা স্মৃতি জেগে ওঠে। এতটা সময় জুড়ে সবকিছুই যেন কল দেওয়া পুতুলের মতো চলে আসছিল। কন্যার প্রতি পিতার আর্তনাদ যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কাশিমের বুকে পুনরায় ভিটেমাটি ছাড়ার এক আশ্চর্য কান্নার প্রকাশ ঘটতে চাইলেও তা সে বহু কষ্টে সংবরণ করে রাখে।

তথ্যসূত্র:

খন্দকার ওয়াহিদা, জানুয়ারি ২০২৩, 'ময়নাবিবির নাও', কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স।

১। তদেব, পৃষ্ঠা ২০

২। তদেব, পৃষ্ঠা ২৪

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৩
৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৯
৭। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৫
৮। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৬
৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৬
১০। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৭।

দন্ত্য-ন, মূর্ধন্য পাড়ায় ৪৭-এর ফ এবং ৬৯-এর ঙ : রবীন্দ্র প্রতিবাদ (মানব সম্পদ ও একবিংশ শতাব্দী)

বুদ্ধদেব সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সভ্যতার আদি কাল থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল মানব-সম্পদ। সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর করে যার ওপরে বা যুগের নিরিখে প্রগতিশীলতার দ্যোতক এই সম্পদই। সেই যুগের শিরেই শ্বাশ্বত মুকুট শোভিত হয়েছে, যে যুগে এই সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। আগামী শতাব্দীতেও তা কার্যকরী। মানব-সম্পদের অবমূল্যায়নের ফল সভ্যতার কালো ইতিহাস রচনা, যা কখনই কাম্য নয়। চাননি রবীন্দ্রনাথও, তার ছাপ পাওয়া যায় তাঁর রচনাগুলিতে। মানুষ কখনই একটা সংখ্যা হতে পারে না, হলে মানবতার অপমান। শুধুমাত্র কায়িক পরিশ্রম নয়, রবীন্দ্রনাথে মতে চিত্ত হবে ভয়শূন্য, নম্র, বিচার ক্ষমতাযুক্ত, বৌদ্ধিক ও ক্ষমাশীল। 'আফ্রিকা' কবিতায় সে সুর আমরা শুনেছি। সমাজ তথা দেশের তরে সর্বপরি মানব-কল্যাণে নিয়োজিত মানুষই তো সম্পদ। 'রক্তকরবী' নাটকে ফাগুলাল বা বিশু পাগল নামক ব্যক্তিদের '৪৭-ফ' ও '৬৯-ঙ' নম্বরে চিহ্নিতকরণ- এটি এক অর্থে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ। রাক্ষসপুরীর নৃশংস জীবন-যাপনের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন একদিকে কঠিন যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে তেমনি অন্যদিকে মানব-সম্পদের অবমূল্যায়ণের বিরুদ্ধেও, যা কালে কালে প্রাসঙ্গিক। একবিংশ শতাব্দীতে সে প্রাসঙ্গিকতা আর এক ধাপ উপরে বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তনে ভাবিত হয়ে তা বাস্তবায়নের সচেতনতাই উত্তরণের একমাত্র পথ।
সূচক শব্দ: নম্বর, মানব-সম্পদ, অব-মূল্যায়ন, সভ্যতা, কালো-ইতিহাস, একবিংশ শতাব্দী, উত্তরণ।

মূল আলোচনা:

রবীন্দ্রনাথ যখন 'রক্তকরবী' লিখছেন তখন ভারতবর্ষ পরাধীন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে তাদের উপর ব্রিটিশের অত্যাচার চরমসীমা স্পর্শ করেছে। ভারতবাসী প্রতি মুহূর্তে সাক্ষী হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দমন নীতির। দেশে একদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন দানা বাঁধছে অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে তরুণরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে বুক বাঁধছে। কলকারখানায় শ্রমিকবিক্ষোভ বেড়ে চলেছে, বামপন্থী সমাজবাদী জননেতারা এগিয়ে আসছেন শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে। সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠছে। বাংলা সাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে পালাবদলের নানা চিহ্ন। এই সমস্ত ঘটনারই সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ। প্রত্যেকটি ঘটনার অভিঘাতকে নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাধ্যমত সমাধানের পথ খুঁজেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সভ্যতা ধ্বংসকারী আস্ফালন, মনুষ্যত্ব বিরোধী মহাযুদ্ধ কোনদিন মেনে নিতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। বারবার ধ্বনিত হয়েছে ধিক্কার তাঁর বক্তব্যে, তাঁর কলমে। "পরাধীন ঔপনিবেশিক অনুন্নত দেশগুলিতে মনুষ্যত্বের নিষ্ঠুর অপচয় ও অকারণ লাঞ্ছনা, মানবিক

অধিকার হরণের অমানুষিক চক্রান্ত ও পাশবিক বর্বরতা কবির বহু নিশীথ রাত্রির নিদ্রা হরণ করেছে।”[১]

নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের কান্না চিরদিন রবীন্দ্রনাথকে আকুল করে তুলেছে এবং রাষ্ট্রশক্তির দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে মুক্তির দিশা দেখানোর জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন যুব শক্তিকে, বিশ্বাস করেছেন তারাই ওড়াবে বিপ্লবের জয়ধ্বজা। ‘বলাকা’য় রয়েছে যৌবনের বন্দনা, ‘ফাল্গুনী’তে কবিপ্রাণের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপিত হয়েছে যৌবনের উদ্দেশ্যে। ১৯২১ সালে প্রকাশিত ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যে আমেরিকার পুঁজিবাদী ভোগসর্বস্ব ব্যক্তিত্ব বিনাশী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কবির অনাস্থা তা অনুভব করা যায়। এর পরই ‘মুক্তধারা’তে (১৯২২) বিজ্ঞানের তথা যন্ত্রের শক্তিকে অশুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তা কিভাবে পররাজ্যগ্রাসী মানুষের জীবিকা হননকারী শক্তিতে পরিণত হয় তা দেখান হল। তবে শুধু এখানেই থেমে গেলেন না রবীন্দ্রনাথ, যন্ত্রণাকাতর আঘাতপ্রাপ্ত যৌবন কেমন করে প্রাণঘাতী মানবদ্রোহী যন্ত্রকে, ক্ষমতার সিংহাসনে যাঁরা বসে আছেন তাদের হাতের অস্ত্রকে আঘাত করবে সেই চরম পরিণতিকে বিশ্বাসের সাথে চিহ্নিত করে গেছেন। এরপর আবার ‘বসন্ত’ নামক গীতিনৃত্যনাট্যে কবি যৌবনের জয়গান গাইলেন। ‘বসন্ত’ (১৯২৩) তিনি উৎসর্গ করলেন নবযৌবনের প্রতীক বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে। আর ঠিক পরেই রচিত হল ‘রক্তকরবী’ (১৯২৩, বৈশাখ ১৩৩১)। শিলং বাসের সময় রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছিলেন ভারতবর্ষের শিল্পাঞ্চলগুলিতে হতভাগ্য শ্রমিকদের দুর্বিসহ অমানবিক জীবনযাত্রার কথা। এর আগেই আমেরিকা ভ্রমণের সময় তিনি ধনতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রতন্ত্রের কুৎসিত চেহারা দেখে এসেছেন। এইসব অভিজ্ঞতাই রক্তকরবী রচনার বীজ। ‘শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায় লিখেছিলেন-

> “অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের দানবপুরীতে ছিলেম। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক আর কুবের হল আর, অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ। সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই- এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না।”[২]

পাশাপাশি ‘কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে’ ‘কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে, ‘কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে’, ‘গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া শীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন’-এই জাতীয় মন্তব্য ‘রক্তকরবী’র সূচনায় কবি স্বয়ং করেছেন। এই প্রতিটি মন্তব্য বুঝিয়ে দেয় কোন যুগ-জীবন-যন্ত্রণা, বাস্তবতাবোধ ও সমাজ সচেতনতা থেকে ‘রক্তকরবী’র ফুটে ওঠা।

‘রক্তকরবী’ নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল, ১৯২৩) রচনা করেন। তখন তিনি বাস করছেন শিলং এর শৈলাবাসে। রচনার সময় তিনি নাটকটির নাম দিয়েছিলেন ‘যক্ষপুরী’। পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই তিনি ‘যক্ষপুরী’ নাম বদলে নাম রাখলেন ‘নন্দিনী’। ১৩৩১ সালে যখন নাটকটি আশ্বিন সংখ্যা ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হল তখন তার নাম

হল ‘রক্তকরবী’। ১৩৩৩ সালে এটি পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে (ডিসেম্বর, ১৯২৬)। প্রবাসীতে যে মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৯২৪) এটি প্রকাশিত হয়েছিল সেই মাসেই বিশ্বভারতী’ কোয়ার্টারলিতে এই নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ ‘Red Oleanders’ প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্যে ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতা পরিণামে যে মানুষকে পশুত্বের স্তরে নিয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সেটি প্রতিটি পদক্ষেপে উপলব্ধি করেছিলেন। ‘রক্তকরবী’ নাটকে নন্দিনীর প্রশ্নের (‘ওরা তোমাকে পশুর মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরই লজ্জা করছে না? ছি ছি, ওরাও তো মানুষ!’) উত্তরে বিশু বলেছে-

> ‘বিশু ।। ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে যে– মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে। ...
>
> বিশু ।। চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি।’

এই হল একালের আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততার স্বরূপ। মানুষের ব্যক্তিত্ব, অস্তিত্ব সবই এখানে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ এই পৃথিবীতে নির্জীব, আত্মবিস্মৃত, বিশেষত্ব-বর্জিত, পণ্য উৎপাদন আর মুনাফা লোটার যন্ত্রে পর্যবসিত। ব্যক্তি হিসেবে তার সমস্ত পরিচয় কেড়ে নিয়েছে এই সমাজ ব্যবস্থা। নামের বদলে এখানে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয় মানুষ- ‘৪৭ ফ’ বা ‘৬৯ ঙ’। তাদের বাসস্থান হয় ‘দন্ত্য-ন’ বা ‘মূর্ধণ্য-ণ’ পাড়ায়। অন্যদিকে মনুষ্যত্ব ও মানবতার এই ধ্বংসলীলা সম্পাদন করছে যারা তাদের পরিণামও যে ভয়ংকর হতে চলেছে সেকথাও বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ। ক্ষমতা, শক্তি, সম্পদের পেছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ হারাতে বসেছে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ- মানবিক অনুভূতি, আবেগ। প্রেম, সৌন্দর্য, খুশি, আনন্দ, গান, রঙ, রস মুছে যাচ্ছে এদের জীবন থেকে। প্রকৃতির নন্দিনীর রক্তকরবী সাথে তথা প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এখানে সম্পর্কের শুধু একটাই রূপ- শাসক আর শোষিত। এটাই কুবেরতন্ত্রের সামগ্রিক চরিত্র। জড়বস্তুর ভেতরেও প্রাণ থাকে, তাকে উপলব্ধি করলে জড়কেও ব্যবহার করা যায় জীবনের কাজে। জীবনের সাথে জীবনের, জড়ের সাথে জীবনের সহজ সম্পর্কেই প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর আপন ছন্দ। যন্ত্র নির্ভর ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় এই সহজ ছন্দটাই স্তব্ধ হয়ে গেছে। রাজার অত্যাচার প্রবল হয়ে উঠেছে আর যে দুর্বল, অসহায় সে কেবল তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার থেকে আরো গাঢ় অন্ধকারে। শক্তির আস্ফালন তীব্র হয়ে উঠেছে। বাড়তে থাকে নতুন নতুন সংখ্যা; মানব সম্পদের চরমতম অপব্যবহার। প্রেম-সৌন্দর্য তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ায় প্রেমের দ্বারা শক্তিকে সংহত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে শুধুই শক্তির অপব্যবহার। চিৎবৃত্তিকে হারিয়ে মানুষ কেবলই প্রবৃত্তির পেছনে ছুটতে ছুটতে অন্তরের দিক থেকে হয়ে পড়েছে নিঃস্ব, রিক্ত, ক্লান্ত। যন্ত্র বিজ্ঞান তাকে বাইরের দিক থেকে যতই ক্ষমতাশালী করুক না কেন অন্তরে অন্তরে সে হয়ে পড়ছে দ্বিধাগ্রস্ত, দুর্বল, শ্রীহীন।

‘রক্তকরবী’র কাহিনি গড়ে উঠেছে যে দ্বন্দের উপরে তার বহুমাত্রা, যার একটি হল অবশ্যই দুটি সভ্যতার দ্বন্দ্ব। যার একদিকে রয়েছে কৃষি নির্ভর সভ্যতা ও অন্যদিকে যন্ত্রনির্ভর ধনতন্ত্র সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন ‘কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী’ সভ্যতার দ্বন্দ্ব। যে সময়ে দাঁড়িয়ে কবি এই দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করছেন তাঁর নাটকে সেই সময়টার সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি মুখব্যাদান করে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে সমস্ত মানব সভ্যতাকেই। শুধু পাশ্চাত্য বললে ভুল হবে, প্রাচ্যের জাপানও রয়েছে এই দলে। রবীন্দ্রনাথ-ইউরোপ-আমেরিকা-জাপান ভ্রমণের সূত্রে সাক্ষী হয়েছিলেন সে ঘটনার। আবার

একই সময়ে রাশিয়া ও চীনে পালাবদলের সূচনা হচ্ছে। সে দিকও স্বচক্ষে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই পালাবদলের ফলে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটল এবং ধনতন্ত্রের বদলে সমাজতন্ত্রের হাত ধরে এক নতুন বিশ্বের স্বপ্ন দেখা শুরু করল মানুষ। সে স্বপ্নে নিজের স্বপ্নকে মিলিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একেবারে মিশিয়ে দিলেন না। বরং একটু অন্যরকম করে পথ দেখালেন মানব মুক্তির। তিনি বুঝলেন শুধু শ্রমিকদের লড়াই কাঙ্ক্ষিত দিশা দেখাতে পারবে না কারণ ধনতন্ত্রের শক্তি অনেক বেশি, ক্ষমতা অনেক বেশি। শ্রমিকের প্রতিরোধ ধুলোয় মিশিয়ে দিতে তাদের সময় লাগবে না। তবে কি মুক্তি আসবে না? আসবে, যদি ধনতন্ত্রকে তার ভেতর থেকে শিকড় সমেত উপড়ে ফেলা যায় তবে মুক্তি আসবে। যদি তাকে দাঁড় করানো যায় তারই আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততার মুখোমুখি, তার ভেতরে জাগানো যায় অনুশোচনা। এই বিশ্বাসেরই ছবি আঁকলেন রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'তে। রাজা, অধ্যাপক, সর্দার প্রত্যেককেই রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করিয়েছেন নন্দিনী নামের প্রাণময়, আলোময় দর্পণের সামনে। তাদের প্রত্যেকেরই জীবনবোধে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে রাজা নিজেই নিজের জাল ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন, ভেঙে ফেলেছেন নিজের ধ্বজাদন্ড, মিশে গিয়েছেন নন্দিনী-বিশু-ফাগুলালদের দলে। অধ্যাপকও ছুটে গিয়েছে সেই দলে এমন কি বিরোধী পক্ষ সর্দার পর্যন্ত তার বর্শায় জড়িয়ে নিয়েছে নন্দিনীর দেওয়া কুন্দফুলের মালা। তবে এই পরিবর্তন হঠাৎ ভাবে একদিনে হয়নি, তার জন্য জীবন দিতে হয়েছে রঞ্জনকে, কিশোরকে, প্রাণের বিনিময়ে উন্মুক্ত হয়েছে বিপ্লবের পথ।

নাটকের পটভূমিতে রয়েছে সমসাময়িক বস্তুবাদী ধনতন্ত্রবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মুষ্ঠিতে আবদ্ধ ও উৎকট সংগ্রাহী সমাজব্যবস্থা। মূলত সমকালে পাশ্চাত্যে বাণিজ্য পুঁজি ও শিল্প পুঁজির প্রসারে মানুষে ঐশ্বর্যনিশা ও বিত্তশালীদের অর্থমাসুদা মানবিক জীবনকে কিভাবে পর্যুদস্ত করেছিল এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কীরূপ আকার ধারন করতে পারে তারই রূপায়ন ঘটেছে এ নাটকে। রুপায়ন করতে গিয়ে নাট্যকার যে নামকরনের আশ্রয় নিয়েছেন তা মূলত ব্যাতিক্রমী প্রতীক হয়ে উঠে কখনো হয়ে উঠেছে প্রেমযৌবনের পরিচায়ক, কখনো বা হয়ে উঠেছে বিপ্লবের পরিচায়ক। যা প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুনত্বের আস্বাদ দিতে সক্ষম হয়েছে, প্রানের সন্ধান ঘটিয়ে নাটকটিকে পাঠকের সামনে অর্থপূর্ণ করে তুলেছে। আর এরই ফলে নাট্যকার পেয়েছেন নামকরণের সার্থকতা।

মানুষ কখনও সংখ্যা হতে পারে না, মানুষ মানবিক গুণযুক্ত; তার ব্যবহার যোগ্যতায় তথা সার্বিক কল্যাণে তা সম্পদে পরিণত হয়। শুধু তাকে কাজে লাগাতে হয়, সমাজ তথা দেশের স্বার্থে, মানুষেরই কল্যাণে। 'রক্তকরবী' কি শুধুই একটি নাটক? অনেকেই বলেছেন, এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয়ে লালন করা কোনো স্বপ্ন। কেউ কেউ এই নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেণিসংগ্রাম চেতনার ছায়া খুঁজেছেন। বিশ্লেষকদের একটি অংশ এ নাটকে রবীন্দ্রনাথে ঠাকুরের সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রভাব পড়েছে বলেও যুক্তি দেখিয়েছেন। তবে রূপকাশ্রয়ী এ নাটকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রবীন্দ্র মানসে একটি স্বপ্ন খুব উজ্জ্বল যেখানে আঁধার ভেঙে এক উজ্জ্বল আলো সন্ধানের স্পৃহা অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু সেই আঁধার ভাঙার জন্য যে বিপ্লব প্রয়োজন তার ধরনটা একেবারেই আলাদা। নাটকের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যক্ষপুরী নামে পরিচিত একটি নগরে নানা রকম দ্বন্দ্বের উপস্থিতি। এখানে কোনো উৎপাদন নেই, নেই কোনো সৃষ্টি। আছে শুধু অমানবিক শ্রম। দিনের পর দিন যক্ষপুরীর শ্রমিকরা পাতাল থেকে সোনা তুলে আনছে। কেউ বা সোনা খোদাইয়ের কাজ করছে। সবার উপরে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী রাজা। মাঝখানে আরো কয়েকজন পেশাজীবীর উপস্থিতি দেখা গেলেও বস্তুতপক্ষে কথা বলার ক্ষমতা

কারো নেই। নাটকের মূল চরিত্র নন্দিনীকে উপস্থাপন করা হয়েছে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির পরিবর্তনকামী এক নারী হিসেবে। যক্ষপুরীর যে আঁধার সেই আঁধারে একটু আলোর পরশ নিয়ে আসতে তার নান্দনিক চেষ্টার কোনো অন্ত নেই। নান্দনিক বলছি একারণে যে, নন্দিনী বিপ্লবী নারী হলেও তার বিপ্লবের পথ কখনোই সহিংস নয়। বরং বিশু পাগলার গান, কিশোরের রক্তকরবী অনুষঙ্গ এসেছে বারবার যা নন্দিনীকে উপস্থাপন করেছে আলো অন্বেষী এক নান্দনিক নারী হিসেবে। নাটকে শ্রমিকদের প্রতিবাদ বিষয়গুলো আপাতদৃষ্টিতে মার্কসের শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের প্রাথমিক আভাস দিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই শ্রেণি সংগ্রাম আর নন্দিনীর বিপ্লব এক কিনা তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

'রক্তকরবী' একদিকে যেমন রাজার অহং হননের মধ্যদিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ, তেমনি অন্যদিক থেকে বলা যায় মানুষের তথা মানবতার সঠিক মূল্যায়ণের সূচনা। মানুষ যখন সংখ্যায় পরিণত হয় সেটি সেই মানুষের তো বটেই সর্বোপরি মানবতা অপমান। এই প্রতিবাদও রবীন্দ্রনাথ নাটকটির মধ্যদিয়ে জানিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে দাঁড়িয়ে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের এজাতীয় অপমান কখনই কাম্য নয়, রবীন্দ্রনাথ যেটি সেই সময়ে উপলব্ধি করেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। পৃথিবীর ইতিহাসে মানব সম্পদই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দেশের সার্বিক উন্নতির মূলে এই সম্পদই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান শতাব্দীতে তা সবচেয়ে বড় প্রশ্নের মুখে। বিশ্বে প্রত্যেকটি প্রাণের মৃত্যু অবসম্ভাবী। মানুষ বেড়ে ওঠে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে। এটির মাধ্যমে সে যেমন নিজেকে শিক্ষিত করে তোলে তেমনি আগামী প্রজন্মের কাছে যোগ্য উত্তরসূরির ভূমিকা পালন করে। সভ্য সমাজে এ এক চিরন্তন প্রথা। এটি তখনই সম্ভব যদি রাষ্ট্রচালিত শাসনকাঠামো শিক্ষাকেন্দ্রিক ও নান্দনিক হয়। যেখানে মানব সম্পদের কার্যকারীতা সুনিশ্চিত করে সার্বিক উন্নতিকে লালন করা হবে। এ ধারা ভেঙ্গে পড়লেই বিপদ। মুখ থুবড়ে পড়বে যুগের তথা সভ্যতার উন্নতির রথ। নাটকে রাজাকে যদি একজন দায়বদ্ধ শাসক হিসাবে ধরি তাহলে ঐ সংখ্যাগুলি মানবতার অপমান তো বটেই, সঙ্গে মানব সম্পদের চূড়ান্ত অপব্যবহার নয় কি? একবিংশ শতকে সে প্রশ্ন আরও জোড়ালো হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের কথা বলেছেন। তিনি মানবতার কবি, তাইতো ক্ষমাধর্ম ধারণ করার কথা বলেন আফ্রিকাকে। নাট্যকার জালের আড়ালে থাকা রাজার মনে জমে থাকা পর্বতসম অহংবোধ, তার অত্যাচারী মানসিকতার পতন ঘটানোর আয়োজন করেছেন সমগ্র নাটক জুড়ে। অবতারণা করেছেন নন্দিনীকে, রঞ্জনের ধারণাকে। পরিণতিতে আমরা দেখেছি রাজা নিজেই তার ধ্বজদণ্ড ভেঙ্গে সামিল হয়েছেন, মিশে গেছেন ওই সংখ্যাদের দলে। নাটকে সেখানেই মানবতার জয় ঘোষিত হয়েছে। মানুষ হয়ে আর একটি মানুষকে অত্যাচার, বঞ্চনা এইসমস্ত বিষয়গুলি যেখানেই দেখেছেন সেখানে তীব্র প্রতিবাদ হেনেছেন কবি। মানুষকে আপন করে নিয়ে, ভালোবাসার কোমল সুরে সকলকে বেঁধে তোলার কথা বলেছেন। যুগ শেষ হবে, সভ্যতার ঘরে জমা হবে নতুন একটি সভ্যতা। কিন্তু সেই যুগ তথা সভ্যতাগুলির গোত্র নির্ণয় করবে সেই সময়ের রাজাদের মত অত্যাচারী মানুষের পতন ও সংখ্যা নামধারী মানুষগুলো তাদের অধিকার দেওয়ার মধ্যদিয়ে। এর অন্যথা হলে তা চিহ্নিত হয় সভ্যতার কালো যুগ হিসাবে, ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যে কথাটি উঠে আসে তা হল- ইতিহাস তো শুধু সাক্ষ্য বহন করেই ক্ষান্ত থাকে, তার বুকের কালো দাগ কি মুছে ফেলতে পারে? পারে না! যারা অত্যাচারিত, যারা বিগত দিনে সংখ্যায় পরিণত হয়ে জীবনের ইতি টেনেছে সেগুলির দাগ কোনকিছুই

ইতহাসের পাতা থেকে মুছে দেওয়া যায় না। তাই প্রয়োজন- প্রেম, সংযম, নির্লোভ মানসিকতা লালন-পালন। তার জন্য গুরু-দায়িত্ব জালের আড়ালে থাকা রাজাদের তথা ধন কুবেরের রাজ্যে থাকা দায়িত্বাধীন শাসকের। দরকার ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে মানবতার চর্চা, নাকি মানুষকে সংখ্যায় পরিণত করে পরোক্ষভাবে মানব সম্পদের অপব্যবহারে সামগ্রিক ক্ষয়সাধন! কালের নিয়মে সে প্রশ্ন আজ উঠছে বইকি।

বর্ণনীয় বিষয়ের শেষ পর্বে এসে নাট্যকারের ভাষায় উত্তরণ প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলে প্রবন্ধটি শেষ করবো। 'রক্তকরবী'র পরিণতি নাটকটির পাঠক মাত্রই অবগত। দুটি পন্থার দ্বান্দ্বিক পরিমণ্ডলে নাটকের চরিত্রগুলির বিচরণ। সংখ্যায় নামাঙ্কিত চরিত্রগুলি স্বর্ণকারাগারে শুধুই পরিশ্রমে ব্যস্ত, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে তাদের অবস্থান অনেক দূরে। মনের অধিকাংশ কুঠরী তখনও তাদের বন্ধ। চাবুকের আঘাতে তাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে রঙীন বসন্তগুলি, যে মুক্ত আনন্দ তারা পেতে পারতো, যাদের অধিকার ছিল স্বপরিবারে প্রকৃতির কোলে সুস্থ জীবনে যাপনের, কিন্তু তা থেকে তারা বঞ্চিত। সেই রকম একটি পরিবেশে নন্দিনী যেন বিদ্যুতের এক ঝলক আলো, যে আলোতে তারা খুঁজে পেয়েছে ঘন অন্ধকার গুহাতে বাঁচবার পথ। প্রকৃতির কোলে তারা ফিরে গিয়ে স্বাচ্ছন্দে ফসল ফলাতে সক্ষম হওয়ার মধ্যদিয়ে মানবিক মূল্যবোধ রক্ষিত হয়েছে। নাট্যকার খুব যত্ন সহকারে রাজার মনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেখানকার পাপময়, অন্যায়ে জর্জরিত এক কালো অন্ধকার দেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। একটা সময়ের পর মানুষ আর সংখ্যা থাকেনি। সেখানে প্রবাহিত হয়েছে নন্দিনীর ছোঁয়ায় জীবনানন্দের ধারা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুভশক্তি। তাদের বসবাসের পাড়াগুলিতে ফিরেছে স্বাভাবিক অবস্থায়। একবিংশ শতক ও আগামী শতক গুলিতেও রবীন্দ্রনাথের দেখানো এই উত্তরণের পথ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। মানুষ সংখ্যায় পরিণত হওয়া তা মানবতার অপমান। রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন তাদের সুন্দর স্বাভাবিক জীবনে। মানুষ হোক মানবিক, হয়ে উঠুক মানব সম্পদ। যা মানুষের, দেশের ও আগামী প্রজন্মের কাছে তারা হয়ে উঠবে যোগ্য উত্তরসূরী। দায়বদ্ধ রাজারূপী শাসকের সেই অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটুক, বঞ্চিত সংখ্যা-প্রজন্ম লুপ্ত হোক। মূল্যবোধ সঞ্চারের মধ্যদিয়ে মানব সম্পদের ব্যবহার যথার্থ হলে তবেই রচিত হবে শাশ্বত মানব সভ্যতার জয়ের ইতিহাস।

তথ্যসূত্র:

১। বসু/ড. অরুণ কুমার/রবীন্দ্র বিচিন্তা/পৃ. ২৭৬
২। শিক্ষার মিলন/কালান্তর/পৃ. ১৭১-১৭২।

নজরুলের ‘দুর্দিনের যাত্রী’ : নিষেধের পটভূমিকায়

বিজন বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ

সারসংক্ষেপ: কাজী নজরুল ইসলাম হলেন প্রথমত একজন কবি। এর পাশাপাশি তিনি একজন বলিষ্ঠ প্রাবন্ধিক। স্বদেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক নজরুল পরাধীন দেশবাসীর দুর্দশায় কাতর হয়েছেন। তাঁর কবিতায়, প্রবন্ধে আছে লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং অত্যাচারী ইংরেজ শাসক ও তাদের মদতপুষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাঁর লেখনী সমস্ত ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠেছে। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধে বঞ্চিত ও পরাধীন দেশবাসী খুঁজে পেয়েছে শাসকের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের প্রেরণা। শাসকের কাছে এ তো রীতিমত অশনি-সংকেত। তাই একে একে অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধগ্রন্থ নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করেছে সরকার। কয়েকটি গ্রন্থ সরাসরি বাজেয়াপ্ত না হলেও ছিল সরকারি আতসকাঁচের নিচে। সন্দেহের তালিকায় থাকা এমনই একটি প্রবন্ধগ্রন্থ 'দুর্দিনের যাত্রী'। এই গ্রন্থের 'আমরা লক্ষীছাড়ার দল', 'তুবড়ি বাঁশির ডাক' ইত্যাদি প্রবন্ধে তরুণ যুব সমাজের প্রতি শাসকের বিরুদ্ধে পথে নামার আহ্বান অস্পষ্ট থাকেনি। স্থবিরতাহীন ও জরামুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনের প্রয়োজনে এই অকুতোভয় তরুণদলকেই প্রাবন্ধিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রবন্ধগুলিতে আছে সমস্ত দ্বিধা ও জড়ত্ব দূরে সরিয়ে নিজের নায্য প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার দাবি করে পথে নামার ডাক। আর এতেই প্রমাদ গুনেছে ইংরেজ সরকার। সরাসরি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে, এই গ্রন্থ হয়ে উঠেছিল সরকারের মাথাব্যথার কারণ।

সূচক শব্দ: দুর্দিনের যাত্রী, বঞ্চিত স্বদেশবাসী, আত্মজাগরণ, তরুণদল, বিদ্রোহ, নিষেধাজ্ঞা।

মূল আলোচনা:

একজন প্রথম শ্রেণির কবি যখন প্রবন্ধ লেখেন তখন সেখানে কবিসুলভ আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়। একটি কবিতা বহুজনের হৃদয় ও চেতনাকে ছুঁয়ে যায় তার অন্তর্নিহিত আবেগের জন্য। স্বল্প আয়তনে গভীর একটা ভাব প্রকাশের জন্য আবেগ তার চালিকা শক্তি। সাধারণভাবে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আবেগ নয়, তার প্রধান অবলম্বন হলো যুক্তি। যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে থাকে প্রবন্ধের ভিত। আবেগধর্মী ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এ ক্ষেত্রে আলোচ্য নয়। কবিতা ও প্রবন্ধ দুটি আলাদা প্রকাশ মাধ্যম এবং আলাদা বৈশিষ্ট্যে তারা স্বতন্ত্র। ভাব, ভাষা প্রকাশভঙ্গি সব দিক থেকেই একটি কবিতার সৌন্দর্য থেকে প্রবন্ধের সৌকর্য অনেক দূরবর্তী। তাই একজন কবির লেখা প্রবন্ধ পড়তে গেলে একটা অতিরিক্ত কৌতূহল তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। এবং সেই কবি যদি হন নজরুল, তাহলে তো কথাই নেই। তাঁর সমগ্র ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের পথ চলার অবলম্বন হল প্রখর আবেগ। গগনস্পর্শী আবেগের আর এক নাম নজরুল।

লেখক জীবনের প্রায় উন্মেষলগ্ন থেকে প্রবন্ধ লিখেছেন নজরুল। রাজনীতি তাঁর প্রবন্ধের বড় অংশ জুড়ে। সমকালীন স্বদেশ, পরাধীনতার সংকট, বঞ্চিত পীড়িত দেশবাসী,

স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের দিশাহীনতা ইত্যাদি তাঁর প্রবন্ধের বিষয় হয়েছে বারে বারে। শুধু স্বদেশ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিও তিনি নিজস্ব বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন এবং তুলে ধরেছেন প্রবন্ধের পাতায়। শুধুমাত্র রাজনীতি নয়, নজরুলের মতো প্রথম শ্রেণির একজন ভাষা শিল্পী ও সংগীত বিশারদ যে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়েও তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'যুগবাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'রুদ্রমঙ্গল' ইত্যাদি প্রবন্ধগ্রন্থে নজরুলের অধিকাংশ প্রবন্ধ গ্রন্থিত হয়েছে। নজরুলের সমগ্র লেখালেখির মূলে আছে মানবপ্রেম। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির নেপথ্যে আছে মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। দেশবাসীকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। তাই দেশবাসীর উপর ঘটে চলা চরম বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে ওঠেন। সমস্ত শোষণ বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিকার চান। দেশবাসীকে নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে ও আত্মজাগরণে উদ্বুদ্ধ করেন। বলিষ্ঠ তাঁর লেখনীতে তাই বেজে ওঠে শাসক বিরোধিতার সুর। অত্যাচারী শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করা এ জাতীয় লেখা তাই ব্রিটিশ শাসকের কাছে হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। এবং এ সব ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে শাসকেরা যা করে এসেছে, এখানেও তাই হল, একের পর এক নজরুলের লেখা ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হতে লাগলো। প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগবাণী', কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙার গান', 'প্রলয় শিখা' ও 'চন্দ্রবিন্দু'— এই পাঁচটি গ্রন্থ সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা হল।

সুনির্দিষ্টভাবে বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ না হলেও নজরুলের আরও কয়েকটি গ্রন্থ ছিল সরকারের সন্দেহের তালিকায়। এমনই একটি গ্রন্থ হল 'দুর্দিনের যাত্রী'। 'ধুমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে গড়ে ওঠা এই গ্রন্থেও আছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বার্তা। দেশবাসীকে সচেতন করা ও প্রেরণা দেওয়ার প্রয়াস। একটা সময় অবস্থা এমনই হয়ে পড়েছিল যে, নজরুলের প্রায় সমস্ত লেখাই ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের রীতিমতো নজরদারিতে থাকতো। আমলা মহলে নোট চালাচালি চলত। 'দুর্দিনের যাত্রী' নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নজরুল প্রবন্ধ সমগ্র' (দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৯) গ্রন্থের 'গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি' অংশে 'দুর্দিনের যাত্রী' তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে ঢাকা থেকে আব্দুল কাদির একটি চিঠি লিখেছিলেন 'দেশ' পত্রিকায়। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ তারিখে প্রকাশিত সেই চিঠিটি নজরুল গবেষক শিশির কর তাঁর 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে পুনরায় ছাপিয়ে দিয়েছেন। চিঠিতে কাদির সাহেব লিখেছেন—

> ''প্রথম মুদ্রণের পরে ৪০ বৎসরের মধ্যে এই পুস্তিকাদ্বয় ('রুদ্রমঙ্গল' ও 'দুর্দিনের যাত্রী') আর ছাপা হয়নি। এ-সম্পর্কে নজরুল আমাকে বলেছিলেন যে, এই দুইখানি পুস্তিকার প্রচারই সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল।''[১]

এই পত্রের প্রতিক্রিয়ায় শিশিরবাবু 'দেশ' পত্রিকাতেই তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন ৫ জানুয়ারি ১৯৮০ তারিখে প্রকাশিত একটি চিঠিতে। পরে তাঁর 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে এই চিঠিটিও পুনরায় ছাপিয়েছেন তিনি। সেখানে তিনি লিখেছেন—

> ''এখন পর্যন্ত 'দুর্দিনের যাত্রী' সম্পর্কে আমি কোন তথ্য পাইনি। তবে ওই নামে নজরুলের কোন বই যে নিষিদ্ধ হয়নি, তা জানা যায় বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কার্যবিবরণী থেকে এবং নিষিদ্ধ বই সম্পর্কে

> বাংলা সরকার যেসব গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন, তাতেও 'দুর্দিনের যাত্রী'র নাম নেই। ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ বেঙ্গল কাউন্সিলের কার্যবিবরণীতে পাই, হুমায়ুন কবিরের প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন নজরুলের যে কয়েকটি বই নিষিদ্ধ বলে জানান, তাতে 'দুর্দিনের যাত্রী'র নাম নেই।"[২]

যাই হোক, 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থটিও নিষিদ্ধ হবার সম্ভাবনায় ছিল। ১৯২৫ সালে এই প্রবন্ধের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। স্বল্পায়তন এই বইটিতে সাতটি প্রবন্ধ আছে।

'দুর্দিনের যাত্রী' প্রবন্ধ পুস্তিকার প্রথম রচনাটি হল 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল'। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৮ই ভাদ্র এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে সমাজ পরিবর্তনের মূল হল এই লক্ষ্মীছাড়ার দল। গতানুগতিক পথ, গতানুগতিক চিন্তাধারা, শোষণ, বঞ্চনা সব কিছুর বিরুদ্ধে এরা সোচ্চার, সর্বত্র। শৃঙ্খলা নয়, কোনও রকম শৃঙ্খলকেই এরা মানে না। বিদ্রোহ সর্বব্যাপী। দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে যেমন বিদ্রোহ, তেমনি বিদ্রোহ নিজেদের ভালো-মন্দ নিজেরাই বুঝে নেওয়ার অধিকারের দাবিতে। এই অকালকুষ্মাণ্ড, নিজের খেয়ে মনের মোষ তাড়ানো, লক্ষ্মীছাড়ার দলকে কোনও দিনই পছন্দ করেনি কোনও রাজশক্তি অথবা সমাজের তথাকথিত দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা। অথচ পৃথিবীতে বারে বারে বিপ্লব বয়ে এনেছে এরাই। এরাই সেই লক্ষ্মীছাড়ার দল। মানবতার মহত্তোর সাধনার লক্ষ্যে এরা পথ চলে। তুচ্ছ জীবনে এরা পথ চলে বিপদ সংকুল সেই পথে। এই দীপ্ত দামাল ছেলের দল যারা লক্ষ্মীছাড়া বলে পরিত্যক্ত, প্রাবন্ধিক নজরুল মিশে গেছেন এদের সঙ্গে। তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন নতুন যাত্রা পথে। ফুল ছড়ানো সে পথ নয়, সে পথ নয় কোন শিষ্ট ছেলের। তাই তো তাঁর দরকার এই লক্ষ্মীছাড়াদেরই। কেননা সে পথে, পথে পথে পাথর ছড়ানো। তাই এই দুর্দিনে প্রাবন্ধিক লক্ষ্মীছাড়া এই যাত্রীদলকে উদ্দেশ করে বলেন-- ''শনি হবে আমাদের কপালে জয়টিকা, 'ধূমকেতু' হবে আমাদের রথ, মরুভূমি হবে আমাদের মাতৃক্রোড়, মৃত্যু হবে আমাদের বধূ।'' দেশবাসীর উদ্দেশে এই আহ্বান খুব অস্পষ্ট থাকেনি রাজশক্তির কাছে। ইংরেজ শাসক সহজেই খুঁজে পেয়েছে প্ররোচনার ইঙ্গিত। তরুণ যুবসমাজকে রাজবিদ্রোহী করে গড়ে তোলার ইন্ধন। স্বল্পায়তন অথচ গভীর এ জাতীয় প্রবন্ধ তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশদের ভাবিয়ে তুলেছিল গভীরভাবে।

পুস্তিকার দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'তুবড়ি বাঁশির ডাক' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ এর ১২ই ভাদ্র। এখানেও আছে সমস্ত স্থবিরতা, কূপমণ্ডূকতাকে অতিক্রম করে নতুন করে সমাজ ও দেশ গঠনের আহ্বান। পরিবর্তন-প্রত্যাশী, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর তরুণ দলকে প্রাবন্ধিক উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন নব সৃষ্টির মহাযজ্ঞে। এই তরুণ দল প্রাবন্ধিকের বড় প্রিয় 'নাগ-শিশুর দল'। এদের কাছে তার গভীর প্রত্যাশা। তাই তো বারবার তিনি এদের উৎসাহিত করছেন বিবর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। এদেরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি পৌঁছে যাবেন কাঙ্খিত লক্ষ্যে। এই প্রবল বিষধর নাগ-নাগিনীরা তাদের বিষের জ্বালায় বিপর্যস্ত করে দিক এই ঘূণধরা অন্তঃসারহীন, মনুষ্যত্বহীন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের উল্লাসে মেতে উঠুক তারা। ফনা উঁচিয়ে, পুচ্ছ দুলিয়ে তারা মহানন্দে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। তারা আকাশে ছড়িয়ে দিক হলাহল-জ্বালা। নীল আকাশ হয়ে উঠুক বিবর্ণ। এমনকি, 'রবি-শশী-তারা গ্রহ-উপগ্রহ সব বিষ-দাহনে নিবিড় কাল হয়ে উঠুক, বাতাস খুন-খারাবির রঙে রেঙে উঠুক।' প্রবল অসাম্য ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে হোক

প্রবল বিদ্রোহ। এমন কি, এই বিদ্রোহ হোক এই অসাম্য ও অমানবতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভগবানের বিরুদ্ধেও—

> "আসুক নিখিল অগ্নিগিরির বিশ্ব-ধ্বংসী অগ্নিস্রাব, ভস্মস্তূপে পরিণত হোক এ-অরাজক বিশ্ব। ভগবান তার ভুল শোধরাক। এ খেয়ালের সৃষ্টিকে, অত্যাচারকে ধ্বংস করতে তোমাদের কোটি ফণা আস্ফালন করে ভগবানের সিংহাসন ঘিরে ফেলুক। জ্বালা দিয়ে জ্বালাও জ্বালাময় বিধি ও নিয়মকে।"[৩]

এহেন প্রবল বক্তব্য যে কোনও প্রজাশোষক রাজশক্তির কাছেই মাথাব্যাথার কারণ। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এতই প্রত্যক্ষ যে, ভয় পেয়েছিল অত্যাচারী শাসক ইংরেজ।

'দুর্দিনের যাত্রী'র সব প্রবন্ধের বক্তব্যই একই সুরে বাঁধা। ব্রিটিশ শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান কোথাও অনুচ্চারিত নয়। ব্রিটিশ মদতপুষ্ট যে শ্রেণি সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন যাপনকে দুর্বিষহ করেছে বিদ্রোহ তাদের বিরুদ্ধেও। বিদ্রোহ নিজের হীনতা, মেরুদণ্ডহীনতা, জড়তা, স্থবিরতার বিরুদ্ধেও। সকলকে আত্মজাগরণে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক। দীর্ঘ সয়ে আসা অন্যের অধীনতা, গোলামী আর নয়। সহজাত আবেগে নজরুলের এই বক্তব্য তীব্রভাবে প্রকাশিত। পুস্তিকার তৃতীয় প্রবন্ধ 'মোরা সবাই স্বাধীন, মোরা সবাই রাজা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ এর ৫ই ভাদ্র। হীনবল, নুব্জ,নতমস্তক দেশবাসীর মনে বীরত্ব সঞ্চার করে সকলকে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রাবন্ধিক।' আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা- এ বোধ ও বিশ্বাসে সকলকে জেগে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন। আর এ পথেই পরাধীনতার সমস্ত বন্ধন অচিরেই যাবে ছিন্ন হয়ে।

স্বরাজী আন্দোলনের ভরা জোয়ারে লিখিত এই সমস্ত প্রবন্ধে সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গও আছে। দেশবাসী স্বরাজ পেতে চায়, কিন্তু চাইলেই তো স্বরাজ মেলে না। চাওয়া তীব্র হতে হয়। যথার্থ উদ্যোগী ও উদ্যমী হয়ে দেশবাসীকে স্বরাজ ছিনিয়ে আনতে হবে। তাই তো প্রাবন্ধিক বলেন—

> "স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে, নিজেই রাজা বা সবাই রাজা; আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই। এই বাণী যদি বুক ফুলিয়ে কোনো ভয়কে পরোয়া না ক'রে মুক্তকণ্ঠে বলতে পার, তবেই তোমরা স্বরাজ লাভ করবে, স্বাধীন হবে, নিজেকে নিজের রাজা করতে পারবে; নৈলে নয়।"[৪]

এ প্রবন্ধে আছে অচেতন দেশবাসীকে সচেতন করার আন্তরিক প্রয়াস। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উন্নত মস্তকে সকল দেশবাসী যদি স্বাধীনতা দাবি করে তবে সাফল্য তাদের হাতের মুঠোয়। এ রচনার যে কি বিপুল প্রভাব পড়তে পারে সমাজের বুকে, তা শাসকের পক্ষে বুঝতে কোন রকম অসুবিধা হয়নি সেদিন।

১৩২৯ এরই ৫ই ভাদ্র প্রকাশিত হয়েছিল প্রবন্ধ 'স্বাগত'। 'দুর্দিনের যাত্রী' সংকলনের চতুর্থ রচনা এটি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কারামুক্তি উপলক্ষে প্রবন্ধটি লিখিত। দেশবাসীকে শোষণ ও বঞ্চনার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার ব্রত নিয়েছেন যারা, কারাবাস তাদের জীবনে স্বাভাবিক। দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক দেশমায়ের এই বীর সন্তানদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রাবন্ধিক— "স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তোমরা ফিরে এস এই বাংলার শ্মশানে।" ইংরেজ শাসন ও শোষণে জর্জরিত দেশ সত্যিই শ্মশানভূমি বটে। অর্থহীন, বিত্তহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন এই দেশ। দেশের মানুষের জীবনমৃত বেঁচে

থাকা। শাসক ও তার সহযোগী শ্রেণি দেশের এই মৃতপ্রায় মানুষগুলিকে চারিদিক থেকে শোষণের বেড়াজালে বেঁধে রেখেছে। এদের প্রবল স্বার্থপরতা, ক্ষমতা ও অর্থলোলুপতাকে বোঝাতে লেখক শ্মশানের পচা মাংসের জন্য কুকুর শেয়ালের টানাটানিকে তুলনা করেছেন। আর এই শ্মশানভূমিতেই চিত্তরঞ্জন, বীরেন্দ্রকে তিনি ঋষির বেশে দেখতে চান। এই যেন হয় তাঁদের সাধন ক্ষেত্র। শ্মশানের এই সাধন ক্ষেত্রে আছে শুধু পিশাচের খল খল অট্টহাসি আর অসহায়ের করুণ মর্মভেদী ক্রন্দন। কবে ঘটবে এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন? জড় নিষ্প্রাণ জাতির জীবনে কবে ফিরবে প্রাণের উদ্দীপনা? সমস্ত বন্ধন ভয়, রাজভয় জয় করে দেশবাসীর জীবনে নিশ্চয়ই একদিন এসে যাবে সেই কাঙ্ক্ষিত দিন।

'মেয় ভুখা হুঁ' প্রবন্ধটি সংকলনের পঞ্চম প্রবন্ধ। এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ এরই ২৯ শে ভাদ্র। রূপকের আশ্রয় লেখা এই প্রবন্ধে সমকাল, সমসমাজ ও নানা ধরনের মানুষের কথা উঠে এসেছে। দুপুর রাতে একাকিনী ভুখারিনী পাগলি মেয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। মুখে তার একই কথা, ম্যায় ভুখা হুঁ। প্রাবন্ধিকের ভাষায়—

> ''এলোকেশে জীর্ণাশীর্ণা ক্ষুধাতুর মেয়ে কেঁদে চলেছে ''মেয় ভুখা হুঁ''। তার এক চোখে অশ্রু আর চোখে অগ্নি। দ্বারে দ্বারে ভুখারিনী কর হানে আর বলে, ''মেয় ভুখা হুঁ।''[৫]

শ্রীহীন, জৌলুসহীন, অনাহারজীর্ণ, বন্ধন-লাঞ্ছিত দেশমাতাকে আর কিভাবেই বা প্রকাশ করা যায়! উন্মাদিনীপ্রায় দেশমাতা সত্যিই বুভুক্ষু। কিন্তু সে অন্ন চায় না, জল চায় না, চায় না বস্ত্র। মেয় ভুখা হুঁ— সে চায় রক্ত, সে রক্ত পান করতে চায়। সন্তানের রক্ত পানেই তার পরিতৃপ্তি। দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে এই একমাত্র পথ। এই আত্মবলিদানের মহোৎসবে সকল দেশবাসীকে দেশ মায়ের আহ্বান। দেশবাসীর রক্তদানের বিনিময়েই ঘনঘোর তমসাবৃত রজনীর শেষে জাতির জীবনে ফুটে উঠবে নতুন ভোর। কিন্তু সকল দেশবাসীই দেশমায়ের এই আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত হতে পারেনি। সাধারণ সমাজে জন্মদাত্রী মায়ের কাছে দেশের এই আহ্বান ছেলে ধরারই ছলনা। সে প্রাণপণ ছেলেকে বুকে বেঁধে রাখে, যাতে সে দেশের আহ্বানে উতলা হয়ে না উঠে। সব মা-ই চান দেশের দুঃখ যন্ত্রণা দেখে দেশ উদ্ধারের সংকল্পে তাদের সন্তানেরা যেন মাতোয়ারা না হয়ে ওঠে। ও পথে গেলে তার আর রক্ষে নেই। তাই, মেয় ভুখা হুঁ— এই আওয়াজ যেন ছেলের কানে না পৌঁছায়, এই চিন্তা সর্বক্ষণ। দেশের কেউ বা ভীরু, কেউ বা উদাসীন, কেউ বা অতি সাবধানী, তা না হলে শৃঙ্খল এত শক্ত হতে পারত না। পরাধীন দেশের এই ভয়ংকর দুর্দশা, তার 'মেয় ভুখা হুঁ' ধ্বনি সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না।

এমন পরিস্থিতিতেও অকুতোভয় দামাল ছেলেরা দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে করে চলেছে আত্ম বলিদান। জাতির জীবনে তারা অমর হয়ে থাকবেন বলে প্রবন্ধের শেষে জানিয়েছেন লেখক। সমাজের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার হলাহল পান করেছিলেন বলেই তো শিব হলেন নীলকণ্ঠ। দেশবাসীর দুঃখ যন্ত্রণার প্রতিকার করতে গিয়ে যারা প্রাণ বিসর্জন করেছেন তারাও তো নীলকণ্ঠ। ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জনে তারা অমরত্বে উত্তীর্ণ। প্রাবন্ধিকের এই বক্তব্য তো ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লববাদে সরাসরি প্রশ্রয় ও প্ররোচনা। ফলে এই রচনার মূল্য শাসকের কাছে ঠিক কতখানি, তা সহজেই অনুমান করা চলে।

''পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ ?'' শীর্ষক ছোট রচনাটি 'দুর্দিনের যাত্রী' সংকলনের ষষ্ঠ প্রবন্ধ। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ বঙ্গাব্দেরই ৫ই আশ্বিন। রূপকের আড়ালে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী প্রবন্ধেরই মতো। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এর

শিরোনাম। রবীন্দ্রনাথের গানের কিছু পংক্তি এখানে ব্যবহার করেছেন প্রাবন্ধিক। দেশমাতার পরাধীনতার বেড়ি খুলে ফেলতে যুবক তরুণদলকে প্রেরণা দিয়ে চলেছেন তিনি। ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে এগিয়ে চলার অর্থ ভয়ংকর বিপদসংকুল পথে পা বাড়ানো। পথের বাঁকে বাঁকে মৃত্যুর হাতছানি। জীবন বাজি রেখেও দেশমাতাকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এই তরুণ দল সংকল্পবদ্ধ। কবি, প্রাবন্ধিক এদেরকেই উৎসাহিত করে চলেছেন—

> "উত্তর দাও, হে আমার তরুণ পথ-যাত্রী-দল। ওরে আমার রক্ত-যজ্ঞের পূজারী ভায়েরা! বল্ তোরাও কি আজ সৌন্দর্যাহত রূপ-বিমূঢ় পথহারা পথিকের মত মৌন নির্বাক চোখে ওই ভৈরবী রূপসীর পানে চেয়ে থাকবি? উত্তর দে মায়ের পূজার বলির নির্ভীক শিশু।"[৬]

রক্ত দিয়ে মায়ের পূজার বেদী ভিজিয়ে দিয়ে এরা করে যাবে মাতৃভক্তির প্রকাশ। তরুণ দলের প্রাণ বলিদান কখনো বিফলে যেতে পারে না। আর এমন অসংখ্য আত্মদানের মাধ্যমেই তারা দেশকে তমসামুক্ত করবে, স্বাধীন করে তুলবে। এই মৃত্যুহীন যুবক দল এই দেশের বুকে উড়িয়ে দেবে বিজয় নিশান। প্রাবন্ধিক যেন ভবিষ্যতের দ্রষ্টা। তিনি জানেন নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে স্বাধীনতা নিয়ে আসা এই তরুণ দলের নাম সোনার অক্ষরে খোদিত হবে মহাকালের পাতায়। সমাজের বুকে এই সমস্ত রচনার প্রভাব অনিবার্য। দেশের সেই ভয়ংকর দুর্দিনে কত আবেগদীপ্ত যুবক যে ছুটে এসেছিল দেশমাতার পরাধীনতার গ্লানি মোচনে তার ইয়ত্তা নেই। সন্দেহ নেই এই জাতীয় রচনা ইংরেজ রাজশক্তিকে চিন্তিত করেছিল গভীরভাবে।

'আমি সৈনিক' প্রবন্ধটি 'দুর্দিনের যাত্রী' সংকলনের শেষ রচনা। গভীর দেশপ্রেম এই রচনাটির মূল সুর। দেশকে ভালোবাসার প্রকাশ নানাভাবে ঘটতে পারে। কেউ সেবক হয়ে দরিদ্র, পীড়িত, আর্ত মানুষকে সেবা করতে পারে। বিপন্ন মানুষের পাশে সহমর্মিতা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে একজন সেবক। অন্নহীনের মুখে সে তুলে দিতে পারে একমুঠো অন্ন। কিন্তু আজ এই সেবকের পাশাপাশি সৈনিকের বড় প্রয়োজন। প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটি হলো 'এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে- সেবক সৈনিক হ'তে পারবে।' দেশ মায়ের কাছে সেবকের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সৈনিকেরও। দেশদরদী এমন সেবক এর দেখা পাওয়া গেলেও তেমনভাবে সৈনিকের সন্ধান মেলে না। যে সৈনিক নিজের রক্তবিন্দুর বিনিময়ে দেশকে মুক্ত করবে, স্বাধীন করবে, রক্ষা করবে। এই প্রবন্ধে তাই লেখক সেই সৈনিককেই অন্বেষণ করেছেন দেশবাসীর মধ্যে।

দেশকে ভালোবেসে সেবা করার মধ্যে আছে মহনীয়তা। এবং এই দায়িত্ব মূলত নারীদের। নারীর কল্যাণময়ী রূপ আসলে দেবীত্বেরই প্রকাশ। প্রাবন্ধিকের কথায়—

> "সেবার ভার নেবে নারী কিংবা সেই পুরুষ যে- পুরুষের মধ্যে নারীর করুণা প্রবল। নারীর ভালোবাসা আর পুরুষের ভালোবাসা বিভিন্ন রকমের। নারীর ভালোবাসায় মমতা আর চোখের জলের করুণাই বেশি। পুরুষের ভালোবাসায় আঘাত আর বিদ্রোহই প্রধান।"[৭]

দেশের মানুষকে ভালোবেসে বিপদের দিনে তাদের পাশে পরম মমতায় সেবা ও ত্রাণ নিয়ে পৌঁছে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্লচন্দ্রেরা। তাঁরা হাজারো মানুষকে উৎসাহিত করেছেন, উদ্দীপিত করেছেন এই সেবা কাজে। এই মহৎ কর্মযজ্ঞের কারণেই 'রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাংলার দেবতা, তাদের পূজার জন্য বাংলার চোখের জল চির- নিবেদিত থাকবে।' কিন্তু সৈনিক কোথায়? কোথায় সেনাপতি? প্রাবন্ধিকের কাছে এমনই একজন সেনাপতি ছিলেন বিবেকানন্দ,

যাঁর পৌরুষদীপ্ত দীপ্ত হুঙ্কার সচকিত করেছিল দেশবাসীকে। দেশবাসীর মধ্যে সৈনিক পুরুষের সন্ধান করেছেন প্রাবন্ধিক। নজরুলের ভাষায়—

> ''দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে।''[৮]

প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি সরাসরি বিদ্রোহের আহ্বান আছে প্রবন্ধটিতে। নজরুলের প্রবল আবেগ যেভাবে ফুটে উঠেছে লেখনীতে, তাতে শাসকের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব ছিল না। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন যে কত গৌরবের সে কথায় তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধে—

> "যখন দুশমনের বর্শা-ফলক আমার বুকে বিদ্ধ হয়ে আমায় সৈনিকের গৌরব-দীপ্ত মরণের অধিকারী করবে যখন আমার রক্ত-হীন দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়বে সেদিন তুমি বলো প্রভু, ''বৎস! তুমি আমার কর্তব্য করেছ।''[৯]

এ জাতীয় লেখা ইংরেজ শাসককে কিছু শঙ্কিত করে তুলবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

নজরুলের 'দুদিনের যাত্রী' খুব বেশি আলোচিত বই নয়, অথচ গুরুত্বপূর্ণ বই। এর সাতটি প্রবন্ধেই প্রকাশিত হয়েছে পরাধীনতার জ্বালা, প্রকাশিত হয়েছে কবিসুলভ আবেগ। আর এই আবেগই নজরুলের লেখনীকে করে রেখেছে সর্বদা সচল। বারে বারে নিষিদ্ধ হলেও তিনি পরোয়া করেননি। আর অনেকেই নজরুলের লেখায় সাহিত্যগুণ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ সম্পর্কেও নজরুল সচেতন ছিলেন। এবং এ জাতীয় অভিযোগ সপাটে উড়িয়ে দিয়ে নিজেই 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় ঘোষণা করেছিলেন, 'পরোয়া করি না বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুক কেটে গেলে'। আসলে নজরুল রচনাকে বুঝতে গেলে দেশ কালের প্রেক্ষিতটিও স্মরণে রাখা উচিত। প্রবল শাসকের বিরুদ্ধতা ও রক্তচক্ষুকে তিনি ভয় পাননি, বরং শক্তিদর্পী ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ভয় পেয়েছিল। তাঁর লেখনীকে বেড়ি পরাবার চেষ্টা করা হয়েছে। নানাভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সারাক্ষণ নজরুলের পিছনে রয়েছে সরকারি গোয়েন্দার নজরদারি। তাই তো 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় মজা করে কবি নিজেই লিখেছিলেন—

> ''বন্ধু তোমরা দিলে নাক' দাম
> রাজ-সরকার রেখেছেন মান!
> যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন। আর কিছু
> শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?''[১০]

যাই হোক, শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা— পরাধীন দেশবাসীর এই গভীর দুর্দিনে নজরুল ছিলেন প্রকৃত অর্থেই এক নির্ভীক যাত্রী। এবং মহাকাল একথা নিশ্চয়ই মনে রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

১) কর শিশির, ১৯৮৩ (দশম মুদ্রণ মে ২০২৪) নিষিদ্ধ নজরুল, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১০৪

২) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৮-১০৯

৩) সম্পাদনা: হুদা মহম্মদ নুরুল, নবী রশিদুন, দ্বিতীয় সংস্করণ-- আষাঢ় ১৪১৬/জুন ২০০৯, নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র, ঢাকা, নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃষ্ঠা-৮৫

৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৮৬

৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৯০

৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৩

৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৬

৮) তদেব, পৃষ্ঠা-- ৯৬

৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৭

১০) ইসলাম নজরুল, ১৩৩৫ (ঊনচত্বারিংশৎ সংস্করণ-- অগ্রহায়ণ ১৩৯৭), সঞ্চিতা, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা-৮৯।

শ্রীচৈতন্যকেন্দ্রিক উপন্যাসে সামাজিক প্রেক্ষাপট : প্রসঙ্গ রূপক সাহার ‘ক্ষমা করো, হে প্রভু’

পর্ণা বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একজন চর্চিত চরিত্র হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর জীবন, আদর্শ, ধর্মভাবনা, সমাজভাবনা সবকিছুই বাংলার সমাজ, মানুষ ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। চৈতন্যদেব তাঁর সমকালে যেমন মানুষের উন্নতির কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, অন্তর্ধানের পরেও তাঁর ভাবনা মানুষকে সত্যের পথে, শুভর পথে চলতে সাহায্য করেছে। একবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবকে নিয়ে রচিত অন্যতম একটি উপন্যাস রূপক সাহার ‘ক্ষমা করো, হে প্রভু’-তে কোন সমাজ প্রেক্ষাপটে, কীভাবে চৈতন্যদেবকে, তাঁর ভাবনাকে দেখানো হয়েছে সেগুলোই এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে একুশ শতকের সমাজে চৈতন্যদেব কতটা প্রাসঙ্গিক এবং তাঁর সমাজভাবনার প্রয়োজনীয়তা কোথায় — সেই দিকেই আলোকপাত করা হয়েছে এখানে। এই সময়ের একটি চরিত্র গোরার মধ্যে চৈতন্যদেবের জন্মান্তর দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। নিজের মধ্যে অলৌকিকত্ব আবিষ্কার করার আগে থেকেই সে দলিত সমাজের উন্নতির কাজে যুক্ত, মানুষের ভালো করাই তাঁর জীবনের ব্রত। উপন্যাস এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে গোরা আর চৈতন্যদেব এক হয়ে গিয়েছেন। কালের ব্যবধানেও যে সমাজের সমস্যার কোনো বদল হয়নি এবং একালেও চৈতন্যদেবের মতো একজন সমাজসংস্কারকের প্রয়োজন রয়েছে — উপন্যাসের আলোচনার মাধ্যমে সেটাই দেখানো হয়েছে।
সূচক শব্দ: শ্রীচৈতন্যদেব, সমাজ, উপন্যাস, প্রাসঙ্গিকতা, একবিংশ শতক।

মূল আলোচনা:

ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে সমাজের গভীর সম্পর্ক; সমাজ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যেমন একজন মানুষের চরিত্র গড়ে তোলে, একইভাবে ব্যক্তিও তাঁর কর্ম, ভাবনার দ্বারা পরিবারকে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে এরকমই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব হলেন শ্রীচৈতন্যদেব; তাঁর আবির্ভাব ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে এবং অন্তর্ধান ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে। চৈতন্যদেবের সমকালে সমাজে তাঁর প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা যে কী বিপুল পরিমাণে ছিল তা জীবনীকাব্যগুলো থেকে সহজেই জানা যায়। চৈতন্যদেবের আদর্শ, ধর্মভাবনা, সমাজভাবনা — কোনো সময়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়; তা সব কালের সব সমাজেই প্রযোজ্য। যেকারণে বর্তমানকালেও তাঁকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে। চৈতন্যদেবের চরিত্রের বহুমাত্রিক দিক নিয়ে তাঁর অন্তর্ধানের প্রায় পাঁচশো বছর পরে একবিংশ শতকে উপন্যাস রচনা করছেন সাহিত্যিকেরা। বিংশ শতক থেকেই চৈতন্যজীবনী নিয়ে বাংলায় উপন্যাস লেখার সূচনা হয়েছে এবং এই শতকেও লেখা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম একটি হল রূপক সাহার ‘ক্ষমা করো, হে প্রভু’। একবিংশ শতকের একজন ঔপন্যাসিকের লেখায় চৈতন্যদেবের সমকালের সমাজ পরিবেশের কী পরিচয় রয়েছে, বর্তমানকালের সমাজপ্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবের সমাজভাবনার কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আদৌও

তা রয়েছে কিনা — উপন্যাসের আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সন্ধানের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য স্থান হল তাঁকে নিয়ে রচিত জীবনী কাব্যগুলো, যা একইসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে রচিত প্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনীকাব্য। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়ের সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার কথাও জানা যায় এই কাব্যগুলো থেকে। ষোড়শ ও একবিংশ শতকের সমাজের বিবরণ দিতে গিয়ে যেন এই দুই কালের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন ঔপন্যাসিক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পেছনে থাকা রহস্যের অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই উপন্যাসের কাহিনি বয়ন হয়েছে। একবিংশ শতকের সমাজ প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবের জন্মান্তর দেখিয়ে রূপক সাহা আজও আমাদের সমাজে চৈতন্যদেবের মতো একজন সমাজসংস্কারকের প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরেছেন। চৈতন্যদেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহের আদলেই একবিংশ শতকের গোরা চরিত্রটিকে এঁকেছেন ঔপন্যাসিক; সেইসঙ্গে তাঁদের জীবনের ঘটনাসমূহকেও তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন।

> "পাঁচশো বছর আগে তাঁর জীবনে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তোর জীবনেও সেই সব ঘটনা ঘটছে। তবে এখনকার যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।"[১]

চৈতন্যদেব যেমন সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের উদ্ধার করার জন্য একজন জননেতার মতো সকলকে একজোট করতে চেয়েছিলেন, একইভাবে একবিংশ শতকের সমাজে দলিতদের উন্নতিসাধনে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দিতে চেয়েছেন দলিত পার্টির একজন কর্মী, পরবর্তীতে নেতা গোরা। মধ্যযুগে ব্রাহ্মণদের দ্বারা যেভাবে অন্ত্যজরা শোষিত হত, একইভাবে আজও যেন উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে চলেছে দলিতরা। সময় বদলে গেলেও শাসক আর শোষিতের ভূমিকা সমাজে একইরকম রয়ে গিয়েছে। দলিতদের ওপর অকারণে শারীরিক অত্যাচার করা, দলিত মেয়েদের রেপ করাকে আর অপরাধ মনে করছে না একশ্রেণির মানুষ, এই ধরনের অন্যায় করার পর তাদের ভাব এমন যে দলিতদের শোষন করাটা যেন তাদের জন্মগত অধিকার। উচ্চশ্রেণির এই অকথ্য অত্যাচারকেই হাতিয়ার করে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে দলিতরা।

> "মার খেয়ে দলিত, আদিবাসীরা ক্রমে ক্রমে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। উচ্চবর্ণের মানুষদের আর তারা মানবে না।"[২]

এমনকি কিছুক্ষেত্রে পুলিশও সমাজের এই পিছিয়ে থাকা শ্রেণির মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছে না, তারাও উচ্চশ্রেণির বা শাসকশ্রেণিরই মুখাপেক্ষী হয়ে কীভাবে তাদেরকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচানো যায় সেই পরিকল্পনা করতেই বেশি আগ্রহী। আইনে সব মানুষের সমানাধিকারের কথা বলা হলেও যতদিন পর্যন্ত না নিজেদের মনের ভেতর থেকে এই সমভাব জেগে উঠছে ততদিন এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন অসম্ভব। উপন্যাসে বস্তিতে বসবাসকারী মানুষদের নানারকম সমস্যার কথাও লেখক বলেছেন। পাঁচশো বছর আগে চৈতন্যদেব সমাজে যে সমানাধিকার আনতে চেয়েছিলেন, শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গিয়ে আন্দোলন করেছিলেন — তাঁর সেই স্বপ্ন যে আজও অসম্পূর্ণই থেকে গেছে তার স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের পারিপার্শ্বিকেই রয়েছে, উপন্যাসেও তার বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

> "স্বাধীনতার তেষট্টি বছর পরেও সমাজটা বদলাল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা দলিতদের টিউবওয়েল ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। এটা আমাদের কাছে খবর।"[৩]

একবিংশ শতকের সমাজব্যবস্থার অন্যতম একটি সমস্যা হল দলিত সমস্যা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকারি সুযোগ-সুবিধা থাকলেও সেগুলি সম্পর্কে তারা অনেকেই ওয়াকিবহাল নয়; এমনকি তাদের বাড়ির বাচ্চারা চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়লেও সমাজের এক শ্রেণির তাতে কিছুই যায় আসে না, সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষেরা যেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যস্ত।

> "পনেরো কিলোমিটার দূরে একদল মানুষ পানীয় জলের অভাবে ধুঁকছে, আর অন্য একদল মানুষ ভজন শুনতে শুনতে শরবত পান করছে!"[৪]

যদিও সব জায়গায় এই অবস্থা একরকম নয়; শহরাঞ্চলে এখন অনেক দলিত ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা ও উচ্চশিক্ষার জগতে এগিয়ে আসছে নিজেদের পরিচিত গণ্ডি অতিক্রম করে। সমাজের এই বৈপরীত্য যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে এবং কবে যে এর থেকে মানুষের মুক্তি ঘটবে তাও আমাদের জানা নেই। এমনকি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দলিত সম্প্রদায়ের হওয়ায় একজনকে সমাজের উচ্চবর্ণের আরেকজনের থেকে সার্টিফিকেট নিতে হচ্ছে চাকরি পাওয়ার জন্য।

উপন্যাসে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যবিরোধী একটি সংগঠনের কথা বলা হয়েছে, যাদের প্রধান কাজই ছিল সেই আশ্রমে থাকা অনাথ শিশুদের ছোটবেলা থেকে কঠিন অনুশাসনের মধ্যে রেখে তাদের মনে চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে এত বিষ ভরে দেওয়া যাতে তারা চৈতন্যদেবকে খারাপ ভাবে, তাঁকে ঘৃণা করে। এই সংস্থার হয়ে যারা কাজ করত তাদের মধ্যে একজন হল পুরন্দর। একবিংশ শতকেও যে আমাদের সমাজে চৈতন্যভাবনা বিরোধী একটি দল এতটা সক্রিয় থাকতে পারে এবং চৈতন্যচর্চাকে নির্মূল করার জন্য যে পাশবিক উপায় অবলম্বন করতে পারে তা দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। পুরন্দরের মতো এই ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই কিছু না বুঝে একজন শ্রদ্ধেয়, পূজ্য ব্যক্তিকে ঘৃণা করতে শিখে যায়। চৈতন্যদেবকে নিয়ে যারা গবেষণা করছে, চর্চা করছে তাদের ক্ষতি করতে এই ছেলেদেরকে কাজে লাগায় এই চৈতন্যবিরোধী সংস্থা।

> "ছোটবেলা থেকে এই লোকটাকেই ঘৃণা করতে শেখানো হয়েছে ওদের। বলা হয়েছে, গৌড় থেকে আসা শ্রীচৈতন্য নামে এই লোকটা উৎকল সমাজকে একশো বছর পিছিয়ে দিয়েছে। সকাল সন্ধ্যা হরিনাম করতে বলে, একটা বীর জাতির সর্বনাশ করেছে। এই লোকটার জন্যই একটা সময় কলিঙ্গ রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছিল। তার ভক্ত আর অনুগামীদের বিনাশ করাই পুরন্দরের একমাত্র কাজ। এই লক্ষ্যে সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর মতো আরও তেষট্টি জন।"[৫]

বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এখনও অনেক পরিবারে জাতপাত একটি বড় সমস্যা। মেয়ে নীচু জাতের ছেলেকে বিয়ে করলে এখনও অনেক পরিবারকে সমাজের থেকে আলাদা করে একঘরে করে দেওয়া হয়। সামান্য খাওয়ার জলটুকু নেওয়ার জন্য একটি বস্তির দলিত মেয়ে, একইসঙ্গে একজন অসুস্থ শিশুর মা "ভদ্দরলোকদের পাড়া" থেকে জল আনতে গেলে তাকে চোর অপবাদ দিয়ে মেরে খেলা হয়। কারণ সে নিজের গণ্ডির বাইরে গিয়ে সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট কল থেকে তার অসুস্থ, দলিত সন্তানের তেষ্টা মেটানোর জন্য, তার জীবন বাঁচানোর জন্য রাতের অন্ধকারে সকলের অজান্তে খাওয়ার জল আনতে গিয়েছিল। এই একবিংশ শতকে এসেও এধরনের মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয়

আমাদের, এমনকি ডাক্তার থেকে পুলিশ সবাই মিলে উচ্চবিত্তের দোষীকে বাঁচাতে মিথ্যে রিপোর্ট বানাতেও দ্বিধা করে না।

> "সরকার চালান উচ্চবর্ণের মানুষরা। দেশটা চলে ওদেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের কী হল না হল, তাতে ওঁদের কী আসে যায়? জল আন্দোলনে শহিদ এই মাধবীর মৃত্যু ওঁদের মনে কোনও রেখাপাতই করবে না। টাকলা জগাই না কে...আর ক'দিন পর পাড়ায় ফিরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। পুরো কেসটা ধামাচাপা পড়ে যাবে।"[৬]

শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি হয়েছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু এক্ষেত্রেও যেন শেষে গিয়ে লাভের গুড় পেয়েছে উচ্চবর্ণের মানুষেরাই আর দলিত, আদিবাসী, অন্ত্যজ কৃষকরা জমিহারা, বাস্তুহারা হয়ে গিয়েছে।

পাঁচশো বছর পর চৈতন্যদেব আবার মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করবেন এই ধারণায় বিশ্বাসী উপাসনা, তিনি একবিংশ শতকে কোথায় জন্মেছেন, এখন কী অবস্থায় রয়েছেন — এই সমস্ত বিষয়ে সে গবেষণা করছে। উপাসনা নবদ্বীপের একটি বৈষ্ণব পরিবারেরই মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের জন্মান্তর বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তাকে ও তার পরিবারকে বৈষ্ণব সমাজের একাংশের থেকেই প্রাণনাশের হুমকি, অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। সমাজ থেকে গোঁড়ামি দূর করার জন্য চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণবধর্মকে নতুনভাবে সংস্কার করেছিলেন, সেই সমাজেই এখনও রয়ে গিয়েছে কুসংস্কার, নিয়ম পালনের আতিশয্য।

উপন্যাসে চৈতন্যদেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রেখে গোরা চরিত্রটিকে দেখানো হয়েছে। চৈতন্যদেবের মতো সেও সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের উন্নতিসাধনের কাজে ব্রতী হয়েছে। শ্রীচৈতন্য যেমন নগরের সব মানুষকে একজোট করে কাজীর অন্যায় শাসনের বিরোধীতা করেছিলেন, একুশ শতকের গোরাও তেমনি দলিতদের একত্র করে সমাজের অসাম্যকে দূর করতে চায়। শ্রেণি ও জাতপাত উভয় ক্ষেত্রেই এই সাম্যতার প্রয়োজন, যা চৈতন্যদেবেরও আশা ছিল এবং তিনি এ কাজে কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও পুরোপুরিভাবে দেশের সর্বত্র এই সমানাধিকারের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। জাতপাত আমাদের দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একইসঙ্গে স্পর্শকাতর সমস্যা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এর গতিপ্রকৃতি বিভিন্নরকম; সেই সমস্তকিছুকে জেনেই দলিত পার্টির হয়ে কাজ করতে চায় গোরা। ধনী-দরিদ্র, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের ভেদাভেদে সমাজ আজও জর্জরিত। পুলিশ, প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্যবসা, রাজনীতি, মনোরঞ্জন সব ক্ষেত্রেই রয়েছে কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ যারা অসহায়দের ওপর শোষণ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে। এই বৈষম্যতাই যে পৃথিবী ধ্বংসের অন্যতম কারণ হতে চলেছে তা বিশ্বাস করে গোরা।

একবিংশ শতকের পাশাপাশি চৈতন্যদেবের সমকালের সমাজ পরিস্থিতিরও পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে দলে দলে হিন্দুরা যেভাবে ধর্মপরিবর্তন করেছিল বা বলা যেতে পারে করতে বাধ্য হয়েছিল সেই বিবরণও এখানে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে নিমাই কীভাবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল, সবাইকে ভালোবেসে আপন করে নিয়েছিল — সেকথাও ঔপন্যাসিক বলেছেন। চৈতন্যদেব যেমন তাঁর সমকালে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের নিয়ে জনসংগঠন তৈরী করেছিলেন, তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছিলেন — গোরাও একইভাবে একুশ শতকে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের

সংঘবদ্ধ করে উচ্চবর্ণের দ্বারা এই দীর্ঘকালের শোষণ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে সবক্ষেত্রে সমানাধিকার দিতে চায়।

> "ভাবতে পারো, একটা মানুষ পাঁচশো বছর আগে সাম্যের কথা বলেছেন। পাঁচশো বছর আগে! আমি তো বলব, উনিই বিশ্বে প্রথম... যিনি সাম্যবাদের বীজ ছড়িয়ে ছিলেন।...উনিই প্রথম গণশোভাযাত্রা, গণবিক্ষোভ, গণনাট্য, গণসত্যাগ্রহ, গণসঙ্গীত আর গণসংকীর্তনের প্রবর্তন করেছিলেন। অশিক্ষিত হরিজনদের কোল পেতে দিয়েছিলেন...ওঁর ওই আন্দোলন আমি এ কালের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করছি।"[৭]

রাজনীতি বর্তমান সমাজব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছে, আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্ম। স্বার্থলোভী নেতারা নিজেদের লাভ করছে সাধারণ মানুষদের আবেগের সুযোগ নিয়ে, যা ঔপন্যাসিকও দেখানোর চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন চরিত্রদের মাধ্যমে। উপন্যাসের চরিত্র হোম মিনিস্টার গোবিন্দ সাহুর চোখে তাই গোরার দলিত পার্টির নেতা থেকে হঠাৎ অবতার হয়ে ওঠা কোনো অলৌকিকতা প্রকাশ করে না বরং এটা তার কাছে গোরার একটি চাল মনে হয়েছে যার মাধ্যমে সে দলিতদের সমর্থন আদায় করতে চেয়েছে। দেশের অধিকাংশ ধর্মভীরু মানুষই গোরাকে সম্মান করে তাঁর সঙ্গে থাকবে, তাঁর ডাকে সাড়া দেবে এটা স্বাভাবিক — গোরার এই হঠাৎ পরিবর্তনকে তাই রাজনৈতিক চাল বলে মনে হয়েছে গোবিন্দ সাহু, পদ্মনাভর মতো স্বার্থান্বেষীদের।

ঔপন্যাসিক এখানে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক ও একুশ শতক — দুই সময়েরই সামাজিক পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন। দুটি একেবারে ভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবকে রেখে সমাজের ওপর তাঁর প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। এই বিশাল সময়ের ব্যবধানে যুগ পরিবর্তন হলেও অনেক সমস্যাই আজও রয়ে গিয়েছে। বৈষম্যহীন যে সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন চৈতন্যদেব দেখেছিলেন এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য আন্দোলন থেকে শুরু করে নিজের প্রাণ পর্যন্ত তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল — সেই সমতাপূর্ণ সমাজ আজও আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। জাতিভেদ, শ্রেণিবিভাজন, আর্থিক বৈষম্য বিভিন্ন কারণে আজও একশ্রেণির মানুষেরা শোষিত হয়ে চলেছে; অন্যদিকে উচ্চবিত্ত সমাজের কিছু ধূর্ত মানুষ নিজেদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি করতে, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে ক্ষমতার অপব্যবহার যেমন করছেন তেমনি ব্যবহার করেছেন ধর্মকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মনের ভাবনাকে, তাদের অনুভূতিকে, আবেগকে। সমাজের এই বাস্তব চিত্রের সঙ্গেই পাঠকের পরিচয় করিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের আলোচনার মাধ্যমে সবশেষে এটাই বলা যায় যে পাঁচশো বছরের ব্যবধানে দুটো সমাজকেই বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। একইসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন সময়ের এই পার্থক্যেও সমাজের মূল সমস্যাগুলো একই রয়ে গিয়েছে; আর এখানেই রয়েছে চৈতন্যদেবের ভেদাভেদহীন সমাজভাবনার প্রাসঙ্গিকতা। মূলত সমাজসংস্কারক চৈতন্যদেবকেই ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব যেমন অবতারের পাশাপাশি একজন সমাজসচেতক রূপেও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন — বর্তমান সময়েও তাঁর মতো একজনকে যে সমাজের কতটা প্রয়োজন তাই গোরা চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সম্পূর্ণ উপন্যাস পাঠ করে তাই আমরা বলতে পারি একবিংশ শতকের সমাজ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে চৈতন্যদেবের সমাজভাবনা কত গভীর ও যথার্থ — ঔপন্যাসিক রূপক সাহা অত্যন্ত নিপুণভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে এই সাযুজ্যকে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

তথ্যসূত্র:
১। সাহা, রূপক, এপ্রিল ২০২২, ক্ষমা করো হে প্রভু, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, পৃঃ ৩৩১
২। তদেব, পৃঃ ১০
৩। তদেব, পৃঃ ১৯
৪। তদেব, পৃঃ ১৯
৫। তদেব, পৃঃ ৩০
৬। তদেব, পৃঃ ৭২
৭। তদেব, পৃঃ ২০৪।

রবিশংকর বলের ছোটগল্পে ফ্রয়েডিয় তত্ত্ব

পায়েল বাগচী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবরা

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত মনো চিকিৎসক তথা বিজ্ঞানী ফ্রয়েডের 'মনো বিকলন তত্ত্ব' কিভাবে উত্তর আধুনিক কথা সাহিত্যিক রবিশংকর বলের ছোটগল্পের অবলম্বন হয়ে উঠেছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মানসিক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত 'সাইকো এনালিটিকাল' থিওরির সাহিত্য জগতে গুরুত্ব যেন আরো স্পষ্ট করে ধরা পড়ে রবিশংকর বলের গল্প বয়নে।

সূচক শব্দ: ফ্রয়েড, রবিশংকর, চেতন ও অচেতন জগত, 'id-ego-super ego' স্তর, যৌনতা, স্বপ্ন জগত, সাবলিমেশন, গল্প, চরিত্র।

মূল আলোচনা:

আলোচনাটি ফ্রয়েড না রবিশংকরকে নিয়ে, বলতে গেলে বলতে হয় আলোচনাটি ফ্রয়েডিয় ছোট গল্পকার রবিশংকরকে নিয়ে। বিষয়টি স্পষ্ট করতে গেলে আগে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের আলোচনার সংক্ষিপ্ত প্রয়োজন আছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মনোবিজ্ঞানী তথা চিকিৎসক ফ্রয়েড এমন এক জটিল তত্ত্বের নিক্ষেপণ বা উৎক্ষেপণ করলেন যা-

"এই দুনিয়ার সকল ভালো
আসল ভালো নকল ভালো।"[১]

নিস্তরঙ্গ জলাশয় যেন ঢিল ছোঁড়ার কাজ করল। যে মনকে নিয়ে বেশি মন কষাকষি করবার অবকাশ ইতিপূর্বে সাহিত্য, সমাজ কিংবা চিকিৎসা জগত পাইনি; ফ্রয়েড মনোসমীক্ষণতত্ত্বতে তার দুটি অংশের উল্লেখ করলেন—

১. চেতন অংশ
২. অচেতন অংশ

এই দুটি অংশের তিনটি স্তরের (ইদ, ইগো, সুপার ইগো) কার্যাবলীর কথা বলে ফ্রয়েড পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন,'ইদ' স্তর জাত যৌন কামনা-বাসনা 'ইগো' ও 'সুপার-ইগো' (সামাজিক মূল্যবোধ যাদের মাপকাঠি) স্তরে এসে অবদমিত হয়েই নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি জীবন ও ব্যক্তি জগতের সব ঘটনাকে। এই নিয়ন্ত্রণ থেকে বাদ পড়ে না সাহিত্যও। 'ইদ' ভিত্তিক যৌন আকাঙ্ক্ষা বা 'লিবিডো'কে ইগো (সামাজিক সমঝোতা বিধানের চেষ্টা) ও 'সুপার-ইগো' (নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা) স্তরে সরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার পাঁচটি পথের উল্লেখ করেছেন মনো চিকিৎসক ফ্রয়েড। তার মধ্যে সাহিত্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'repression' বা অবদমন। লেখক মানসের জমতে থাকা এই অবদমন সাহিত্যে বহিঃপ্রকাশ পায় মূলত তিনটি ভাবে-

১. ফ্যান্টাসি
২. ডে-ড্রিমিং
৩. সাবলিমেসন

বাকি দুটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সাবলিমেশনকেই অধিক সাহিত্যিক মর্যাদা দেয়া হয়। এটি কে অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষার সুভাষণ বলা যেতে পারে। পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে গেলে-কামজ, দৈহিক মানবীয় প্রেম আকাঙ্ক্ষাকে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম রূপে প্রকাশ করলে যৌন আকাঙ্ক্ষার সাবলিমেসন ঘটে।

এখানেই ছক ভেঙেছেন রবিশংকর। গোড়া থেকে আগা অবধি ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের নগ্নতাকে (বা সত্যতাকে) তিনি মেনে চলেছেন। সাবলিমেশনকে যেন তিনি ইচ্ছা করে ছুঁতে চাননি। 'সমাধিক্ষেত্রে লুকোচুরি'গল্পের নায়িকা কান্তার তাই অনায়াসে সন্তানকে শেখাতে পারে সঙ্গমের সৌন্দর্য; লেখক রবিশংকর এটি বিশ্বাস করেন আর খুব অনায়াসে সেই বিশ্বাস সঞ্চারিত করেন পাঠকের মধ্যেও—

"কান্তার সেই আদিমতা, যে সন্তানকে সঙ্গমের সৌন্দর্য শেখাতে পারে।"[২]

ফ্রায়েড ছোট্ট অ্যাটমবোমার মত সমাজে নিক্ষেপ করেছিলেন ইডিপাস (aedipus complex) ও ইলেক্ট্রা (electra complex) কমপ্লেক্স তত্ত্ব, রবিশংকর লেখায় সেই তত্ত্বকে এঁকে দিয়েছেন কোন রকম হেঁয়ালি ছাড়াই। রচনার লাইনগুলি সমাজ অস্বস্তির কারণ হতে পারে কিন্তু শিল্পবোধ সেখানে অকৃত্রিম—

"জন্ম থেকে জ্ঞানত যে মাকে সে দেখেনি, তাকে ওখানেই দেখেছিল মণিময়...তাকে জন্ম দেওয়ার সময় যেমন যন্ত্রণায় নীল, তেমনই নগ্ন, দুই পা ফাঁক হয়ে আছে, স্তনদ্বয় স্ফিত...কাংড়া চিত্রের মতোই কি যে সিমেট্রি ছিল মার অবয়বে-সে কামনা ঘন চোখে তাকিয়ে দেখতো আর মৃত্যুকে স্পর্শ করতো।"[৩]

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের 'মনোসমীক্ষন' তত্ত্ব অবতারণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানসিক রোগের নির্ণয় ও তার চিকিৎসা। ফ্রয়েড জানান ইদ, ইগো, সুপার-ইগো স্তরের মেলবন্ধনের অসঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারে এমন এক অবস্থার যাকে সমাজ নাম দেয় উন্মাদগ্রস্ততা। সামাজিক সুস্থতার থেকে রবিশংকরের অধিক আকর্ষণ সবসময়ই থেকেছে উন্মত্ততার প্রতি। রবিশংকরের নায়কেরা (মণিময় তাদের মধ্যে প্রধান) তাই ভাষা ও ভাবনার জাল বুনে চলে স্যানিটরিয়ামে, কিংবা অ্যাসাইলামে বসে; কখনো কখনো সামাজিক কোলাহলের বাইরে একাকী। বলতে চাইছি, রবিশংকরের গল্পের পাত্র পাত্রীরা অধিকাংশই ফ্রয়েড বর্ণিত সেই বিশেষ অবস্থার শিকার,যার সামাজিক নাম 'পাগলামি'—

> "রমার উপর মাঝে মধ্যেই শারীরিক অত্যাচার চালাই। অর্থাৎ অ্যাসাইলামে যাবার পরিস্থিতি আমার খেলাগুলির দ্বারাই নির্মিত। হ্যাঁ একমাত্র অ্যাসাইলামে গেলেই আমি আবার ভাষা শরীরের রক্ত চলাচল শুনতে পাবো।"[৪]

মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বের সাহিত্যে অবতারণার একটি প্রধান অবলম্বন তত্ত্বে বর্ণিত স্বপ্ন জাগতিক ব্যাখ্যা। যদিও ১৮৯৯ সালে ফ্রয়েড প্রকাশিত বই 'interpretation of dream'কে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বেই স্বপ্ন জগতকে নিয়ে উন্মাদনা শুরু হয়েছিল। 'মনোসমীক্ষন' তত্ত্বে আবার ঘুরে ফিরে গুরুত্ব পেল এই জগত। রবি শংকর এর লেখায় খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করলে ধরা পরে ফ্রয়েডিয় 'অটোমেকানিজম'-এর অবতারণা। অটোমেকানিজম এর হাত ধরেই রবিশংকরের গল্প যেন স্বপ্নের ঘোর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় না। পরাবাস্তবতা ও বাস্তবতা মিলেমিশে যায় স্বপ্নের পটভূমিতে। দুটি style এ রবিশংকরের গল্পে স্বপ্নকে দেখা যায়-

১. গল্পের চরিত্রের মুখে স্বপ্নের বর্ণনা

২. গোটা গল্পটা একটি স্বপ্ন

প্রথম স্টাইলের উদাহরণ –

> "প্রিয়নাথ ভেবে চলে এলেক্সি কেমন স্বপ্ন দেখত। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি স্বপ্নের দৃশ্য তৈরি করে ফেলল...স্বপ্ন ৩: শূন্যে এক বেশ্যার সঙ্গে এলেক্সি সঙ্গমরত। আর তাদের নিচে পৃথিবীর রং কমলালেবুর মতো।"[৫]

দ্বিতীয় স্টাইল এর উদাহরণ–

> "স্বপ্নের ভিতরে তার দিকে উড়ে এসেছিল একটি চিঠি...চিঠিটা ধরার জন্য তাকেও বেশ কিছুটা উড়তে হয়েছিল। মণিময় নিশ্চিত জানতো এই চিঠি সেই অন্ধকারের...বিরাট ক্যানভাস জুড়ে সে ডানাওয়ালা শিশুদের উড়াল এঁকেছিল.. এবং তার দুই হাতের পাতায় জন্ম নিয়েছিল দুটি চোখ।"[৬]

এভাবেই তত্ত্বের ঘেরাটোপে আটকে, যৌনতা ও স্বপ্ন জাগতিক মেলামেশার আবহে একজন উত্তর আধুনিক কথা সাহিত্যিক আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলেন আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর ছত্রছায়ায়। রবিশংকর বলের গল্পের পরতে পরতে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের প্রকাশ লেখককে মুক্তি দিয়েছে বাস্তব বস্তু জগত থেকে।

তথ্যসূত্র:

১. রায় সুকুমার, আবোল-তাবোল, ছড়া-'ভালো রে ভালো'
২. বল রবিশংকর, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিকেশন, গল্প-সমাধি ক্ষেত্রে লুকোচুরি।
৩. বল রবিশংকর, সেরা ৫০ টি গল্প, গল্প-দারুনিরঞ্জন।
৪. বল রবিশংকর, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিকেশন, গল্প-'অ্যাগনেস, প্রিয় অ্যাগনেস'।
৫. বল রবিশংকর, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিকেশন, গল্প-'প্রিয়নাথ ও সময়ের শর'।
৬. বল রবিশংকর, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিকেশন, গল্প-'মণিময় বাড়ি ফিরছে'।

নবনীতা দেব সেনের ‘ইহজন্ম’ উপন্যাসে : নারীসত্তার পাঠকৃতি

রিবা দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ : নবনীতা দেব সেন সাহিত্যের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। তাঁর ধৈর্য্য, মেধা, রুচিবোধ ও মননশীলতার পরিচয় সাহিত্যে নানা ভাবে উঠে এসেছে। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথায় তাঁর উপন্যাসে উঠে আসতে দেখা যায়। বিশেষত নবনীতা দেব সেনের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে নারী। সেই নারী চরিত্রগুলি যেমন শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত তেমনি প্রতিভাসম্পন্ন। তারা জীবনের সমস্ত ধরনের বাধা-বিপত্তি নিজের মননের জোরে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। তাঁর 'ইহজন্ম' উপন্যাসে বাঁশি নামক চরিত্রটির মধ্যে সেরকমই একজন নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। যে জীবনের সব রকম প্রতিকূলতার পাঁচিল নিজের ব্যক্তিত্বের জোরেই ডিঙ্গিয়ে যেতে পেরেছে। বাঁশি তার আত্মবিশ্বাস, সাহসী মনোভাব, সংগ্রামী মানসিকতার কারণেই বিদেশের মাটিতে সংসার গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। নবনীতা দেব সেন এই বাঁশি চরিত্রটিকে সামনে রেখেই ভারতীয় নারীর জীবনসংগ্রামে জয়ের কাহিনিকে লিপিবদ্ধ করেছেন।
সূচক শব্দ: নারী, জীবনসংগ্রাম, প্রাণশক্তি, আত্মবিশ্বাস, লড়াই, ভালোবাসা।

মূল আলোচনা:
বাংলা সাহিত্যের জগতে নবনীতা দেব সেনকে লেখক হিসেবে কোনও একটি নির্দিষ্ট অভিধায় বাঁধা যায় না। কারণ তিনি সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখালেখির একটা বড় অংশ জুড়ে অবস্থান করছে নারী। সেটা তাঁর গবেষণাই হোক বা কবিতা কিংবা কথাসাহিত্য। তিনি ছিলেন মুক্ত চিন্তার অধিকারী। তাই তাঁর লেখায় মানবিক মূল্যবোধের দিকটি নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য তাঁর সৃষ্ট নারীরা প্রতিহিংসা পরায়ণ নয়, তারা পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেই চলেছে। নবনীতা দেব সেন ঘর-বাহিরকে আপন করে তোলার মন্ত্র জানতেন। তাই খুব সহজে অচেনা মানুষকে নিজের করে নিতে পারতেন। আসলে তাঁর ভালোবাসা দেওয়া এবং নেওয়ার ক্ষমতা দুই-ই ছিল প্রবল। তবে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে কখনও পিছ্পা হননি। যেটাকে সত্য বলে জেনেছেন, সেটাকেই অকপটে প্রকাশও করেছেন। তাঁর এই জীবনবোধই লেখার পাতায় উপস্থাপিত হয়ে উঠেছে। সুমিতা চক্রবর্তী ‘উপন্যাসের নবনীতা : বাংলা কথাসাহিত্যে ব্যতিক্রম’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন : "ইউরোপ এবং আমেরিকার সমাজ-জীবনে, অভিবাসী সমাজের প্রতিটি পরতে বহু জটিল অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের যন্ত্রণাময় কাটাকুটি খেলা নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান এবং আবর্তিত। এই জীবনটাকে খুব কাছে থেকে চিনেছেন নবনীতা দেবসেন। পশ্চিমের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি পড়তে গেছেন, গবেষণা করেছেন, সংসার করেছেন। সেই সঙ্গে নিয়মিত স্বদেশেও এসেছেন এবং থেকেছেন। নারী হবার সূত্রে এবং বিশিষ্ট গবেষক হবার সূত্রে বিদেশিনী এবং অভিবাসিনী নারীদের পরিচয় তিনি পেয়েছেন বিভিন্ন দিক থেকে।"[১] এই পরিচয়ের প্রতিচ্ছবি আমরা তাঁর 'ইহজন্ম' (২০০৭)

উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ করি। সেখানে বাঁশি নামের এক ভারতীয় নারী কীভাবে বিদেশের মাটিতে জীবনসংগ্রাম করে জয় লাভ করেছে, সেই অপরাজেয় কাহিনিই ব্যক্ত হয়ে ওঠে।

'ইহজন্ম' উপন্যাসের বাঁশির এই অপরাজেয় জীবনসংগ্রামের কাহিনি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে, উপন্যাসের সূচনা অংশের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এখানে নবনীতা দেব সেন যেভাবে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, সমসুযোগ ও সমমর্যাদার দাবি তুলেছেন, তা সত্যিই অনন্য। বাঁশির বান্ধবী হান্না অরেনস্টাইনের উপনয়ন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। আমাদের হিন্দু ধর্মে যেমন বয়ঃসন্ধিকালে উপনয়নের ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি ইহুদি ধর্মেও এই ব্রত পালনের চল রয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও মন্ত্রের মধ্য দিয়ে ইহুদি ছেলেরা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। তারা শুদ্ধ হয়ে জাতে উঠে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'টোরা' স্পর্শ করতে পারে। তবে এই 'বার মিৎসভা' ব্রতটি শুধু বালকরাই পালন করে। বালিকাদের নবজন্মের কোন উৎসব হয় না। ইহুদি মেয়েরা কখনও পবিত্র 'টোরা' গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, তারা মন্দিরের প্রধান প্রার্থনা ঘরের নিচের তলাতেও বসার অধিকার পর্যন্ত পেত না। তাদের বসতে দেওয়া হত দোতলার ঘরের চিকের আড়ালে। কারণ মেয়েদের মুখ দেখে যদি পুরুষের মনে অপবিত্র চিন্তা আসে। তাদের যদি ধ্যানভঙ্গ হয়। ইহুদি মেয়েরা এই ভাবনার পরিবর্তন চাইল। তাই সত্তরের দশকে যখন পশ্চিমের নারীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন ইহুদী নারীরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ইহুদি ধর্মযাজকদের আইনকে ভেঙে ফেলতে চায়। আর নবনীতা দেব সেনও মনে করেছেন : 'আমাদের দেশেও তো একই ব্যাপার। ব্রাহ্মণত্বের দাবি তো কেবল পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার পেতে হলে উপনয়ন হওয়া চাই, এবং উপনয়নে কোনও নারীর অধিকার নেই।... ইহুদি মেয়েরা যদি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই নিয়মের বিরোধিতা করে, তারা যদি ধর্মেও পুরুষের সমান আচরণের অধিকার চায়, তাতে আধুনিক মানুষের তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা তো যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ।'[২] উপন্যাসটির শুরুতেই নবনীতা দেব সেন এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গেই অনিতা অগ্নিহোত্রী জানান : 'একটি সাম্প্রতিক উপন্যাসে পড়ছিলাম, সূচনাতেই আছে, 'বান্ধবী হান্না অরেনস্টাইনের উপনয়ন হচ্ছে—সেপুলভেডা আর মন্টানার মোড়ে ওই ছোট লুথারান চার্চটাতে। ওটাকে ওরা ইহুদি মন্দির হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়।' প্রৌঢ়া ইহুদি রমণীর উপনয়ন (Bat Mitz Va) দিয়ে উপন্যাস, বাংলা ভাষায়, আরম্ভ করার আগে বুক কেঁপে উঠবে না এমন কতজন পাঠকভীরু তরুণ লেখক আছেন? ... লেখক নবনীতা দেবসেনের প্রবল পরাক্রম, তিনি রাস্তা পেরনোর সময় এদিক-ওদিক তাকান না, ফলে 'পাঠক' নামক যানকেই সামলে চলতে হয়। এই দার্শনিক নির্লিপ্ততা আসলে তাঁর দূরপ্রসারী লেখক-দৃষ্টির অন্য নাম।'[৩] আসলে নবনীতা দেব সেন সবসময় নারীদের অবস্থানকে 'কর্ম' থেকে 'কর্তা'র জায়গায় আনতে চেয়েছেন। তার পরিচয়ই 'ইহজন্ম' উপন্যাসে পাওয়া যায়।

এ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে বাঁশির ব্যক্তিত্বময়ী নারীসত্তার কথা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ঘটনাক্রমে বাঁশির শৈশব থেকে তার জীবনপথ যত সামনের দিকে এগিয়েছে, ততই তার ব্যক্তিত্বের প্রভা আলোকিত হয়ে উঠেছে। বাঁশির শৈশব কেটেছিল এক দমবন্ধময় পরিবেশে। মাত্র চার বছর বয়সে মাতৃহারা বাঁশি, ধনী ব্যবসায়ী পিতার অনাদর, স্নেহহীনতার কারণে কার্শিয়াঙে ক্রিশ্চান ছোটমামিমার কাছে বড় হয়ে উঠে। বাঁশির পিতা শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য করে গেছেন, সাংসারিক কোনও দায়-দায়িত্ব পালন করেননি। তিনি ব্যবসার

কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন, আর বাড়িতে নিয়ে আসতেন নিত্যনতুন বান্ধবী। বাঁশির মা মারা যাওয়ার পরও তার এই বহির্মুখী উচ্ছৃঙ্খল-জীবনের দৌরাত্ম্য কমেনি, বরং ক্রমান্বয়ে বেড়ে গিয়েছিল। পিতার এই চারিত্রিক সংযমহীনতা বাঁশির শৈশবকে নষ্ট করে দেয়। শৈশবে বাঁশির জীবন-সংঘর্ষ আরও বেশি ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে বিবাহ পরবর্তী জীবনে। সে নিজের মেধা ও মননের জোরেই স্কলারশিপের টাকায় বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল, সেখানে নিজের প্রচেষ্টায় এরোপ্লেন কোম্পানির চাকরি নেয়। তারপর স্বামী ইন্দ্রকে বিদেশ নিয়ে গিয়ে সংসার শুরু করে। আমরা সাধারণত দেখি, স্বামী স্ত্রীকে বিদেশে নিয়ে এসে সংসার করার মতো ঘটনা, কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উলটপুরাণের পরিচয় মেলে। বাঁশি তার একক প্রচেষ্টাতেই সমগ্র সংসারের দায় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় তাদের এই সুখের সংসারে হঠাৎ কালো ছায়া নেমে আসে। ইন্দ্র একসময় ভীষণভাবে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। নেশার জন্য টাকা পয়সা চুরি করতেও সে দ্বিধা করে না। ছেলের এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, ইন্দ্রের মা কুমুদিনী দেবী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এরকম পরিস্থিতিতে বাঁশি একাই নিজের কাজ ও সংসার সামলেছে। অসুস্থ শাশুড়ি, নেশাগ্রস্ত স্বামী, সন্তানের দায়-দায়িত্ব পালন করেছে। সে প্রতি শনিবার ইহুদিদের অ্যালকোহলিক অ্যাননিমাস সভ্যদের প্রার্থনা সভায় ইন্দ্রকে নিয়ে গেছে। বাঁশির তিন বছরের প্রচেষ্টায় ইন্দ্রের নেশা মুক্তি ঘটে, সে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। বাঁশি তার মনের জোর ও আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করেই স্বামীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছিল।

বাঁশিকে ইন্দ্রের সংসারের প্রাণশক্তি বলা যায়। বাঁশি তার পরিবারের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল, অথচ তাকেই ইন্দ্র প্রতিনিয়ত কষ্ট দিয়ে এসেছে। বাঁশি যখন ইন্দ্রের কাছে সন্তান চেয়েছিল, তখন ইন্দ্র প্রস্তুত ছিল না। তাই বাঁশির প্রথম শিশুটি নষ্ট করতে গিয়ে ইন্দ্র তার মাতৃত্বের ক্ষমতাকেই নিঃশেষ করে দেয়। ইন্দ্রের এই গর্ভপাত করানোর জঘন্যতম ঘটনায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর উপর হওয়া শোষণের দিকটিকে মনে করিয়ে দেয়। বর্তমানে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু আজও কী নারীজীবন সম্পূর্ণরূপে বিপদ মুক্ত হতে পেরেছে? কারণ অনেক সময় নারীর শরীর ও তার জরায়ুর মালিক হয়ে ওঠে পুরুষতন্ত্র। তাই নারীর গর্ভবতী এবং গর্ভপাত করানোকে পুরুষ সহজাত অধিকার বলে মনে করে। এখানে নবনীতা দেব সেনের কথা ধরেই বলতে হয় : 'যে যতই মুক্ত স্ত্রীশক্তির পরিপূর্ণতার কথা বলুক, সমাজ তো এখনও পুরুষশাসিত, ... দেখতে পাচ্ছি দ্রুত পরিবর্তন আসছে, তবুও তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা।'[৪] স্বামীর কাছ থেকে এত বড় আঘাত পাওয়ার পরও বাঁশি কিন্তু নিজের সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। একসময় ইন্দ্র যখন তার অফিসে বিদেশি সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, তখনও বাঁশি ইন্দ্রের সাথে ঝগড়া করেনি। শুধু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল, হয় ইন্দ্র এই সংসার ছেড়ে চলে যাক, নয়তো সে তার মেয়েকে নিয়ে এই সংসার ত্যাগ করবে। এরপরেই ইন্দ্র মেমটির কাছ থেকে সরে আসে। বাঁশি কিন্তু নিজের জীবনের এই কঠিন সময়েও ভেঙে পড়েনি। শুধু তাই নয়, নেশাগ্রস্ত ইন্দ্র যখন নেশা ছাড়তে অপারগ হয়ে উঠেছিল, তখন বাঁশিকে সাথে নিয়ে সে আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল। কিন্তু বাঁশি ইন্দ্রকে সরাসরি জানিয়ে দেয় : 'যেতে হলে তুমি একাই যাও—আমি যাব না। আমার ওপরে একজন বৃদ্ধা, আর একজন বালিকার জীবন নির্ভর করে। আমার অনেক কাজ বাকি। আমি মুক্তি চাই না। আমি মুক্তই। তোমার ইচ্ছে করে তুমি একাই পালিয়ে যাও—অমন দায়িত্বহীন কাজ করার কথা আমি

দুঃস্বপ্নেও ভাবি না; শুনতেও রাজি নই। তোমার চিন্তাটাই মহাপাপের—নেশার যা গর্হিত অপরাধ, তার চেয়েও ঢের বেশি গর্হিত তোমার এই চিন্তা।'[৫] অর্থাৎ স্বামীর এই হৃদয় দৌর্বল্য সিদ্ধান্তে, বাঁশি তার ব্যক্তিত্ব থেকে এক পা-ও সরে দাঁড়ায়নি। কারণ তার কাছে নিজের প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। সে জীবনটাকে সম্মান করে। অনেক কষ্টে সে আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। তাই জীবন অবসানের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এ-ভাবেই ইন্দ্রের মনের নেতিবাচক চিন্তাগুলোকে বাঁশি সমূলে উৎপাট করে দেয়। তাকে সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। আসলে জীবন মানে হেরে যাওয়া নয়, প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। বাঁশির এই সহ্য ক্ষমতা, ধৈর্য্য, আত্মবিশ্বাস আমাদের মুগ্ধ করে। তাই একসময় ইন্দ্রেরও মনে হয়েছে : 'বাঁশি আমার জীবনে এসে পড়েছে যেন সূর্যের রশ্মির মতো প্রাণসঞ্চারি শক্তি নিয়ে।–'আমার' শুধু নয়। আমাদের জীবনে।'[৬]

ইন্দ্রের কারণেই বাঁশির গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বাঁশি নিজের মাতৃত্বের স্বপ্নকে পূরণ করেছিল রঙিনকে দত্তক নিয়ে। এখানে বাঁশি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুধু নিজের মাতৃত্বের স্বাদকেই পূরণ করেনি, তার নারীত্বের অবমাননার যোগ্য জবাব দিতে পেরেছে। যা তার মুক্ত মনের পরিচয়কেই বহন করে। তবে বাঁশির এই সন্তান দত্তক নেওয়ার ঘটনায়, ইন্দ্রের বাবা রাগ করেছিলেন। কার রক্তকে নিজেদের বংশে আনা হচ্ছে এটা ভেবে। অথচ মানুষ নিজের বিষয়ে কতটুকু জানে! তাই কুমুদিনী দেবীও মনে করেছেন পূর্বে যখন সমাজে : 'বড় বড় যৌথ পরিবার ছিল, সেখানে কত যথেচ্ছাচার চলত, কত গোপন কেচ্ছা-কেলেংকারি—কে জানে সত্যি সত্যি কোন শিশুর পিতা কে? শুধু তো জরায়ুর ঠিকানাটাই নিশ্চিত জানা। ভৃত্য থেকে পুরুতমশাই, দেওর থেকে শ্বশুরমশাই—সকলেরই সম্ভাবনা থেকে যায় বংশধরের জন্ম দেওয়ার গৌরবের অংশভাগ হবার। কেন যে আমরা বংশগৌরব নিয়ে ভাবি? কেন যে পিতৃত্ব নিয়ে এত আমাদের চিন্তা? শাস্ত্র থেকে পুরাণের কাহিনি থেকে কিছুই কি শিখিনি আমরা?'[৭] আসলে আমরা অনেকসময় নিজেদের কুৎসিত মানসিকতার কারণেই বিচার করতে বসি বংশগৌরবের ইতিহাস। অথচ পৃথিবীতে এমন কত শিশু রয়েছে যারা পরিবারহীন, এমন কত অবস্থাপন্ন মা-বাবা আছেন, যারা সন্তানহারা। শুধুমাত্র বংশগৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে মানুষ সহজ সুখের পথটিকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু বাঁশি সুখী হওয়ার সেই সহজ পথকেই বেছে নিয়েছিল। বাঁশির এই স্বাধীন ভাবনা-চিন্তার পেছনে নবনীতা দেব সেনের মানসিকতায় কাজ করেছে। আসলে তিনি নিজেও তাঁর দুটো সন্তান থাকার পরে, শ্রাবস্তী নামের এক মেয়েকে পুষ্যি নিয়েছিলেন : 'ষাট বছর বয়সে আরও একবার মা হয়েছি আমি। তিন নম্বর মেয়ে আমার চেয়ে একচল্লিশ বছরের ছোট। সে আবার আরও এক গল্প। দুই মেয়ে এই মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে, এক মেয়ে এসে এই মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছে। আমি এখন তিন মেয়ের মা।'[৮] তাই কোথাও যেন বাঁশির মুক্ত চিন্তনের পেছনে স্রষ্টার মনোগত ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

সাধারণত শাশুড়ি বউমার ঈর্ষা-বিদ্বেষময় সম্পর্ক আমরা যেমন অতীতে দেখে এসেছি, তেমনি তা বর্তমানেও পরিলক্ষিত হয়ে ওঠে। অনেক সময় দেখা যায় ছেলের বিবাহের পর শাশুড়িরা হীনমন্যতায় ভোগেন, কখনও তারা নিজেরা জীবনে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করেছেন বলে, পুত্রবধূর ওপর সেই কর্তৃত্বই বজায় রাখার চেষ্টা করেন। আবার বৌমারাও কখনও শাশুড়িকে নানা কারণে অপমান, অসম্মান করে বসেন। এই ভাবনা-চিন্তারই পরিবর্তন প্রয়োজন। একে অপরের সাথে মেনে ও মানিয়ে নেওয়ার চেয়েও বেশি জরুরী আন্তরিক অন্তরঙ্গতা বজায় রাখা। তবেই একটি পরিবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। শাশুড়ি-বৌমার সম্পর্কের এই ব্যতিক্রমী

ভাবনাকে নবনীতা দেব সেন এ উপন্যাসে কুমুদিনী ও বাঁশি চরিত্রকে সামনে রেখে দেখিয়েছেন। বাঁশি শুধু ইন্দ্রকে নয়, তার অসুস্থ শাশুড়ি মায়ের পাশে থেকে তাকে শক্তি জুগিয়েছে, সুস্থ করে তুলেছে। আসলে বাঁশির গর্ভধারিনী মায়ের জীবনে ছিল শুধু যন্ত্রণা আর ভয়। তিনি প্রায় বিনা যত্নেই মারা গিয়েছিলেন, তাই বাঁশি তার জীবনে পাওয়া আরেক মাকে হারাতে চায়নি। সে কুমুদিনী দেবীকে নিজের সবটুকু দিয়ে যত্ন করেছে। শাশুড়ি-বৌমার এই সম্পর্ক আমাদের পরিচিত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে, এখানে রয়েছে মা-মেয়ের অকৃত্রিম বন্ধন। তাই ইন্দ্ররও একসময় মনে হয়েছে : 'বাঁশি যেভাবে মাকে ভালোবেসেছে, এবং মা'ও যেমন করে বাঁশিকে কন্যাস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, এই দুটোই রীতিমতো বিশেষ ঘটনা। আমি দেখতে পাই দুজনকেই— দুজনের আন্তরিকতাই আমার স্বচ্ছ চোখে ধরা পড়ে।'[৯] আজ ঊনসত্তর বছর বয়সে কুমুদিনী দেবী বাঁশির কারণেই সঠিক চিকিৎসা পেয়ে, সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাই কুমুদিনী দেবী মনে করেন বাঁশিই তার আসল মা। বাঁশি তার শাশুড়িকে আদর, যত্ন, মর্যাদা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, রঙিন যে আজ ঠাকুমাকে ভালোবাসে, আহ্লাদ করে তার পেছনেও রয়েছে বাঁশিরই সৎ শিক্ষা। ভবানীপুরের বাড়ির কুমুদিনীর নতুন জন্ম হয় বিদেশে এসে। এতদিন স্বামীর চাপে থাকতে থাকতে তিনি যেন নিজেকে কোথাও হারিয়ে ফেলেছিলেন। বিদেশে এসে কুমুদিনী দেবী ইংরেজি বই পড়তে শুরু করেছেন, সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছেন। অর্থাৎ তার জীবনের নবতর অধ্যায় সূচনাতে, জীবনকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার পেছনে বাঁশির ভূমিকাই প্রবল।

উপন্যাসের ঘটনাক্রমে দেখা যায় বাঁশি যে আত্মপ্রত্যয়ী ভাবনার বীজ সকলের মধ্যে বপন করেছিল, পরবর্তী সময় সেটাই আকাশে ডালপালা মেলে বিস্তার লাভ করেছে। তাই বাঁশির সেরিব্রাল অ্যাটাকের সংকটময় মুহূর্তে কুমুদিনী দেবী, ইন্দ্র, রঙিন, বাদল একে অপরের অবলম্বন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কুমুদিনীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অপারেশনের জন্য বাঁশিকে হেলিকপ্টারে করে বড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বাঁশির এই অবস্থাতেও ইন্দ্র তার মায়ের বুকের জোর দেখে অবাক হয়ে যায়। যে মানুষটি কয়েকদিন আগে মেন্টাল হোমে চিকিৎসা রত ছিলেন, সেই মানুষটির অদ্ভুত মনোবলের কারণেই আজ বাঁশির অপারেশন সম্ভব হয়। অথচ ওই পরিস্থিতিতে সকলেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল, শুধুমাত্র ইন্দ্রের মা ছাড়া। তার স্নেহের জোরেই বাঁশি আজ ডীপ কোমার থেকে ফিরে আসতে পেরেছে। সবচেয়ে বড় কথা এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতেও ইন্দ্র নেশার দিকে ফিরে যায়নি। বাঁশি সারা জীবন অনুতাপ করে গেছে, তার মা ছিল না বলে, কিন্তু বাঁশির প্রতি কুমুদিনীর প্রাণঢালা মায়া-মমতা তাকে মাতৃত্বের পর্যায়েই উন্নীত করেছে। বাঁশি একসময় তার অসুস্থ শাশুড়িমাকে নবজন্মদানে সচেষ্ট হয়েছিল। আর আজ কুমুদিনী দেবী মেয়েকে সুস্থ করে তোলার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি রঙ্গিনকে বুঝিয়েছেন যে, ভাইফোঁটার মন্ত্র দিয়ে মেয়েরা ভাইয়ের আয়ু বাড়াতে যমের দুয়ারে কাঁটা পর্যন্ত দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আসলে 'যমের দুয়ারে কাঁটা মেয়েরা সত্যি সত্যি দিতে পারে; হ্যাঁ রে, ভালোবাসা দিয়ে যমকেও আটকে দেওয়া যায়, সত্যি।'[১০] কুমুদিনী দেবী সাবিত্রী, বেহুলার গল্পও রঙ্গিনকে বলেছেন, শুধু বরকে নয়, মা'কেও সন্তানরা ফিরিয়ে আনতে পারে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি দিয়ে। ভালোবাসার জোরেই সব যুদ্ধ জয় করা সম্ভব। এখানে আমরা যদি কুমুদিনীকে অতীত সত্তা হিসেবে দেখি, আর রঙিনকে দেখি ভবিষ্যৎ সত্তা হিসেবে, তাহলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, অতীত সত্তা এসে কোথাও যেন ভবিষ্যৎকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ভারতীয় পুরাণের ব্যক্তিত্বময়ী নারীদের কথা। যা রঙিনের জীবনের কঠিন, সংকটময় চলার পথকে সহজতর করে তোলে। ঠাকুরমার কাছ থেকে পাওয়া এই মননের জোর সঞ্চয় করেই, রঙিন

তার মামা বাদলকে জানিয়েছে : 'উই উইমেন নেভার গিভ আপ। উই উইমেন ক্যান ওয়র্ক ওয়ন্ডার্স—লাইক সাবিত্রী অ্যান্ড বেহুলা—যমের দরজাতেও কাঁটা দেওয়া ইজ পসিবল, অ্যান্ড উই উইমেন ক্যান ডু দ্যাট, জাস্ট ভালোবেসে—'[১১] তাই রঙিন বিশ্বাস করে তার অচেতন মায়ের চেতনা ঠিক একসময় ফিরে আসবে। তার মা আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। আসলে নবনীতা দেব সেনের সাহিত্যে উঠে আসা মেয়েরা খুব সহজে হার মেনে নেয় না, তারা লড়াই চালিয়ে যায়। সেটা সংসারের দ্বিধা-দ্বন্দ্বময় পরিবেশের সাথেই হোক বা সমাজে সংঘটিত হওয়া ন্যায়-অন্যায়ের বিরুদ্ধেই হোক কিংবা নিজের শারীরিক অসুস্থতার সাথেই হোক। আর নবনীতা দেব সেন নিজেও তো তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধির সাথে লড়াই করেই এগিয়ে গেছেন। এই মনোবল, অদম্য জেদই তাঁর নায়িকাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

নবনীতা দেব সেন তাঁর অক্ষরমালার স্পর্শে দেখিয়ে দিয়েছেন মেয়েরা চাইলে জীবনে কি না করতে পারে। তাই 'ইহজন্ম' উপন্যাসের বাঁশি ঘরে-বাইরে নানা ধরনের কঠিন প্রতিবন্ধকতা উত্তীর্ণ করে, এক বলিষ্ঠ জীবন গঠনের পরিচয় দিতে পেরেছিল। বিদেশের মাটিতে সে তার জীবনীশক্তি ও প্রবল ব্যক্তিত্বের জোরেই একসময় পরিবারে সুস্থিতি আনতে সক্ষম হয়েছিল। আর বাঁশির অসুস্থতার পরবর্তী সময়ে কুমুদিনী দেবী এ পরিবারের হাল ধরেন। তিনি সকলকে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। তাঁকে কেন্দ্র করেই বাদল, ইন্দ্র, রঙিন নিজেদের মননের জোরকে পুনরুজ্জীবিত করতে পেরেছে। জীবনের এই কঠিনতম পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করে, জয় লাভ করার মন্ত্র তো তারা একদিন বাঁশির কাছ থেকেই শিখেছিল। এই নারী মননের ঔজস্বিতাই একসময় সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আসলে আমাদের সমাজে বহুক্ষেত্রেই নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে না। সেখানে সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ডে নারীর অবস্থানকে নগণ্যভাবে দেখা হয়। অথচ সেই নারীদের আত্মবিশ্বাস, সাহসী মানসিকতা, লড়াকু ভাবনার দ্বারাই কত অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়ে ওঠে। সে দিকটিই নবনীতা দেব সেন 'ইহজন্ম' উপন্যাসের বাঁশি ও বাঁশির বান্ধবী হান্না অরেনস্টাইনের কাহিনিকে সামনে রেখে দেখিয়ে দিয়েছেন। নারীর এই বুদ্ধিদীপ্ত, প্রজ্ঞাময়, বলীয়ান রূপ আমাদের মুগ্ধ করে তোলে।

তথ্যসূত্র:

১) দেব পাল ঈশা (সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০২২, দেবীপক্ষ, পরম্পরা, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৪৩

২) দেবসেন নবনীতা, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২, পাঁচটি উপন্যাস, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২০১-২০২

৩) দেব সেন নবনীতা সম্মাননা প্রণতিপত্র, নভেম্বর ২০১৯, অহর্নিশ, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পৃষ্ঠা. ৩৮

৪) দেব সেন নবনীতা, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০২২, ভালো-বাসার বারান্দা (২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২২৫

৫) দেবসেন নবনীতা, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২, পাঁচটি উপন্যাস, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২২৫-২২৬

৬) দেবসেন নবনীতা, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২, পাঁচটি উপন্যাস, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২০৪

৭) দেবসেন নবনীতা, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২, পাঁচটি উপন্যাস, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২১৬

৮) দত্তগুপ্ত শর্মিষ্ঠা, বিশ্বাস অহনা (সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৪, এগারোয় পা মেয়েদের অন্তরঙ্গ কথা, গাঙচিল, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২০৮

৯) দেবসেন নবনীতা, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২, পাঁচটি উপন্যাস, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২০৮

১০) দেবসেন নবনীতা, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২, পাঁচটি উপন্যাস, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২৩৯

১১) দেবসেন নবনীতা, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২, পাঁচটি উপন্যাস, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২৩৯

আকর গ্রন্থ:

১) দেবসেন নবনীতা, অষ্টম মুদ্রণ, জুন ২০২২, পাঁচটি উপন্যাস, পত্রভারতী, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ:

১) দেব পাল ঈশা (সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০২২, দেবীপক্ষ, পরম্পরা, কলকাতা

২) দেব সেন নবনীতা সম্মাননা প্রণতিপত্র, নভেম্বর ২০১৯, অহর্নিশ, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা

৩) দেব সেন নবনীতা, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০২২, ভালো-বাসার বারান্দা (২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪) দত্তগুপ্ত শর্মিষ্ঠা, বিশ্বাস অহনা (সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৪, এগারোয় পা মেয়েদের অন্তরঙ্গ কথা, গাঙচিল, কলকাতা

৫) দেব সেন নবনীতা, পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২০, নবনীতার নোটবই, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৬) ভট্টাচার্য তপোধীর, প্রথম বঙ্গীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০২২, নারীচেতনা : মননে ও সাহিত্যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৭) বাগচী যশোধরা, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০২১, নারী ও নারীর সমস্যা, অনুষ্টুপ, কলকাতা

৮) ভট্টাচার্য সুতপা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার ও সমসাময়িক দর্শন : একটি আলোচনা

মীনাক্ষী ভট্টাচার্য
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: ইউরোপিয়ান নবজাগরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙালি নবজাগরণের পথিকৃত ছিলেন। যে সমস্ত দার্শনিক ইউরোপিয়ান নবজাগরণের কাণ্ডারি ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অনেকাংশে ওই সকল দার্শনিকবৃন্দের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা শিক্ষা সংস্কার, ভাষাসংস্কার ও সমাজ সংস্কার মূলক কাজে ওই সকল বিভিন্ন দার্শনিকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই বর্তমান গবেষণা পত্রটিতে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দার্শনিক চিন্তনের দিকটিতে আলোকপাথ করতে আগ্রহী। যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনই নিজেকে দার্শনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেননি। দর্শন বিষয়ক কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধও তিনি রচনা করেননি। পরবর্তীতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর রচিত দার্শনিক আলোচনামূলক প্রবন্ধও বিরল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নবজাগরণের কান্ডারী হলেও আধুনিক ভারতীয় দার্শনিক হিসাবে বা সমসাময়িক দার্শনিকগণের মধ্যে তিনি আজও অনুপস্থিত। এবিষয়ে অভিমতটি হল, তথাকথিত দার্শনিক আলোচনায় উনি কখনই অংশগ্রহন করেননি বলেই হয়ত তথাকথিত দর্শনের আলোচনার অন্তরালোলেই তিনি থেকে গেছেন। বিদ্যাসাগরের অসামান্য দার্শনিক প্রতিভা, দার্শনিক চিন্তনে আধুনিক মনষ্কতা দর্শনের আলচনায় এক বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি করতে সক্ষম।

সূচক শব্দ: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দার্শনিক চিন্তন, নবজাগরণের কান্ডারী, সমাজ সংস্কার, আধুনিক মনষ্কতা।

মূল আলোচনা:

উনিশ শতকে বাংলা নবজাগরণের এক প্রধান স্তম্ভের নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার। বাঙালি মানসে একটি বহুল পরিচিত নাম বিদ্যাসাগার। যদিও আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ কোন দাশর্নিক আলোচনা পাইনা, তথাপি উনার শিক্ষা সংস্কার ও সমাজ সংস্কার মূলক কাজের থেকেই উনার দার্শনিক চিন্তনের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া ধর্ম শাস্ত্রের পণ্ডিত ও সংস্কৃত ভাষা বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারনেও ভাষা দার্শন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এখানে বলে রাখা ভালো, ভারতীয় দর্শনের অন্যতম গ্রন্থ সায়নাচার্য মাধবাচার্য রচিত সর্বদর্শন সংগ্রহের ভূমিকা রচনা এবং সর্বদর্শন সংগ্রহের সম্পাদনার কাজটি কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। সর্বদর্শনের ভূমিকায় তিনি লেখেন-"the great majority of the learned of this country are probably not even aware of its existence....by good fortune I produce three manuscript from Benares."[১]

তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দার্শনিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা না করার যে আভিযোগ পণ্ডিত মহলে ওঠে এবং সম্ভবত যে কারণটিকে বলবৎ করে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকের সম্মানটি দেওয়া হয়নি। সেই আপত্তিটি আদতে যথপযুক্ত কি না, সে প্রসঙ্গে বিচারের প্রয়োজন আছে বলেই বোধ করি। কারন ভারতীয় দর্শনের সর্বদর্শন সংগ্রহ

ছাড়ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে এবং পাশ্চাত্য দর্শনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রভাব বিদ্যাসাগরের উপর দেখা যায়। সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। যে কারনে আলোচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বদর্শন সংগ্রহের ভূমিকা সম্পাদনার বিষয়টি উল্লেখ করলাম, তার কারণ সর্বদর্শন সংগ্রহ ভিন্ন ভারতীয় দর্শনের প্রথমিক পাঠই যেখানে অসম্পূর্ণ, সেখানে বিদ্যাসাগরের দর্শন বিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আলোকপাত অপরিহার্য বলেই বোধ করি।

সমসাময়িক দার্শনিক হিসাবে তাঁকে গন্য করতে হলে, আলোচনার অভিমুখটি হবে যে সমসাময়িক দর্শনের আলোচনার পরিসরে যে সকল বহুল প্রচলিত দর্শনিক তত্ত্ব গুলি বিদ্যমান, সেই তত্ব গুলির কি প্রকার প্রভাব তাঁর কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়েছে।

দার্শনিক তত্ব এবং বিদ্যাসাগরের মতাদর্শের পারস্পারিক আলোচনা

- ভাববাদ ও বিদ্যাসাগর
- বস্তবতাবাদ ও বিদ্যাসাগর
- প্রয়োগবাদ ও বিদ্যাসাগর
- অজ্ঞেয়বাদ ও বিদ্যাসাগর
- বস্তুবাদ ও বিদ্যাসাগর

ভাববাদ ও বিদ্যাসাগর

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে ভাববাদ কি সেই বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনার প্রয়োজন। ভাববাদ এমন একটি দার্শনিক তত্ত্ব, যে তত্ত্বের প্রাণকেন্দ্রে আছে ধারণা, ভাববাদীদের মতে ধারণাই একমাত্র সত্য। তারা একটি অধিবিদ্যক ধারণার জগতের কল্পনা করেন। তারা মনে করেন ধারণার একপ্রকার অধিবিদ্যক মূল্য বর্তমান, এই ধারণকেই তারা আদর্শসত্য বলে অবিহিত করেন। দর্শন শাস্ত্রে প্লেটোকে ভাববাদের জনক বলা হয়। আনুমানিক খ্রীঃপূর্ব ৪০০ শতাব্দী এই ভাববাদের জন্ম বলে ধরা হয়। প্লেটো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ্ 'রিপাবলিকে' দুটি জগতের উল্লেখ করেন, যা দ্বিজাগতিক তত্ত্ব নামে বিখ্যাত।

এই দুইটি জগতের মধ্যে একটি হল ধারণা বা সামাণ্যের জগত এবং অন্যটি হল বাহ্য জগত। বিশেষের জগত নিত্য সামান্যের জগতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকটি বিশেষের ধারণা নিত্য সামান্যের ধারনার উপর নির্ভরশীল।[২] এই সামান্য বিশেষের ধারণাটি পরবর্তীতে দেহ-মনের ক্ষেত্রেও পর্যবসিত হয়। আমরা কেবল যথার্থ মনের দ্বারাই সামান্যকে বা সত্যকে জানতে পারি। পরবর্তীতে এই ভাববাদী চিন্তার ধারক হলেন বিশপ বার্কলে, যাঁর ভাববাদ 'আত্মগত ভাববাদ' নামে পরিচিত।

বিদ্যাসাগরকে কখনই ভাববাদী দার্শনিক বলা যাবে না। তিনি প্লেটোর নৈতিক আদর্শগত দিকটির দ্বারা প্রভাবিত হলেও ভাববাদের সমালোচনা করেন বলেই বোধ করি। এখন মূল আলোচ্য বিষয়টি হল কেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভাববাদী দার্শনিক বলে দাবি করা যায় না। তাঁর স্বপক্ষে প্রধান যুক্তিটি হল, তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচি থেকে বার্কলের ভাববাদী দর্শনটি বাদ দেওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন। তিনি বার্কলের ইনকোয়ারি গ্রন্থ এর ত্রুটি দেখেছিলেন।[৩]

এই বিষয়ে তাঁর যুক্তিটি ছিল যে, তাঁর তিনি প্রয়োগবাদ, উপযোগীতাবাদকে ভাববাদের তুলনায় অধিক ও সমাজ উপযোগী বলে মনে করতেন। তাছাড়াও তিনি ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী আদর্শ কেও সমালোচনা করেন। খুবসম্ভবত সেই কারনেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাংখ্যাদর্শন ও বেদান্ত দর্শনকে পাঠ্য উপযোগী বলে মনে করতেন না। 'শিক্ষার্থী রূপেও শাস্ত্রে

দর্শনে ন্যায়-স্মৃতি-পুরাণে তাঁর শ্রদ্ধার কোন প্রমাণ মেলে না। শিক্ষক হয়েই তিনি বেদান্ত দর্শন ভুল বলেই পাঠ্যসূচি থেকে বর্জনের সুপারিশ করেছিলেন।'[৪] পড়ে যদিও তিনি সাংখ্য ও বেদান্ত সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যসূচিতে রাখার অনুমোদন দেন। তাঁর কারণটি অবশ্য ছিল অন্য, তিনি মনে করে ছিলেন ভারতীয় দর্শনের সংস্কার মুক্তি ঘটাতে গেলে পাশ্চাত্য দর্শন পড়ার পাশাপাশি ভারতীয় দর্শনের অধ্যায়নও প্রয়োজন।

বাস্তবতাবাদ ও বিদ্যাসাগর

বাস্তবতাবাদী দর্শনের জনক হলেন বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল। বাস্তবতাবাদী দর্শনিকগণের মতে জগতের একমাত্র সত্য হলো এই বাহ্য জগৎ ও বাহ্য জগতের বস্তু সমূহ। বাস্তববাদে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় যে, সত্য সর্বদাই বস্তুগত এবং সত্য হলো তাই যা বাহ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বের দ্বারা জ্ঞাত হয়। অ্যারিস্টটলকে একই সাথে বাস্তবতাবাদ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবক্তা মনে করা হয়। বাস্তবতাবাদের উদ্দেশ্যেই হলো বাস্তবিক বাহ্য জগতের মাধ্যমে চরম সত্যে উপনীত হওয়া। অ্যারিস্টটল প্রথম ব্যক্তি যিনি যুক্তিবিদ্যাকে একটি মৌলিক পাঠ্যসূচি হিসাবে নির্বাচন করেন। যুক্তির নিরিখে বিচার বিবেচনা করে সত্য নির্ধারণের সূচনা হয় এই বাস্তবতাবাদের হাত ধরেই।[৫]

বাস্তবতাবাদের এই শর্ত, নিরপেক্ষ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব এবং পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদী আলোচনার অনেকখানি প্রভাব বিদ্যাসাগরের ওপর পরিলক্ষিত হয়। তিনিও তার দর্শন চিন্তায় সর্বোপরি যুক্তির প্রাধান্যতাকে স্বীকার করে ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানতাত্বিক আলোচনাকে তিনি ভারতীয় দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে স্বাগত জানান। তাই সাংখ্য মীমাংসা দর্শনকে অগ্রাহ্য করলেও ন্যায়দর্শন চর্চাকে তিনি অনুমোদন করেন। ন্যায় শ্রেণীর পাঠক্রম সম্পর্কে তাঁর অভিমতটি ছিল এইরূপ, "উদয়নাচার্যের কুসুমাঞ্জলি সম্বন্ধে বলেছেন-'The line of argumentation on the whole is to be found in modern European works on the same subject.' গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্বচিন্তামণি সম্বন্ধে বলেছেন, 'His reasoning is similar to that of the schoolmen of the middle ages of Europe. This treatise is what Bacon would call a cobweb of learning'."[৬] বিদ্যাসাগর মহাশয় দার্শনিক মিলের যুক্তিবিদ্যা ও উপযোগিতাবাদী দর্শনকে বেশ খানিকটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের লজিক (১৮৪৩) পঠন-পাঠন অপরিহার্য্য বলে অভিহিত করেন। কারণ, এই পাঠ মনকে পরিশুদ্ধ করায় এবং সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিবাদি রাখতে সহায়ক হবে।[৭]

পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদের সাথে ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের নৈতিকতার সমন্বয়েই। গড়ে ওঠে বিদ্যাসাগরের দর্শন চিন্তা। কারণ বিজ্ঞান ব্যাতিত কেবল আধ্যাত্বিকতার দ্বারা কখনোই ভারতীয় দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে না। সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রেও আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ওপর পাশ্চাত্য বাস্তবতাবাদের প্রভাব দেখতে পাই। তিনি কিন্তু যুক্তি ব্যতীত ভারতীয় হিন্দু সাহিত্য তথা বৈদিক সাহিত্যের সমালোচক ছিলেন না। তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য দর্শনের আঙ্গিকে নিরীক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা। তিনি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং দর্শনচর্চায় বাংলাভাষা প্রচলনে আগ্রহী হন। তাই শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ভারতীয় দর্শনকে তথা ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতাকে পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদের নিরিক্ষে পর্যালোচনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রয়োগবাদ ও বিদ্যাসাগর

প্রয়োগবাদ প্রথম সূচনা হয় চার্লস সেন্ডার্স প্রিন্স নামক একজন দার্শনিকের হাত ধরে, পরবর্তীতে এই প্রয়োগবাদী ধারার দুইজন বিখ্যাত দার্শনিক হলেন উইলিয়াম জেমস ও জন ডিউই। প্রয়োগবাদীগণের মতে অভিজ্ঞতাই একমাত্র সম্বল, বাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা আমাদের সমস্ত জ্ঞান লাভ করি। যাচাইযোগ্যতাই সত্যতার একমাত্র মানদণ্ড, যাচাইযোগ্যতার ক্ষেত্রে বস্তুগত অভিজ্ঞতাই একমাত্র হাতিয়ার। অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্য বলে কিছুই নেই, এই বিশ্বচরাচর সর্বদাই পরিবর্তনশীল। আমাদের অর্জিত সমস্ত সত্যই স্থান, কাল ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল।[৮]

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাস্তবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে গণ্য করার পাশাপাশি ওনাকে একজন প্রয়োগবাদি দার্শনিক ও বলা যায়। "প্রয়োগবাদী দর্শন দ্বারা বিদ্যাসাগর প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবস্বীকৃতি। মানুষ কী, তার স্বরূপ কীভাবে নির্ণয় করা যায়, সমাজে মানুষের স্থান ও মর্যাদা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়-এই হচ্ছে প্রয়োগবাদী দর্শনের মূল লক্ষ্য আলোচ্য বিষয়।"[৯] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাক্তিজীবনের ওপর সামান্য কিছু পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাই যে, উনি প্রয়োগবাদের পথেই যোগ্যতার তত্বটিকে ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন।

বিদ্যাসাগর পুনঃজন্মের মত আধ্যাত্মিক ঘটনার অবিশ্বাসী ছিলেন, এছাড়াও যথার্থ প্রয়োগ বা প্রয়োজন ছাড়া শাস্ত্রকে তিনি অন্তঃসার-শূন্য বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আমাদের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতের অতিরিক্ত কোনো জগৎ নেই। যা কিছু পরম বা যা কিছু সত্য সবই এই বাহ্য জগতেই রয়েছে। তিনি অতীন্দ্রিয় শক্তি বা পারলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারমূলক বিভিন্ন কাজের মধ্যেও প্রয়োগবাদি ভাবনা চিন্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি প্রথম শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষা ও ভার্নাকুলারের ভাষার ওপর জোর দেন।[১০]

বিদ্যাসাগর যৌক্তিক চিন্তা ভাবনাকে মানব জাতির সর্বোচ্চ উদেশ্য বলে মনে করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষাদর্শনে আমরা সর্বোপরি যে বিষয়টির প্রভাব দেখি তা হলো নীতিশিক্ষা। তিনি শাস্ত্রের বা ভারতীয় দর্শনের নৈতিকতার দিকটিতেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কোনো প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির দিকে নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের 'ভার্চুর' ধারণাটির ন্যায় তিনিও নীতিশিক্ষাকেই তার দর্শনের মানদণ্ড হিসেবে গড়ে তোলেন। ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতেও নীতিশিক্ষার গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। তথাপি বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সাহিত্য নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাকে অপচ্ছন্দই করতেন।

অজ্ঞেয়বাদ ও বিদ্যাসাগর

প্রয়োগবাদী ধারার পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের মধ্যে অজ্ঞেয়বাদী দর্শনের প্রভাব ও পরিলক্ষিত হয়। অজ্ঞেয়বাদ হলো এমন একটি দার্শনিক তত্ত্ব যেখানে কেবল মানবজগতে মানুষের স্থান ও বাহ্য জগত ইত্যাদি হলো আলোচ্য বিষয়। কোনো আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় সেখানে সকল অজ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। টি.এইচ.হাক্সলে ছিলেন অজ্ঞেয়বাদের প্রবক্তা। অজ্ঞেয়বাদের ক্ষেত্রেও আমরা প্রয়োগবাদের মত যুক্তির ওপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করতে দেখি।

বিদ্যাসাগরের দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ, মানুষের গুরুত্ব ও মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ স্থান পেয়েছে। তবে সেই কারণেই হয়তো তিনি যুক্তির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ

করেছেন। বিদ্যাসাগরের চিন্তায় তাই দ্বর্থ্যহীনভাবে তার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় ভাটা পড়েছিল। বিদ্যাসাগর অনুরাগী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যই প্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক বলে অভিহিত করেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগরকে অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক বলেই মনে করতেন।[১১]

এই কারনে তৎকালীন পন্ডিত মহলে তিনি ছিলেন সমালোচিত, কিন্তু আমার মনে হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পুরোপুরি একজন অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক বলা যায় না। তিনি সংস্কারমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ একজন পন্ডিত ছিলেন। লৌকিক বা পারলৌকিকতায় তার অবিশ্বাসের কারণে তাকে অজ্ঞেয়বাদী বলাটা হয়তো ঠিক হবে না, কারণ তার সমাজকল্যাণ ও শাস্ত্রের প্রতি আস্থা কোনো অংশে একজন ধর্মীয় শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু পন্ডিত অপেক্ষা কম ছিল না। তিনি কেবল যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রগ্রহনের কথা বলেছিলেন, তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একজন অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক না বলে একজন ধর্মনিরপেক্ষ পরিচ্ছন্ন ও সংস্কারমুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।[১২]

বিদ্যাসাগর ও বস্তুবাদ

পাশ্চাত্য দর্শনের বস্তুবাদকে জড় বস্তুবাদ হিসেবে দেখলে একটা বিরাট বড় ভুল হবে। পাশ্চাত্য দর্শনে যাকে matter বলা হয় তা কেবল জড়বস্তু নয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে বিশেষ করে বস্তুবাদী ধারাতে ভূত, চতুর্ভূত বা পঞ্চভূতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। জগতের উৎপত্তি কোনো ঈশ্বর বা নিমিত্ত কারণ থেকে নয়, এই চতুর্ভূতের স্বভাববশতঃ আকস্মিক ভাবেই এ জগতের উৎপত্তি। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা কোনো লীলা কার্য্য এই জগৎ নয়। চৈতন্যও এই চতুর্ভূতেরই কার্য তাই ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনকে ভূতচৈতন্যবাদীও বলা হয়। এখানে বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন যে, চার্বাক দর্শন যদিও ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনের একটি প্রধান ও অন্যতম ধারা, তথাপি ভারতের বস্তুবাদী ধারায় কিন্তু চার্বাক ছাড়াও আরো বিভিন্ন বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায় যেমন অজিত কেশবম্বলী, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই সকল বস্তুবাদী ধারার স্থান না পাওয়া গেলেও পালি বা প্রাকৃত সাহিত্যে বিভিন্ন লোকায়ত দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

জৈনদের প্রামাণ্য গ্রন্থে যেমন সূত্র কৃতঙ্গ সূত্র ও আয়োগসূত্রে অনেক লোকায়ত গোষ্ঠীর কথা উল্লিখিত আছে। যাহার বাহ্য জগতের উৎপত্তির ক্ষেত্রে এই পঞ্চভূতের অস্তিত্বের বাইরে অনন্য কোনো কিছু স্বীকার করে না। চার্বাক দর্শন সম্প্রদায় কিন্তু ভারতীয় বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের ধারার খুব সম্ভবত শেষ ধারা, যদিও এটি বহুল প্রচলিত। তবে এই ধারাটির প্রচার ও প্রসারের জন্যও অনেকাংশে বিদ্যাসাগর দায়ী ছিলেন। চার্বাক দর্শনকে ভারতীয় দর্শনে স্থান করিয়ে দেওয়ার জন্যও বিদ্যাসাগরের অবদান অনেকখানি, চার্বাক সম্পর্কে তথ্যও প্রধান যে বইটি থেকে পাই তা হলো, সায়ণাচার্য মাধবাচার্য রচিত সর্বদর্শন সংগ্রহ দায়িত্ব সহকারে সম্পাদনা করেন, কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই নয় গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদেও সচেষ্ট হন।

এর থেকেই দেশ বিদেশের বহুলাংশে এই নিরীশ্বরবাদী বেদবিরোধী ভারতীয় দর্শনের কথা জানতে পারেন। "অধ্যাপক জয়নারায়ণ নিজেই সেকথা লিখেছেন- 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যৎকাল সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধক্ষ্য ছিলেন (১৯৫১-৫৮)। তৎকাল তিনি আমাকে ঐ পঞ্চদশ দর্শন ও শাঙ্করের 'স্থুলমর্ম্মা' সকল বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া প্রচারিত করিতে কহেন। তিনি যৎকাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যায়ন করিতেন তৎকাল আমার নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যায়ন করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ, তাঁহার প্রবর্ত্তানুসারে আমি এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই।"[১৩] বিদ্যাসাগরের পূর্বে পন্ডিত মহলে চার্বাক চর্চার কোনো ইতিহাস পাওয়া

যায় না। যুক্তিবাদের পাশাপাশি বস্তুবাদ বিষয়েও তার অগাধ আগ্রহ দেখা যায়। তিনি মনে করতেন বেদান্তের স্মৃতি তত্ত্বের ব্যাখ্যার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো সামঞ্জস্য নেই, তার থেকে ভূতচৈতন্যবাদের ব্যাখ্যাই অধিক সন্তোষজনক।

এই সকল পর্যালোচনার পরেও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সম্পূর্ণরূপে চার্বাক বস্তুবাদী দার্শনিক বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। কারণ পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজে তিনি বেদান্ত শিক্ষা বন্ধ করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে বড়োলাটকে চিঠি লিখেছিলেন- "...কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদান্তের পাঠ বন্ধ করিতে চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাহার সহিত আমার মত মেলে না।.... ভারতবর্ষের প্রচলিত দর্শনসমুহের মধ্যে বেদান্ত অন্যতম। ইহা আধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধীয় কলেজ ইহার অধ্যাপনা বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতা পারে, ইহা আমি মনে করি।"[১৪]

উপসংহার:

বিদ্যাসাগর হিতবাদী দর্শন মতবাদের দ্বারাও অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভাবনায় কোনো বিশেষ প্রকার ধর্ম স্থান পায়নি, এর প্রাণকেন্দ্র ছিলো সমস্ত ধর্মের মানুষ। রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের প্রতি যেমন তার অনীহা ছিল, ঠিক তেমনই তৎকালীন প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্মের প্রতিও তার অগাধ আনুগত্য দেখা যায় না। সকল ধর্মের নৈতিকতার দিকেই তার বেশি আগ্রহ ছিল, ধর্মদর্শনে বিদ্যাসাগরের মতামত প্রসঙ্গে পন্ডিত অজয় কুমার দত্ত দুই চারজন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পন্ডিতদের সঙ্গে আলোচনায় বলেছিলেন----"অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য। ভাস্কর ও অর্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস, যা কিচ্ছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ, এবং বেকন ও কোমত যেকোন প্রকৃত তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র।"[১৫]

ভারতীয় দর্শনে আস্তিক্য বা নাস্তিক্য বিষয়টি কিন্তু বেদ প্রামাণ্য কেন্দ্রিক, ঈশ্বর প্রামাণ্য কেন্দ্রিক নয়। বিদ্যাসাগরকে কখনোই কি বেদবিশ্বাসী বলা যুক্তিসঙ্গত হবে? নিত্যকর্মে তার অনাস্থা থেকেই বোঝা যায় যে বৈদিক ব্যবস্থায় তার আস্থা ছিল না। কারণ যদি তিনি বেদ অনুরাগী হতেন, তাহলে নিশ্চয় সান্ধ্য বন্দনা, গায়েত্রী জপ ইত্যাদি নিত্যকর্মের বিধানে অনীহা দেখাতেন না। কারণ নিত্যকর্ম অসম্পাদনের ফল যে প্রত্যব্যায়, এবং এই প্রত্যব্যায়ের ফল যে নরকভোগ একথা নিশ্চয় বিদ্যাসাগরের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতের অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি দেহে উপবিত ধারণ করতেন, মহাশয় পিতামাতার অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়াও করেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের সাথে যোগসূত্র ধরে, তাঁকে একজন একেশ্বরবাদী আস্তিক প্রমান করার ও চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বর বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিজেই অবশ্য বলেন, ঈশ্বরের বিষয়ে আমি নিজে কিছুই জানিনা।[১৬]

চন্ডীচরণ দাবি করেন যে 'বোধোদয়ের' নিরাকার চৈতন্যের আদর্শই ছিল বিদ্যাসাগরের 'ঈশ্বর' আদর্শ। কিন্তু রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের মতে বোধোদয়ের যে আদর্শ তা উইলিয়াম চেম্বার্স রচিত 'রুডিমেন্টস অফ নলেজ' বইয়ের গড অফ ক্রিয়েশন শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা আছে গড ইস "স্পিরিট অ্যান্ড ইজ ইনভিসিবল" অর্থাৎ বিদ্যাসাগর এখানে কেবলই একজন অনুবাদক মাত্র। তার নিজের এরূপ মত হলে পরবর্তীতে তিনি সেটি তুলে নিতেন না।[১৭]

বিনয়কৃষ্ণ ঘোষও অবশ্য ঈশ্বর বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর নিরিখেই বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক প্রমান করেছেন। সামাজিক বিধানের ক্ষেত্রেও তিনি 'মনুসংহিতা' পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত

করেন। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিরীশ্বরবাদী বলা গেলেও বেদ প্রামাণ্যের নিরিখে চরমপন্থী নাস্তিক বলা যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত মত, "ধর্ম কি তাহা মনুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবার কোন প্রয়োজন নেই।"[১৮] একাধারে যেমন তিনি শাস্ত্রকে প্রমান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তেমনই শাস্ত্রের ধর্মান্ধতার প্রতিবাদে মুখর হয়ে শাস্ত্রশিক্ষা তিনিই সকলের কাছে উন্মুক্ত করেন। শাস্ত্র প্রামাণ্যের নিরিখে বিদ্যাসাগরের আস্তিক্য ও নাস্তিক্য নিয়ে তাই একটা দোলাচল থেকেই যায়।

বিদ্যাসাগর যে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রয়োগবাদ, দৃষ্টিবাদ ও যুক্তিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার প্রধান নিদর্শন হলো বিদ্যাসাগরের মানব স্বীকৃতি বা মানব কেন্দ্রীকতা। নবজাগরণের যুগের দর্শনের একটি প্রধান বৈশিষ্টই হলো মানব কেন্দ্রীকতা। নবজাগরণের পূর্বে দর্শন ছিল ঈশ্বর বা ধর্ম কেন্দ্রীক, কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি দেখা যায় তা হলো মানব-কেন্দ্রীকতা। Humanism হলো মানব তন্ময়তা ও মানব মুখিনতা।[১৯]

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচরিত্রে দয়াদাক্ষিণ্য, মহানুভবতা, উদারতা সবকটা গুনই ছিল মানবকেন্দ্রীক এই অর্থেই বিদ্যাসাগরকে হিউম্যানিস্ট দার্শনিক অবশ্যই বলা যায়। এছাড়া নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা প্রসার, বহুবিবাহরোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন এই সমস্ত সমাজসংস্কারমূলক কাজগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে তার দার্শনিক চিন্তন অবশ্যই হিউম্যানিস্ট। বিদ্যাসাগর ছিলেন ভারতের নবজাগরণের কান্ডারী, তিনি মানুষের নির্বাসিত চেতনাকে পুনঃজ্জীবনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। বিদ্যাসাগরের দর্শনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সর্বহারা দরিদ্র শোষিত শ্রেণী, শোষক শ্রেণীকে তিনি পদানত করার প্রতিজ্ঞায় ব্রতী হয়ে এক বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন- "আমি তখনো অনুভব করিতেছিলাম এবং এখনো অনুভব করিতেছি যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য, তাহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে তাহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্যের মধ্যে।"[২০]

মানবকেন্দ্রিকবাদী আদর্শের দ্বারা উদবুদ্ধ হয়ে বর্ণপরিচয়, বোধোদয়ের মতো পুস্তক লেখেন, সংস্কৃততে দেবনাগরী ভাষার ব্যবহারের পরিবর্তে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখেন। তাই তার দর্শনের সার ও সঠিক মূল্যায়ন ব্যতীত তার এহেন পান্ডিত্যের রহস্য উদঘাটন কখনোই সম্ভব নয়। শাস্ত্রব্যাখান ব্যতীত সংস্কার মুক্তি কখনোই সম্ভব নয়। বৈদিক শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যানের যে প্রয়োজন আছে এবং এই বৈদিক দর্শনের নবব্যাখ্যান দ্বারাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা সম্ভব, এই বিষয়টির প্রয়োজন নবজাগরণের দুই পথিকৃত বিদ্যাসাগর ও রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন।

যথার্থ ব্যাখ্যান ব্যতীত যেকোনো শাস্ত্র শিক্ষায় অরণ্যে রোদনের ন্যায় ব্যর্থ ও অযৌক্তিক। অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল থেকে সমাজকে মুক্ত করে মানবমনের ও মানবজীবনের মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন যে সকল ব্যক্তিগণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।[২১] বিদ্যাসাগরের ব্যাক্তিজীবন এবং সংস্কারমূলক কাজের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিদ্যাসাগর ব্যাক্তিজীবনে একজন নিরীশ্বরবাদী, বস্তুবাদী, যুক্তিবাদী, প্রয়োগবাদী, সংস্কারমুক্ত, ধর্মনিরেপেক্ষ হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ মানবতাবাদী পন্ডিত। বিদ্যাসাগরের এই পরিচ্ছন্ন মানবকেন্দ্রী দিকটি প্রথাগত দর্শনের আলোচনায় নতুন একটি পথের দিশা দেখাবে বলেই আশা রাখি।

তথ্যসূত্র:
১. ঘোষ, বিনয়, ১৩৬৪, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা-৫৭.
২. Russel, Bertrand, 1945, **History of Western Philosophy**, New York, Simon and Schuster, Page-119 -120.
৩. করিম, ডঃ নেহাল, ২০১২, **বাঙলার মনীষা**, ঢাকা, অনন্যা৩৮/২ বাংলা বাজার, পৃষ্ঠা-৩২.
৪. করিম, ডঃ নেহাল, ২০১২, **বাঙলার মনীষা**, ঢাকা, অনন্যা ৩৮/২ বাংলা বাজার, পৃষ্ঠা-৩২.
৫. Russel, Bertrand, 1945, **History of Western Philosophy**, New York, Simon and Schuster, Page- 195.
৬. দাশ, শিশিরকুমার, ১৪০৯, **বিদ্যাসাগর: সংস্কৃত ও ইংরেজি**, কলকাতা, বিভাব গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৬
৭. রহমান, ডঃএম. মতিউর, ২০১৭, **বাঙলার দার্শনিক মনীষা**, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ,পৃষ্ঠা- ২৬৮.
৮. Russel, Bertrand, 1945, **History of Western Philosophy**, New York, Simon and Schuster, Page- 817-821.
৯. রহমান, ডঃএম. মতিউর, ২০১৭, **বাঙলার দার্শনিক মনীষা**, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ২৬৯.
১০. রহমান, ডঃএম. মতিউর, ২০১৭, **বাঙলার দার্শনিক মনীষা**, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃষ্ঠা-২৬৯.
১১. করিম, ডঃ নেহাল, ২০১২, **বাঙলার মনীষা**, ঢাকা, অনন্যা ৩৮/২ বাংলা বাজার, পৃষ্ঠা-৩৪.
১২. ঘোষ,বিনয়, ১৩৬৪, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১৩.
১৩. পাল, সন্দীপ, ২০১৯, **বিদ্যাসাগরের দর্শন চিন্তা, ঢাকা**, জাতিয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩০.
১৪. পাল, সন্দীপ, ২০১৯, **বিদ্যাসাগরের দর্শন চিন্তা, ঢাকা**, জাতিয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩১.
১৫. রহমান, ডঃএম. মতিউর, ২০১৭, **বাঙলার দার্শনিক মনীষা**, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃষ্ঠা-২৭১.
১৬. করিম, ডঃ নেহাল, ২০১২, **বাঙলার মনীষা**, ঢাকা, অনন্যা ৩৮/২ বাংলা বাজার, পৃষ্ঠা-৩৫.
১৭. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ২০২০, **বিদ্যাসাগর কি সত্যিই আস্তিক ছিলেন**, কলকাতা, প্যাভ্লন ইন্সটিটিউট, পৃষ্ঠা-১
১৮. করিম, ডঃ নেহাল, ২০১২, **বাঙলার মনীষা**, ঢাকা, অনন্যা ৩৮/২ বাংলা বাজার, পৃষ্ঠা-৩৫.
১৯. ঘোষ, বিনয়, ১৩৬৪, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা-৫০-৫১
২০. ঘোষ, বিনয়, ১৩৬৪, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১৬.
২১. ঘোষ, বিনয়, ১৩৬৪, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ৫৬-৫৭

গ্রন্থপঞ্জী:

- করিম, ডঃ নেহাল, ২০১২, **বাঙলার মনীষা**, ঢাকা, অনন্যা ৩৮/২ বাংলাবাজার.
- ঘোষ, বিনয়, ১৩৬৪, **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড.
- দাশ, শিশির কুমার, ১৪০৯, **বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত ও ইংরেজি**, কলকাতা, বিভাব গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা.
- পাল, সন্দীপ, ২০১৯, **বিদ্যাসাগরের দর্শন চিন্তা, ঢাকা**, জাতিয় সাহিত্য প্রকাশ.
- ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ২০২০, **বিদ্যাসাগর কি সত্যিই আস্তিক ছিলেন**, কলকাতা, প্যাভ্লন ইন্সটিটিউট.
- রহমান, ডঃ এম. মতিউর, ২০১৭, **বাঙলার দার্শনিক মনীষা**, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ.
- Russel, Bertrand, 1945, **History of Western Philosophy**, New York, Simon and Schuster.

‘মহিষকুড়ার উপকথা’ : দিন বদলের ছবি

অজয় শীল শর্মা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: একথা প্রায় সকলেই জানি সাহিত্য সমাজের দর্পণ। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের মতো সাহিত্যেরও পরীক্ষাগার ছড়িয়ে আছে গোটা পৃথিবীব্যাপী। পৃথিবীর অন্তর্গত মানুষ ও তাকে ঘিরে থাকা বিশ্বপ্রকৃতির গতিবিধি নিয়েই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেইসব বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বপ্রকৃতিরই নানা ছবি ফুটে ওঠে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। তাই সাহিত্যের মধ্যে আমরা বিশ্ব তথা মানবসমাজেরই খণ্ডিত খণ্ডিত চিত্র দেখতে পাই। কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর ‘মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে এরকমই একটি চিত্রের ক্রমবর্ধমান রূপ অঙ্কন করেছেন। বয়স্কদের মুখে আমরা প্রায়শই একটি আক্ষেপের কথা শুনতে পাই – ‘আগে কি ছিল আর এখন কি দেখছি?’ – কথাটি কেবল আমাদের গুরুজনেরাই নয় আমরাও আমাদের অনুজদের বলি একথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ এটা বলতেই পারি অতীতের সময়ের সঙ্গে বর্তমান সময় কিংবা বর্তমান সময়ের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সময়ের কোনো মিল নেই। তা ক্রমশ পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। তবে সময় কি কখনো বদলায়? সময় কখনো বদলায় না- সে তার নিজস্ব গতিতে আপন মনে অবিরাম এগিয়ে চলে। সময় যেসব উপকরণের মাধ্যমে তথা যেসব উপকরণের উপর ছাপ রেখে এগিয়ে চলে সেসব উপকরণের রূপ বদলে যায়। তাই ইতিহাসের পাতায় আদিম যুগের মানুষ ও তার ব্যবহৃত উপকরণ এমনকি প্রকৃতির যে রূপ দেখতে পাই, আধুনিক যুগে এসে তার এক ভিন্ন রূপ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। সেই পরিবর্তিত রূপ মানুষের কাছে কখনো আশীর্বাদ, কখনো অভিশাপের মূর্তি ধারণ করে। ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ উপন্যাসে আমরা এরকমই একটি বদলের ছবি দেখতে পাই। যা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।
সূচক শব্দ: অরণ্য, নগরায়ন, কৃষিনির্ভর জীবন, আগ্রাসী মনোভাব, লাঙল।

মূল প্রবন্ধ:

অমিয়ভূষণ মজুমদার স্বভাব ঔপন্যাসিক, নিশ্ছিদ্র ছবি তাঁর স্বোপার্জিত অভিধা। ‘রাজনগর’, ‘গড় শ্রীখণ্ড’, ‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘হলং মানসাই কথা’, ‘চাঁদবেনে’, ‘মধুসাঁধুখা’ প্রভৃতি বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রের মণিমাণিক্যের স্রষ্টা। উপন্যাস বলতে তিনি যা বোঝেন তা একটি চিঠিতে এইভাবে লিখেছেন—

> “উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে একটি থিম যা আমাদের চোখের নীচে ফুটে ওঠে। একটা থিম যা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ থিম নামে এক জীবন্ত বিষয়ের ভাব।”[১]

‘মহিষকুড়ার উপকথা’ এক অকিঞ্চনের একমাত্র রত্ন স্ত্রী ও তার গর্ভজাত আত্মজকে হারিয়ে ফেলার ফ্রেমে আঁটা। উপন্যাসটির পটভূমি কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার অঞ্চল। উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে এক আদিম অরণ্যবেষ্টিত গ্রাম। সেই গ্রামের এক বিশেষ জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবনযাপন উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। ইতিহাসের যুগ থেকে এই অরণ্য আছে— মুঘল, তাতার, তুর্কীদের আগমনের ইতিহাস আছে, আছে মীরজমুলার ইতিহাস। এখন ইংরেজি

নামের সম্মান পেয়ে এই অরণ্য আজ 'রিজার্ভ ফরেস্ট'। আর এই অরণ্যকে বেঁধে ফেলা হয়েছে কালো পীচের রাস্তা দিয়ে- ঝরঝর করে লরি-ট্রাক চলে, ইস্পাতের করাত নষ্ট করে অরণ্যকে।

কালের অন্তরালে জীবনপ্রবাহ ধারা ক্রমশ পরিবর্তনশীল। একসময় মানুষ আগুন জ্বালানোর কাজে পাথর ব্যবহার করত— কিন্তু বর্তমানে সময়ের তাগিদেই মানুষ এক নিমেষেই আগুন জ্বালাতে সক্ষম। ইতিহাস হাতড়ালে এরকম হাজারো নজির খুঁজে পাওয়া যাবে। সাহিত্যে সেসব নজিরকেই আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। অমিয়ভূষণের 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসটি সেরকমই একটি সময়পর্বের পরিবর্তনের ইয়িহাসকে বহন করে চলেছে। উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সেই বদলের ছবি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিকরে যাযাবর জীবন কৃষিনির্ভর জীবনে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং শেষে নগরায়নের করাল চক্ষুর গ্রাসে পশ্চাৎ অপসরণ ঘটছে অরণ্যপ্রকৃতির ও কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার তার এক জীবন্ত ও বাস্তব আলেখ্য এই উপন্যাসটি।

প্রযুক্তির উন্নতির গ্রাসে মানুষ আজ দীর্ণ, দৈন্য। আধুনিক সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি ক্রমশ পেছনে ফেলে দিচ্ছে আদিম অরণ্যনির্ভর জীবনকে। উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে আসফাক নামক চরিত্র। যার সখ আহ্লাদ ও সামর্থ্য সীমিত। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকেই সম্পূর্ণ উপন্যাসটি দেখানো হয়েছে। এই আসফাক যদি অরণ্যপ্রকৃতির প্রতিনিধি হয়, তবে অন্যদিকে রয়েছে আটশো বিঘা জমি ও চল্লিশ-পঞ্চাশটি গরু-মোষের মালিক আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ধ্বজাধারি জাফরুল্লা। আসফাক, যে একসময় স্বাধীনভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস করছিল নিজের রাজ্যে, তাকে লোভী স্বার্থপর আগ্রাসী মনোভাবী জাফরুল্লা নিজের করায়ত্ত করেছে শুধুমাত্র পাওয়ার অর্থাৎ ক্ষমতার জোরে। এই পাওয়ার শব্দটির সঙ্গে আসফাক আগে পরিচিত ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছে জাফরুল্লার খামারে কাজ করতে করতে। তাই জাফরুল্লার বন্দুকের পাওয়ার সম্পর্কেও সে অজ্ঞাত নয়— যা আকাশে সচ্ছন্দে ছোটা হরিণকে গতিহীন, নির্বাক, নিথর করে দিতে পারে অনায়াসেই। এছাড়াও ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসটিতে 'পাওয়ার' শব্দটিকে আরো নানা উপমার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তিনি যেন বলতে চাচ্ছেন প্রতিদিনের চেনা রঙিন শ্যামল ছবি বদলে যাচ্ছে এই পাওয়ারের জোরেই। তাঁর কথায়, পাওয়ার ছিল বলেই জাফরুল্লার মতো ষাটোর্ধ্ব, টাকপড়া তিন বিবি সম্বলিত মানুষ এক হতদরিদ্র সহায়সম্বলহীনের একমাত্র সম্বল প্রেমিকা কমরুন ও তার গর্ভজ আত্মজকে নিজের করে নিতে পেরেছে অবিলম্বে। অমিয়ভূষণ মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা সেই লোভী স্বার্থপর মানুষটিকে এবং সমাজের রূপ পরিবর্তনের ছবিটিকে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে আঞ্চলিক ভাষার ফ্রেমে আঁটা এই উপন্যাসে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

উপন্যাসটির সূচনায় রয়েছে একটি গ্রাম। যে গ্রামটি ছিল অরণ্যবেষ্টিত। এই গ্রামটির নামকরণের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি গ্রাম-সংলগ্ন এই অরণ্যে একসময় প্রচুর বুনো মোষ ঘুরে বেড়াত। এই বুনো মোষকে শিকার করার জন্য একদল মানুষ আসত তাদেরকে বলা হতো বেদিয়া। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অরণ্য নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত নগরায়নের ফলে, তার সঙ্গে মুছে গেছে অরণ্যে বিচরণ করে বেড়ানো সেইসব বুনো মোষের পায়ের ছাপ ও বিলীন হয়ে গেছে সেই বেদিয়ারাও। সেই মোষগুলি কিংবা সেই মানুষগুলি কোথায় গেছে কেউ জানে না। শুধু মহিষকুড়া নয়, উপন্যাসটিতে লেখক তুলে এনেছেন আরো কিছু গ্রামের নাম— তুরুককাটা, ভোটমারি ইত্যাদি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় গ্রামগুলি যেন অরণ্যের কোলে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। এই অরণ্য জননী তার গাছপালার আচ্ছাদনে তাদের আগলে রেখেছে। গ্রামগুলির

আশ্রয়স্থলই ছিল এই ঘননিবিষ্ট অরণ্য। সেই অরণ্যকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হতো সেখানে তিলার্ধ ফাঁকও নেই যেখান দিয়ে প্রাণের বাতাস অবিলম্বে চলাফেরা করতে পারে।

অরণ্যকে নিয়ে অমিয়ভূষণের চিন্তাভাবনা, অরণ্যের নিসর্গ-সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা তৈরি করেছে 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট। যদিও এখানে তিনি অরণ্যের দুটি রূপের কথা উল্লেখ করেছেন- একদিকে সে শান্ত স্নিগ্ধ জননী, অন্যদিকে হিংস্র রাক্ষসী। অর্থাৎ একদিকে আশ্রয়দাতা অন্যদিকে হিংস্র। তবে অমিয়ভূষণ যেন আদিম হিংস্র অরণ্য নয় আশ্রয়দাতা অরণ্যকেই ফিরে পেতে চেয়েছেন। যা মানুষের লোভের করাতে অচিরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অসীম অরণ্যের চারপাশে মানুষ পীচের রাস্তার সেকল বেঁধে অরণ্যকে করে তুলছে ক্রমশ সীমিত। শ্রদ্ধেয় অলোক রায়ের ভাষায়—

> "লোহার শিকল পরানোর মতো কালো পীচের রাস্তা-সড়ক দিয়ে আমরা অরণ্যকে বেঁধে ফেলেছি। —'কিন্তু এত শাসন সত্ত্বেও, কোথায় যেন এক চাপা অশান্তি ধিক্ ধিক্ করে, যেন বিদ্রোহ আসন্ন, যেন পাকা সড়কের বাইরে যাওয়া সবসময় নিরাপদ নয়। ... যারা বনের বুকে ফুটন্ত কালো পিচ ঢেলে সড়ক তৈরি করে আর যারা লাঙলের পিছনে ধৈর্য ধরে এগোয়, তারা একই জাতের। আগুনে পুড়লে তবু আশা থাকে, ছাইয়ের তলা থেকে নবাঙ্কুর দেখা দেয়; লোভের লাঙলে পড়লে...- সব ধ্বসে যায়!"[২]

অর্থাৎ যে লাঙল ছিল শান্তির প্রতীক সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক তাকে লেখক আজ আগ্রাসনের প্রতীক বলেছেন। কাহিনিতে আসফাককে যখন দেখতে পাই তখন তার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। রোগা লম্বাটে হলুদ চেহারা। আর সকলের মতো তার কালো চেহারা ছিল না। আর তাই বুঝি মুন্নাফ অর্থাৎ জাফরুল্লার একমাত্র ছেলে তাকে ধলামিয়া বলে ডাকত। এই মুন্নাফের মধ্য দিয়েও আমরা একটা পরিবর্তনের ছবি দেখতে পাই। মুন্নাফ, যে কিনা জাফরুল্লার চার বিবির এক সন্তান সে প্রথমে তার মায়ের কথায় আসফাককে মিয়াসাহেব বলে ডাকত, যেখানে সে অন্যান্য সব চাকরদের নাম ধরেই ডাকে। কিন্তু কাহিনির শেষে দেখা যায় আসফাককে সে তার নাম ধরে ডাকে। বিবর্ণ ও লজ্জিত মুখে আসফাক মুন্নাফের এই আচরণের কারণ জানতে চাইলে মুন্নাফ জানায় বাবা অর্থাৎ জাফরুল্লার কথাতেই সে নাম ধরে ডেকেছে।—

> "কেন মুন্নাফ তোমরা মোক্ মিঞাসাহেব না কন?'
> মুন্নাফের মুখে লজ্জার মতো কিছু একটা দেখা দিল।' না, আব্বা কয় চাকরক্ তা কওয়া লাগে না।"[৩]

অর্থাৎ নগরায়ন যেমন করে গ্রাস করেছে অরণ্যকে তেমনি যেন জাফরুল্লার প্রভাব প্রতিপত্তি অনায়াসেই গ্রাস করে নিল মুন্নাফ ও আসফাকের এতদিনের স্নেহের সম্পর্ককে। হতদরিদ্র আসফাকের মায়ের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই বাবার মৃত্যু হয়। অরণ্যের মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছিল তার বাঁচার আশ্রয়। বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা আসফাক অরণ্যের মধ্যেই দেখেছিল কমরুনকে। কমরুন ছিল বেদিয়াদের দলের একজন। তার স্বামী বসন্ত রোগে মারা যায়। তাকে ফেলে রেখে বেদিয়া গোষ্ঠী চলে যায়। অসহায় সদ্য স্বামীহারা কমরুনের এখন একমাত্র সহায় আসফাক। তারই সহায়তায় কমরুন তার স্বামীকে কবর দেয়। আসফাক কমরুনের মুখেই শুনেছিল তাদের যাযাবর জীবনবৃত্তির কাহিনি। কীকরে তারা বছরের পর বছর বনে বনে ঘুরে ঘুরে তাঁবু খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করে সে কাহিনি আসফাককে বিচলিত করে। কারণ কমরুনকে নিয়ে আসফাক চলতে চেয়েছিল তার জীবনের পথে কিন্তু তারা দুজনেই একটি দল

হতে পারে না। তাছাড়া প্রয়োজনীয় সামগ্রী তেল নুন শাড়ি চাল এসব কি করে কিনবে আসফাক যা দিয়ে তাদের পেট চলবে— সে তো মোষের ডাক ডেকে অন্যের বাথানের মোষকে নিজের কব্জা করতে পারবে না, এমনকি সে অন্য কোনো ভাষাও জানেনা। অতএব নিজের অযোগ্যতার তালিকায় আসফাককে নীরবে মাথা নিচু করেই থাকতে হয়। আবার কমরুনের পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবেও আসফাক থাকে নিরুত্তর। সেদিনও আসফাক নীরব ছিল, আজও নীরব— সেদিনও সে অক্ষম ছিল, আজও অক্ষম। তাই কমরুনকে পেয়েও সে অনায়াসেই তাকে হারিয়ে ফেলে। জাফরুল্লা ব্যাপারী কমরুনকে চার নম্বর বিবি বানিয়ে তার চারপাশে শুধু তারই অধিকারের গণ্ডি বেঁধে দেয়। যে গণ্ডির ভেতরে আসফাকের মতো মানুষের প্রবেশ নিষেধ আর তাই আসফাক আজ শুধু জাফরুল্লার চাকর।

ক্রমশ বিস্তৃত অরণ্যের মতো তাদের দুজনের পথও অনেকটা বিস্তৃত হতে পারত। কিন্তু জাফরুল্লার মতো মানুষের লোভনীয় দৃষ্টি তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। অসীম অরণ্যকে যেমন মানুষের লোভের লাঙল দিন দিন সীমায়িত ও সংকীর্ণ করে তুলেছে, তেমনি যেন আসফাক-কমরুনের সম্পর্কের মধ্যেও জাফরুল্লা ব্যাপারী একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছে। মানুষের লালসার শিকার হয়ে তাই হারিয়ে যাচ্ছে অরণ্য প্রকৃতি ও অরণ্যনির্ভর যাযাবর জাতি। তাই আসফাককে আজ জাফরুল্লার খামারে কাজ করতে হয়। কমরুনকে নিতে হয় সংসারের দায়িত্ব। জাফরুল্লার অবর্তমানে আসফাককে পাহারা দিতে হয় তার খামার বাড়ি এমনকি তার বিবিদেরও। অরণ্যে ঘুরে বেড়ানো কমরুন যেমন জাফরুল্লার ঘরে বন্দী, তেমনি অরণ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো মোষগুলি কারো না কারো বাথানে বন্দী। তারা যেন সভ্যতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। জাফরুল্লা ব্যাপারীর বাথানেও রয়েছে চল্লিশ-পঞ্চাশটি গরু-মোষ। এগুলি দেখাশোনার ভার আসফাকের। এই আসফাকই একদিন জাফরুল্লার ওষুধ আনতে গিয়ে বনে হারিয়ে যায় এবং মোষের মতো আঁ-আঁ-আঁড় করে ডাকে। সেদিনই সে নিজেকে চিনতে পেরেছিল, বুঝতে পেরেছিল সেও আজ এই মোষগুলোর মতোই জাফরুল্লার বাথানে বন্দী। শত চেষ্টাতেও এই শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। তাই নিজের অজান্তেই অন্তরে জেগে ওঠা প্রতিবাদ জাফরুল্লার প্রতিপত্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে।

সেই ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির বলেই জাফরুল্লা আজ পঞ্চায়েতে প্রধান। তার বাড়িতে হয় বিরাট ভোজের আয়োজন। শহর থেকে আসে অনেক লোক। রাতে হরিণ মারা হয়। হরিণের মাংস দিয়ে হয় ধুমধাড়াক্কা খাওয়ার আয়োজন। আর এই জাফরুল্লার নামেই নির্বোধ আসফাক হাকিমের কাছে নালিশ করে। কতটাই না বোকা সে, কারণ জাফরুল্লা এখন আর কাউকে পরোয়া করে না। শহর থেকে সে একটি লরি কিনেছে এখন আর গরুর গাড়ির প্রয়োজন নেই। জাফরুল্লার যাবতীয় জিনিস লরিতেই পাঠানো হবে। এই যন্ত্রের সঙ্গে কোনো গরু-মোষেরই তুলনা হয় না। এই যন্ত্র-মোষের কাছে যেকোনো মোষই সর্বদা মাথানত করে।—

> "...এই কলের মোষের সঙ্গে কোন মোষেরই লড়াই জেতার ক্ষমতা হবে না। সে যত দেখল তত অবাক হয়ে গেল।"[৪]

এভাবেই কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ 'মহিষকুড়ার উপকথা'র ছোট্ট পরিসরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। যা অত্যন্ত বাস্তব এবং সুপরিকল্পিত। নতুনের জন্য পুরাতনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়- এটা যেমন সত্যি, তেমনি পুরাতনের হাত ধরে নতুনের জয়গান এটাও ধ্রুব সত্য। তাই পুরাতনকে কখনো জীবনের ডায়েরী থেকে মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু দ্রুত নগরায়নের ফলে আদিম অরণ্যপ্রকৃতি ক্রমশ পৃথিবীপৃষ্ঠা থেকে নিঃশেষ হয়ে

যাচ্ছে। জমির মালিক জাফরুল্লা ক্ষমতা-প্রতিপত্তির মালিক হচ্ছে, পঞ্চায়েতে প্রধান হচ্ছে। উপন্যাসের শেষে দেখা যাচ্ছে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানো হরিণ খাবার ডিশে স্থান পাচ্ছে। পশুদের জায়গায় চলে আসছে বৃহৎ আকার ট্রাক। যাকে আসফাক মরদা মোষ বলে ভুল করেছে। এবং শোনা যাচ্ছে পরাজিত আসফাকের বিদ্রোহমিশ্রিত আঁ-আঁড় ধ্বনি। কারণ সে এখন জেনে গেছে–

> "...এক ছটাক জমি নাই যা কারো না কারো, এক হাত বন নাই যা কারো না কারো। বনে যে হারিয়ে যাবে তার উপায় কী?"[৫]

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৮১, প্রথম দে'জ সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৬, 'মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প', ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৮
২. তদেব, পৃ. ১০
৩. তদেব, পৃ. ৮৮
৪. তদেব, পৃ. ৮৯
৫. তদেব, পৃ. ৮৭।

পরিবেশচেতনা প্রসারে তপন বাগচীর ছড়াসাহিত্য

নীলাদ্রিশেখর সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

সারসংক্ষেপ: পরিবেশরক্ষা আজ বিশ্বব্যাপী এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার যার অবস্থান থেকে পরিবেশরক্ষায় পদক্ষেপ না নিলে এই বিশ্ব মানুষের জন্য বাসযোগ্যতা হারাবে। সকল দেশের সরকারই এর জন্য বহমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির মাধ্যমেও পরিবেশরক্ষায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করাও এক ধরনের উদ্যোগ বটে! এই সময়ের একজন সব্যসাচী লেখক তপন বাগচী তাঁর ছড়ার মাধ্যমে পরিবেশচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দোবদ্ধ চরণে, অন্ত্যমিলের প্রয়োগে তাঁর ছড়া শ্রুতিগ্রাহ্য হওয়ায় মানুষের অন্তরে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। পরিবেশের কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে, কী ধরনের ধ্বংস হতে পারে, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা দরকার, তার প্রায় সবকিছুই উঠে এসেছে তাঁর ছড়াসাহিত্যের পঙ্‌ক্তিতে। লোকসাহিত্যের আঙ্গিকে তিনি তুলে ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিগত সমস্যাকে। কঠিন বাস্তবকে তিনি তুলে এনেছেন ছড়ার সরল বাক্যে, যা মানুষকে মনে রাখতে সহায়তা করবে। শিশুকিশোর তথা সাধারণ পাঠকের কাছে কতটা গ্রহণীয় হয়ে এই ছড়া পরিবেশরক্ষায় সুচেতনা সৃষ্টি করতে পারে, এই প্রবন্ধে তা তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: পরিবেশ, টিভি, ফ্রিজ, এরোসোল, এয়ারকুলার, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, আগ্নেয়াস্ত্র, কীটনাশকে, উষ্ণায়ন, দুর্যোগ, রোগ-বালাই, ভূমিক্ষয়, ভূমণ্ডল, ঘূর্ণিঝড়, শব্দদূষণ, মাইক্রোফোন, গ্যাসট্রিক, স্নায়ুরোগ, জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু প্রভৃতি।

মূল আলোচনা:

সব্যসাচী লেখক তপন বাগচী (জ. ১৯৬৮) একহাতেই লিখে চলেছেন ছড়া, কবিতা, গান, প্রবন্ধ উপন্যাস প্রভৃতি। সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর সমান বিচরণ। বড়োদের সাহিত্যের উঠোনে যেমন তাঁর অবাধ বিচরণ, তেমনি ঢুকে পড়েন ছোটোদের অন্দরমহলে। তিনি পৌনেশতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। ছড়ার বই লিখেছেন কুড়িটির মতো। অনেক আগেই তাঁর কবিতাসমগ্র (২০২২) আমরা পেয়েছি। সম্প্রতি ২০২৫ একুশে বইমেলায় ঢাকার আদিগন্ত প্রকাশন প্রকাশ করেছে তাঁর 'ছড়াসংগ্রহ'। তিনশ কুড়ি পৃষ্ঠার বইটি থেকে শুধু 'পরিবেশ পড়ি বেশ' নামক ছড়াগ্রন্থ নিয়েই আমরা তাঁর পরিবেশচেতনা সন্ধান করতে চাই। গ্রন্থনামের জন্য নয়, বইটি সুখপাঠ্য, বইটি বহুলালোচিত, বইটি হৃদয়গ্রাহী, বইটি পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম, সর্বোপরি বিশিষ্টজনেরা স্কুলপাঠ্য হবার দাবিও করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি দেবদাস আচার্যের উক্তি প্রণিধানযোগ্য-

> "বইটির প্রতিটি ছড়াই প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত। ছড়ার ছকটিও চমৎকার। উপস্থাপনায়, বিষয় পরিচয়, মাঝে মানবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব এবং শেষে প্রতিকারের উপায় বা সাবধানতা অবলম্বন। শিশু-কিশোরদের সুন্দরভাবে সুনিপুণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান। ছড়ার মাধ্যমে বিষয়গুলি মনে রাখাও সহজ। এই

> বইটি কেবলমাত্র ছড়ার বই-ই নয়, বলা যায় পরিবেশ সম্বন্ধে শিক্ষামূলক ছড়ার বই। বইটি শিশু পাঠ্যপুস্তক হওয়ার উপযুক্ত বই।”[১]

ছোটোদের লেখা নিয়ে বিশিষ্টজনদের ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। সহজ-সরল ভাষা, ছোটোদের মনোজগতে বিচরণ আরও কত কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়! বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ও গবেষক ড. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে-

> “ছোটোদের সাহিত্য ছোটোদের মন মতো কিশর জীবনের কথা, সমাজের কথা আসুক। পশুপাখি, পরিবেশ, প্রকৃতিকে ছোটোরা ভালবাসতে বাসতে শিখুক। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা জাগুক। ছোটোদের প্রতি মনে শুভবোধ তো একজন সত্যিকারের ছোটোদের লেখকই জাগিয়ে তোলেন। দেন নৈতিক শিক্ষা। ভালো-মন্দ চেনান, আলো অন্ধকার চেনান। এসব আসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, শুভবোধ জাগানোর জন্য, পরিকল্পিতভাবে গল্প ফাঁদলেও সেই গল্প মাঠে মারা যাবে। ছোটোদের আজগুবি লেখারও কোনো মানে হয় না। কল্পলোকে নয়, ছোটদের পা যেন মাটিতে থাকে। কঠিন বাস্তবকে যেন চিনতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে।”[২]

এই চেনা-জানা বা উপলব্ধি করি তপন বাগচীর মনে বাসা বেঁধেছে শৈশবেই, যা তাঁর আত্মকথনেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামীণ পরিবেশে তাঁর জন্ম, বেড়ে-ওঠা মাঠ-ঘাট, খাল-বিলকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির ফোলে তাঁর পিজ যাতায়াত। তিনি জানান আত্মপরিচয়ে--

> “আমার ছোটবেলা কেটেছে কদমবাড়িতে। ছায়াঢাকা মায়াভরা গ্রাম। উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত একটি খালের দুই পাড় ঘেঁষে বিস্তৃত। প্রথমে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় আর দক্ষিণে দিঘির পাড়ে একটি বাজার। দিঘির পাড় এখন স্বতন্ত্র একটি গ্রাম। অধুনিক কোনো সুবিধা ছিল না গ্রামে। বর্ষাকালে রাস্তাঘাট পুরোটাই ডুবে যেত। নৌকোই তখন একমাত্র ভরসা। বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে বাঁশের পাঁচটি সাঁকো পার হতে হত। চৈত্র-বৈশাখ মাস ছাড়া বাকি দশ মাসই নৌকো চলত। রাস্তার দুপাশে বাড়ি আর গাছপালা। রাস্তায় ধুলো আছে কিন্তু কলকারখানার ধোঁয়া নেই। চুলোর রান্নার যেটুকু ধোঁয়া তা উপরে আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে মিলিয়ে যেত। পরিবেশ বিঘ্নকারী কোনো উপকরণই ছিল না সেই গ্রামে। পরিবেশ রক্ষার কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই শান্ত পরিবেশ ছিল গ্রামে। প্রাকৃতিক পরিবেশই ছিল উপভোগ্য। এমনকি পুকুরের জল দিয়েই রান্না হতো। মাটির কলসে থিতিয়ে খাওয়া হতো পুকুর থেকে আনা জল।”[৩]

ছায়াঘেরা মাঠ, বৃক্ষাচ্ছাদিত পথ, খাল-বিল-নদী, পরিবেশ-বান্ধব প্রকৃতিই ছিল কবির আশৈশব। একুশ শতকে প্রকৃতির যখন দমবন্ধ অবস্থা তখন কবি তাঁর শৈশবের যাপনচিত্র মনে এনে লিখতে থাকেন ---

> “টিভি ফ্রিজ-এরোসোল আর এয়ারকুলার থেকে
> ক্লোরোফ্লোরা কার্বন-গ্যাস বেরোয় ছেঁকে ছেঁকে
> আগ্নেয়াস্ত্র থেকেও বেরোয় তীব্র গ্যাসের ঝাঁজ
> জ্বালানী আর কীটনাশকেও---বলব কত আজ?”[৪]

বর্তমানে যেভাবে মানুষ পরশুরামের মতো কঠোর হস্তে কুঠার ধারণ করেছে যে গাছ কেটে প্রকৃতির উঠোন ফাঁকা করে দিচ্ছে। সেখানে গড়ে উঠছে বড়ো বড়ো অট্টালিকা, কলকারখানা। বাড়ছে টিভি, ফ্রিজ, এয়ারকুলারের ব্যবহার। জ্বালানি, আগ্নেয়াস্ত্র, কীটনাশক থেকে দূষিত হচ্ছে চারদিকের পরিবেশ। বাড়ছে মারণব্যাধি রোগ। প্রকৃতির এক বড়ো সমস্যা আজ এই দূষণ। সে জল, বায়ু, মাটি যা-ই হোক। দূষণের সম্ভাব্য ফল ঠিক কী হতে পারে তাও ব্যক্ত করেছেন তিনি, এই ছড়ার শেষ পঙ্‌ক্তিতে--

"দুর্যোগেরই ঘনঘটা বাড়বে পৃথিবীতে
শীতের দিনে বৃষ্টি হবে, পড়বে গরম শীতে
রোগ-বালাইও বৃদ্ধি পাবে, ফলবে ফসল কম
বিশ্বজুড়ে ঘটবে এমন নানান ব্যতিক্রম।"[৫]

বর্তমানে আমরা দেখছি বর্ষাকালে বৃষ্টি নেই, শীতকালে শীত নেই, পুকুর-নদী-খাল-বিল সব জলশূন্য। পরিবেশ যেন আমাদের প্রতি রুষ্ট। রোগ-ব্যাধিতে মানুষ জর্জরিত। ছোটোদের কবিতায় পরিবেশদূষণ ও তাঁর প্রভাবের ব্যাখ্যা নিয়ে বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক আনসার-উল-হক লেখেন--

"এই বইটিতে এক-একটি লেখা যেন এক-একটি হাইড্রোজেন বোমা। কলেবর ছোটো কিন্তু ব্যাপ্তি বিশাল। এযেন বিন্দুর মধ্যে মহাসমুদ্র দর্শন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব আমরা ভুলতে বসেছি। আমরা বিস্মৃত হই, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম প্রধান উপকরণ হল বায়ু। সেই বায়ুদূষণ আজ বিশ্বজুড়ে। সেই দূষণের বিরুদ্ধে কবির কলম শাণিত তরবারি হয়ে আমজনতার ময়দানে হাজির।"[৬]

এই গ্রন্থের 'পাহাড়কাটা' নামক কবিতায় কবি পাহাড় কাটার ফলে পরিবেশের যেসকল ক্ষতি হয় তার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন-

"আজকে দেখছি পাহাড়ের প্রতি অশুভ আক্রমণ
অবাধে কাটছে পাহাড়ের মাটি, উজাড় পাহাড়ি বন-
নষ্ট হচ্ছে প্রাণী-উদ্ভিদ, বাড়ছে পাহাড়ি ধস
ক্ষমতার জোর যতই দেখাই---প্রকৃতি কি মানে বশ?
ভূমিক্ষয় বাড়ে, ভরে ওঠে দেখি খাল-বিল-নদী-নালা
প্রকৃতি বিরূপ হলেই দেখছি---মানুষের বাড়ে জ্বালা।
ঠেকাতেই হবে পাহাড়ের ক্ষতি আইনের ফাঁক দিয়ে
না হলে আসবে মহাদুর্যোগ--টানবে জীবন নিয়ে।"[৭]

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাহাড়কাটা বা মাটিকাটা কতটা দায়ী তার কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এই ছড়ায়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিশুসাহিত্য একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ও গবেষক রাশেদ রউফ লেখেন--

"তপন বাগচী পাহাড় কাটা নিয়ে লিখেছেন চমৎকার একটি ছড়া। আমরা জানি পাহাড় মানেই প্রকৃতির দান, সেই পাহাড়কাটার মহোৎসব চলছে চারিদিকে। এতে পাহাড়ের নিচে বা আশেপাশে যারা বসবাস করছেন, তারা খুব ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন। যে কোনো সময় ধসে পড়ে দুর্ঘটনা বা

> প্রাণহানির আশঙ্কা বিরাজ করছ। এর পাশাপাশি চলছে টিলা কেটে মাটি বিক্রির কাজও। আইনের মাধ্যমে পাহাড় কাটা রোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন লেখক।"[৮]

'ভূমিক্ষয়' শীর্ষক ছড়াটি থেকে চার লাইন উদ্ধৃত করছি। এই ছড়ায় উঠেছে ভূমিক্ষয়ের মতো পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের কারণগুলো--

"বনের ধ্বংস গাছের ঘাটতি ভূমিক্ষয় ডেকে আনে
ইটের দালান তৈরির ফলে কিংবা বানের টানে
ভূমণ্ডলের ক্ষতি হয় খুব, ক্ষয়ে যায় ধীরে ধীরে
ঘূর্ণিঝড়ের কারণেও জেনো মাটি যায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে।"[৯]

আজ মানুষ গাছ কেটে সেখানে বাড়ি তৈরি করছে। এক জায়গার মাটি কেটে পুকুর বুজিয়ে ফেলছে, ইটভাটার জন্যে, প্রচুর মাটি কাটতে হচ্ছে। ফলস্বরূপ ভূমিক্ষয় হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। সর্বোপরি বন্যাকে বা ভূমিকম্পকে আটকানোর হাত তো নেই, তাদের কারণেও ভূমিক্ষয় হচ্ছে অহরহ। এর ফলে মানুষে মানুষে সৌহার্দ্যের সীমা কলুষিত হয়। সমাজে দরিদ্রতা বাড়ে। মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়। খাদ্যের জোগান হ্রাস পায়। এছাড়াও 'শব্দদূষণ' ছড়াটিতে চিনি লেখেন--

"রেলগাড়ি আর বিমানের যে কী ডাক
শব্দদূষণ চলছে যে অফুরান
গাড়ির তুমুল শব্দে বাঁচাই দায়
মাইক্রোফোনের শব্দে কাটছে কান।

শব্দদূষণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।
রক্তের চাপে বাড়ে মানসিক রোগ
বাড়ে হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, বধিরতা
আলসার আর গ্যাসট্রিক-দুর্ভোগ।"[১০]

শব্দদূষণ হলো এমন একটি শব্দ বা শব্দসংকুল পরিবেশ করে, যা মানুষের স্বাস্থ্য এবং স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য ক্ষতিকর। অর্থাৎ মানুষ বা কোনো প্রাণীর শ্রুতিসীমা অতিক্রমকারী কোনো শব্দ সৃষ্টির কারণে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাকেই শব্দদূষণ বলে। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে সে কথাই সহজ-সরল ভাষার ও ছন্দে গাঁথলেন কবি। রেলগাড়ি, বাস, ট্রাক, বিমানের হর্নের আওয়াজ, অনুষ্ঠানে মাইক্রোফোনের আওয়াজ, বাজি-পটকার আওয়াজ ইত্যাদির কারনে শব্দ বৃদ্ধি হতে পারে। দূষণের ফলে যে সমস্ত রোগ ছড়াতে পারে উল্লিখিত ছড়াতেও তা তিনি বর্ণিত করেছেন। রক্তচাপ, মানসিক চাপ, হৃদরোগ, স্নায়ু রোগ এমনকি ঘুমের ও ব্যাঘাত ঘটে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদের কবিতা 'নারী'-তে লিখেছিলেন-

"সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।"

আক্ষরিক অর্থে নীতিকথা মনে হলেও এটি মূলত সাম্যের কথা। এখনো আমাদের সমাজে নারীরা লাঞ্ছিত, বঞ্চনার স্বীকার হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান আজও সেভাবে সুনিশ্চিত হয়নি। এটা তো একধরনের প্রতিবন্ধকতা বা পরিবেশের রোগ। তপন বাগচীর 'সাত দিনের সাতকাহন' নামক ছোটোদের গল্পগ্রন্থে প্রায় প্রত্যেক গল্পেই তিনি নীতিকথামূলক কিছু

ছড়া যুক্ত করেছেন। নিম্নে উল্লিখিত ছড়াটি আমাদের পরিবেশ-বোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। যেখানে করি লেখেন--

"সমাজটা তো অনেক বড়
হরেক জনগণ
সবার কথায় কান দিলে কি
ভরবে নিজের মন?
যে যা বলুক সব কথা কি
চলতে হবে মেনে
ছেলে-মেয়ে একই সমান,
এটুক রাখিস জেনে।"[১১]

একদম ছোটোবেলা থেকে ছেলে-মেয়ের সামাজিক ভেদাভেদ তিনি তুলে দিয়ে এক নতুন আবহ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। আজও টিকেট কাটার লাইন, ট্রেন-বাস সর্বত্র নারী ও পুরুষে বিভাজন। কিছু সুবিধা থাকলেও বৃহত্তর পরিসরে ভাবলে তা অসুবিধাই বটে! এখান থেকে তৈরি হয় কে ছোটো, কে বড়ো, কে উঁচু, কে নীচু! কবি এই পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যে ছড়ায় এক অনন্য নজির রাখলেন। 'পরিবেশ পড়ি বেশ' ছড়াগ্রন্থের তৃতীয় কবিতার নাম 'জলবায়ু'। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন--

"একদিন ধ্বংসের
মুখোমুখি হয়ে যায়
জীববৈচিত্র্য
ক্ষতি করে পরিবেশ
কখনোই হবে না সে
মানুষের মিত্র।"[১২]

জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভারসিটি হলো পৃথিবীর সব জীবন্ত জিনিসের বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা। এতে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ। প্রাণী, অণুজীব এবং তাদের মধ্যে থাকা জেনেটিক তথ্য, এবং তারা যে বাস্তুতন্ত্র তৈরি করে সবগুলিই অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই বাস্তুতন্ত্র একটি শেকলের দ্বারা বাঁধা যেখানে কোনো একটি খুলে গেলেই পুরো বাস্তুতন্ত্র দুমড়ে মুচড়ে পড়বে। কবি উল্লিখিত বাক্যবন্ধে একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষ নিজ ব্যবহারে পরিবেশের ক্ষতি করে, কখনোই তার মিত্র হতে পারবে না। বরং এই জীববৈচিত্রের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে একদিন ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ একুশ শতকের অভিশাপ প্লাস্টিক। শুধু ব্যবহারে ও সহজলভ্যতার জন্য মানুষ ব্যবহার করে যত্রতত্র ছুঁড়ে ফেলে, যার শেষ অবস্থান নদী বা সাগরের জল। আর সেই নিক্ষেপের ফল আমরা সবাই অবগত। আগামীকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যই কবির এই স্বীকোরোক্তি।

এছাড়াও আর্সেনিক, ওজোনস্তর, সুনামি, লবণাক্ততা, 'বন্যা' 'বায়ুদূষণ', 'দুর্গত', 'নদীভাঙন', 'উপকূল', 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' নামক বিভিন্ন ছড়ায় তিনি পরিবেশবান্ধব শব্দ ও বাক্যবন্ধের সংযোজন ঘটিয়েছেন, যা পড়লে পরিবেশবান্ধব মনন সৃষ্টির সহায়ক হবে, একথা হলফ করে বলা যায়। পরিবেশ সুরক্ষাকল্পে এবং শিশুকিশোরদের মানসিক বিকাশে ঠিক কী ধরনের বাণী প্রয়োগ করা উচিত তা যথাযথরূপে প্রকাশ করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক সরল দে তাঁর একটি লেখায় লিখেছেন-

> "ছড়া কখনোই সমাজ-বিচ্ছিন্ন বা সময়-নিরপেক্ষ হতে পারে না। ছড়া শুধু অবাস্তব কল্পনা নয়, চলমান জীবনের শিল্পরূপ। মানুষ মানুষের জন্য। ছড়া লেখকও মানুষ। সুতরাং ছড়াও মানুষের জন্য। ছড়ার আবেদন সবর্জনীন। ছড়ার অসীম ক্ষমতা। ছড়া মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, ঘুমপাড়ায় আবার ঘুম ভাঙায়।"[১৩]

এমন কিছু ঘুম ভাঙানিয়া ছড়াই লিখেছেন কবি তপন বাগচী তাঁর 'পরিবেশ পড়ি বেশ' নামক ছড়াগ্রন্থে। যারা পরিবেশের কথা না ভেবে এখনো জেগে ঘুমোচ্ছেন, তাঁদের অন্তত সেই ঘুম ভাঙানোর প্রচেষ্টা তিনি একপ্রস্থ করেছেন এই গ্রন্থে। কবি হিসেবে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরেছেন সাবলীলভাবে। এ কি শুধু তাঁর একার দায়? এদায় পাঠকের, এ দায় সমাজের সকলের। তাঁর এই অমূল্য প্রচেষ্ট একই সঙ্গে পরিবেশের জন্য এবং ছড়াসাহিত্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১. দেবদাস আচার্য, ছড়ায় ছড়ায় জনশিক্ষা, 'কথাকৃতি: পঞ্চাশে তপনজ্যোতি', সম্পা. নীলাদ্রিশেখর সরকার, নবম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২০১৯, নদিয়া, পৃ. ৫৯

২. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সাক্ষাৎকার সংগ্রহ), সম্পা. নীলাদ্রিশেখর সরকার, কথাকৃতি, নদিয়া, পৃ. ১৮

৩. লেখকের সঙ্গে তপন বাগচীর সাক্ষাৎকার, বেথুয়াডহরি, নদিয়া, ভারত, ১৯ এপ্রিল ২০২৫

৪. তপন বাগচী, উষ্ণায়ন, পরিবেশ পড়ি বেশ, 'ছড়াসংগ্রহ', আদিগন্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০২৫, পৃ.২৬১

৫. তপন বাগচী, উষ্ণায়ন, তদেব

৬. আনসার উল হক, কবি তপন বাগচীর চৈতন্য-ভাবনায় বিশ্বপরিবেশ, 'কথাকৃতি: পঞ্চাশে তপনজ্যোতি', তদেব, পৃ.৩২৫

৭. তপন বাগচী, পাহাড় কাটা, পরিবেশ পড়ি বেশ, তদেব, পৃ.২৭৪

৮. রাশেদ রউফ, তপন বাগচীর ছড়া, 'কথাকৃতি: পঞ্চাশে তপনজ্যোতি', তদেব, পৃ. ৫১৮-৫১৯

৯. তপন বাগচী, ভূমিক্ষয়, পরিবেশ পড়ি বেশ, তদেব, পৃ. ২৬৬

১০. তপন বাগচী, শব্দদূষণ, পরিবেশ পড়ি বেশ, তদেব, পৃ. ২৭২

১১. তপন বাগচী, সাতদিনের সাতকাহন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩৬

১২. তপন বাগচী, জলবায়ু, পরিবেশ পড়ি বেশ, তদেব, পৃ. ২৬৩

১৩. সরল দে, কবি তপন বাগচী ও কবিতার বিষয়-আশয়, 'কথাকৃতি: পঞ্চাশে তপনজ্যোতি', তদেব, পৃ. ৫২০।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আধুনিকতা

তুহিনা মণ্ডল (মল্লিক)
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়, সোনামুড়া, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, পুঁজিবাদের উত্থান পাশ্চাত্য সাহিত্যজগতে পালাবদল ঘটিয়েছিল। সমাজব্যবস্থা, রোমান্টিক সাহিত্য আদর্শ এবং সাহিত্যিকের আত্মসচেতনতাকে বিদ্রুপ করে প্রচলিত বিধির পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন আধুনিক পন্থী সাহিত্যিকেরা। রোমান্টিক চিন্তাচেতনার পরিবর্তে ঘুণধরা সমাজের পঙ্কিল বাস্তবতাকে পুঁজি করে বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিকতা ও রূঢ় বাস্তববাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। পাশ্চাত্যের এই ঢেউ এসে পৌঁছেছিল সমুদ্রপারে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রেও। বাংলার সাহিত্যজগতেও তখন প্রবল দোলাচলতা---একদিকে সমস্ত সাহিত্যজগত জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুগামীরা, অপরদিকে রবীন্দ্রপ্রভাব ও রবীন্দ্র আদর্শকে অস্বীকার করে আপন আপন প্রতিভার স্বাক্ষর ফুটিয়ে তুলতে প্রস্তুত নব্য সাহিত্যিকের দল যাঁদের প্রকাশ ঘটেছিল মূলত: 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'পরিচয়' এবং 'কবিতা'-র পৃষ্ঠা জুড়ে।

কল্লোলগোষ্ঠীর তরুণ লেখক কবিরা সরাসরি রবীন্দ্র-বিরোধিতায় উচ্চকণ্ঠ হলেও বেশিরভাগ তরুণ তুর্কীর দল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন তাঁর সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েই। অতিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন এবং অবশ্যই অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ, নজরুল এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

সূচক শব্দ: আধুনিকতা, অশ্লীলতা, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রবিরোধিতা, আধুনিক রবীন্দ্রনাথ, চিরন্তন রবীন্দ্রনাথ।

মূল আলোচনা:

১৯২৭ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অমল হোম 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসঙ্গে 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করলে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস---অমল হোমের প্রবন্ধের বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন এবং আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করে রবীন্দ্রনাথকে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন লিখলেন 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ যা প্রকাশিত হল 'বিচিত্রা' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরই সাহিত্যমহলে শুরু হল তর্জা---রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' এর প্রতিবাদ করে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখলেন 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' প্রবন্ধ। নরেশচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত অশ্লীল সাহিত্যের হোতা। নরেশচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন 'সাহিত্যের নবত্ব' –প্রবন্ধ। এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন শরৎচন্দ্রও। 'পরিচারক' পত্রিকার সম্পাদক অতুলানন্দ রায়ের উস্কানিতে শরৎচন্দ্র লিখলেন রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে 'সাহিত্যের রীতিনীতি', রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে লিখলেন 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে বেশ কিছুদিন কলমের যুদ্ধ চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্যগুলি মেনে নিতে পারলেন না পাশ্চাত্য ভাবধারায় ভাবিত আধুনিকতার ধ্বজাধারী

নব্যসাহিত্যিকের দল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই অন্যের মতে নিজের মত পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন না। তাই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী এবং দিলীপ রায়কে লেখা চিঠিতে বিভিন্ন সময় পাশ্চাত্য এবং বাংলা আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন সেই মতগুলিই সুশৃঙ্খলিত হয়ে উঠল 'সাহিত্যধর্ম', 'সাহিত্যে নবত্ব', 'আধুনিক কাব্য', 'নবযুগের কাব্য' (যা আসলে অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া' ও 'এক মুঠো' কাব্যের রবীন্দ্রকৃত সমালোচনা) প্রবন্ধে। মূলত: এই চিঠি ও প্রবন্ধগুলির নিবিড়পাঠে খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া যায় আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিটি।

বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতার ধারণাটি ঊনিশ শতকের নির্মাণ। সময় বদলের সাথে সাথে বদলে যায় অশ্লীলতার ধারণাও। সাধারণত: অশ্লীলতার দুটি দিক থাকে---প্রথমত: অশ্লীল শব্দের ব্যবহার দ্বিতীয়ত: ভাবের অশ্লীলতা। বিশ শতকের সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে যে বিতর্ক তা এই ভাবের অশ্লীলতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে এই বিষয়ে লিখেছেন যে স্ত্রী-পুরুষের মিলন আহার ব্যাপারের উপরের কোঠার কারণ ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ রয়েছে। জীবধর্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গৌণ কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তোলে তাই কাব্যে ও সকলপ্রকার কলায় তা এতটা জায়গা জুড়ে আছে। সাহিত্যে যৌনতা বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য—

> "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বেআব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য-পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটাই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।"[১]

নারী-পুরুষের মিলন স্বাভাবিক ব্যাপার, সাহিত্যে তা এতটুকুই ব্যবহৃত হতে পারে, যতটা প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনকে ছাপিয়ে মিলনের মাধুর্য্যের পরিবর্তে মিলনের অশ্লীল বর্ণনার আয়োজন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

একটা সময় ধর্ম সবকিছু শাসনে রাখত, বর্তমানে বিজ্ঞান ধর্মের জায়গা নিয়েছে। বিজ্ঞানের ব্যক্তিভাব বিবর্জিত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা সাহিত্যে বিদেশ থেকে আমদানি করা। এই আধুনিকতার দুটি দিক—একটি সৌন্দর্যহীন নির্লজ্জতার প্রকাশ এবং অপরটি দারিদ্র্য নিয়ে আস্ফালন। রঙের বদলে কাদা দিয়ে হোলি খেললে তার উদ্দেশ্য রঙীন করা থাকে না, মলিন করা হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ শতকের বাংলা আধুনিক সাহিত্য এই কাদা নিয়ে হোলি খেলায় মেতেছে। 'সাহিত্যের নবত্ব' প্রবন্ধেও তিনি লিখছেন—

> "আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে-অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডারিজম।"[২]

বিজ্ঞান ব্যক্তিস্বভাববর্জিত, তার ধর্মই হল সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল আধুনিক সাহিত্যিকদেরও ক্রমে ঘিরে ধরেছে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে

যৌনমিলনের দৈহিকতার বিষয় উঠে এসেছিল এই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ঘিরেই। কিন্তু ভারতবর্ষে যেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমাজ বা মানবমনকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি সেখানকার সাহিত্যে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণ হাস্যকর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> "সম্প্রতি যে দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলব্ধ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে সে দেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি সে দেশের সাহিত্যে ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে। ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায় 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন' উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে!' ভারতসাগরের এ পারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, "হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরি।"[৩]

বিশ শতকের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চিত দুই বিষয় লালসার অসংযম এবং দারিদ্র্যের আস্ফালন যে সাহিত্যের নিত্য বিষয় নয়, পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত তা নানাভাবে নানা জায়গায় ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন নব্যকবিদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত শক্তিশালী তাঁদের লেখায় সাহস আছে, বাহাদুরী নেই। কিন্তু যাঁরা শক্তিহীন তাঁরা কৃত্রিমতা দিয়ে সাহিত্যকে আবিল করে তুলছে—তারাই নিজেদের অপটুত্বকে ঢাকতে নির্লজ্জতাকে পৌরুষ বলে জাহির করছে। "বাঁধিগতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই বলেই সে হাল আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ করে রাখে। বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডার বাঁধা নিয়মে তৈরি করে রাখে, যাতে—তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধা বুলি আছে—অপুট লেখকের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডার'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্রের আস্ফালন, আর একটা লালস্যার সংযম।"[৪]

নৈর্বক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কয়লাকুঠি বা বস্তিজীবনের কথা সাহিত্যে বর্ণিত হলে তা সত্য হলেও নিত্য নয়। অমিয় চক্রবর্তীকেও চিঠিতে লিখেছিলেন ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে জ্বর উঠে কিন্তু সেটা বিকারমাত্র নিত্য নয় তেমনি সাহিত্যে লালসার অসংযম ও দারিদ্র্যের আস্ফালন বিকারমাত্র, নিত্য নয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র 'আমি কবি যত কামারের' কবিতায় নিজেকে যতই খেটে খাওয়া মানুষের কবি বলে দাবী করুন না কেন কবিতার ভাষা বা চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির কোন যোগ নেই।

"মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই কুম্ভকারের চাকা"—এ ভাষা কোন শ্রমিক শ্রেণির ভাষা হতে পারে না। আধুনিক কবিরা তাত্ত্বিক ভাবে নিজেদের প্রোলেতারিয়েত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করলেও প্রকৃতপক্ষে যে তা নন তা অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় না। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আমি কবি যত কর্মের আর ঘর্মের'—এই ঘোষণা কে চ্যালেঞ্জ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

> "সেটা সত্য হোক
> শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।

সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।"[৫]

একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল "সাহিত্যের নবত্ব" প্রবন্ধেও—"এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্র-নারায়ণ'-এর ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেননি—ভালোরকম উপার্জন করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন।"[৬]

'কল্লোল' গোষ্ঠীর কবি ও লেখকদের অন্ধ পাশ্চাত্যনুকরণ যেরকম রবীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করেছিল তেমনি ফ্রয়েড, মার্কস, ডারউইনের তত্ত্ব এবং তৎকালীন আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য (এলিয়ট থেকে Huxley) সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সহায়ক ছিলেন তাঁর এককালীন সাহিত্যসচিব অন্যতম আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। বিদেশে থাকার সুবাদে বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে এবং বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে। বিদেশে থাকার সুবাদে বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে এবং বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে সবসময় রবীন্দ্রনাথকে জানান দিতেন তিনি। পাশ্চাত্য বিভিন্ন গ্রন্থের কপিও পাঠাতেন কবিকে। আধুনিকতা প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ তাই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার ধারণাকে বুঝতে অন্যতম মাইলফলকের কাজ করে।

৬ই জানুয়ারি ১৯৩৫-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন—আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে তিনি প্রবেশ করতে বাধা পাচ্ছেন কারণ আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমার বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণী রূপে। সমসাময়িক তরুণ প্রজন্মের তৎকালীন আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে বোধকে সম্মান জানিয়েই লেখেন—

> "নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ই একটা স্পর্ধামাত্র।"[৭]

ইংরেজি আধুনিক কাব্যের ঔদ্ধত্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান দৃষ্টি হেনে তিনিSturge Moore-এর সাহিত্যের প্রশংসা করে লিখেছেন—তাঁর সাহিত্যে জনতার ফরমাসে নব্যতার ভেক ধরেনি, তাঁর সাহিত্যের আভিজাত্য অম্লান।

চিঠিপত্র ১১ খণ্ডে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ৮৭ সংখ্যক পত্রে (৭ই এপ্রিল, ১৯৩৬) নেভিন্সনের বই ভালো লাগছে বলে জানাচ্ছেন কারণ একই তাঁর লেখা আধুনিকতার লক্ষণ আক্রান্ত নয়, সার্বজনীন। ৯৫ সংখ্যক পত্রে (২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮) Huxley-র বই পড়ে আপ্লুত হয়ে লিখছেন—

আধুনিক যুগের চিত্তবিকৃতির ব্যঙ্গ মানুষের পূজার ঘরে যে রকম কুৎসিৎ উৎসাহের সঙ্গে কালোপাহাড়ি আরম্ভ করেছিল, তাতে ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছিল, ঐ বইটিতে নিত্যকালের হাওয়ায় মানুষের শাশ্বত সাধনার বাণীর স্পর্শ পাওয়া গেল।

এই চিঠিতেই আধুনিক কবিদের তুচ্ছকে নিয়ে বাহাদুরির চেষ্টা, সামান্যকে সহজ আনন্দের পরশমণি ছুঁইয়ে অসামান্য করে তোলার পরিবর্তে তা নিয়ে ওস্তাদী করার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি। একই কথা লিখেছিলেন কয়েক বছর আগে 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে (এপ্রিল, ১৯৩২)—

> "বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত আজ অসুস্থ্য, অসুখী, অব্যবস্থিত।"[৮]

রোমান্টিক কবিরা বাছাই করে বিষয় নির্বাচন করতেন যেমন তেমনি আধুনিক কবিরাও বাছাই করেন। পার্থক্য কেবল বিষয় নির্বাচনে। আগেকার কবিরা তাজা ফুল বাছাই করতেন, আধুনিক কবিরা পোকা ফুল বাছাই করেন। অঘোরপন্থীরা যেমন বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস, দূষিত পদার্থ খায়। আধুনিক কবিরাও কাব্যজগতে অঘোরপন্থার সাধনা করেন।

'আধুনিক কাব্য' প্রবন্থটি প্রমাণ করে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চর্চার গভীরতা। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন কালের চেয়ে ভাবের আধুনিকতাই আধুনিকতা বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত। কারণ আধুনিকতা কালকে মেনে চলে, কালের অবসানে তার খোলস যায় পড়ে, কিন্তু নবীনতা সর্বকালীন। এই প্রসঙ্গে এলিয়টের কাব্য ও পূর্ববর্তী শতকের চৈনিক কবি লি-পো-র কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করে লি-পো-কে আধুনিক কবি বলে দাবী করেছেন।

যে কোন ক্ষেত্রে আদর্শ না থাকলে সাধনার মূল্য থাকে না—একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। ১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠিতে (চিঠিপত্র ১৬, সুধীন দত্তকে লেখা ১৪ নং চিঠি) লিখছেন—

পাঠক সাধারণের নিয়ত দাবীর কর্ষণে সকল দেশেই সস্তা সাহিত্যের প্রচুর ফলন ফলচে। কিন্তু সাহিত্যে বা ব্যবহার সামগ্রীতে সস্তার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আদর্শের দাবী পরিমাণের মাপে বিচার চলে না। আদর্শরক্ষা করতে গেলে সাধনার প্রয়োজন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে চিঠিপত্র ১১ খণ্ডের ১১০ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষার কাঠিন্য এবং বিষয়বস্তুর মননশীল প্রকাশের কথা বলছেন। এ প্রসঙ্গেই বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' পড়ে তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি একথাও জানাচ্ছেন। আক্ষেপ করে লিখছেন—

> "আমাদের দেশে হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলচি যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কী করে? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে সনাতনীও হতে পারে অথবা উভয়ই হতে পারে কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়েটের বা অডিনের বা এজরাপাউন্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না।"[৯]

তাহলে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতা বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই জানাচ্ছেন—আধুনিকতা মানে উদ্ধত অবিশ্বাস আর কুৎসার দৃষ্টি দিয়ে ব্যক্তিগত চিত্তবিকারের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ নয়, রবীন্দ্রনাথের কাছে আধুনিকতা হল—

> "বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।"[১০]

আধুনিক কাব্য ও সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দোলাচলতা থাকলেও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন প্রচলিত রবীন্দ্রভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে—তবে এই নূতনত্ব বাহ্যিক নয়, আভ্যন্তরীণ তাই সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রবিরোধীদের আদর্শ হয়ে উঠলেন। যে রবীন্দ্রনাথ 'পরিশেষে' কাব্যের "আগন্তুক" কবিতায় লিখলেন—

> "কালের নৈবেদ্যে লাগে যে সকল আধুনিক ফুল
> আমার বাগানে ফোটে না সে।"[১১]

সেই রবীন্দ্রনাথই ১৯৩৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন—

> "বর্তমান যুগধর্মের প্রেরণাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার পথের বাঁকচুর সে ঘটিয়েছেই সব সময়ে জানতে পারি বা না পারি। আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে পুরাতন বাসাতেই, আমি বাসাবদল করিনি—বোধ হচ্ছে না করবার কারণ এই যে আমার বাসায় জায়গা ছিল যথেষ্ট।"[১২]

দেশবিদেশ থেকে নানারকম ভাবের প্রেরণা কবিমনকে প্রভাবিত করেছে, তাঁর সৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করেছে। আমরা পেয়েছি 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'পত্রপুট' (১৯৩৬), 'শ্যামলী' (১৯৩৬), 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮), 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯)-এর মতো অনবদ্য সব কাব্য যেখানে কখনো বিষয়ের বৈচিত্র্য, কখনো ছকভাঙ্গা ছন্দ প্রমাণ করেছে রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যিকদের হতভম্ব করে প্রকাশিত হয়েছিল 'শেষের কবিতা' যেখানে আধুনিকপন্থীদের সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার বিরোধকে ইঙ্গিতে তুলে ধরেছিলেন তিনি। 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য' গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু লিখছেন—"শেষের কবিতার প্রথম কিস্তি বেরনো মাত্র বিকিয়ে যেতে লাগলো। মাসে মাসে এই আশ্চর্য নতুন রচনাটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হল যেন একটা বন্ধ দুয়ার, যা আমাদের আনাড়ি হাতের আঘাতে কোন উত্তর দেয়নি, তা এক জাদুকরের স্পর্শে হঠাৎ খুলে গেলো.......কী সহজে কী সম্পূর্ণ করে কী সুন্দর ভঙ্গিতে। মনে হল বইটা যেন আমাদেরই, অর্থাৎ নবীন লেখকদেরই উদ্দেশ্যে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্য এটি গুরুদেবের একটি তির্যক ভর্ৎসনা। অবাক হয়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের "আধুনিক মূর্তি"।"[১৩]

গল্প বলার নতুন ধরণ দেখা গেল 'সে' 'তিনসঙ্গী', 'লিপিকা'-য়—বৈজ্ঞানিক চেতনা; পুরানোকে ভেঙে নতুন চালে চলার আধুনিকতা যেখানে ভাষারূপ পেল। রূপকথার আদল ভেঙ্গে বেড়িয়ে এল রূঢ় বাস্তব 'লিপিকা'-র গল্পগুলিতে। সৃষ্টি হল সোহিনীর মতো চরিত্র। 'রূপশিল্প' ('প্রবাসী', আষাঢ় ১৩৪৬), 'চিত্রলিপি' (ভাদ্র ১৩৪৭) প্রবন্ধে চিত্র ও সংগীত সম্পর্কে তাঁর আধুনিক ভাবনা ভাষারূপ পেল। কিন্তু আধুনিকতা বলতে প্রচলিত যে ধারণা তাকে ছাপিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার এক শাশ্বতরূপ তুলে ধরলেন তাঁর সৃষ্টিতে—যেখানে যুগধর্মের তিলক অপেক্ষা চিরন্তন রবীন্দ্রনাথই ধরা দিলেন নবরূপে।

সূত্রনির্দেশ:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, চৈত্র ১৩৬৫, পৃ. ৮২-৮৩।
২. ঐ, পৃ. ৮৭
৩. ঐ, পৃ. ৮৪
৪. ঐ, পৃ ৮৯
৫. https:\\tagoreweb.in/Verses/Janmodin-138/bipula....

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ, পৃ. ৯০
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১১, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৯, পৃ. ১৩৬।
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১১, পৃ. ১১৮।
৯. ঐ, পৃ. ২৩৮।
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, পৃ. ১১৬.
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ৮, পৃ. ১৮৬।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১১, পৃ. ২৩৫।
১৩. বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য, নিউ এজ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৬২।

গ্রন্থপঞ্জী:

আকর গ্রন্থ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, চৈত্র, ১৩৬৫।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১১ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮১।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১৬ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। ড. অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, মার্চ ২০০২।
২। ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল, ২০০৭।
৩। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ, ২০০৭।

শ্রমিক আন্দোলনে নারীনেত্রী : ঔপনিবেশিক বাংলা ও স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবাংলার বিগত পাঁচ দশকের প্রেক্ষিতে একটি ঐতিহাসিক বীক্ষণ (১৯২০-১৯৭০)

শিল্পা দেবনাথ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
বিরাজলক্ষী ঘোষ
অধ্যক্ষ, বি.এড বিভাগ
ঘোলদিগরুই শিক্ষন মন্দির, পুরশুরা, হুগলী

সারসংক্ষেপ: দেশ ও দশের উন্নতি হয় প্রত্যেক শ্রেণি, বর্ণ, জাতি, এবং সমাজের উচ্চ ও নিপীড়িত সকল মানুষের কল্যান সাধনের মধ্যে দিয়ে। একটি অংশকে পিছিয়ে রেখে কখনই অপর অংশ এগিয়ে যেতে পারে না। এগিয়ে চলার জন্য তাই এই দেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার আন্দোলন নয় জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের, মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকের, সামাজিক শোষণের প্রতি নারীর, ধর্মীয় ধ্বজাধারীর বিরুদ্ধে অবদমিতের। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বহুমুখী হওয়াটাই সমীচীন। প্রত্যেক শ্রেণির নিজের ওপর হয়ে চলা দলনকে না বুজলে এবং তার বিরুদ্ধে কণ্ঠ না তুললে প্রকৃত স্বাধীনতা দেশে আসতে পারে না। এই উপলব্ধি থেকেই পরাধীন দেশে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যেমন শ্রমিক কৃষক সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস হয়েছে তেমনি তারা নিজ উদ্যোগে ও সচেতনতায় অনেক সময় প্রতিবাদে এসেছেন, এই আলোচনাতে যদিও একাধারে সমাজের দুটি অংশ অর্থাৎ শ্রমিক এবং তার সমস্যা এবং শ্রমিক আন্দোলনে নারী নেত্রীগনের ভূমিকা তুলে ধরা হবে তবুও সমাজের বাকি অংশ সমানভাবে এমনি পারস্পরিক ভাবে একে অপরের পাশে বার বার এগিয়ে এসেছে পরাধীন এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করতে পরাধীন দেশে ও স্বাধীনতার পরবর্তী সময় নারীদের এগিয়ে আসার পরিসর আজকের মতো না হলেও মুস্টিমেয় কিছু নারী যারা কালের থেকে অনেক এগিয়ে তাদের চেতনায়, তাদের আত্মত্যাগে এই কিছুসংখ্যক প্রগতিশীল নারীকে শ্রমিক নেত্রী রুপে দেখা এই লেখার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে বলা যায় বীণা দাস এর কথা, বলা যায় সুধা রায় এর কথা, স্মরণ করতে হয় ডঃ মৈত্রেয়ি বসুকে, বলতে হয় দুখমৎ দিদির কথাও। ঔপনিবেশিক বাংলায় এবং স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের কিছু শ্রমিক অসন্তোষের চিত্র তুলে ধরলে এবং কিভাবে সেই অসন্তোষ আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়েছে উক্ত প্রগতিশীল নারীদের সেখানে অবদান কতখানি এবং তাদের সীমাবদ্ধতাটি কোথায় তাও বিশ্লেষণের দাবি রাখে যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হবে।

সূচক শব্দ: শ্রমিক নেত্রী, প্রগতিশীল, বঞ্চনা, আন্দোলন, সমাধান, চেতনা, জীবনবোধ, শিক্ষা, সীমাবদ্ধতা।

মূল আলোচনা:

পরাধীন এবং স্বাধীন বাংলায় চটকল, কয়লাখনি, চা বাগিচা, বন্দর, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রবার শিল্প, বিড়ি শিল্প, ছোটো, বড়ো কারখানা গড়ে ওঠে এই কারখানাগুলি ছিল বেশিরভাগ বিদেশী কোম্পানি এবং এই শিল্পগুলির সাথে সাথে তৈরি হয় একটি শ্রমিক শ্রেণীও। কারখানা ভিত্তিক শ্রমিক শ্রেনী বাংলায় ঔপনিবেশিক ভারতেই গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে বাংলার গ্রামে গঞ্জের মানুষ অথবা স্থানীয় মানুষ এই কারখানা গুলিতে শ্রমিকের কাজ করলেও বাঙ্গালিরা পরবর্তী সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হিসেবনিকেশ রাখা অথবা তত্ত্বাবধায়ক কাজ করতে থাকে কারন স্থানীয় স্তরে কিছু জমি জায়গা থাকায় তাদের কিছু বারতি আয় এর উপায় ছিল, এই কায়িক পরিশ্রমের জায়গা পুরন করতে থাকে বাংলার বাইরের বিভিন্ন ভাষাভাষীর বিভিন্ন ধর্মের শ্রমিকরা। এদের পরিশ্রম কম ছিল না কিন্তু থাকার বস্তিগুলি ছিল নরকের সমান। অপরিচ্ছন্ন বসতি, অপরিমিত খাদ্যাভ্যাস তাদের ঠেলে দিত নেশার দিকে, মেয়েদের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয় অল্প বয়সে বিয়ে, অনেক সময় বিক্রি হয়ে যাওয়া বস্তির পরিবেশে এগুলি কিছুই অসম্ভব ছিল না। এমন জীবনযাপন থেকে, অভাব থেকে, লাঞ্ছনা থেকে, তাদের জীবনবোধ এর দিকে, শিক্ষার দিকে রুচির দিকে, আলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন কিছু নারী এবং কিছু রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের সদস্যরা। এই নারীরা কখনো এসেছেন সমাজের ওপরতলা থেকে অথবা শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই। সংগঠিত করেছেন শ্রমিক চেতনাকে। কালের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও তারা প্রগতির পক্ষপাতি এটা বলা যায়।

বিষয়গত উদ্দেশ্য:

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সবসময়ই পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে একশ্রেনির মানুষ নিজেদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়, কিছু মধ্যস্বত্তভোগি নিজের ভাগ্য তৈরি করে যারা পারেনা শুধুই নিজের শ্রম দিয়ে যায়, আর সেই শ্রমপিছু কিছু মজুরি শুধু পায়, থাকে না কোন স্বাস্থ্যবিমা, এমনকি ক্রমাগত শ্রম দিয়ে মজুরি পাওয়ার নিশ্চয়তা। এই শ্রেনির ক্রমাগত শোষণ এবং তার আশু সমাধান করতে যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের যাত্রাকে তুলে ধরা এই লেখার উদ্দেশ্য।

এতৎ বিষয়ক গ্রন্থ পর্যালোচনা:

বাংলার শ্রমিক ইতিহাসের আলোচনায় যে নারীদের নাম উঠে এসেছে তাদের অনেকের যাত্রা তারা নিজেরাই তুলে ধরেছেন, যেমন বীনা দাস, তার ‘শৃঙ্খল ঝংকার’ এ এবং মৈত্রেয়ি বসু তার ‘মুক্তির অধিকারে’। তাদের জীবনদর্শন তাদের লেখার মধ্যে দিয়েই খোঁজার চেস্টা হয়েছে এই লেখায়, আবার যারা ঠিক রাজনীতির শিক্ষার ও সম্ভ্রান্ত পরিসরে বড় হননি মঞ্জু চট্টপাধ্যায় তাদের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন ‘অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস’ বইটিতে, সম্পাদনায় নির্বাণ বসু। লেখার রসদ খোঁজা হয়েছে, সিটুর মাসিক পত্রিকা ‘শ্রমিক আন্দোলন’ মাসিক পত্রিকাতে যেখানে শ্রমিক নেত্রীদের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনা:

জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের অনেক দিক রয়েছে। জাতীয়তাবোধ প্রত্যেক শ্রেণির একাত্ম না হলে এবং একে অপরের স্বার্থ না বুজলে সম্ভব না। প্রত্যেক শ্রেনির মিলিত সহযোগ ছাড়া তা হয় না। বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশ এর দশক এই এই সহযোগ দেখিয়ে দিয়েছিল। এই দুই দশক দেখেছে গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ, দেখেছে খিলাফত, আবার জাতীয় আন্দোলনে স্বরাজ্যদলের

আবির্ভাব, হিন্দুস্থান রিপাবলিকান রেভ্যুলুশন দলের চন্দ্রশেখর আজাদ এর নেতৃত্বে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। ত্রিশ এর দশকে বিপ্লবি কর্মকাণ্ডের জোয়ার বাংলায় ছিল অভূতপূর্ব। ১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সেনেট হলে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি করে হত্যা করে ১৪-১৫ বছরের দুটি মেয়ে। তার দুই মাস পরেই ১৯৩২ ৬ই ফেব্রুয়ারী সেনেট হলে কনভোকেশন গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন বীণা দাস। তিনি ছিলেন বেনিমাধন দাস এর কন্যা। বেনিমাধব দাস সুভাষ চন্দ্রের বসুর স্কুল জীবনের শিক্ষক। বীণা দাস এর গোটা পরিবারই রাজনৈতিক পরিবার। কলেজ জীবনে দেশের ভবিষ্যৎ আন্দোলন নিয়ে সুভাষ বসুকে তিনি প্রশ্ন করেছেন দেশ কিভাবে স্বাধীন হবে, সুভাষ বসু এর উত্তরে বলেন, কিছু পাওয়ার আগে পাগল হয়ে উঠতে হয় তবেই তা পাওয়া যায়, বীণা দাস তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, সেদিনের কলেজ পড়ুয়া বহু ছাত্র ছাত্রী প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে গুপ্ত সমিতি গুলির সাথে যুক্ত ছিলেন, ধনী বন্ধু দের কেউ অর্থ দিয়ে, আর যাদের অর্থ দেওয়ার ক্ষমতা নেই তারা নিজেকেই দিয়ে দিতেন সমিতির কাজে। জীবনের স্বপ্নের দিনগুলিতে তিনি খুজে বেরিয়েছেন কিভাবে অর্থ আর দলের সদস্য পাওয়া যায়। যৌবনের এই পাগলামির দিনগুলি তাকে জুগিয়ে দিয়েছিল অপার সাহস। এই সাহস থেকেই হত্যার চেস্টা করেন গভর্নরকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় গুলি। গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘ ছয় বছর একটানা জেল। দীর্ঘ কারাবাসে ছিলেন মেদিনীপুর জেল, সেখান থেকে প্রেসিডেন্সি, এবং হিজলি জেল। তদানিন্তন ব্রিটিশ সরকার আন্দামান জেল এ পাঠানোর তৎপরতাও নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে শেষ অব্দি তা সফল হয়নি। মুক্তি পেলেন সাত বছর পর ১৯৩৯ সালে।[১] জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে এর পরেও তিনি জড়িত থাকতে চেয়েছেন। গনবিপ্লবের স্বপ্ন, বিরাট মানবিকতা তাকে টেনে নিয়ে এ সেছে শ্রমিক আন্দোলনে। শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম তার কাজ করা শুরু হয় টালিগঞ্জের চালকলে। মহিলা ও শিশু শ্রমিক দের দুর্দশা সেখানে বেশি। পুরুষ শ্রমিকরা সারাদিন খেটে মাঝে শুধু দুপুরে খাওয়ার সুযোগ পান, বেতন পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ আনা। মহিলা শ্রমিকদের বেতন আরও কম। এই সমস্যাগুলি নিয়ে আগে ধর্মঘট হলেও গুলবাহার নামে সর্দারনী যিনি প্রথমে শ্রমিক ধর্মঘটের নেত্রী হলেও মালিকপক্ষ তাকে টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়, ভেঙ্গে যায় ধর্মঘট। শ্রমিকরা যেখানে ছিল সেখানেই পরে থাকে। এমন সময়ই বীনা দাস রঙ্গমঞ্চে আসেন। তবে শ্রমিকরা প্রথম থেকেই তাকে অবিশ্বাস এর চোখে দেখেছিল। এর মধ্যেও তিনি চেষ্টা করে গেলেন শ্রমিক বস্তির মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে, কিন্তু যেখানে ভদ্র ভাবে জীবন বাঁচার মতো অর্থ নেই, বস্তির মেয়েদের বাড়ির অভাবের কারনে অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ের পর শুরু হয় আরেক দুর্বিষহ জীবন, ছেলেরা অসামাজিক কাজ করে, নেশায় লিপ্ত থাকে, তাদের সুস্থ জীবনই নেই সেখানে, প্রতিবাদ আন্দোলন, রাজনীতিবোধ অনেক দূরের বিষয়। ১৯৪২ এর আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে অব্দি তিনি হাওড়া-হুগলি অঞ্চলে শ্রমিক ইউনিয়ন এ কাজ করেছেন, এই সময় তার ছায়াসঙ্গি ছিলেন কমলা বসু এবং তারাদাস ভট্টাচার্য। ১৯৪০-৪১ এ বীনা দাস ঘুসুরি তে রাধেশ্যাম কটন মিল, হনুমান জুট মিল, বেলুড়ে ক্রাউন অ্যালুমিনিয়াম, আরও অনেক। তিনি চেষ্টা করেছেন এই সব কলকারখানা গুলিতে শ্রমিকদের কাজের সময়, উপযুক্ত মজুরি, চাকরির স্থায়িত্ব, মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, ছাঁটাই করার বিরুদ্ধে.... এই ধর্মঘটগুলি কখনো সফল হতো, কখনও হত না কিন্তু দিনশেষে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হত। তবে তার রাজনৈতিক জীবনে বহুবার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে স্তম্ভিত হয়েছেন ক্লান্তি এসেছে, কিন্তু পথ চলা থামেনি এই অগ্নিকন্যার তবে সময়ে সময়ে ভয় ও

পেয়েছেন, লিখে গিয়েছেন ‘শৃঙ্খল ঝঙ্কার’ বইটিতে, এই কর্মময় জীবনের শেষ যেন নিস্ফলা মরুভূমি না হয়...।[২] শেষ জীবনে বারানসীতে খুব কস্টের মধ্যে দিয়ে তার মৃত্যু হয়।

বীণা দাস এর মত সব নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে আসেননি, যেমন সুধা রায়, তিনি ছিলেন কমলা গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা, এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা, তিনি সরাসরি শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই শ্রমিক রাজনীতিতে পদার্পণ করেন, সুধা রায় কাজ করেছেন বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে। বাণিজ্যের জন্য কলকাতা বন্দর ছিল অত্যন্ত প্রানচ্ছল এবং কর্মব্যস্ত। আজকের মত সেদিনের গঙ্গা মজে যায়নি। তাই জাহাজ কোম্পানি গুলির বেশির ভাগ জাহাজ কোম্পানিগুলি ছিল ইংরেজ মালিকানাধীন। বন্দরে নানা স্তরের শ্রমিক কাজ করত। কায়িক পরিশ্রমের কাজ গুলি বেশির ভাগ বাংলার বাইরের শ্রমিকরাই করতেন। এর মধ্যে ছিল বিহারি, উর্দুভাষী মুসলিম, হিন্দুস্থানী, এবং ওড়িয়া। সারাদিনের গলদঘর্ম কাজ করে না ছিল থাকার পরিস্কার বাসস্থান না ছিল উপযুক্ত বেতন। কর্মস্থলে এরা একাই থাকত পরিবার নিয়ে না। ১৯৩৪ এ মার্চ মাসে পোর্ট অ্যান্ড ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তৈরি হল। তবে তা সহজেই তৈরি হয়নি। এর নেপথ্যে যে যারা ছিলেন তাদের কথা বলতে গেলে আরো একটু পিছনে যেতে হয়। বন্দর শ্রমিকদের এই সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল তদানিন্তন লেবার পার্টি এবং পেজেন্টস পার্টির নেতৃত্বের উদ্যোগে। এর মধ্যে উল্লেখ্য নাম যার তিনি হলেন সুধা রায়। এছাড়াও লেবার পার্টির অন্যান্য সদস্যরা নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার, নির্মল সেনগুপ্ত, শিশির রায়, কমল সরকার এদের অবদানও রয়েছে। লেবার পার্টির থেকে ডক শ্রমিকদের সংগঠিত করতে এরা এগিয়ে এলেন। সুধা রায় ও এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। সেই সময় খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, চুনাগলি, এই অঞ্চল গুলিতে যে ডক শ্রমিক রা থাকতেন এই অঞ্চলগুলি ছিল খুবই ভয়াবহ। এর মধ্যে দিনে, রাতে নারী হিসেবে কাজ করা সাহসের বিষয়। এই সাহস ছিলও সুধা রায় এর। যদিও তিনি নতুন না, প্রভাবতি দেবী সন্তোশকুমারি এরা আরো আগেই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন। তবে সুধা রায় এর সাথে তাদের পার্থক্য এখানেই যে সুধা রায় তিনি তার হাজরা লেন এর বাড়ি থেকে খিদিরপুরে শ্রমিক বস্তিতে গিয়ে শ্রমিকদের রাশিয়ায় লেলিনের নেতৃত্বে কিভাবে শ্রমিকরা দুবার বিপ্লব করে অথবা দেশের মধ্যে কিভাবে লড়াই মধ্যে দিয়ে তারা শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব তা তিনি শ্রমিকদের বোঝাতেন। এই রাজনৈতিক সচেতনতা প্রভাবতী সন্তোষকুমারিরা তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক দের মধ্যে জাগাতে পারেননি। শ্রমিক আন্দোলন দাবি দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। পোর্ট অ্যান্ড ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তৈরি হওয়ার পর এর সভাপতি হলেন আজিজ সর্দার। নানা দাবির ভিত্তিতে এই ডক শ্রমিকগন আন্দোলন শুরু করেন। দাবির মধ্যে ছিল ৮ ঘণ্টা কাজ, দৈনিক মজুরি ১২ টাকা ৮ আনা থেকে বাড়িয়ে ১৬ টাকা ৮ আনা করতে হবে। কাজের চাপ কমাতে হবে, মোট ২০০০০ শ্রমিকের মধ্যে ১৫০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। শ্রমিকদের এই দৃঢ়তা সত্ত্বেও শ্রমিক সর্দারদের মধ্যে কেউ কেউ সুহুরাবর্দির প্ররোচনায় পা দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যায় জড়িয়ে পরেন। ধর্মঘট ভেঙ্গে যায়। তবে সুধা রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বের সাফল্য এখানেই যে ধর্মঘট ভেঙ্গে গেলেও ইউনিয়ন ভাঙ্গেনি।[৩] রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করতে তারা সক্ষম হয়েছিলেন। সুধা রায় যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে একাই যে নেতৃত্ব দিয়েছেন তা নয়, কিন্তু শ্রমিকদের বস্তিগুলিতে ছিল তার অবাধ বিচরণ। এমনকি ধর্মঘট ভেঙে দেওয়ার জন্য যদি জাহাজ কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রাণনাশ এর ষড়যন্ত্র করা হয় তার খবর শ্রমিকরা আগে ভাগেই দিয়ে

দিতেন, হয় লুকিয়ে রাতের বেলা বস্তি থেকে সাবধানে বের করে দিতেন, নয়ত রাতে বস্তিতেই থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন, সামাজিক অর্থনৈতিক দুরত্ব, বস্তির রুচিহীন পরিবেশ থাকলেও শ্রমিকরা তাদের 'সুধাদি'-কে পরম শ্রদ্ধা ভালবাসা ও নির্ভরতার আশ্রয় মানতেন[৪]।

বাংলার ইতিহাসে ১৯৪২ এর মন্বন্তর ছিল একটা অভিশাপ। একের পর এক সমৃদ্ধ গ্রাম উজার করে কলকাতাতে চাষি পরিবারগুলি উঠে আস্তে থাকে। ৩৫ লক্ষ্য মানুষ মারা গেছেন এই দুর্ভিক্ষয়ে। যারা বেঁচে ছিলেন তারা দেখেছেন সেকালের বিত্তবান মানুষরা কতটা দরিদ্র। কলকাতায় কাতারে কাতারে মানুষ একটু ফ্যান এর জন্য দরজায় দরজায় গেলেও সেদিনে 'দরিদ্র' বিত্তবান রা এই মানুষগুলির দুমুঠো অন্নের সংস্থান করেননি। এই সময় এগিয়ে আসে দুটি সংগঠন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' এবং 'নিখিল ভারত শিশুরক্ষা সমিতি'। সেদিনের কথা বলতে গেলে অনেকের মধ্যে আরো একজনের কথা বলতে হয় তিনি হলেন ডঃ মৈত্রেয়ি বসু। গিরিডিতে জন্ম তার। বড় হয়েছেন ব্রাহ্মধর্মের বাতাবরনে। কলকাতা মেডিকেল কলেজে তিন বছর ডাক্তারি পরেছেন। এরপর ১৯৩৩ সালে জার্মানি থেকে এম.ডি ডিগ্রি সম্পূর্ণ করে দেশে ফিরে আসেন। ফিরে এসে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে কিছু দিন কাজ করেন এবং পরে তা ছেড়ে দেন এবং যোগ দেন গান্ধিবাদী রাজনীতিতে, তখন সময়টা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের। যদিও জনগনের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ কিন্তু বেশিরভাগ নেতৃত্ব গ্রেপ্তারির জন্য জনগন খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়ে। শ্রমিক অসন্তোষ ও কম ছিল না সেই সময়। বন্দর শ্রমিকরা সেই সময় আসেন মৈত্রেয়ি বসুর কাছে। তবে আগের চাইতে বন্দর শ্রমিকরা এখন অনেক সংগঠিত এবং সচেতন। এর দশ বছর আগে সুধা রায়, কমল সরকার, শিশির রায়, নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার, রজনী মুখার্জি এদের নেতৃত্বে বড় আন্দোলন হয়েছিল। বন্দর শ্রমিকরা সর্দার দের মাধ্যমে কাজে সুযোগ পেতেন, যেই সর্দার যখন তার অধিনে থাকা স্রমিকদের কাজ দিতে পারতেন তখনিই তারা কাজ পেত। বাকিরা পেত না। প্রত্যেকের একসাথে কাজ পাওয়ার ব্যাবস্থা ছিল না। মৈত্রেয়ি বসু এই ব্যবস্থার অবসান চাইলেন। শুধু জাহাজেই এই সমস্যা নয় বন্দরের আশে পাশে বিভিন্ন সামগ্রীর যে কারখানাগুলি ছিল সেগুলিতেও শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি ছিল না। এই শ্রমিক দের পাশে দাড়াতে তিনি গান্ধিজির অনুমতিতে কমিউনিস্টদের লাল পতাকা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছেন। গান্ধির মতে তাদের সমস্যার সমাধান হওয়া উদ্দেশ্য তা তেরঙ্গা পতাকায় হচ্ছে নাকি লাল পতাকায় তা বিবেচ্য না। একটি আরেকটির প্রতিপক্ষ নয়। তবে বলে দীর্ঘদিন তিনি পোর্ট ও ডক শ্রমিক ইউনিয়ন এ কাজ করলেও এখানে বাম এবং মুসলিম লিগ এর প্রাধান্য বেশি থাকায় খুব জোড়ালো ভুমিকা তিনি নিতে পারেননি। তাই বলে শ্রমিক ভাইদের থেকে কম ভালবাসা পাননি তিনি। লিখে গিয়েছেন নিজের আত্মজীবনীতে, মুঙ্গেরের চাঁদ মুহাম্মদ, হুসেনি সর্দার, উড়িষ্যার শচীকান্ত মিস্ত্রি, নোয়াখালির আতর আলি এরা সবাই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং একটি পরিচয়ে বিশ্বাসী যে তারা শ্রমিক। পেশায় ডাক্তার ছিলেন মৈত্রেয়ী বসু, আবেগের বশে হলেন জাতিয়তাবাদি নেত্রী, হলেন শ্রমিক সংগঠক, তিনি বহু বছর 'wage board' এর সদস্যা ছিলেন, ১৯৪৫ সালে AITUC এর বাংলার শাখায় সহ সভানেত্রী পদে নির্বাচিত হয়েছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে অবহেলিত বাচ্চাদের একটি হোমে তিনি কাটিয়েছেন বহু বছর। এমনই এক বর্ণময় ব্যক্তিত্বের অধিকারি ছিলেন ডঃ মৈত্রেয়ি বসু।[৫]

শিক্ষিত রাজনৈতিক পরিমন্ডল থেকে একটি দৃপ্ত কণ্ঠ উঠে আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেই কণ্ঠ পুঁথি পড়ে বা পারিবারিক শিক্ষার পরিমন্ডলে হয়নি, হয়েছে প্রতিদিনকার বেঁচে থাকার লড়াই এর মধ্যে দিয়ে সেই বিপ্লবি কণ্ঠ অনেক বেশি খাঁটি। যেমন ছিলেন দুখমত দিদি। বরানগরের আলমবাজার চটকল এর শ্রমিক নেত্রী। নেত্রি হয়েছেন শ্রমিক থেকেই। মধ্যপ্রদেশ এর বিলাসপুর এর থেকে পশ্চিমবাংলায় আসেন কাজ খুঁজতে। নানা জায়গায় মজদুর এর কাজ করে শেষ পর্যন্ত তুলনামূলক স্থিতিশীল এই চটকল এর কাজেই তিনি থিতু হন। সময়টা ১৯৩৭ সাল। সারা বাংলা কেন্দ্রীয় চটকল ধর্মঘট সমিতি গঠন করে মন্দার সময় ছাটাই করা বেতন পুনঃরুদ্ধার করা, ছুটি প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা দেওয়া, শারিরিক নিগ্রহ না করা, আরও কিছু বিষয় এর ওপর আন্দোলন শুরু হয়, সামিল হন দুখমত দিদিও। শ্রমিক হিসেবে, শ্রমিক নেত্রী তিনি তখনও হননি। তার অনেক বছর পর দেশ স্বাধীন হয়েছে। শ্রমিক সমস্যা যে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে তা নয়, তবে তাদের জোর বেড়েছে অনেকখানি। আগের থেকে শক্ত হয়েছেন দুখমতও। পঞ্চাশের দশকে কারখানার ওয়ার্কার্স কমিটিতে ভোটে জয়লাভ কোরে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন তিনি। প্রথাগত পড়ালেখা না থাকাটা এক্ষেত্রে সমস্যার কিন্তু স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মী তরুন মিত্রের সাহায্য পেলেন। আরো একটি ঘটনা যা প্রমান করে যে দুখমত কতখানি লড়াকু ছিলেন, খাদ্য আন্দোলনের সময় তিনি সরকারি গুদাম লুট করে তা বিলিয়ে দেন অভাবি মানুষের মধ্যে, পুলিশ বাড়িতে গ্রেপ্তারি করতে এলে নির্ভয়ে দুখমত তার স্বামীর পোশাক পড়ে পুলিশের সামনে দিয়েই বেড়িয়ে যান। সুতরাং পথের লড়াই পথই তাকে চিনিয়ে দিয়েছে। প্রথাগত শিক্ষা অথবা কমিউনিস্ট পার্টির তালিম কোনটাই তাকে দুখমত তৈরি করেনি, করেছে তার স্বভাবজাত নেত্রী সুলভ মানসিকতা, লড়াইয়ের মনোভাব। তবে বাম রাজনীতি তাকে যে রাজনৈতিক সচেতনতা দিয়েছে তা তিনি আজীবন মনে রেখেছেন, তাই বৃদ্ধ অবস্থায়ও রাজনৈতিক কাজে তিনি নিজেকে লিপ্ত রেখেছেন[৬]।

উপসংহার:

উপনিবেশিক অর্থনীতি হোক অথবা স্বাধীন দেশ, মালিকের শোষণের চরিত্র কখন পাল্টে যায়না। তা নতুন রুপে নতুন খোলসে ফিরে ফিরে আসে, তার প্রতিরোধ এর জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন এই নারীরা, কখন সফল প্রতিরোধ করেছেন শোষণের, কখনও হেরে গেছেন মালিকপক্ষ ও তার দালালদের বিভেদমূলক ষড়যন্ত্রে। কিন্ত ভেঙ্গে যাননি। নতুন করে তৈরি হয়েছেন পরবর্তী আন্দোলনের জন্য। এই নারীরা এবং তাদের সহযোগী শ্রমিক ভাই ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের দীর্ঘদিনের লড়াই এর ফসল আজকের প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ আপতকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা, সমান কাজে সমান মজুরি আরো যা যা সুবিধা আজ শ্রম মূল্যের মানদণ্ড হিসেবে পরিগণিত তা আদায় করেছেন এই শ্রমজীবী এবং তাদের পরম শ্রদ্ধার 'সুধাদি', 'দুখমত দিদি' এবং আরো অনেকে।

তথ্যসূত্র:

১. বীণা দাস, 'শৃঙ্খল ঝংকার', কলকাতাঃ র‍্যাডিকাল, ২০১৫, পৃপৃ- ১-২৫

২. বীণা দাস, 'শৃঙ্খল ঝংকার' পৃপৃ-৫০-৮০

৩. মঞ্জু চট্টপাধ্যায়, 'বন্দর শ্রমিক ধর্মঘট' (১৯৩৪) ও কমিউনিস্ট নেত্রী সুধা রায়' প্রকাশিত 'অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস' সম্পাদনায় নির্বাণ বসু, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু পাবলিকেশন, ১৯৭৩, পৃপৃ- ৪২১-৪২৬

৪. কমল সরকার, 'কমরেড সুধা রায়' *শ্রমিক আন্দোলন,* ৪/৭/১৯৮৭, ১৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃপৃ-২৭৯-৭৮২

৫. মঞ্জু চট্টপাধ্যায়, 'ডঃ মৈত্রেয়ী বসু- একা এবং একা' প্রকাশিত 'অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস' সম্পাদনায় নির্বাণ বসু, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু পাবলিকেশন, ১৯৭৩, পৃপৃ-৪৩৬-৪৪০

৬. মঞ্জু চট্টপাধ্যায়, 'আলমবাজারের লড়াকু শ্রমিক নেত্রী দুখমত দিদি' প্রকাশিত 'অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস' সম্পাদনায় নির্বাণ বসু, কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও সেতু পাবলিকেশন, ১৯৭৩, পৃপৃ-৪৫৬-৪৬০।

বিচ্ছিন্নতাবাদ বিষয়ে উৎপল দত্তের ভাবনা : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

অলোক বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ, শান্তিপুর, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারত সহ বিশ্বের বহু দেশ বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের কয়েক দশক পরেও ভারতের মতো বহু জাতি, উপজাতি, ভাষা, উপভাষা বা পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতার নানা সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে ভারতের নানা প্রান্তে পরিচিতি সত্তার আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের শাসক দলগুলি পরিচিতি বা বিভাজনের বিষয়টিকে নিয়ে সংকীর্ণ রাজনীতি শুরু করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ভাষাগত আত্মপরিচিতির প্রেক্ষাপটে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি সামনের সারিতে চলে আসে। আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অতিকেন্দ্রিক সংবিধান বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিকেন্দ্রিত রাজনীতির প্রবর্তনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে অনগ্রসর জাতি বা শ্রেণিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের ইচ্ছাকে ভারতের শাসক দল 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' বলে প্রচার করে। নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে বিচ্ছিন্নতাবাদকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে অনগ্রসর জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের ইচ্ছা ও সংগ্রাম তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে উৎপল দত্তের ভাবনা আলোচিত হয়েছে।
সূচক শব্দ: বিচ্ছিন্নতাবাদ, পরিচিতি সত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, উৎপল দত্ত, চিন্তা-ভাবনা।

মূল আলোচনা:

ভূমিকা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতসহ বিশ্বের বহু দেশ বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ঐ সব দেশ ছিল বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের জাতিগত শোষণের শিকার। স্বাভাবিকভাবেই এই জাতিগত শোষণ থেকে পরাধীন জাতিগুলির মুক্তি বা জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের সংগ্রাম ছিল ন্যায়সংগত অধিকার লাভের সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রামে সাফল্য লাভের পর এই অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ উপস্থিত হলেও ভারতের মতো সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে বিভিন্ন জনজাতি, ভাষা বা অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটেনি।[১]

ভারতের মতো বহু জাতি, উপজাতি, ভাষা, উপভাষা বা পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার নানা সমস্যার সমাধান হয়নি স্বাধীনতা লাভের ছয় দশক পরেও। এই সমস্যাকে কেন্দ্রীয় সরকার কখনোই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেনি। ফলে ভারতের পশ্চাতৎপদ বা অনগ্রসর জাতিগুলির মানুষ নানাভাবে শোষণের শিকার হয়। এই শোষণ কখনও কখনও জাতের নামেও হয়ে থাকে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই শোষণের চরিত্র জাতিগত নয়, শ্রেণীগত।[২]

নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে বিচ্ছিন্নতাবাদকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। ঐক্যবদ্ধ আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান, সেই জাতীয় রাষ্ট্রের ভেতর পশ্চাৎপদ বা অনগ্রসর শ্রেণিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের ইচ্ছা ও সংগ্রাম, শাসকবর্গ কর্তৃক সেই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে চিহ্নিতকরণ ও দমন-পীড়ন, সর্বোপরি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রামগুলির সমস্যার সমাধানের জন্য উৎপল দত্ত তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে অনগ্রসর জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের ইচ্ছা ও সংগ্রাম তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে উৎপল দত্তের ভাবনা এবং বর্তমানে সেই ভাবনার কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হবে।

মূল আলোচনা:

উৎপল দত্তের মতে, ভারত তথা বিশ্বে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে। তাঁর মতে, "বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এক একটি জাতিসত্তার বিকাশ, দেশের সীমানা নির্ধারণ এবং সেই ঐক্যবদ্ধ দেশের জন্য গর্ব ও ভালোবাসা। ভারতে যতই মারাঠা বা রাজপুত দেশপ্রেমের কথা বলা হোক, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ছিল আঞ্চলিকতার প্রকাশ। বারবার ইতিহাসের বইতে বলা হয় ঐক্যবদ্ধ ভারত ব্রিটিশের সৃষ্টি, যেটা বলা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ ভারত ব্রিটিশ বুর্জোয়ার সৃষ্টি। ব্রিটিশ চরিত্রে এমন কোনও বিশেষত্ব নেই যে তারা পদানত দেশকে ঐক্যবদ্ধ না করে থাকতে পারেনা। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্য এই যে মুনাফার লোভে তারা একেকটা দেশকে এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাঁধতে বাধ্য হয়।"[৩] অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন, ঐক্যবদ্ধ ভারত সামন্ততান্ত্রিক বা প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক শাসকের সৃষ্টি নয়; ঐক্যবদ্ধ ভারত ব্রিটিশ বুর্জোয়ার সৃষ্টি।

উল্লেখ্য, আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার' গ্রন্থে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "মধ্যযুগের ইউরোপের রাজনৈতিক কাঠামো ছিল সামন্ততান্ত্রিক। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সমাজ বিপ্লব তথা রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শগত এবং বাস্তব ভিত্তি সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং নবোদ্গত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম হয়।[৪]

তবে বাস্তবে আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংগঠন ইউরোপের দেশগুলিতে রাতারাতি হয়নি। নানা দ্বন্দ্ব- সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে আজকের ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্রগুলি গঠিত হয়েছে। উনবিংশ- বিংশ শতকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ সারা বিশ্ব জুড়ে কায়েম হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং পরে এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসন উঠে গিয়ে যখন জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম হল, সে সব দেশের নতুন শাসকেরাও ঠিক ওই আদর্শ মেনেই তাদের নতুন রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি করল। আমাদের দেশেও ঠিক তাই হয়েছে।

এ কথা সত্য, বর্তমান ভারত রাষ্ট্র হল বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের শ্রেণি শাসনের যন্ত্র। এদেশে বসবাসকারী সমস্ত জাতি, উপজাতি এবং উপভাষার মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যাবলী এই শ্রেণী চরিত্রের দ্বারাই মূলত নির্ধারিত হয়।[৫]

'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' বা ভারতে সব জাতি ও সংস্কৃতির এক দেহে লীন হওয়ার যে কথা বারবার বলা হয়- তাকে উৎপল দত্ত সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, "ভারতের ইতিহাস চিরদিনই শান্তিপূর্ণ শ্রেণি সহযোগিতার ইতিহাস, এখানে যে শক-হূন-পাঠান- মোগল সবাই এক

দেহে লীন হয়েছে এই বিচিত্র তত্ত্ব বহুদিন যাবত প্রচারিত হচ্ছে। নেহরুর 'ভারত আবিষ্কার' থেকে ইস্কুলপাঠ্য ইতিহাসেও এই মিথ্যা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। শ্রেণীসংগ্রাম ও ফিউদাল যুগের অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ যে সব ইতিহাসেরই চালিকা শক্তি- বিশেষত ভারতের ইতিহাস যে অত্যাধিক রক্তপাতে কলঙ্কিত- এ তত্ত্ব চেপে না গিয়ে বুর্জোয়ার উপায় নেই। আর এক দেহে লীন হওয়ার নমুনা তো এখনও ভুরি ভুরি পাওয়া যাচ্ছে- হিন্দু- মুসলিম, উত্তর ভারত- দক্ষিণ ভারত, নাগা -ভারতীয় হিন্দি -অহিন্দিভাষীর সংঘর্ষ বুর্জোয়ারা সৃষ্টিই করতে পারত না যদি সত্যিই সব সংস্কৃতি, সব জাতি এক দেহে লীন হত।"[৬]

ভারতের পশ্চাৎপদ ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও পূর্ণ বিকাশের ইচ্ছাকে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' বলে আখ্যা দেয়। এটা বুর্জোয়া শ্রেণীর এক ধরনের চক্রান্ত বলে তিনি মনে করেন। তিনি মন্তব্য করেন, "ভারতের পশ্চাদ্পদ বা অনগ্রসর শ্রেণীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বুর্জোয়া-শাসক শ্রেণী তাদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এবং পশ্চাদ্পদ শ্রেণীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে, তারা বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে প্রচার করে।"[৭]

একটি সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত বলেছেন, "আজকে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা ছাড়া দিচ্ছে এবং সবাই একবার করে বক্তৃতা দিয়ে বলছেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদ বড় খারাপ জিনিস, ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতি ভেঙে চুরমার হচ্ছে'- এর সবটাই হচ্ছে বুর্জোয়া প্যাঁচ। এই আজকের যারা প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষমতায় রয়েছেন, তাদের তাঁবে থেকে ভারতবর্ষের সংহতি ও ঐক্য কোনওদিনই গড়ে উঠতে পারে না। 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' বলে চ্যাচাচ্ছেন সব থেকে বেশি তাঁরা, যাঁরা ভারতবর্ষকে কেটে দু- টুকরো করেছিলেন।"[৮]

যেহেতু ভারত বহু ভাষাভাষী, জাতি, উপজাতির মানুষের দেশ, তাই স্বাধীনতার আগে থেকেই দাবি উঠেছিল, গোটা দেশের ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং, অর্থনৈতিক সমন্বয়, প্রতিরক্ষা বিভাগ, বৈদেশিক বিভাগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে ভাষার ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলি পুনর্গঠিত করে তাদের হাতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার। স্বাধীনতার পর প্রধানত গণআন্দোলনের চাপে, ভাষার ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলিকে অনেকখানি পুনর্গঠিত করা হয়। কিন্তু অঙ্গরাজ্যগুলিকে প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়নি। সংবিধানে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে কিছুটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ছাপ দেওয়া হলেও যতদিন গেছে কেন্দ্রের হাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বেশী বেশী কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং রাজ্যের ক্ষমতা আরও সংকুচিত করা হয়েছে। ফলে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রের ওপর বেশী বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।[৯]

বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতির যে ধরনের অসম বিকাশ ঘটেছে, তাতে অনেকগুলি রাজ্য ও অঞ্চল তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ অবস্থায় থেকে গেছে। ফলে এইসব এলাকার অধিবাসীদের মনে অসন্তোষ এবং ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে যা থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে।[১০]

অনগ্রসর বা বঞ্চিত জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের ইচ্ছা ও সংগ্রামকে ভারতের বুর্জোয়া শাসকবর্গ কর্তৃক 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যা দেওয়া ও তাকে দমনপীড়নের আসল কারণ যে অর্থনৈতিক শোষণ অক্ষুন্ন রাখা, সে কথা উৎপল দত্ত নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন। 'উন্নয়নশীল দেশের সিনেমা' নামক প্রবন্ধে উৎপল দত্ত লিখেছেন, "ভারত এক বহুজাতিক দেশ: যতগুলি ভাষা ততগুলি জাতি। রাজধানীর সেইসব আকাটদের আমরা তো জানি যারা তোতা

পাখির মতো সারাক্ষণ আবেগগত সংহতি ও ঐক্যের বুলি আওড়ায়। আসলে এ-সবই ষড়যন্ত্র - ভারতের জাতিগত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য ধ্বংস করার চক্রান্ত, যাতে রাষ্ট্রভাষার স্টিমরোলার চালিয়ে দেশটাকে এক ছাঁচে গড়ে নিয়ে অবাধে অর্থনৈতিক শোষণ চালানো যায়।[১১]

আবার, "হোয়াট ইজ টু বি ডান' নামক বক্তৃতায় উৎপল বলছেন, "ভারতের জনগণের ঐক্যের প্রতি ভারতীয় শাসক শ্রেণীর কোন আগ্রহই নেই, তারা কেবল এদেশের ভৌগোলিক ঐক্য সংরক্ষণ করতে চায় যাতে ওরা একে আরও ভালোভাবে শোষণ করতে পারে, যাতে ওদের কলকারখানা গুলোতে কাঁচামাল ইতস্তত বয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং উৎপন্ন পণ্যের জন্য একটা সম্মিলিত বাজার পেতে পারে। মানবিক উপাদান, সাংস্কৃতিক উপাদান, বিভিন্ন জাতির আপন আপন ভাষা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করার অধিকারের প্রশ্ন, শাসক শ্রেণীর কাছে চূড়ান্ত অপছন্দের। ওরা এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে বিচ্ছিন্নতার সাথে এক করে দেখে। প্রত্যক্ষ লাভের প্রতিশ্রুতি দেয় না এমন সমস্ত কিছুই ওদের কাছে বিপজ্জনক ও পরিত্যাজ্য। ওদের ঐক্য হচ্ছে শোষণের ঐক্য।[১২]

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের 'অপারেশন ব্লু স্টার' সম্পর্কে উৎপল দত্ত তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' নামক বক্তৃতায় উৎপল দত্ত বলছেন' "আমাদের পাঞ্জাবি নাট্যকারদের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি যে তাঁরা 'অপারেশন ব্লু-স্টার' নিয়ে লিখুন, আর সব থেকে ভয়ঙ্কর প্রশ্নগুলো তুলে ধরুন। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির কে ভিন্দ্রানওয়ালে দুর্গে পরিণত করেছিলেন। সেটা করার আগে কেন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল না? ইন্দিরা গান্ধী কি ভিন্দ্রানওয়ালের আগ্রহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না? গুরু অর্জুনজয়ন্তীতে কেন স্বর্ণমন্দির আক্রান্ত হলো যখন তা পূণ্যার্থীতে ভর্তি ছিল? আত্মসমর্পণের পর অঙ্গনে কতজনকে গুলি করে মারা হয়েছিল? কেন গ্রন্থাগার পোড়ানো হয়েছিল?[১৩]

এটা আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাবকে দ্বি-ভাষিক রাজ্য ঘোষণা করে। কিন্তু পাঞ্জাবি ভাষা উপেক্ষিত থেকে যাওয়ায় ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় অকালি দল পাঞ্জাবি ভাষাভাষী জনগণের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে। নির্বাচনোত্তরকালে অকালি দল পাঞ্জাবি ভাষাভাষী জনগণের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠনের দাবির পরিবর্তে শিখদের জন্য পৃথক রাজ্য 'পাঞ্জাবি সুবা' গঠনের দাবিতে প্রচার অভিযান শুরু করে।

১৯৫৬ সালে পাঞ্জাব ও পেপসু-কে নিয়ে নতুন পাঞ্জাব রাজ্য গঠনের সময় 'পাঞ্জাবি সুবা' গঠনের দাবি মানা হয়নি। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব রাজ্যকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই রাজনৈতিক পদক্ষেপ অকালি দলের নেতৃত্বকে খুশি করতে পারেনি। অকালি দল তাদের ১৯৭৩ সালে গৃহীত আনন্দপুর সাহির প্রস্তাব অনুযায়ী বেশ কিছু দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করে।[১৪]

কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংবাদ মাধ্যম আনন্দপুর সাহির প্রস্তাবকে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী দলিল বলে চিহ্নিত করে। আসলে অকালি দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিখ ধর্মীয় মনোভাবকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। এ ব্যাপারে অকালি দল কে টেক্কা দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভয়ংকর সুবিধাবাদী কৌশল অবলম্বন করে জার্নেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালাকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালান। এই কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। উল্টে ভিন্দ্রানওয়ালে ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেন। ফলে ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী ভিন্দ্রানওয়ালে এবং তার অনুগামীদের অমৃতসর স্বর্ণমন্দির থেকে উৎখাত করার জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ

দেন। ৩ জুন স্বর্ণ মন্দিরে সেনাবাহিনীর অভিযান 'অপারেশন ব্লু-স্টার' পরিচালিত হয়। ২৪ ঘন্টা ধরে সংঘর্ষ চলার পর সেনাবাহিনী মন্দিরের দখল নেয়।[১৫]

অনগ্রসর জাতিগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের ইচ্ছা ও সংগ্রাম তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সমস্যা সমাধানের জন্য উৎপল দত্ত তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষে প্রত্যেক জাতির পূর্ণ বিকাশ চাই, প্রত্যেক জাতিরই ভাষা সংস্কৃতির পূর্ণতম বিকাশ ঘটুক। সেটাই ছিল মূল স্লোগান। সেটাকে বিপথে চালিত করেছে প্রতিক্রিয়াশীলরা, এটাই সত্য। যেমন, অসমে আমরা দেখেছি, সেখানে লড়াইটা হওয়া উচিত ছিল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে, দিল্লির বিরুদ্ধে, সেখানে হয়ে যাচ্ছে ভায়ে- ভায়ে সংঘর্ষ। প্রতিক্রিয়াশীলরা এই স্লোগানটা ব্যবহার করেছে, প্রতিক্রিয়াশীলরা নেতৃত্ব দিয়ে ফেলেছে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে যখন শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণী অংশ নেবে তখনই ভারতবর্ষে বিপ্লব সম্ভব হবে এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতির পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হবে। অথচ কেউ আমরা কাউকে ছেড়ে চলে যেতে চাইবো না, আমরা একই সঙ্গে থাকবো, একই দেশে। অবশ্যই পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে, পূর্ণ বিকাশ নিয়ে।"[১৬]

উপসংহার: পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ভূত জাতি সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কসবাদীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নাম করে জাতিগত বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বকে সমর্থন করে। বলাবাহুল্য এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। জারশাসিত রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা করে তারা ভারতকে জাতিসমূহের কারাগার বলে আখ্যা দিয়েছে। অন্ধভাবে লেনিনের ব্যবহার করা শব্দ ধার করে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়েই তাদের এই শিশুসুলভ ভ্রান্তি। তখনকার রাশিয়ার সাথে স্বাধীনতা- উত্তর ভারতের অবস্থার কোন মিল নেই। তা সত্ত্বেও ভারতে জাতি সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কসবাদ- লেনিনবাদ অনুসারে জাতিসমূহের অধিকার সংক্রান্ত মূল ধারণাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কিন্তু এই বাধ্যবাধকতার মানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভেদকামী শক্তির সহায়তা করা কখনোই নয়। জাতিসমূহের অধিকার সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারা অনুসারে ভারতে জাতি সমস্যার সমাধানের জন্য একমাত্র পথ হল ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্ত রাজ্যের হাতে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন ও সমান ক্ষমতা দেওয়া এবং উপজাতি এলাকা বা সেই সব এলাকা যেখানে জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দ্বারা পৃথক রূপে চিহ্নিত তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মধ্যেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া এবং তাদের বিকাশের জন্য পরিপূর্ণ সাহায্য দেওয়া।[১৭]

মার্কসবাদীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের সব জাতি ও জনগোষ্ঠীর মানুষকে বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা সম্ভব। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন জাতি নির্বিশেষে যত ঐক্যবদ্ধ হবে, তার কার্যকারিতাও তত বেশি হবে। দেশে গণতন্ত্রের যত প্রসার ঘটবে, সমাজের সমতা যত বাড়বে, ছোট ও পশ্চাৎপদ জাতি বা জনগোষ্ঠীগুলির মানুষের মধ্যে বঞ্চনার অভিযোগ ততই কমবে।[১৮] (অনিন্দ্য পৃষ্ঠা ৩৮) বর্তমান পরিস্থিতিতে অনগ্রসর জাতিগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের ইচ্ছা ও সংগ্রাম বা তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা সমাধানে উৎপল দত্তের মত ও দৃষ্টিভঙ্গি তাই আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. ভুক্ত, অনিন্দ্য (সম্পা.), ২০১২, ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, কলকাতা, মিত্রম, পৃ. ৯

২. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯-১০
৩. মুখোপাধ্যায়, অরূপ (সম্পা.), ২০১৪, এপিক থিয়েটার: সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, প্রথম খন্ড, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, পৃ.১৩২
৪. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, ২০১২, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, কলকাতা, আনন্দ, পৃ. ৭১-৭২
৫. ভুক্ত, অনিন্দ্য, পূর্বল্লিখিত, পৃ. ১০
৬. সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পা.), ২০০৫, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত: এক সামগ্রিক অবলোকন, কলকাতা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, পৃ. ২২-২৩
৭. দত্ত, উৎপল, ২০০৫, বিষয় থিয়েটার' কলকাতা, নাট্য চিন্তা ফাউন্ডেশন, পৃ. ৫২
৮. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৩
৯. ভুক্ত, অনিন্দ্য, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০
১০. পূর্বোল্লিখিত
১১. সাহা, নৃপেন্দ্র, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৯২-২৯৩
১২. দত্ত, উৎপল, ২০১০, হোয়াট ইজ টু বি ডান, কলকাতা, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, পৃ. ২৭
১৩. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৩
১৪. ভুক্ত, অনিন্দ্য, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬-১৭
১৫. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭-১৮
১৬. দত্ত, উৎপল, ২০০৫, বিষয় থিয়েটার, কলকাতা, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, পৃ. ৫৩-৫৪
১৭. ভুক্ত, অনিন্দ্য, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৭-৩৮।

খেরওয়াড় আন্দোলন : ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ

প্রসেনজিৎ হেমব্রম
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ১৮৫৫ এর হুলের পর অনেকেই মনে করেন সাঁওতালদের কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ১৮৭৪ এর খেরওয়াড় আন্দোলন ছিল ধর্মীয় ভাবাবেগের সম্বন্বয়ে গড়ে ওঠা এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভূমিকা স্বরূপ। হুলের ব্যর্থতা ও বহির্জগতের সাথে যোগাযোগ সাঁওতাল সমাজকে এবং তাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যকে কলুষিত করে তুলেছিল। সমাজের শুদ্ধিকরণ (সাফা) -এর মাধ্যমে প্রকৃত সাঁওতাল নির্ধারণ এবং তাদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে, সাঁওতালদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধনই ছিল খেরওয়াড় আন্দোলনের নেতা ভাগীরথী মাঝির মূল উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্মের সান্নিধ্যে এসে কিছু ধর্মীয় রীতির পরিবর্তন ও রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভাবনের সাথে সাথে, আন্দোলন গড়ে তোলার নতুন কৌশলের পথই ছিল এই খেরওয়াড় বা সাফা হড় আন্দোলন।
সূচক শব্দ: হুল, সাঁওতাল, খেরওয়াড়, ধর্ম, দেকো, তুড়ুক, জাতীয়তাবাদ।

মূল আলোচনা:
'হুল' ব্যর্থতার পর সাঁওতালরা দিশাহীন হয়ে পড়েছিল। বিশেষত সিধু কানুর মৃত্যু সাঁওতাল জাতিকে অনেকটা ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সাঁওতালদের প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করতে না পারলেও সাঁওতাল সমাজের কিছু অংশ এই বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। সাঁওতালদের অনেকে মনে করেছিলেন মহাবিদ্রোহে যোগদানের ফলে তাদের জাতিসত্তা ক্ষুন্ন হতে পারে কারণ তাদের অনেকে এটিকে হিন্দু আন্দোলন বলে মনে করেছিলেন এবং এই বিদ্রোহে যোগদান তাদের সামাজিক উন্নতিতে সহায়ক হবে না তাই সাঁওতাল সমাজ এই বিদ্রোহ থেকে দূরেই ছিল। আসল কথা হল - 'হুল' ব্যর্থ হওয়ার পর সাঁওতাল সমাজের কোন উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়নি। উপরন্তু সাঁওতাল সমাজে ভাঙানও দেখা দিতে শুরু করে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দিনাজপুর ও মালদা অঞ্চলে অভিবাসন সাঁওতালদের ঐক্য ও অস্তিত্বের ওপর প্রশ্নচিহ্ন উঠতে শুরু করে। এর সাথে প্রশ্নের মুখে পড়ে সাঁওতালদের ধর্ম ও ঐতিহ্য নিয়ে যা সাঁওতালদের বাকি জাতি থেকে আলাদা করে রাখে। আমরা পূর্বেই দেখেছি সাঁওতালদের ধর্ম সম্পর্কে বহির্জগতের মনোভাব। সাঁওতালদের ধর্মের আঙ্গিকে মিশনারিদের ধর্মান্তকরণ বজায় ছিল পূর্ব থেকেই। মিশনারিরা যেমন খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারকে মহৎ উদ্দেশ্য বলে মনে করত এবং সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করত তেমনি সাঁওতালরা বিদ্রোহের পর ক্লান্ত, ক্ষুধিত, দুর্দশাগ্রস্ত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদে ভুক্তভোগী হয়ে সামান্য টুকু জীবনধারণের চাহিদায় কোথাও স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয় আবার কোথাও জোরপূর্বক। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে মিশনারি ব্যতীত সাঁওতালদের গবেষণা সম্ভব ছিল না। এই মিশনারি রাই সাঁওতালদের সমাজের সামনে তুলে আনে ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সাঁওতাল সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটায়। মেদিনীপুর জেলার ভীমপুর গ্রামে সাঁওতাল ছেলেদের একটি হাইস্কুল ও মেয়েদের জন্যও একটি এমই স্কুল চালু করা হয়। কাঠের কাজ ও দাঁতের কাজ শেখানো হয় মিশনারীদের উদ্যোগে। তৎকালীন সময়ে বাঁকুড়া

সারেঙ্গাতে একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। যেখানে আদিবাসী রোগীদের চিকিৎসার পরিষেবা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ক্ষুধার জ্বালা জমির মালিকানা হ্রাস কাজের সঠিক পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হয়ে সহজ সরল সাঁওতালদের পক্ষে খ্রিস্ট ধর্মের সান্নিধ্য থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা ছিল প্রায় অসম্ভব। হুলের পূর্বে ও ব্যর্থতার পর সাঁওতালদের খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি যেমন আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তেমনি মহাবিদ্রোহের পর সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এবং বহির্জগতের সাথে মেলামেশার দরুন খ্রিস্টধর্মের সাথে সাথে হিন্দু (দেকো), মুসলিম, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় দ্বারাও সাঁওতাল সমাজ প্রভাবিত হয়। তবে সাঁওতাল সমাজে হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব বেশি লক্ষণীয়। মুসলমান যাদের সাঁওতালরা তুডুক বলে সম্বোধন করে তাদের সাথে সাঁওতাল পুরুষরা কম মেলামেশা করত যার ফলে মুসলিম প্রভাব কম ছিল বললেই চলে তবে অনেক সাঁওতাল নারী মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে নারীরা সাঁওতাল সমাজ থেকে দূরে চলে যাওয়ায় মুসলিম ধর্ম কম প্রভাবেই ফেলেছিল সাঁওতাল সমাজে।[১] বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে যোগাযোগের ফলে সাঁওতালদের একাংশ মনে করেন ভিন্ন ধর্মের সান্নিধ্য তাদের জাতিসত্তাকে কলুষিত করে তোলে। যার জন্য সাঁওতাল সমাজে 'শুদ্ধিকরণ' বা 'সাফা'-র প্রয়োজন। তাই ১৮৭৪ সালে ভাগীরথী মাঝি নেতৃত্বে শুরু হয় সাফা হড় বা খেরওয়াড় আন্দোলন। অস্তিত্বের সংকটের সাথে সাথে সাঁওতালদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিও ঠিক করার উদ্দেশ্যে ভাগীরথী মাঝি এই আন্দোলনের ডাক দেন।

১৮৫৫ এর ব্যর্থতা এবং দারিদ্রতার সাথে ঐক্যনিবেশিক ও পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ সাঁওতালদের ধ্বংসের মুখে ফেলেছিল। এর সাথে অন্যান্য অঞ্চলে অভিবাসন, খ্রিস্ট ধর্মে প্রচারকদের সেবা ও হিন্দু-মন্ত্রের আওতায় এসে সাঁওতালরা তিনটি সম্প্রদায় বিভক্ত হয়েছিল। এক- 'বিন্দিন হড়' যারা প্রাণী বাধে বিশ্বাসী অর্থাৎ যেসব সাঁওতাল প্রকৃতি পূজারী যারা গাছ পাথর ফুল পশুপাখি ইত্যাদির ওপর দেবত্ব আরোপ করত। মারাংবুরু অর্থাৎ বড় পাহাড়, সিংবঙ্গা অর্থাৎ সূর্য দেবতা চান্দোবঙ্গা অর্থাৎ চাঁদ দেবতা। সাঁওতালদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান প্রকৃতি কেন্দ্রিক। এমনকি জগতের সৃষ্টের পৌরাণিক কাহিনীতেও কাঁকড়া, কচ্ছপ কেঁচো, হাঁসের উল্লেখ রয়েছে। তাই সহজেই সাঁওতালদের প্রাণীবাদী বলা হয়, দুই- 'ইশাইহড়' বা খ্রিস্টান সাঁওতাল। যারা মিশনারিদের অনুপ্রেরণায় খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তিন- 'খেরওয়াড়', যেসব সাঁওতাল হিন্দুত্ববাদীর রীতি অনুকরণ করে।

সাঁওতালরা পূর্ব থেকেই নিজেদের 'খেরওয়াড়'[৮] বলে ডাকতো। এটি প্রাচীন ও সাঁওতালদের প্রকৃত ঐতিহ্য বহন করে। এই খেরওয়াড়রা প্রকৃত সাঁওতাল বলে বিবেচিত হতো।বলা হয় খেরওয়াড়রা মারাংবুরু থেকে চাষাবাদ শিখে স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করেছিল।[৩] সাফা কথার অর্থ হল শুদ্ধ এবং হড় কথার অর্থ হল মানুষ অর্থাৎ সাফা হড় হলো শুদ্ধ মানুষ এবং এই সাফা হড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল প্রকৃত সাঁওতাল নির্ধারণ এবং সাঁওতালদের মধ্যে সংহতি স্থাপন। পি ও বোডিং সমস্যা গত ধারণার কথা উল্লেখ করে বলেন খেরওয়াড় শব্দটি সাঁওতালদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি সাধারণ উচ্চারণ তবে তিনি বংশের জন্য সঠিক সাঁওতাল শব্দটি উল্লেখ করেননি।[৪] সাঁওতালদের মূল শব্দ খেরওয়াড় বা পাখিদের পূর্বপুরুষ যার একটি দীর্ঘ বংশ রয়েছে পৌরাণিক অতীত ঘিরে।[৫] মিশনারিদের ভাষায় খেরওয়াড় হলো একটি শব্দ যা সাঁওতাল অভিবাসনের সময় হারিয়ে যায় এবং ১৮৭১ সালের আন্দোলনের সময় পুনরোজ্জীবিত হয়।[৬] আবার খেরওয়াড় বংশের ধরমপুন্থি কাঁথাতে বলা হয় সাঁওতালরা পূর্বপুরুষদের নাম হারায়নি এবং সাফা হড় আন্দোলনের সাথে এটির কোন সম্পর্ক ছিল না, যা ১৮৭১ সালে

সংঘটিত হয়েছিল।[৭] পিও বোডিং আবার বলেন চাই চম্পার সমৃদ্ধ দিন গুলিতে অবিলম্বে যুদ্ধে পরাজয় ক্ষমতাচ্যুত স্থানান্তর অবশেষে খেরওয়াড় নাম হারানোর দৃশ্য দেখা দিয়েছিল।[৮] জি এন বারল্,যিনি ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগনার কমিশনার ছিলেন। তিনি স্পষ্টত দেখেছিলেন-একটি ব্যবস্থা, যেটি খেরওয়াড় শব্দের অধীনে প্রণয়ন করা হয়েছিল, যা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের সাথে যুক্ত বিষয়গুলির সাথে সাথে জাতীয় ধারণাগুলিকে মিশ্রিত করে একটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছিল।[৯] ১৮৮১ সালের আদমশুমারি বিরোধী আন্দোলনের সময় সাঁওতাল বিদ্রোহীরা প্রকৃতপক্ষে খেলোয়ার হিসেবে নিজেদের সরকারি নথিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।[১০]

জেলা	পুরুষ	মহিলা	মোট
৭৫% নতুন খেরওয়াড়, ডুমকা	৩১২২	২৯৮৭	৬১০৯
সব পুরাতন খেরওয়াড়, পাকুর	৩৩৫৯	৩২৪৩	৬৫৯৬
সব নতুন, জামতারা	২	৫	৭
সব নতুন, দেওঘাট	১২৩	১৩৫	২৫৮
ভাগীরথের পুরনো অনুসরণকারী, রাজমহল	২৭০২	২৬২৬	৫৩২৮
ভাগীরথের পুরনো অনুসরণকারী, গোদ্দা	১১২৮৭	১১৩৭৫	২২৬৬২

ভাগীরথী মাঝি যিনি ১৮৫৫ এর হুল বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন। তিনি ১৮৬৮ সালে ভাগলপুর কারাগারে বন্দী ছিলেন এবং পরে মুক্ত হয়ে খেরওয়াড় আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি সরকারের কাছে নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন কারণ তিনি বন্দী মুক্ত হয়ে মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহী আচরণ করতে উজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[১১] ভাগীরথী মাঝি বলেন আমরা বা আমাদের পিতারা পাপ করেছে যখন আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে তখন আমরা দেশের মালিক হব।[১২] আরো বলেন ১৮৫৫ এর সময় ঈশ্বর দেশটি আমাদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু মূর্খতার কারণে এই সুযোগটি হাতছাড়া হয় এবং ঈশ্বর তখন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন কারণ আমরা পাপ করেছিলাম। তাই আমরা যদি তার পরামর্শ মেনে চলি এবং সঠিক আচরণ করি তাহলে আমরা আমাদের জমি ফিরে পাবো। তিনি খেরওয়াড় আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে লোকেদের একটি পরিষ্কার জীবন যাপন করার নির্দেশ দেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নোংরা কাপড় ত্যাগ, রান্না করার আগে স্নান করা এবং পশুপাখি ও শুকর হত্যার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পশুদের প্রতি সদয় হওয়া এবং পশুভক্ষণ থেকে বিরত থাকা এইসব রীতি অনুসরণ কারীদের বলা হত ‘সাফা’। যারা এই রীতি অস্বীকার করেন এবং পুরাতন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে জীবনধারণ করেন তাদের ‘ঝুটা’ বা মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি এও বলেন সাঁওতালদের কর দিতে হবে না কারন তারাই লাঙল চাষ করেছিলেন এবং ঈশ্বর যিনি ফসল ফলাতে সক্ষম করেছিলেন।[১৩] ভাগীরথী মাঝিকে নেতৃত্ব দানে সহায়তা করেছিলেন দুবিয়া গোসাই নামক এক ব্যক্তি যিনি প্রবল ভাবে হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী খেরওয়াড়রা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এক-‘সাপাই’, দুই-‘সামরা’, তিন-‘বাবাজিউ’। তিন সম্প্রদায়ী রামচান্দোরে পুজো করত।[১৪] ‘সাপাই’ নামটি ‘সাফা’ থেকেও উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ পরিষ্কার এবং এই লোকেদের আপত্তিকর অভ্যাস বিবেচনা করার জন্য যা শেখানো হয়েছিল, তা পরিষ্কার করার জন্য তাদের মূল অনুশীলনের উল্লেখ রয়েছে। ‘সামরা’ নামটি গোদ্দা জেলার একটি গ্রামের নির্দেশ করে যেখানে তাদের শাখার নেতা বাস করতেন। ‘বাবাজিউ’-এই তিনটির

মধ্যে প্রধান শাখা। পূর্বে সাপাই,বাবাজীউ ও সামরা উভয়েই একই রকম আচরণ করত।গুরুরা ভিন্ন ছিল কিন্তু অনুশীলন একই ছিল।[১৫] এটি পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং গুরুরা তাদের নিজস্ব ধারনা অনুসরণ করে বিভিন্ন অভ্যাস গ্রহণ করতে শুরু করে। দামিন-ই-কোহ সহ ভাগলপুর, বীরভূম, পূর্ব হাজারিবাগে ও উত্তরের মালভূমি অঞ্চলে বিদ্রোহীদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল ১৮৫৫ এর 'হুল'।[১৬] তাই 'হুল' পরবর্তী এই আন্দোলন তাদের আকৃষ্ট করে। ভাগীরথী মাঝি উপলব্ধি করেছিলেন যেখানে শিক্ষার অভাব বর্তমান সেখানে ধর্মীয় ভাবাবেগ বেশি। তাই সিধু কানু যেমন সাঁওতালদের একত্রিত করার উদ্দেশ্যে ধর্ম বা ঠাকুরের সহায়তা নিয়েছিল ঠিক তেমনি তিনিও ধর্মের সাহায্য নিয়ে সাঁওতালদের একত্রিত করতে সচেষ্ট হয়। ১৮৭১ সালের গোদ্দা জেলার তুলেহ বারকপে ও তারদিহা গ্রামে নিজেকে গুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মিশনারি প্রত্যক্ষদর্শীরা নথিভুক্ত করেছিলেন যে ভাগীরথী মাঝি বাউসিতে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং সেই রাজ্য পুনরুদ্ধারের নেমেছিলেন যা ঠাকুর একবার হুলের নেতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[১৭]

ধর্ম- খেরওয়াড় আন্দোলন শুরু হলে সর্বপ্রথম প্রশ্ন ওঠে সাঁওতালদের জাত নিয়ে। সাঁওতালরা নিচু জাত? না উচ্চ জাত? হিন্দু না মুসলমান? বৌদ্ধ না খ্রিস্টান? হুলের পূর্ব থেকেই সাঁওতালদের মধ্যে মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করলেও, হিন্দু মুসলিম বা বৌদ্ধদের সাথে সেভাবে তাদের যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। তারা সমাজের বাইরে সাধারণত জঙ্গলে বা নির্জন স্থানে নিজেদের গ্রামবসতি স্থাপন করে জীবন ধারণ করত। কিন্তু হুলের ব্যর্থতা, বিশেষত মহাবিদ্রোহের পর সাঁওতালরা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুত্ববাদী মানুষের সংস্পর্শে এলে সাঁওতাল সমাজে হিন্দুত্ববাদের প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। জমির সন্ধানে এসে চাষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে হিন্দু ধর্মের সান্নিধ্যে এসে সাঁওতালরা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বহির্জগতের সাথে বিদ্রোহে যোগদান এবং একই সাথে জীবন যাপন নিবারণের জন্য তাদের ধর্মের উপর প্রভাব লক্ষণীয়। নিম্নলিখিত তথ্য থেকে তা স্পষ্ট:[১৮]

ধর্ম	সংখ্যা	শতাংশ
হিন্দু	৫৪৫৬২৩১	+১৩.৬৯
মহামেডান	২১৪৫৪৭২	+১০.৯৬
খ্রিষ্টান	৩৭০১২	+৪০.৭১
বুদ্ধিস্ট	৭৫২০২	+৯৩.২৯
অন্যান্য	২৩৩৯৫৪১	-১০.৪৩

১৮৮১ সালে আদমশুমারি অনুসারে সাধারণ জনসংখ্যার সাথে হিন্দুদের অনুপাত ছিল ২.৪২ শতাংশ বেশি এবং আদিবাসীদের অনুপাত ১৮৭২ সালে তুলনায় ৩.২০ শতাংশ কম। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে আরো একটি নতুন কলম চালু হয় যার নাম হিন্দু সাঁওতাল। নিম্নে পরিসংখ্যান সমূহ।[১৯]

ভাগলপুর ডিভিশন	ধর্মীয় সাঁওতাল			হিন্দু সাঁওতাল			মোট		
	পুরুষ	স্ত্রী	উভয়	পুরুষ	স্ত্রী	উভয়	পুরুষ	স্ত্রী	উভয়
মংঘ্যর	৩৪৬০	৩৪৭৮	৬৯৩৮	০	০	০	৩৪৬০	৩৪৭৮	৬৯৩৮
ভাগলপুর	৬৭৯৫	৬৫৯৮	১৩৩৮৪	২০	২২	৪২	৬৮১৫	৬৬১১	৬৯৩৮
পুরনিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	০

মালদহ	৯০২	৮৩২	১৭৩৪	৪২১	৪১২	৮৩৩	১৩২৩	১২৪৪	২৫৬৭
সান্তাল পরগনা	২৭০৮০১	২০৬৭৪৫	৫৩৭৫৪৬	৪৬২৮	৪৫২০	৯১৪৮	২৭৫৪২৯	২৭১২৬৫	৫৪৬৬৯৪
টোটাল	২৮১৯৫৮	২৭৭৬৪৪	৫৫৯৬০২	৫০৬৯	৪৯৫৪	১০০২৩	২৮৭০২৭	২৮২৫৯৮	৫৬৯৬২৫

সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হলো সাঁওতালরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে নিজেদের সংস্কৃতি নিজের সমাজের মানুষের উপর। পূর্বে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার আশায় খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দুত্ববাদের প্রবেশের ফলে সাঁওতালরা হিন্দুত্ববাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। তাদের কাছে দেশ বহির্ভুত সাদা চামড়ার মানুষ অপেক্ষা দেশীয় মানুষ বেশি আপন। তাই মার্টিন ওরান্স বলেন সাঁওতালদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনা গড়ে উঠেছিল হিন্দু ধর্মের সাথে সাংস্কৃতিক অভিযোজনের মাধ্যমে, যা সাঁওতাল বিদ্রোহের বহু পূর্ব থেকেই চালু ছিল।[২০] তিনি আরো বলেন সাঁওতালদের এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ধাক্কা খেয়েছে, তাই এখন তাদের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য তারা হিন্দু বিশ্বাস ও অনুশীলনকে পছন্দ করছে।[২১] তবে কুমার সুরেশ সিং ভিন্নমত পোষণ করেন তিনি বলেন বহিরাগত সব হিন্দু গোষ্ঠীর ওপর আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।[২২] উচ্চবর্ণ উচ্চবর্গের ক্ষেত্রে এর প্রভাব মোটেই ছিল না। থাকলেও তা ছিল অল্প। কিন্তু নিম্নবর্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর এর প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। এ প্রসঙ্গে তিনি দুটি শ্রেণীর কথা বলেছেন। এক-জমির সন্ধানে আসার চাষী ও দুই কামার, কুমোর, ছুঁতোর, তাতী ইত্যাদি নানা বৃত্তিজীবী। তবে এখানে আরো একটি বিষয় উঠে আসে যেমন অভিবাসনের ফলে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের সমাজ সংগঠন ভেঙ্গে গিয়েছে বা প্রাচীন ও গ্রামীণ সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ শিথিল হয়েছে যার ফলে তাদের মধ্যে সংস্কৃতিতে কিছুটা বিনষ্ট হয়েছে যার ফলে হিন্দু প্রভাব কিছুটা বিস্তারিত হয়েছে। কিন্তু আবার দেখা গিয়েছে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাই বিভিন্ন আঘাত আসার পরেও তাদের সংহতি বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হয়নি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ঐতিহ্য তাদেরকে বহিরাগত শত্রুকুলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্দীপ্ত করেছে।

সাঁওতাল সংস্কৃতি প্রভাব কেবলমাত্র নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত ছিল। উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ছিল না। কারণ বর্নাশ্রম কাঠমোয় গড়ে ওঠা হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ উচ্চবর্গ গোষ্ঠী সচেতনভাবে নিম্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী থেকে বহুক্ষেত্রে নিজেদের দূরত্বের চেষ্টা করেছে। তাই এই নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা হিন্দু সমাজের অংশ বলে বিবেচিত হলেও তাদের স্থান ছিল সমাজের একেবারে নিচু তলায়। প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণেতর বিভাগের যে আলোচনা নিহার রঞ্জন রায় করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি এরা আসলে ছিল বর্নাশ্রম-বহির্ভূতঃ অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য।[২৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই আদিবাসী সম্পর্কে উচ্চবর্ণে হিন্দু গোষ্ঠীর মনোভাবের কোন পরিবর্তন আসেনি। ওই শতাব্দী প্রথম দশকে ভাগলপুর গ্রামে পরিক্রমা সময় বুকানন হ্যামিল্টন এর মনোভাবের কথা জানতে পারি। সেখানকার আদিবাসীরা ছিল সাম্প্রতিককালে অন্য জায়গা থেকে চলে আসা সাঁওতাল। গ্রামের যে অংশে বর্ণ হিন্দুদের বাস সেখানে সাঁওতালদের বাড়ি বানানোর কোন অধিকার ছিল না। তারা থাকতো গ্রামের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে। হিন্দুদের গরুর দুধ দোওয়া সাঁওতালদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। মনে করা হতো তাদের অশুচিতায় গরু বা দুধের পবিত্রতা নষ্ট হবে এর কোন ব্যতেও ঘটলে সারা গ্রামে অনাচারের প্রতিবাদ জানাতো।[২৪]

সাঁওতালরা হিন্দু ধর্ম দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না যেমন শুদ্ধতা ও শুদ্ধির ধারণা প্রধানত হিন্দু ধারণার আদলে গড়া। তবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণে যে সাঁওতালরা তাদের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি ভুলে গিয়েছে এ ধারণাও ভুল। মারাংবুরু, ঠাকুর জিউ এর পূজা করত। কিন্তু এর সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের মহাদেব, মা কালী ও দূর্গা পূজাও সম্পন্ন হতো সাঁওতাল অঞ্চলে। তাছাড়া হিন্দু ধর্ম যে তাদের সংস্কৃতি থেকে উচ্চতর তা তাদের মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করেছিল।[২৫]

জাতীয়তাবাদ - খেরওয়াড় আন্দোলন যে কেবল ধর্মীয় বা সমাজের ধর্মীয় শুদ্ধিকরণের আন্দোলন ছিল তা নয়। ধর্ম ছিল সামাজিক সংহতির এক প্রয়াস মাত্র। হুল ব্যর্থতার ফলে সাঁওতাল সমাজের কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। কিন্তু ব্রিটিশদের চোখে সাঁওতালরা অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়ে পড়েছিল। সাঁওতাল পরগণা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশাসনিক ধারণা নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির উদ্দেশ্যে গ্রাম সংগঠনকে প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা করে জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়।[২৬] প্রতিটি গ্রামের মাঝি বা গ্রামের প্রধানকে পুলিশের ক্ষমতা দেওয়া হয় কিন্তু এই নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। স্বল্পস্থায়ী ও অনিয়ন্ত্রণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা দুর্দশা গ্রস্থ মানুষের জীবনে কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর সাথে সাথে সাঁওতাল পরগণায় অর্থনীতির উপর বিদেশী নিয়ন্ত্রণ পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৭] এর ফলে সাঁওতালরা সামাজিকভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিকভাবেও ভেঙে পড়েছিল।

পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে যখন বহিরাগত মালিকদের বৃদ্ধি হতে থাকে সাঁওতাল পরগণায় তারা ইউরোপিয়ান পদ্ধতিতে জমিদারী চালাতে থাকে। দুমকা, গোদ্দা রাজমহল অঞ্চলে জমিদাররা সাঁওতালদের কাছ থেকে অবৈধ কর আদায় করতে থাকে।[২৮] মাঝিরা জমিদারদের কাছ থেকে শুধুমাত্র স্বল্প ইজারা পেতো না, উপরন্ত জমি পাওয়ার জন্য অনেক বেশি সালামি দিতে হতো। আবার নবায়নের সময় তাদের খাজনা বৃদ্ধি হতো। জমিদাররা গ্রামের মাঝিদের নিজেদের সুবিধামতো বিতাড়িত করত। তাদের কাছে মাঝিরা সাধারণ কৃষক বলে গণ্য হতো। জমিদাররা খাজনা বাড়ানোর সুযোগ খুজত একশো দুশো তিনশো শতাংশ পর্যন্ত, এমনকি ইজারা নবীনকরণের সময় পুরাতন মাঝিদের বদলে নতুন অপরিচিতদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করত, যারা ছিল মূলত বাঙালি ও ভোজপুরি মহাজন। নতুন জমি দখলকারীরা তাদের নির্দেশে গ্রামে সেরা জমিগুলো দখল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতো ফলে পুরো গ্রামীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। ১৮৭১ সালে সাঁওতাল পরগণায় অফিসার এ ডব্লিউ কসার্ট রাজমহলের দায়িত্ব ছিলেন। তিনি বলেন জেলার প্রতিটি জায়গায় সাঁওতাল মাঝিদের ব্যাপকভাবে তাদের জমি থেকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল।[২৯]

সাঁওতালদের আতঙ্কিত করার জন্য জেলায় সামরিক পুলিশের একটি দল মোতায়েন করা হয়েছিল এর অধীনে ৪৫০৪ পদাতিক বাহিনীর একটি ফিল্ড ফোর্স পাঠানো হয়েছিল এবং সৈন্যরা জেলায় জেলায় টহল দিত যাতে কোন ঝামেলা প্রতিরোধ করা সহজ হয়ে ওঠে।[৩০] এর সাথে সাথে সাঁওতাল পরগনায় ১৮৬৬ সালে শীতকালীন ফসল নষ্ট হওয়ায় এবং কলেরা হাজার হাজার সংখ্যায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু এবং ১৮৭৩ সালে বৃষ্টিপাতের অসম বিতরণের ফলে অন্নের চাহিদা সাঁওতাল সমাজকে বিচলিত করে তোলে।

সাঁওতালরা সচেতন ছিল এমনকি ঋণ পরিশোধ করার পরেও তারা অসহায় ছিল। এক সাঁওতাল বলেছিলেন - আমরা জঙ্গলের প্রাণী হিসাব ও ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ তাই যাতে খুশি হয়, তাই করি।[৩১] ১৮৭১ সালে জিনিসপত্রের দাম ৫০ শতাংশ কমে যায় যা সাঁওতালদের মনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে।[৩২] ১৮৭১ সালের মে মাসে সাঁওতালদের সামাজিকভাবে ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল এমনকি সাঁওতাল শ্রমিকদের দুটি নীল কারখানা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহী যোগদানের জন্য।[৩৩] একটি গুজবও ছড়িয়ে ছিল সাঁওতালদের একটি বাহিনী গোদ্দার দিকে অগ্রসর হয়েছিল, সেখানে তারা তাদের সদর দপ্তর ভাগলপুরে যেতে চেয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল জমিদার ও মহাজনদের হাত থেকে প্রতিকার পাওয়া।[৩৪] ১৮৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ হয়। শীতকালীন ধানের ফসল নষ্ট হয়। জেলার প্রধান ও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বলতে রাজমহলের ধান উৎপাদনকারী জমি, যেখানে বৃষ্টিপাতের অভাব ছিল এবং গড় ফসলের মাত্রা এক চতুর্থাংশ ফসল কাটা হয়েছিল। দুমকা ও গোদ্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৩৫]

খেরওয়াড় আন্দোলনকে ব্রিটিশ বিরোধী বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বললেও ভুল হবে না। ধর্মীয় আঙ্গিকে সাঁওতাল সমাজের সংহতি স্থাপন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও স্বাধীন রাজ্য গঠনই ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। খেরওয়াড় আন্দোলন ছিল এক জনপ্রিয় প্রতিবাদ, ঔপনিবেশিক প্রতিরোধ, জনপ্রিয় ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস। বলা ভালো হুলের পর সাঁওতালরা আর থেমে থাকেনি কোনো না কোনোভাবে পরিবেশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আদিবাসীরা শুধুমাত্র যে হিন্দুদের কোন কোন ধর্ম-বিশ্বাস ও নৈতিক ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান কিছুক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু এর ফলে আদিবাসীদের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক চেতনার জাগ্রত হয়েছে। বিনয় চৌধুরী বলেন হিন্দু ধর্মের সাথে সাঁওতাল সংস্কৃতির উদ্ভব শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য হয়নি সেই সময় সাঁওতালদের অর্থনৈতিক দুর্দশা চরম আকার ধারণ করেছিল বলে, একটু সময় প্রয়োজন ছিল উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে তারা ব্রিটিশ সরকার ও তাদের ভারতীয় দালালদের (জমিদার ও মহাজন) হাতে এত বেশি শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল যে তারা কার্যত ধ্বংসের মুখে পড়েছিল খেরওয়াড় আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আরোপ ও বর্ধিতকরণ প্রতিরোধ করা এবং সাঁওতাল অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বহিরাগতদের তাড়িয়ে দেওয়া। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাদের ভাবনা আগের মতই ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ সালের ব্যর্থতা তাদের সংগ্রামে কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য করে।[৩৬] নরওয়ের ধর্মপ্রচারক এল ও স্ক্রেফরুড একটি চিঠিতে লেখেন এবং বলেন খেরওয়াড় আন্দোলন ছিল একটি উচ্ছৃঙ্খল, সমাজতান্ত্রিক, রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মটি কেবল শেষ হবার একটা উপায়।[৩৭] এই রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাগীরথী মাঝির মৃত্যুর পরও সাঁওতালরা সরকার বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।ফলস্বরপ আদম শুমারি বিরোধী আন্দোলন। যখন ১৮৯১ সালে যখন আদম শুমারি হয় তখন ১৮৮১ সালে পুরনো পদ্ধতিটি গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় কারণ আদম শুমারি বিরোধী আন্দোলনগুলির কারণে এই বছর সাঁওতালদের সংখ্যা সামগ্রিকভাবে ব্যাপকহারে কমে যায়।[৩৮] মজার বিষয় হল একই বছর রিসলে,[৩৯] তার বইতে 'দেশওয়ালিকে' সাঁওতাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ক্রমাগত সামাজিক শোষণ এবং অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তির উপায় হল এই খেরওয়াড় আন্দোলন। সম্ভবত এই পরিস্থিতির কারণে সাঁওতালরা যখন পুরনো দিনের কথা ভাবতে শুরু করে তখন তারা তাদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা এবং সুখের সাথে একটি স্বর্ণযুগ কল্পনা করে। যদি তারা যুক্তি দেখায় তারা তাদের পুরনো পথে ফিরে যায় তাহলে কেন তাদের পুরনো

স্বাধীনতা ফিরে আসবে না, কোনো বিদেশি তাদের হয়রানি করবে না, তাদের কাছে ভাড়া নেওয়া হবে না। তাই খেরওয়াড়রা তাদেরকে স্বাধীন জাতি বলে দাবি করে। সাঁওতালদের এই স্বাধীনচেতা মনই তাদের জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তথ্যসূত্র :

১. Rev. P.O.Bodding;TheKherwar Movement Among the Santals;Edi. Sarat Chandra Roy;Man in India, Vol-1, Ranchi, 1921, pp-222-232

২. Rev. P.O. Bodding; Traditions and Institutions of The Santals, Oslo, Oslo Ethnografiske Museum, Bulletin 6, 1942,pp-3-23

৩. Ibid.

৪. Ibid

৫. সুহৃদ ভৌমিক; রানারমালার ভূমিকা, বেঙ্গলি সাান্থালিডিকশনারি, মেদিনীপুর, মারাং বুরু প্রেস, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৩

৬. Rev. P.O.Bodding;Traditions and Institutions of The Santal, opt. cite,

৭. রামদাস টুডু রেসকা, খেরওয়াল বংশ ধরমপুন্থি, স, সুকুমার শিকদার, সারদা প্রসাদ কিস্কু, কলকাতা, নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৩

৮. Rev. P.O.Bodding;Traditions and Institutions of The Santal, opt. cite, p-12

৯. G N Barlow: Commissioner of Bhagalpur Division,June 1881, File-9C

১০. Report of GN Barlow, Commissioner of Bhagalpur Division, Judicial Procceedings Appendix D, File-9C, August 1881

১১. Letter from the G N Barlow, The Commissioner of Bhagalpur to the secretary of the Government of Bengal, Judicial Proceedings, November 1874, File-755, Wst Bengal State Archives

১২. L S S O. Mally Bengal District Gazetteer:Santhal Parganas, Calcutta, The Bengal Secreteriat Book Depot, p-146

১৩. S P Sinha; The Kherwar Movements 1874-1942 in conflict and Tensions in Tribal Society, New Delhi, Concept Publish Co., 1993, p-207

১৪. Rev. P.O.Bodding; The Kherwar Movement Among the Santals, opt. cite

১৫. ibid

১৬. PC Rai Chaudhary; Gazetteer of India: Bihar santal Paragana, Patna, Patna Superintended Secreteriat Press, 1965, p-130

১৭. adetait account of Bhagirath Majhi and later gurus is found in "Babajiu Reyak Katha" narrated (possibly) by Sangram Murmu, Mohulpahadi 1892-1933

১৮. J A Bourdillon, Report on the Census of Bengal 1881 Vol-1, Bengal Secreteriat Press, 1883, pp-80-90

১৯. 1ibid

২০. Martin Orans; The Santals: A Tribe in search of a Great Tradition, Detroit, Wagne State University Press, 1965, pp-30-39

২১. ibid

২২. Suresh k Singh; Tribal Society in India, New Delhi, Manohar, 1985, pp-70-97

২৩. নীহার রঞ্জনরায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, কলকাতা, লেখক-সমবায়-সমিতি, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা-১২২-১৫৯

২৪. Buchanan Hamilton, Bhagalpur Journal, 1810-11, Patna, 1930

২৫. Martin Orans, opt. cite, p-108

২৬. Extract from Santhal administration report of the year 1862 December 1871 wbsa

২৭. BB Chaudhury; Decline in the old order in the adivasi (tribal) world in peasant history of Pre-late Colonial and Colonial India, Vol-8,ed. D.P.Chottopadhyay, History of Science Philosophy and Culture in Indian Civilization, New Delhi, Pearson Longman, 2008, p-742

২৮. Samar k Mallick; Tranformation of the Santal Society:Free land to Jharkhnd, Calcutta, Minerva Associates, 1993, p-8

২৯. S C baily officiating secretary to the Government of Bengal judicial department to secretary to the Government of Bengal home department judicial 29th July 1877 20-23 A, National Archives of India

৩০. Bengal District Gazetteer, Calcutta, Bengal Secreteriat Press, p-59

৩১. Samar k Mallick, opt. cite

৩২. Demi official from harattarg to H.R.Maddock, Dumka, 27/5/1871, Home Department, Judicial, 29th July, 1871

৩৩. SC beli official secretary to the Government of Bengal judicial department to the secretary of the Government of Bengal home department judicial 21st July 1871

৩৪. ibid

৩৫. L s sO'malley; Bengal District Gazetteer:opt. cite, pp-145-155

৩৬. B B Chowdhury, opt. cite, p-635

৩৭. Qouted from Edward Dyker, Tribal Guerrillas, The Santal of West Bengal and the Naxalite Movement, Bombey, OUP, 1987, p-113

৩৮. District Census Report:Santal Paragana, Calcutta, Bengal Secreteriat Press, 1892, p-7

৩৯. H H Risley; Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, Bengal Secreteriat Press, 1892, p-82.

কাজী নজরুলের সাহিত্যে নবজাগরণের প্রভাব

মানস জানা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (অটোনমাস)

সারসংক্ষেপ: রেনেসাঁসের বৈপ্লবিক প্রভাব পড়েছিল গোটা ইয়োরোপ জুড়ে। শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্যে বহুমুখী বিকাশের পথ খুলে গিয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতি জীবনযাত্রায় যেমন বদল এলো, তেমনি তৈরি হল চার্চ ও পোপতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার আকুতি। রেনেসাঁসের নবচিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষতায় ধারণা এলো; ধর্মীয় ভাবনা, আচার-আচরণ হবে নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিষয়। ভারতীয় নবজাগরণের ঊষাকাল শুরু হয় রামমোহন রায়ের সমাজ ও অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তুলে ধরেছিলেন উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক মননশীলতা। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার, জাতপাতের বিভেদে আটকে থাকা সমাজকে তাঁরা উন্নত, আধুনিক জীবনবোধের সন্ধান দিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির একেবারে সূচনাকাল থেকেই ছিল। তাঁর কাব্য-প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস-নাটিকায় এসেছে পরাধীনতার বিরুদ্ধে চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নারী স্বাধীনতা, নিপীড়িত মানুষের কথা। ধর্ম-বর্ণ-জাতির ঊর্ধ্বে উঠে মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করার সাধনা করে গিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, নজরুলের চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল সাম্যবাদী ভাবধারা। তাঁর বহু রচনা বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ হিসেবে চিরকাল বিবেচিত হবে।
সূচক শব্দ: উন্মেষ, মানবতাবাদ, বাংলা সাহিত্য, হিন্দু-মুসলমান, বিদ্রোহী।

মূল আলোচনা:

কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আলোচনায় দুই বাংলার বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত, সমালোচক ও জীবনীকারের অবদান আছে। এতদসত্ত্বেও তাঁকে নিয়ে বহু বিতর্ক ও বিভ্রান্তি আজও থেকে গিয়েছে। রেনেসাঁস, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের ধারণা এসেছিল সভ্যতার ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণে। মানবতাবাদ কোনোরকম ব্যক্তিচিন্তা বা পান্ডিত্য প্রকাশের মাধ্যম নয়। বিজ্ঞান ও সমাজ বিবর্তনের ধারায় বিশ্বে বিশেষ সময়ে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানবকেন্দ্রিক চিন্তার উপাদানগুলির উন্মীলন। জ্ঞানসাধনায়, সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় মানবতাবাদের প্রসার বিশ্বকে পথ দেখিয়েছিল। ভারতে রেনেসাঁস আন্দোলনের সূত্রপাত ও পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তার ভিত্তিস্থাপন হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এদেশের মাটিতে, সমাজ মননে বহু ভাষা-রুচি-সংস্কৃতির মিলন এবং সেই মিলিত সাধনার বিবর্তন ঘটেছে। বিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের রূপ ও প্রকৃতির অভিনবত্ব আত্মস্থ করেই এদেশের মনন ও মৃত্তিকা থেকে কাজী নজরুলের উত্থান। তাঁকে নিয়ে কবি-সমালোচক মহলে বিভ্রান্তি-দ্বন্দ্ব যাই থাকুক, ব্যক্তিজীবনে- দেশভাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী চিন্তা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আকুতি, সংগ্রাম অনস্বীকার্য।

রেনেসাঁস ও মানবতাবাদ

রেনেসাঁস বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছিল গোটা ইয়োরোপে। মানবতাবাদী ও যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনাগুলো নিয়ে ইয়োরোপের দেশে দেশে বিজ্ঞানী, পন্ডিত, শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে নতুন করে চর্চা শুরু হল। এই জ্ঞানানুশীলনে যুক্ত হয় গ্রিক ও ল্যাটিন ব্যাকরণ, ক্লাসিক গ্রিক সাহিত্য, কাব্য, নীতিশাস্ত্র এবং ইতিহাস। শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্যে অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ করা যায়। ইতালীয় কবি পেত্রার্কা, লেখক বোকাচ্চো, ফ্লোরেন্সের শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস, ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, ইংল্যান্ডের শেক্সপিয়র, ফ্রান্সিস বেকন প্রমুখ ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেনে নবজাগরণের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠলেন। গ্যালিলিও তুলে ধরলেন সামন্তী ধর্মচিন্তার অসারতা। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল প্লেটো, অ্যারিস্টটলের অমূল্য জ্ঞানভান্ডার। "মানব-সভ্যতা যখন চার্চ-শাসিত সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগ থেকে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের দিকে পাশ ফিরছিল, সেই ক্রান্তিকালীন সময়ে চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইতালিতে যে অবিস্মরণীয় সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণ ঘটে এককথায় তাকেই বলে রেনেসাঁস। পরিবর্তিত সমাজ-পরিস্থিতিতে ইতালির সাংস্কৃতিক আবহ বদলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মূলত দুটি শ্রেণীর মানুষ-- হিউম্যানিস্ট ও আর্টিস্ট। হিউম্যানিস্টরা যা করেছিলেন তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি বিনিয়োগ করে, তাঁদের বাক্-যন্ত্র ও লেখনী দিয়ে; আর্টিস্টরা তা করেছিলেন তাদের ছেনি-হাতুড়ি, রঙ-তুলি দিয়ে। একদল গ্রহণ করেছিলেন বৌদ্ধিক পৃথিবীর দায়, অন্যদল নান্দনিক ভুবনের"। (মুখোপাধ্যায়, ২০০৫)

মানবসমাজে তৈরি হল নতুন আকাঙ্ক্ষা, চার্চ ও পোপতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার আকুতি। চার্চের জায়গা নিল রাষ্ট্র। মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে এই নবজাগরণ মানুষকে মুক্ত করল পোপ ও অভিজাততন্ত্রের অন্ধত্ব থেকে। শিল্প বিপ্লব এসেছে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভাঙার প্রক্রিয়ায়। এক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে বিজ্ঞান। তার সঙ্গে আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি, বিভিন্ন খণ্ড-ক্ষুদ্র উপজাতিগুলির মধ্যে যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে এক একটি জাতীয় বাজার। এভাবে একটি ভৌগোলিক সীমার মধ্যে গড়ে উঠতে শুধু করলো জাতীয়তাবোধের মনন। এই জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করে দেশাত্মবোধের উন্মেষ। গণতন্ত্রের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সমগ্র জাতিগত ভাবধারা এবং জাতীয় রাষ্ট্র। সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রা, রীতি-নীতিকে আমূল বদলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও যন্ত্রসভ্যতাকে সামনে রেখে এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সর্বতোভাবে চেষ্টা করলেন বিশ্বের প্রথম সারির দার্শনিক বেকন, স্পিনোজা, কান্ট, ফুয়েরবাখ প্রমুখ। যদিও মনে রাখতে হবে, এই মূল্যবোধ বা মানবিক মমত্ববোধ মানেই তা কিন্তু মানবতাবাদ নয়। এই মানবতাবাদ অর্থে উন্নত মানবিক মূল্যবোধ, যা সেক্যুলার বা পার্থিব মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদ অতিপ্রাকৃত সত্তার ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত। "এই অভিব্যক্তির সাধারণ নাম-- রেনেসাঁস, অর্থাৎ নবজন্ম। সাধারণত তিনটি ধারায় ভাগ করে দেখা যেতে পারে এই নবজন্মকে-- প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলার নতুন নতুন আবিষ্কার, জীবন সম্বন্ধে মানুষের নতুন আশা আনন্দ, ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নতুন বোধ। এই নবজন্মের বা ব্যাপক জাগরণের প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। প্রধানত এর সাহায্যে ইউরোপ, অথবা পাশ্চাত্যজগত তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় খোলস চুকিয়ে দিয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে।"(ওদুদ, ২০১১)

প্রথম যুগে এই মানবতাবাদ ধর্মচিন্তার সংস্কার করে ধর্মকে মানব সমাজের কল্যাণরূপে তুলে ধরেছিল। লক্ষ ছিল উৎপাদনকে ভিত্তি করে সামাজিক সম্পর্ক, উৎপাদনভিত্তিক মানুষে-মানুষে সম্পর্ক। রাজনীতি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম যেন কোনো বাধার সৃষ্টি না করে। অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস যদি থাকেও তবে তা নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বও কম ছিল না। এদের মধ্যে একদল হলেন agnostic বা অজ্ঞেয়বাদী। ঈশ্বর আছে কি নেই, তা নিয়ে তাঁরা ভাবিত নন। প্রথমে যান্ত্রিক বস্তুবাদ, তারপর এই অজ্ঞেয়বাদ এবং তারও পরবর্তীকালে আসে মানবতাবাদ। এটাই চিন্তার সর্বোন্নত রূপ। যারা পার্থিব চিন্তার পুরোধা ব্যক্তিত্ব তাঁরা ইতিহাস, মানবসভ্যতার বিবর্তন ও অর্জিত সমস্ত জ্ঞানকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেন। অতিপ্রাকৃত ভাবধারা, জাত-বর্ণ-সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল ধরে নাড়া দেওয়া শুরু হল। ইওরোপের পঞ্চদশ শতাব্দীর এই ভাঙ্গা-গড়া ভারতে এলো উনিশ শতকে। উনিশ শতকে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তার পরবর্তীকালে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল নবজাগরণের ভাবধারা আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছেন। সেই যৌবনোদ্দীপ্ত মানবতাবাদে নিজেদের সাহিত্যকে রসসিক্ত করেছেন তাঁরা। নজরুল বললেন, নতুন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি-- শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়।

ভারতীয় নবজাগরণ ও নজরুলের সাহিত্য

ভারতীয় নবজাগরণের ঊষাকাল শুরু হয় রামমোহন রায়ের থেকে। রামমোহন যদিও ধর্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ছিল ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে মানুষকে রক্ষা করা। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার, গোঁড়ামি, কূপমণ্ডুকতা, জাতপাতের বিভেদ সমাজকে যখন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, প্রথমে রামমোহন এবং তারপর বিদ্যাসাগর আবাহন করলেন উন্নত, আধুনিক জীবনবোধের। বিদ্যাসাগর তুলে ধরেছিলেন উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক মননশীলতা। তিনি জ্ঞানের আধার শক্ত করেছিলেন পাশ্চাত্যের ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞানের উপর। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল জ্ঞান অর্জন করেছিলেন নবজাগরণের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস থেকে। তাঁরা গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেছিলেন গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি, স্বাধীনতা, নারীর মর্যাদা, নারীমুক্তির চিন্তা, শ্রমজীবী মানুষের জীবনবোধ সম্পর্কে।

কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। কবিতাটি ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে 'বিজলী' পত্রিকার ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২২ পৌষ, ৬ জানুয়ারি সংখ্যায়। 'বিদ্রোহী' নজরুলের মানবতাবাদী চিন্তা ও জীবনবোধের প্রথম সংগ্রথিত রূপ। কবিতাটি মানবতাবাদী চিন্তার উন্নত রূপ ও ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল, দুরন্ত প্রকাশ। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অসাম্যের অবসান। আশু প্রয়োজন ছিল পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তি। বলেছেন-- সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি। এই সেই মানবতাবাদী নজরুল, যিনি মানুষের বৃহত্তর প্রয়োজনে কাব্য-সৌন্দর্যকেও খাটো করতে রাজি ছিলেন। নজরুলের হৃদয়ে ছিল রেনেসাঁসের আলোক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে শক্তির প্রয়োজন। এজন্য ব্যক্তিসত্তার সর্বোন্নত শিখরে পৌঁছাতে হবে। শ্রেণি-বৈষম্যের

অবসান চেয়েছিলেন তিনি। উচ্চ-নীচ, ধনী-গরিবের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর জোরালো কণ্ঠস্বর। অত্যাচারের শক্তি যখন তীব্র, প্রতিবাদের কণ্ঠ তো মৃদু, নমনীয় হতে পারে না! নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা তাই চির জাগ্রত। শান্তি কেবল সেইদিন আসবে, "যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,/অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-।" (ইসলাম, ২০০৫) বিদ্রোহী'র মধ্যে নিহিত আছে অফুরন্ত মানবপ্রেম। কবির মহত্ত্ব হলো মানুষের উপর প্রত্যয়, আস্থা। এরই নাম আত্মমর্যাদাবোধ, অটল মনুষ্যত্ব। তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার। 'বিদ্রোহী'র মধ্যে নিহিত আছে অফুরন্ত মানবপ্রেম। সমালোচক বলেছেন-- " তাঁর বিদ্রোহের মূলে স্বভাবগত অকৃত্রিম মানবপ্রেম শুধু স্বদেশেরই নয়, বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর ... সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন বলেই তাঁর রোমান্টিক কবিচিত্ত মানুষের নির্যাতন, লাঞ্ছনা, শোষণ প্রভৃতি উচ্ছেদ করতে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ"। (গুপ্ত, ১৯৯৭)

নজরুল রোম্যান্টিক কবি। রোম্যান্টিকতার মধ্যে আছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দরদবোধ। বিশ্বসাহিত্যে অতীত যুগের প্রাকৃতিক শক্তিকে দেখে, কল্পনার মধ্য দিয়ে গড়া পৌরাণিক উপাখ্যান বা অতিকায় ক্ষমতাশালী পৌরাণিক চরিত্র, যোদ্ধাদের কাহিনি নিয়ে নতুন করে যে ব্যাখ্যা শুরু হয়েছিল, সেই নতুন চিন্তার আধারে, নব নব বিষয় ও আঙ্গিক এসেছিল সাহিত্যে। পার্থিব মানবতাবাদীরা বলতে চাইলেন যে, পৌরাণিক এসব চরিত্র বা অলৌকিক সব ঘটনা মানুষেরই কল্পনা-- তার মনন জগতের সৃষ্টি। এইসব চরিত্রের অতিমানবিক শক্তিকে তাঁরা দেখালেন মানুষেরই শক্তি হিসাবে। আর সেদিন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে লড়তে, নতুন স্বাধীন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে, মানবতাবাদীদের কাছে যে ধরনের চরিত্র, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আদর্শ চরিত্র প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল, পৌরাণিক উপাখ্যান বা চরিত্রের মধ্যে সেই ধরনের আদর্শরূপকে তাঁরা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেজন্য নজরুলও কেবল শব্দ বা মিথ ব্যবহার বা পাশ্চাত্যের আধুনিকতা গ্রহণ করাই নয়, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল সুর আয়ত্ত করেছিলেন। সেগুলো অনেকখানি বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ।

নজরুল কখনও নারীত্বের অসম্মান হতে দেননি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব সমাজের নারীর উপর নিষ্ঠুর সামাজিক বিধান, শাস্ত্রীয় রীতি-প্রথা, অত্যাচার তাঁর হৃদয়কে করতো ব্যথিত-ক্ষুব্ধ। নারী সমাজের যথার্থ মুক্তি কামনা করেছেন তিনি। যুগ যুগ ধরে শোষিত নারীকে শিল্পীরা, নন্দনতাত্ত্বিকরা বন্দনা করেছেন, তার শৈল্পিক-নান্দনিক রূপ দিয়েছেন। কিন্তু সামাজিক উৎপাদনে নারীর ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়ে গিয়েছে আড়ালে। নজরুল নারীকে স্বপ্নলোকের অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পনা করার বিরোধী ছিলেন। নারীকে তিনি তুলে ধরেছেন সমাজের চালিকাশক্তিরূপেই। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের শিক্ষাকে সামনে তুলে এনেছিলেন তাঁর লেখায়।

"সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে-যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী!
... তবে এর পর-যুগে
আপনারই রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!
যুগের ধর্ম এই—

পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই" (ইসলাম, ২০০১)।
মানবতাবাদের যথার্থ উপলব্ধির ফলেই 'নারী' কবিতায় তিনি লিখতে পেরেছিলেন-- বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি, যা চির-কল্যাণকর, সেই উৎপাদনের অন্তত অর্ধেক অংশের পেছনে আছে নারী সমাজের অবদান।

নজরুলের রচনায় ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির একেবারে সূচনা থেকে। তা অনেকটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় 'ধূমকেতুর পথ' প্রবন্ধে। পরে 'রুদ্র-মঙ্গল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় নামকরণ হয়-- 'আমার পথ'। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুল লিখেছিলেন, "মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশমনির ভাব আনে না।" (ইসলাম, ২০০১)

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি সম্পর্কে নজরুলের গভীর জ্ঞান ছিল। কিন্তু কোনো সংস্কার বা সম্প্রদায়গত ভাবনা তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসে বিপ্লবী দলের শ্রদ্ধেয় নেতা প্রমত্ত ভারতে দীর্ঘদিনের লালিত পুরনো ধর্মীয় আচার-সংস্কার এবং তা থেকে উদ্ভূত চিন্তায় সম্প্রদায়গত বিভেদ দূর করতে ইতিহাসচেতনা, উদার মানবতাবোধ ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা তুলে ধরেছিলেন। সেই শিক্ষায় তিনি তাঁর দলের কর্মীদের গড়েছিলেন। প্রমত্ত বলেছিলেন, "আমার ভারতবর্ষ মানুষের—যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ। ওরে এ ভারতর্ষ তোদের ... মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়; —মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়, –এ আমার মানুষের মহা-মানুষের মহা-ভারত।" (ইসলাম, ২০০৩)

মানবতাবাদের আরও উন্নত রূপ হল সাম্যবাদী চিন্তা। এটি নজরুলের চেতনার আর একটি অন্যতম ভিত্তি। তা থেকেই এসেছে সমাজবিপ্লবের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। বাংলা কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনা প্রথম তুলে ধরেন নজরুল। 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের শুরুতে 'সাম্যবাদী' কবিতায় লিখেছেন, " গাহি সাম্যের গান--/ যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান, /যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান..."(ইসলাম, ২০০৩)। তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার। এই সাম্যবাদী ভাবনা তাঁকে অসাম্প্রদায়িক উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত করেছিল। শেলী, হুইটম্যান, গোর্কির মতো নজরুল চেয়েছিলেন নতুন জগৎ, শাসন-শোষণমুক্ত সমাজ। নজরুল যথার্থই রোম্যান্টিক কবি। এই রোম্যান্টিকতার মধ্যে আছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দরদবোধ। তাঁর কাব্য-উপন্যাস-সংগীত হয়ে উঠেছে মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার।

নজরুলের সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা

আজ একবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনে শোষণ-নিপীড়ন বহুগুণ বেড়েছে। আজ ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, জাত-পাতের বিভেদ নিত্যনতুনভাবে মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। উপমহাদেশে তৈরি হয়েছে যুদ্ধোন্মাদনা। মানুষের পরিচয় কেমন যেন ধর্মনির্ভর হয়ে পড়ছে। আমরা কি তবে হয়ে উঠছি অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক! রাজনৈতিক স্বার্থ মানুষের ইতিহাসচেতনা, মূল্যবোধ, সামাজিকতা বিপন্ন করে তুলছে। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা নষ্ট হচ্ছে। এইসব অবক্ষয়িত চিন্তা সাহিত্যের অঙ্গনকেও কলুষিত করতে উদ্যত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কুক্ষিগত করে ফ্যাসিবাদী

চিন্তার ভিত্তি রচিত হচ্ছে। মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর হাতে মুনাফার পাহাড় জমেছে। অন্যদিকে নিঃস্ব, রিক্ত, শিক্ষাহীন, কর্মহীন, খাদ্যহীন অগণিত মানুষ। কেন এই অসাম্য, কেন এই ক্ষুধা-মৃত্যু! কেন সবকিছু থেকেও মানুষ বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত? এর উত্তর ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের পরিস্থিতি দেখে সেদিনই কাব্য-প্রবন্ধ-অভিভাষণ-সংগীতে তা তুলে ধরেছিলেন নজরুল। তাঁর চিন্তা, মানবতাবাদী সত্তা কেবল একবিংশ শতাব্দী কেন, যুগে যুগে শাসকশক্তির সামনে সাহস-শক্তি-তেজ নিয়ে মানুষকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখাবে। দিয়ে যাবে নবজাগরণের আদর্শ, বলিষ্ঠতা, উন্নত চিন্তা।

কিন্তু আমরা এগিয়ে এসেছি আরও একশো বছর। নজরুলের ধারায় একালের সাহিত্যসেবীকে এগিয়ে আসতে হবে একালের উপযোগী আরও উন্নত ভাব ও শৈলী নিয়ে। কিন্তু বিষয় বা শৈলী শুধু নয়, চাই নজরুলের মতো হৃদয়াবেগ, মনুষ্যত্ববোধ, আদর্শ ও ক্রিয়াশীলতা। কিন্তু তাঁর হৃদয়াবেগ, সাহিত্যিকরূপে দায়বদ্ধতা সবচেয়ে বেশি যেক্ষেত্রে উৎসারিত হয়েছে তা হল অসাম্প্রদায়িকতা। কবি-সাহিত্যিকদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রেনেসাঁসের আদর্শ। আজ যদি আমরা উন্নত আধুনিক মানুষ বলে নিজেদের দাবি করি, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা, মধ্যযুগীয় অন্ধতা, গোঁড়ামি কাটিয়ে বিশ্বের মহামানবের মিলন ক্ষেত্রে স্থান করে নিতে হবে শিল্পী-সাহিত্যিককে। নজরুল কিন্তু সেই আহ্বান রেখে গিয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন, "সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মতো উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোনো ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়ো-ছোটো জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ দেওয়া ডোবার জলের মতো যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য সাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড় ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড়ো সাহিত্যিক।" (ইসলাম, ২০০১)

তথ্যসূত্র:

১. ইসলাম, নজরুল, ২০০১, 'নারী', *কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ: ৮৩

২. ইসলাম, নজরুল, ২০০১, 'রুদ্র-মঙ্গল', *কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ: ৪৩১-৪৩২

৩. ইসলাম, নজরুল, ২০০১, 'যুগবাণী', *কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, প্রথম খন্ড,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ: ৪২৭

৪. ইসলাম, নজরুল, ২০০৩, 'কুহেলিকা', *কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, চতুর্থ খন্ড,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ: ৪১১

৫. ইসলাম, নজরুল, ২০০৩, 'সাম্যবাদী', *কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃষ্ঠা ৭৩

৬. ইসলাম, নজরুল, ২০০৫, 'বিদ্রোহী', *অগ্নিবীণা, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, প্রথম খন্ড,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ: ১০

৭. ওদুদ, কাজী আবদুল, ২০১১, *বাংলার জাগরণ,* ঢাকা, বাংলাদেশ : কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ: ১৫

৮. গুপ্ত, ড. সুশীলকুমার, ১৯৯৭, *নজরুল - চরিতমানস*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ: ১৩৭
৯. মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন, ২০০৫, *ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ: ৬০।

বুদ্ধদেব বসুর 'অনাম্নী অঙ্গনা' : নারীর অস্তিত্ব ও প্রতিবাদের কাব্যনাট্যচিত্র

বঙ্কিম বর্মন

গবেষক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের বাংলা নাট্যসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু একজন অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ মূলত কবি হিসেবে হলেও, তিনি শুধু কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। নাট্যসাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ তাঁকে গদ্য নাটক, কাব্যনাটক, একাঙ্ক নাটক এবং ছোটোদের জন্য নাটক সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর এই সৃজনধারায় তিনি প্রায় ৩২টি নাটক রচনা করেছেন। যার মধ্যে কাব্য নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেন। জীবনের মধ্যবয়সে এসে বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের গভীর চর্চায় নিমগ্ন হন। এই মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাঁকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তিনি মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনির উপর ভিত্তি করে পাঁচটি অনন্য কাব্যনাটক রচনা করেন। এই নাটকগুলি হলো— 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (১৯৬৮), 'কালসন্ধ্যা' (১৯৬৭-৬৮) 'প্রথম পার্থ' (১৯৬৯), 'সংক্রান্তি' (১৯৭০) এবং 'অনাম্নী অঙ্গনা' (১৯৭০)।

বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাটক রচনায় অত্যন্ত দক্ষ নাট্যশিল্পী। যদিও তাঁর আগে থেকেই কাব্যনাট্যের চর্চা হয়, তবে আধুনিক যুগে বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসুর সময়ে, কাব্যনাট্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্প্রকৃতি নিয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর নাটকে নারী চরিত্রের ভূমিকা। এই কাব্যনাট্যে তিনি নারী চরিত্রগুলিকে কীভাবে উপস্থাপন করেন এবং কিভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা ও সম্পর্কের গভীরতা পরিবর্তিত হয়, তা বিশ্লেষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর সময়ে নারী চরিত্র কেবল পার্শ্বচরিত্র হয়ে থাকার পরিবর্তে নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবনা বা সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যে নারী চরিত্র কীভাবে বিকশিত হয়, তা বুদ্ধদেব বসুর 'অনাম্নী অঙ্গনা' কাব্যনাটকটি বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: পর্ণকুটির, শৃঙ্গার, স্বৈরিণী, রন্ধ্রপথ, কৌমার্যহারক, দেবভুঞ্জিতা।

মূল আলোচনা:

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'অনাম্নী অঙ্গনা' নাটকটি মহাভারতের আদিপর্বের ১০৬ সংখ্যক অধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বন করে রচনা করেন। এই অধ্যায়ে আছে বিদুরের জন্মকাহিনি। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে কৌরব বংশ রক্ষার জন্য রাজমাতা সত্যবতী ব্যাসদেবকে আহ্বান জানান। তিনি তাঁর পুত্রবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে ব্যাসদেবের শয্যাসঙ্গ করান। কিন্তু তৃতীয়বার, এক অনাম্নী সুন্দরী পরিচারিকার সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে জন্ম হয় বিদুরের।

মহাভারতের মূল কাহিনিতে এই পরিচারিকার মানসিক অবস্থার ওপর তেমন কোনো আলোকপাত করা হয়নি। তবে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে এই অনাম্নী পরিচারিকাকে কেন্দ্র করেই একটি কাহিনি নির্মাণ করেন। এই চরিত্রটি শুধু একজন দাসী বা পরিচারিকা নয়; নাটকে

তাকে এক মানবী হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়, যার অনুভূতি, আত্মসম্মান এবং মানসিক দ্বন্দ্ব আছে। তাঁর শর্তহীন কর্তব্য এবং সামাজিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যে মনের গভীরে এক অব্যক্ত বেদনা আছে, তাই নাটকের মর্মকথা। নাটকটি অতীত ভারতের সামাজিক কাঠামোর এক গভীর চিত্র তুলে ধরে। শূদ্রজাতীয় মৎসগন্ধা সত্যবতীর রাজবধূ হয়ে ওঠা যেমন এক বিশাল পরিবর্তন ও প্রশ্নের জন্ম দেয়, তেমনই এক দাসী পরিচারিকাকে রাজবংশ রক্ষার কাজে ব্যবহারের ঘটনাও সমাজের স্তরবিন্যাসের কঠোর বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসে। ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলনের জন্য দাসী পরিচারিকাকে পাঠানোর ঘটনায় সমাজের শ্রেণিবৈষম্য এবং নারীর শর্তহীন আত্মত্যাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু এই কাহিনির নাট্যরূপের মাধ্যমে পরিচারিকার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা দ্বন্দ্ব, সামাজিক পরিচয়ের টানাপোড়েন এবং তাঁর কর্তব্যের নিষ্ঠাকে তুলে ধরেন। এভাবেই তিনি মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে তাঁর নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করেন। এই নাটকে কেবল বিদুরের জন্ম নয়, বরং এই অনাম্নী অঙ্গনার মানবিক যন্ত্রণা, তার ত্যাগ ও অমরত্বের গল্পকে বুদ্ধদেব বসু মর্মস্পর্শী রূপে তুলে ধরেন, যা সমাজের ইতিহাস ও বর্তমানকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে সাহায্য করে।

মহাভারতের সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং জাতিভেদ প্রথায় বিভক্ত। এই সমাজে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা উপেক্ষা করেই বংশরক্ষার দায়িত্ব ঠিক করা হয়। পুরুষদের জন্য অবাধ যৌনতার সুযোগ ছিল, এবং শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অতিথি সন্তুষ্ট করতে বা কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করতে স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে যেতে বাধ্য করা হতো। বংশরক্ষার জন্য স্ত্রীকে দিয়ে অন্য পুরুষের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়াও স্বাভাবিক বলে মানা হয়। নারীর পবিত্রতা ও সতীত্বকেও পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত করা হয়। এমনকি দ্রৌপদীর মতো নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণ করাও পরিবারের বা সমাজের রাজনৈতিক স্বার্থে বৈধতা পেত।

মহাভারতের সমাজে নারীর নিজের প্রেম, রোমান্স, বা যৌনতার ইচ্ছা প্রকাশের কোনো স্থান ছিল না। রাজমাতা সত্যবতী, রাজবধূ অম্বিকা, এবং দাসী অঙ্গনার জীবনে এই পিতৃতান্ত্রিক শোষণের একই চেহারা দেখা যায়। নাটকে রানী অম্বিকা দাসি অঙ্গনার উদ্দেশ্যে বলেন—

> 'কিন্তু কে না জানে
> আমাদের ইচ্ছার অধীন নয় জীবন।'[১]

ব্যাসদেবের দু'বারের চেষ্টায় হস্তিনাপুর উত্তরাধিকার হিসেবে শুধু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আর অসুস্থ পাণ্ডুকে পায়। হস্তিনাপুরের জন্য এমন একজন সম্পূর্ণ ও যোগ্য সন্তান দরকার, যে রাজ্য পরিচালনার জন্য সত্যিকারের উপযুক্ত হবে। তাই রাজমাতা সত্যবতী অম্বিকার কাছে অনুরোধ করেন, যেন তিনি আর একবার এক রাতের জন্য ব্যাসদেবের সঙ্গে শয্যাসঙ্গিনী হন। কিন্তু অম্বিকা জানিয়ে দেন—

> 'রুচি রহিত গাভীর মতো
> যে-কোনো বৃষের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি না।'[২]

নারীর সম্মতি ও স্বাধীনতার প্রশ্নে অম্বিকার সংশয় এবং আধুনিক মনোভাব পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে। তবুও, এই নাট্যকথা মহাভারতের মূল প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন না, বরং তাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করে। অম্বিকা রাজমাতা সত্যবতী কে বলেন—

> 'আপনার চোখে আমরা দুই ভগিনী অপরাধিনী,

যেহেতু আমাদের পুত্রেরা বিকলাঙ্গ।
কিন্তু সে জন্য ব্যাসের কোনো দায়িত্ব নেই, কে বলতে পারে?
তিনি উত্তম, তার প্রমাণ কী?'[৩]

নাটককার জীববিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্যকে এমন এক শিল্পিতভাবে ও সুচিন্তিত উপায়ে ব্যবহার করেন, যে তা যেন নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে নিখুঁত ভাবে স্থান পায়।

বুদ্ধদেব বসুর অম্বিকা তার প্রশ্নের মাধ্যমে এমন সৎ কাজ ও উদ্দেশ্যের প্রতি তীব্র সমালোচনা তুলেন, যা সমাজে নারীর অবস্থা ও তাকে দেওয়া অবস্থানকে বিচার করে। তার প্রশ্ন আসলে নারীর চিরকালীন সংবেদনশীলতা ও ক্ষুব্ধ আত্মার অভিব্যক্তি, যা নারীকে তার নিজের অস্তিত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই উচ্চারণে এক ধরনের প্রতিবাদ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়, যেখানে নারীর নিজস্ব পরিচয় ও স্বাধীনতার পক্ষে একটি গভীর আহ্বান থাকে—

'আশ্চর্য!
তাঁরাই পূজ্য হন জগতে
যাঁরা দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর।
যাদের পক্ষে নারী
শুধু এক রন্ধ্রপথ, যাঁর মধ্য দিয়ে
ধমনীর আগুন তারা নিবিয়ে দেন— প্রয়োজন মতো,'[৪]

এরপর নাটকে রাণী অম্বিকা এবং তার প্রিয় দাসী অঙ্গনার মধ্যে এক বিশেষ পরিস্থিতি উঠে আসে। রাজবংশের উত্তরাধিকার টিকিয়ে রাখতে অম্বিকার সঙ্গে ঋষি ব্যাসদেবের মিলন অপরিহার্য। কিন্তু অম্বিকা নিজে এই মিলনে রাজি নন—

'...না, আমি পারবো না।... পারবো না!
আমাকে খুঁজতে হবে অন্য কোনো উপায়,
যে-কোনো, যে-কোনো পথে নিষ্কৃতি।'[৫]

তাই তিনি তার দাসী অঙ্গনার কাছে প্রস্তাব রাখেন, যদি সে এক রাতের জন্য ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। অঙ্গনা তখন দ্বিধায় পড়ে। একদিকে তার শারীরিক এবং মানসিক স্বাধীনতার প্রশ্ন, অন্যদিকে মুক্তির লোভ এবং নিজের কাঙ্ক্ষিত জীবন পাওয়ার সম্ভাবনা—

'আমার জীবন
যা এতদিন আমারই সীমায় বদ্ধ ছিলো,
মৃৎপাত্রের মধ্যে যেমন তণ্ডুল,
এখন তা আমাকে অতিক্রম ক'রে যেতে চাইছে,
রন্ধনকালীন অন্নকে ছেড়ে বাষ্প যেমন ঊর্ধ্বে উঠে যায়।'[৬]

অঙ্গনার অবস্থান খুবই জটিল। সে জানে, সমাজের চোখে একজন দাসীর জীবন তুচ্ছ, কিন্তু ব্যাসদেবের মতো ঋষি যদি তাকে স্পর্শ করেন, তবে সে কলঙ্করহিত থাকবে। এমনকি ঋষির আশীর্বাদে রাজমাতা সত্যবতীর মতো তার ভাগ্যও বদলে যেতে পারে। তাই অঙ্গনা ভাবে সত্যবতীর কথা, যিনি একসময় শূদ্রানী ছিলেন কিন্তু ঋষি পরাশরের সঙ্গে মিলনের পর রাজমাতা হয়ে যান। অঙ্গনার মনেও আশার আলো জ্বলে ওঠে, তার জীবনেও হয়তো এমন পরিবর্তন ঘটতে পারে।

নাটকে রাণী অম্বিকা এবং তার দাসী অঙ্গনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি দেখা যায়। রাণী অম্বিকার কাছে রাজবংশের উত্তরাধিকার রক্ষা করা সবচেয়ে জরুরি। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত পছন্দ বা ইচ্ছার চেয়ে পরিবারের দায়িত্ব অনেক বড়ো। এজন্য অম্বিকা নিজে ঋষি ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত না হয়ে অঙ্গনাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন—

'সন্ধ্যা হ'লে আমি নিজের হাতে ওকে সাজাবো
সূক্ষ্ম বসনে, রত্নমণিতে, পুষ্পমাল্যে।
আজ রাত্রির মতো দাসী হবে রানী, রানী হবে পরিচারিকা।'[৭]

পুরুষদের ইচ্ছা বা চাহিদা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু নারীকে বারবার ভাবতে হয়—তাদের ভূমিকা কী, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কী মূল্য! রাণী অম্বিকা অঙ্গনাকে তার জায়গায় পাঠানোর মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চান। তিনি দাসীর কাছে এই কাজ ভাগ করে দিতে চান, যেন রাজবংশের প্রয়োজন পূরণ হয়। নাটকের শেষে দাসী অঙ্গনা এক বিশেষ অভিজ্ঞতায় পূর্ণতা লাভ করে—

'বিরাট—ভারি—অপরিমেয়—প্রায় অসহ্য।
কিন্তু তবু,
রাত্রি যখন সবচেয়ে স্তব্ধ, অন্ধকার সবচেয়ে গভীর,
হ'য়ে উঠলেন এমন অনির্বচনীয় কোমল, এমন অন্তহীনভাবে নির্ভার,
যে রাত্রিশেষে, উষার পূর্বক্ষণে আমার মনে হ'লো
শুধু তাঁর নিশ্বাসের ফুৎকারে আমি গর্ভিণী।'[৮]

ঋষি ব্যাসদেবের সঙ্গে তার মিলন শুধু শারীরিক নয়, এক ধরনের গভীর আত্মিক তৃপ্তি ও আনন্দের জন্ম দেয়। অঙ্গনার এই তৃপ্তি তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং এক নতুন শক্তির প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু রাণী অম্বিকা এই বিষয়টি মেনে নিতে পারেন না। অঙ্গনার আনন্দ ও তৃপ্তির কথা শুনে তার মনে ঈর্ষা জেগে ওঠে—

'কী, এত স্পর্ধা! এত কূটবুদ্ধি!
ভাবছিস তোর পুত্র হবে কুরুজাঙ্গলের রাজা,
আর তুই—দাসী—রাজমাতা হবি সত্যবতীর মতো!
মূর্খ! জানিস না, মাতা যার শূদ্রাণী, আর পিতা বর্ণসংকর—
সেই পুত্র যত না পূর্ণাঙ্গ হোক,
অন্ধের চেয়েও, ক্লীবের চেয়েও
শতগুণে রাজা হবার অযোগ্য!'[৯]

তিনি নিজেকে এই অনুভূতি থেকে দূরে রাখতে চান, তবুও অঙ্গনার অভিজ্ঞতা তার মনে এক ধরনের অস্বস্তি সৃষ্টি করে। নারীর অহংকার ও ঈর্ষাপ্রবণ মনোভাব একদিকে তাকে পুরুষকে খুশি করার প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ করছিল, অন্যদিকে নারীদের জন্য এক দীর্ঘ বঞ্চনার ক্ষেত্র তৈরি করছিল। এখানে পুরুষতন্ত্রের চোখে নারীত্বের শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে রাণী এবং দাসী সমান হয়ে যায়— অম্বিকা এবং অঙ্গনা দু'জনেই একই রকম বঞ্চনা, হাহাকার, ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার শিকার। নাটকের এই কাহিনিতে আধুনিক মানবিক আবেগ—যেমন ঈর্ষা ও অস্বস্তি—অতি স্বাভাবিকভাবে উঠে এসেছে। এটি দেখায় যে, সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন, মানুষের আবেগ এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে আমরা সবাই এক।

বুদ্ধদেব বসুর "অনাম্নী অঙ্গনা" নাটকটি নারী চেতনার জটিল এবং বহুমুখী দিকগুলোকে তুলে ধরে। এই নাটকের তিনটি প্রধান নারী চরিত্র—রাজমাতা সত্যবতী, রানী অম্বিকা, এবং দাসী অঙ্গনা নারীর ভিন্ন ভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। এই তিন চরিত্রের দ্বন্দ্ব এবং সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে নারীর সৃজনশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপটি ফুটে উঠে। রাজমাতা সত্যবতী একজন শক্তিশালী, কৌশলী এবং দায়িত্বশীল নারী, যিনি বংশ রক্ষার জন্য পুত্রবধূ অম্বিকাকে ঋষি ব্যাসদেবের সঙ্গে শয্যাসঙ্গী হতে বাধ্য করেন। এটি তার সামাজিক অবস্থান এবং দায়িত্ববোধের ফল। সত্যবতীর এই সিদ্ধান্ত তার নিজস্ব অনুভূতির চেয়ে রাজ্যের ভবিষ্যতের প্রতি দায়বদ্ধতাকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু এতে নারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ওপর সামাজিক চাপে কীভাবে আঘাত আসে, তা প্রকাশ পায়। রানী অম্বিকা একজন অসহায় চরিত্র, যিনি নিজেই সত্যবতীর দ্বারা চাপের শিকার এবং একইসঙ্গে নিজের কর্তৃত্ব প্রমাণের জন্য অন্য নারীর উপর একই চাপে জোর প্রয়োগ করেন। তিনি তার দাসী অঙ্গনাকে ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য করেন। এই চরিত্রটি ক্ষমতার লালসা, সামাজিক অবমাননা, এবং কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। তার আচরণ দেখায় কীভাবে সমাজের কাঠামো নারীদের একে অপরের প্রতিপক্ষ করে তোলে। দাসী অঙ্গনা নাটকের কেন্দ্রীয় এবং সবচেয়ে জটিল চরিত্র। তার অবস্থান প্রথমে নির্লিপ্ত মনে হলেও, পরে দেখা যায় সে নিজের সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছায় চালিত। রানী অম্বিকার চাপ সত্ত্বেও, অঙ্গনা তার এই পরিস্থিতিকে ক্ষমতায়নের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। ব্যাসদেবের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে সন্তান ধারণ করে সে রাজমাতা হওয়ার চিন্তা করে, যা তাকে সামাজিকভাবে একটি উচ্চ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। নাটকে নারীর চরিত্রগুলোকে একদিকে সামাজিক কাঠামোর বলি হিসেবে দেখানো হয়, আবার অন্যদিকে তাদের নিজস্ব শক্তি এবং প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সত্যবতী এবং অম্বিকার মাধ্যমে প্রথাগত সামাজিক দায়িত্ব ও ক্ষমতার লড়াই ফুটে উঠে, যেখানে অঙ্গনার মাধ্যমে নারী চেতনার বিকাশ, সৃজনশীলতার উন্মেষ, এবং নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠার লড়াই প্রকাশ পায়। এই নাটকে বুদ্ধদেব বসু নারী চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের কাঠামো, ক্ষমতা, এবং দায়িত্বের টানাপোড়েনকে তুলে ধরেন। নারীর অবস্থানকে কেবল শোষিত নয়, বরং সৃষ্টিশীল ও প্রতিরোধী শক্তি রূপে চিত্রিত করেন। "অনাম্নী অঙ্গনা" নাটকটি একটি গভীর অন্তর্দর্শন, যা নারীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক প্রতিরোধের চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে।

অনাম্নী অঙ্গনা' নাটকে নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক সমাজে নারীর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এবং অসন্তোষকে ফুটিয়ে তোলেন। এই নাটকের মূল নারী চরিত্র কোনো একক নাম দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তিনি সকল নারীর প্রতিভূ। তাঁর নামহীনতা প্রতীকীভাবে নারীর অনির্বচনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং পরিচয়ের সংকটকে তুলে ধরে। নাটকের শেষে এই নারী চরিত্র কোনো চূড়ান্ত মুক্তি বা সমাধানে পৌঁছায় না। বরং তাঁর জীবন এক অনন্ত যন্ত্রণার দিকেই ইঙ্গিত করে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু বুদ্ধদেব : নাটক সমগ্র ১, দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা—৭৩, জানুয়ারি ২০১৩, মাঘ ১৪১৯, পৃষ্ঠা. ২৬১।

২. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৫৩।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৫৫।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৫৮-২৫৯।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৬০।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৬৯।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৭০।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৭৬।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৭৭-২৭৮।

শঙ্খশিল্পের মোটিফ নান্দনিকতা ও সমাজতত্ত্ব

সৌগত চট্টোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রামসদয় কলেজ

সারসংক্ষেপ: বাংলা লোকশিল্পের ধারায় শঙ্খশিল্প এক উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। এই শিল্পের মোটিফ, নান্দনিকতা ও সমাজতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। মনে রাখতে হবে, লোকশিল্পের মোটিফে শুধু নান্দনিকতাই প্রকাশ পায় না, তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে সমাজের কথাও। তারই নির্যাস পাওয়া যাবে এই আলোচনায়।
সূচক শব্দ: অসুন্দর, প্রভুশ্রেণী, সাপেক্ষতাবাদ, খোদাই।

মূল আলোচনা:
শঙ্খশিল্প যখন সর্বোপরি লোকশিল্প তখন লোকশিল্পের নন্দনতত্ত্ব আগে বোঝা দরকার। কিন্তু তারও আগে প্রশ্ন 'লোকনন্দনতত্ত্ব' বলে কি স্বতন্ত্র কোনো নন্দনতত্ত্ব হতে পারে? হলে 'প্রভুশ্রেণীর নন্দনতত্ত্ব' ভাঙিয়ে আমরা আজও কিভাবে করে চলেছি 'লোকশিল্পের নান্দনিক বিচার?'

স্মরণে রাখতে হবে, মানবজাতির কোনো 'অখণ্ড ও নির্বিশেষ' নন্দনতত্ত্ব নেই। দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে, এমনকি একই জাতিগোষ্ঠীর মানুষে মানুষেও নন্দনতত্ত্বের বিভাজন আছে এবং থাকবে[১], থাকবে তার কারণ শুধু 'আপেক্ষিকতা' নয়, প্রভুশ্রেণী সবসময়ই চাইবে তার অধীনস্থ শ্রেণীর নন্দনতত্ত্বের ধারণা গড়ে উঠুক প্রভুশ্রেণীর নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠিতে, যাকে বলে 'সংস্কৃতির আধিপত্যবাদ'।

অধ্যাপক পবিত্র সরকার ঠিকই লক্ষ করেছেন: "মূলত ইয়োরোপের উচ্চশ্রেণীর সৌন্দর্যতত্ত্ব আমাদের সাহিত্য-শিল্প বিচারে প্রভুত্ব করে আসছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্য-সমালোচনা-দর্শন-শিল্পতত্ত্ব ইত্যাদিতে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে ইয়োরোপের শিল্পতত্ত্ব-নন্দনতত্ত্বের প্রাধান্য আমাদের শিল্প সাহিত্যের আলোচনায় খুব দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[২] কিন্তু ইউরোপের ওই 'অবসরভোগী শ্রেণী'র নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিতে কিভাবেই বা সম্ভব গ্রামীণ লোকশিল্পের নান্দনিক বিচার? 'অবসরভোগী শ্রেণী'র সুন্দর-অসুন্দরের ধারণার সঙ্গে তো 'গ্রামীণ নিরক্ষর কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষে'র সুন্দর-অসুন্দরের ধারণার পার্থক্য হবেই। অধ্যাপক সরকার তাই লিখছেন: যতদূর মনে হয় উচ্চশ্রেণীর নন্দনতত্ত্বের একটি পাল্টা নন্দনতত্ত্ব তাই প্রথম তৈরির চেষ্টা করেছিলেন বস্তুবাদী তাত্ত্বিকরা। এখন যে পোস্টমর্ডান নন্দনতত্ত্বে সার্বিকতত্ত্ব বা grand narrative-কে অস্বীকার করা হচ্ছে তারও সূত্র লুকিয়ে আছে ওই সাপেক্ষতাবাদের মধ্যে[৩], যাতে প্রতি গোষ্ঠীর নন্দনতত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়।

লোকশিল্পে লোকসংস্কৃতিতে এই গোষ্ঠীই বড় কথা। প্রতিটি গোষ্ঠীর নন্দনতত্ত্ব সেই সেই গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণে বিচার্য, লোকসংস্কৃতির পরিভাষায় একেই বলে 'Contextual method'। Context ছাড়া Text এবং Texture এর কোনো মূল্যই নেই। ড. সৌমেন সেন

খুব সুন্দর একটি বিবরণ দিয়েছেন। মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ে একটি বাৎসরিক উৎসব পালিত হয়। তাতে একদিন নগ্ন কুমারী নাচের ব্যবস্থা থাকে। সুফসলের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রতীকী অনুষ্ঠান। একসময় পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও শস্যরোপণ ও শসাতোলার কালে শস্যক্ষেত্রে নগ্ননারীর নাচ এবং যৌথ সঙ্গমের অনুষ্ঠান হত। এখনও এইরকম অনুষ্ঠান অনেক হয়।[৪]

তো এগুলিকে আমরা কি বলব? সুন্দর না অসুন্দর? দু'টোর কোনোটাই নয়, নয় তার কারণ, এইরকম আচার-অনুষ্ঠান/শিল্প-সংস্কৃতির বীজ লুকিয়ে রয়েছে গোষ্ঠী বিশেষের যাদুবিশ্বাসে, সেই বিশ্বাসের নিরিখেই গোষ্ঠীবিশেষের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নান্দনিক ব্যাখ্যা সম্ভব। শঙ্খশিল্পের নন্দনতত্ত্ব আলোচনাকালেও আমরা একথা মনে রাখব।

শঙ্খশিল্প শাঁখারি সম্প্রদায়ের শিল্প। কথিত আছে, ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপকন্যাবেশী ঘৃতাচীর গর্ভে যে কুম্ভকার, মালাকার, স্বর্ণকার, চিত্রধর প্রভৃতি নয় পুত্রের জন্ম হয়, 'শঙ্খকার বা শাঁখারী' তার অন্যতম। দু'বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁদের তৈরি শঙ্খশিল্পের নিদর্শনগুলি দেখলে সাধারণভাবে দু'ধরনের কারুকাজ চোখে পড়ে,-"এক, 'খোদাই' (incision or engraving) এবং দুই, 'নতোন্নত তক্ষণকর্ম' (bas-relief)। সাধারণত ধারালো কোনো মাধ্যমের সাহায্যে শক্তজমির ওপর রেখাচিত্র উৎকীর্ণ করাকে 'খোদাই' বলা হয়। ধারালো মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয় সূচের মতো অগ্রভাগযুক্ত নরুন কিংবা হাতুড়ি। তবে শাঁখের মসৃণ পৃষ্ঠপটে ব্যবহার করা হয় লোহার রেত বা কলসকাঁটাযুক্ত এক ধরনের বিশেষ বাটালি। ভারতীয় ভাস্কর্যরীতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত শাঁখের ওপর 'খোদাই' কর্মের সেই একই রীতি বলবৎ।"[৫]

অতঃপর আসা যাকে 'নতোন্নত তক্ষণকর্মে'র আলোচনায়। ড. সুদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন: "সমুদ্র থেকে সংগৃহীত শাঁখাটিকে প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও জলের দ্রবণে ডুবিয়ে পরিষ্কার করা হয়। ফলে সামুদ্রিক কালো আস্তরণ উঠে শাঁখের বহির্ভাগে এক ধরনের দীপ্তি চোখে পড়ে। তারপর শাঁখের গায়ের ফাটা বা পোকায় খাওয়া অংশগুলি নাইট্রিক অ্যাসিড, মোম ও জিঙ্ক পাউডারের বিশেষ দ্রবণ সহযোগে ভরাট করে নেওয়া হয়। এরপর শাঁখের মসৃণ বহির্গাত্রে লোহার রেত দিয়ে যে নকশাটি অঙ্কণ করা হয় তাকে কলসকাঁটাযুক্ত বাটালির সাহায্যে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে 'নতোন্নত তক্ষণকর্ম' সম্পূর্ণ করা হয়।"[৬]

কিন্তু এ তো গেল শঙ্খশিল্পে গড়ে ওঠা কারুকাজের পদ্ধতি সম্পর্কিত ইতিহাস, কিন্তু সেই নন্দনতত্ত্বের পেছনে যে সমাজতত্ত্ব কাজ করে, কাজ করে শিল্পীদের মোটিফ ভাবনা তারও পরিচয় নেওয়া জরুরি। কিন্তু সেই সম্পর্কে যাওয়ার আগে বরং আমরা শঙ্খশিল্প এবং শিল্পীসমাজ সম্বন্ধে দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেব, যাতে তাঁদের তৈরি শিল্পকর্মের নান্দনিক ও সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। স্মরণে রাখতে হবে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে শঙ্খের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত। শঙ্খকে মানুষ দেখে এসেছে দেবশক্তির আধার রূপে। পুরাণে শঙ্খঘোষণার দ্বারা বিজয় ঘোষিত হয়েছে। এর নিনাদ অতীব পবিত্র, এর মাঙ্গলিক ধ্বনি অশুভ নাশে সক্ষম। মাঙ্গলিক ধ্বনির সাহায্যে অমঙ্গল দুরীকরণের এই প্রথাটি অবশ্য আমরা প্রাগার্য সমাজ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল, মুন্ডা, হো প্রভৃতি আদিবাসীদের কাছে আবার শঙ্খের তাৎপর্য আলাদা। 'শঙ্খ' তাঁদের চোখে স্ত্রী

জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। 'শঙ্খপূজা'র অর্থ তাঁদের কাছে প্রজনন শক্তির পূজা। শঙ্খের মোটিফে তাই তাঁরা আঁকেন উর্বরাশক্তির নানা অনুষঙ্গ, আমরা যেখানে আঁকি লক্ষ্মীনারায়ণ, ধানের শিষ, দশাবাতার, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ইত্যাদি। এখানেই পৃথক হয়ে যায় 'ওদের' নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে 'আমাদের' নন্দনতত্ত্বের। ভিন্ন দুই লোকসমাজের নন্দনতত্ত্বের বীজ লুকিয়ে রয়েছে ভিন্ন দুই যাদুবিশ্বাসে। ভিন্ন দুই যাদুবিশ্বাসই এখানে জন্ম দিয়েছে ভিন্ন দুই সুন্দরের। এই সুন্দরের নমুনা ধরা পড়ে শঙ্খশিল্প ও শাঁখার বিভিন্ন মোটিফে। একই জাতিগোষ্ঠীর মোটিফেও ঘটে যায় কত না পার্থক্য। হাঁইসাদার জালফাঁস, শিকলিবালা, চৌমুক্ষী ইত্যাদি বিভিন্ন শাঁখার নামবৈচিত্র্যের মধ্যেই তো লুকিয়ে রয়েছে মোটিফের রূপান্তর। কেউ কেউ তাই বলেছেন, বিভিন্ন গোষ্ঠী আসলে তার পারিপার্শ্বিক সমাজ প্রকৃতি এবং জাদুবিশ্বাসকেই রূপায়িত করতে চান শিল্পের মোটিফে। গোষ্ঠীবিশ্বাসের এই রূপায়ন লোকশিল্পের ক্ষেত্রে যতটা ঘটে, শীলিত শিল্পের ক্ষেত্রে ততোটা ঘটে না। লোকশিল্পের সঙ্গে তথাকথিত ধ্রুপদি শিল্পের এখানেই প্রধান পার্থক্য। দ্বিতীয়ত, লোকশিল্পের উদ্ভব 'প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয়তাবোধ' থেকে, তারপর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা'। কাজেই লোকসমাজের 'সুন্দর'কে বুঝতে হবে লোকজীবন এবং তার মনস্তত্ত্বের নিরিখে।

এ সব কথা যে কত সত্য তার পরিচয় মেলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত শঙ্খ ও শাঁখার বিভিন্ন মোটিফ লক্ষ্য করলে। শঙ্খের একটি পরিচিত মোটিফ হল পদ্ম। বৌদ্ধধর্মে পদ্ম সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। আবার এও জানি, "বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে শাঁখের নৈকট্যবন্ধনের কথা। বর্তমান কালেও নেপাল তিব্বত, চীন বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোনো কোনো বৌদ্ধ-সংস্কৃতিসম্পন্ন অঞ্চলে শাঁখের ধর্মীয় আবেদন খুব গুরুত্বপূর্ণ।"[৭] এরই প্রভাব পড়েছে আমাদের শিল্পীসমাজে। নদিয়ার শঙ্খনগরের তৈরি একটি শাঁখের গায়ে দেখেছি বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তি এবং সেই সঙ্গে পদ্ম। বাঁকুড়ার হাটগ্রামের তৈরি বিভিন্ন শঙ্খশিল্পের নিদর্শনে চোখে পড়েছে মুকুটসহ রাধাকৃষ্ণের রিলিফকর্মের পাশাপাশি পদ্মের জ্যামিতিক নকশা।

'পদ্ম' ছাড়াও আর একটি পরিচিত মোটিফ হল 'অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু'। বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর সর্বত্র মোটিফটি আমার চোখে পড়েছে। এ জাতীয় কারুকাজ আমাদের সহজেই মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা ভারতীয় রিলিফকর্মগুলিকে। 'লক্ষ্মীনারায়ণ', 'মর্ত্যে' ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন', 'রাধাকৃষ্ণ', 'শিবের দক্ষযজ্ঞ নাশ', 'বিষ্ণুর দশাবতার', 'গোপিনীদের বস্ত্রহরণ' ইত্যাদি নানান পৌরাণিক মোটিফগুলি তার নিদর্শন। একইভাবে স্মরণীয় শাঁখার গায়ে অঙ্কিত শিল্পের নান্দনিক সুষমার কথাও। শাঁখের গাত্রপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ লিপির সৌন্দর্যই বা ভুলি কেমন করে ? "শঙ্খলিপি" সম্পর্কিত একটি সংখিপ্ত আলোচনা আমরা বর্তমান গ্রন্থের পৃথক অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করেছি। স্মরণে রাখতে হবে, "নান্দনিক বিধানটা"ই লোকশিল্পের একমাত্র কাজ নয়। তার আরও নানা কাজ থাকে। তবু "সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা"ও যে তার মধ্যে একটি তা নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়, যদিও ওই সুন্দরের ধারণা যে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পৃথক হয়ে যায় সেটাই বলার কথা।

সূত্রপঞ্জি:

১. পবিত্র সরকার, লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৪।
২. ঐ, পৃষ্ঠা ৫।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৫।
৪. সৌমেন সেন, লোকসংস্কৃতি: প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন, অঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৬২।
৫. পৃষ্ঠা ১৫।
৬. সৌগত চট্টোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১০০।
৭. ঐ, পৃষ্ঠা -১০২।

The Role of Information and Communication Technology for Empowering Women in India

Monika Sardar
Research Scholar, Department of Education
West Bengal State University
&
Dilip Kumar Mondal
Associate Professor, Department of Education
Mrinalini Datta Mahavidyapith

ABSTRACT: Information and Communication Technology (ICT) pervades the everyday lives of all types of people. Computers, mobile phones, the internet, and other entertainment devices are engaging day-to-day activities of our lives. ICT has an important role in our day-by-day lives. It makes our lives easier. ICT initiatives are having a real impact in the lives of women. New possibilities for information distribution and knowledge achievement for both men and women have been made possible by the development of ICT. This abstract examines the multifaceted role of ICT in enhancing women's status and opportunities across various domains, including education, employment, healthcare, and social participation. The ICT revolution has brought forth new prospects for social and economic advancement but has also presented difficulties and problems. ICT provides unique opportunities for people's advancement. Through ICT, people are provided unique opportunities for advancement. Simultaneously, at the same time, ICT was broadening the disparities between and within rural-urban, rich-poor, and gender. If women are to participate in political representation, trade and commerce, entrepreneurship development, family and social change, institutional development, decision-making, and productive efforts, their abilities must be improved. There is a necessity to increase the likelihood of women owning, operating, and managing enterprises in all sectors, with a particular emphasis on service-based IT firms. ICT must address all of these issues impacting all women and be used to support the establishment of a society in which women have more influence.

KEYWORDS: nformation & Communication Technology, Women empowerment, Obstacle, Gender equality, NEP-2020.

INTRODUCTION:

Nature of our society male is dominated from the beginning. So the work of women has never been recognized and appreciated (Rathi & Niyogi, 2015). Two-thirds of all working hours worldwide are spent by women, who are typically viewed as low-status and unpaid workers because of their job cultivating food, cooking, raising children, tending to the elderly, maintaining a home, hauling water, and other tasks (Suresh, 2011). India is a nation full of enormous contradictions. Even though it leads the world in the knowledge economy, more than half of the world's impoverished and uneducated population, the majority of whom are women, lives there (Sinha and Sahay, 2019). Between 2001 and 2011, there was a minor improvement in the sex ratio from 933 to 940. According to the 2014 Census, there is still a significant gender disparity in literacy rates between males (82.14%) and females (65.4%), with a difference of 17.10. It is crucial to remember that without equal chances for women, who make up about half of the population, no society can develop to a satisfactory degree (Chandrasekhar, 2003). SDG5 strives for gender equality and empowerment of all women and girls. It is predicated on ending all forms of alteration athwart women and girls and elimination of all forms of oppression against women and girls with harmful practices such as child, promptly and forced marriages. ICT technology has emerged as a powerful force in changing social, economical and political life worldwide. While the use of information and communication technologies (ICTs) remains concentrated largely in the developed world (Sinha and Sahay, 2019).

In recent years, Information and Communication Technology (ICT) has emerged as a transformative force across various sectors, fundamentally altering how societies operate and individuals interact. In India, a nation characterized by its diverse cultural and socio-economic landscape, ICT has proven to be a pivotal tool in bridging gaps and opening new opportunities. One of the most significant areas where ICT has made a notable impact is in the empowerment of women. Historically, women in India have faced numerous challenges, including limited access to education, economic opportunities, and social participation. These barriers have often impeded their ability to contribute fully to the socio-economic development of the country (Rathi, 2015). However, the advent of ICT has introduced innovative solutions that address these challenges head-on. Through digital platforms, mobile technology, and online resources, women are increasingly gaining access to vital information, educational resources, and economic opportunities that were previously out of reach. The integration of ICT into various facets of life such as education, healthcare, and entrepreneurship has created pathways for women to improve their livelihoods and assert their rights.

For instance, digital literacy programs are equipping women with the skills needed to navigate and leverage technology for personal and professional growth. By analyzing case studies and current initiatives, we aim to understand the profound role of ICT on women's lives and the ongoing efforts to address the challenges that remain.

The National Policy for Women, Acts, Panchayati Raj, Five Year Plans, and other plan and policy documents sustained and supported women's empowerment by the Indian gover nment (Dasgupta and Gupta, 2008). As we delve into this exploration, it becomes evident that while ICT holds immense promise for empowering women, its success is contingent upon addressing issues of digital inequality and ensuring inclusive access. The journey towards a more equitable society is intertwined with the continued advancement and thoughtful implementation of ICT strategies.

OBJECTIVES OF THE STUDY

- To find out the role of women empowerment through Information and Communication Technology.
- To understand the obstacle of ICT for women's empowerment.
-

METHODOLOGY OF THE STUDY

The data used in this study is primary and secondary and is collected from a variety of sources, including journals, articles, books, reports, and through different website.

SIGNIFICANCE OF THE STUDY

In the annals of human evolution, women have played a crucial role on par with males. In reality, the position of women in society, the jobs they hold, and the labor they produce serve as barometers of the country's overall development. A country's socioeconomic and political progress will be severely hampered in the absence of women's participation in its economic operations. Despite making up over half of the global workforce and almost two-thirds of all work hours, women only make up one-third of all incomes and possess less than 10% of all resources. Especially in developing countries like India, women experience many forms of deprivation in the areas of politics, culture, economics, social work, and family life due to their poorly defined rights (Manoj et... al, 2023).

INTERPRETATION OF THE STUDY

ICT AND GENDER EQUALITY

Information and communication technology is seen as a tool for advancing women's empowerment and gender equality. CT provides awareness and technical education opportunities for all genders. ICT allows women to

collaborate with men on projects side by side. Technology has been shown to help close the gender gap.Therefore, understanding how one sector relates to another will aid in scheduling makers' comprehension. The reasons behind some initiatives' failure despite their expanding political, economic, and physical reach. And ICT helps, even though women in rural Bangladesh are not greatly impacted by it.to impart the knowledge necessary to ultimately alter their perspective and foster their confidence and sense of self-worth (Hussain, 2021).

WOMEN AND ICT

The world is becoming increasingly connected with the regional growth of internet use in India, in the least developed countries of the region. High-speed broadband and ICTs allow for great exchange of knowledge and transactions. These digital advances have also allowed for more engaged interaction between governments and their citizens. But globally, 200 million fewer women than men have access to the internet in this digital age when access to information and services is available at the click of a button. India -pacific Women from developing countries and rural areas are being left behind. This opportunity to use ICTs to provide vital information and public services for women is being missed, but governments can use these opportunities to create an enabling environment for women to empower themselves together with all stakeholders. The government can provide services including new skills and information, online government transactions for remote and rural populations, and reproductive health information. These initiatives are having a real impact in the lives of women and girls by automating the social benefit scheme. The Akahaya Common Citizen Services Initiative is one example of how the involvement of women in e-government service delivery is a key part of their empowerment. Over 60 percent of the Akshaya centers are run by women first. The Sri Shakti Portal run by the Kudambashri program has helped women engage with governments. When a woman was attacked by her neighbor, Satyama's case gained attention from a minister after photos of her injuries were posted on the portal. As a result, Satyama was able to bring her case to justice with the aid of the minister. In the Philippines, e-government has had an impact on women's lives through telecentres. Where women can access basic government services online. By helping ICTs women gain access to the possibilities created by the internet, mobile phones, and emerging digital technologies by mainstreaming gender into the design and implementation of government ICTs policies and e-government initiatives by ensuring the successful engagement of women. in e-government, and women can find win-win solutions that enhance the impact of empowering women in order to achieve equality for the future.

ROLE OF ICT IN WOMEN EMPOWERMENT

1. Information and education accessibility : Online learning is made possible for women by ICT, which gives them access to educational materials and virtual classes that would not otherwise be available. Information Dissemination Women can access to information on employment prospects, legal rights, and health, which can be vital for their personal and professional growth.

2. Financial Possibilities Entrepreneurship: The use of ICT, women can launch and run online enterprises that cater to international markets at a low initial cost.

Work from Home: Women can work from home with the availability of digital platforms, which gives them freedom and opportunities that they would not have in traditional work environments.

3. Community and Social Involvement : Networking: Women can connect to other, exchange stories, and advocate for gender equality through social media and online forums.

4. **Wellness and Health :** Telemedicine provides women with remote access to healthcare services, making it especially useful in rural areas. Access to vital health information, such as resources for mental health and reproductive health, is made possible by ICT.

5. Civic and Political Engagement : E-Government: Information and communication technology (ICT) can improve women's access to government information and services, enabling them to take part more actively in civic and political life.

Activism: Through digital channels, women can participate in activism and lobbying, impacting legislative modifications and increasing consciousness regarding gender-related matters.

6. Security and Safety Support Networks : Women who are experiencing domestic abuse or other safety concerns can get help from online support groups and services.ICT tools can be awareness about women's legal protections and safe practices.

7. Development of Skills : A woman's ability to use digital tools and platforms enhances women’s total digital literacy, which increases them competitive in the job market.

Technical Skills: Access to training in technical domains helps bridge the gender gap in the technology sector and opens up new career opportunities.

SCHEME FOR DIGITAL EMPOWERMENT OF WOMEN

- ❖ The government has implemented a number of policy changes to guarantee women's and girls' political, social, economic, and educational advancement. In order to enable women and girls to operate digital devices

(such as computers and smartphones) and use them for a variety of purposes, including commercial, educational, and digital transactional purposes, the government has also implemented a number of efforts to improve digital literacy among its citizenry. Under the Digital India agenda, one such initiative is the Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA). By reaching 6 crore rural homes, it seeks to close the digital divide, focusing in particular on the underprivileged women and girls in rural areas. As of 08.12.2022, more than 53% of women had benefited from PMGDISHA.

❖ The Ministry of Education's Department of Higher Education is also in charge of the National Mission on Education through Information and Communication Technology (NMEICT) Scheme, SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds), SWAYAM PRABHA, the National Digital Library (NDL), Virtual Lab, e-Yantra, NEAT (National Education Alliance for Technology), and other programs that guarantee students throughout the nation receive high-quality e-learning.

❖ The nation's programs and plans have been designed with the purpose of empowering women, thanks to the efforts of the Ministry of Women and Child Development. For implementation during the 15th Finance Commission term, the Ministry has developed "Mission Shakti," an Integrated Women Empowerment Programme, as an umbrella scheme for the safety, security, and empowerment of women. Through institutional and convergence mechanisms, it seeks to strengthen mission-driven initiatives for women's safety, security, and empowerment in order to increase efficiency, effectiveness, and financial prudence.

❖ There are two sub-schemes under the Mission Shakti umbrella scheme: "Sambal" for women's safety and security and "Samarthya" for women's empowerment. The 'Samarthya' sub-scheme now includes a new component called the Hub for Empowerment of Women (HEW). Its goal is to enable the divide convergence of programs and schemes intended for women at the central, state/UT, and district levels in order to create an environment that allows women to reach their full potential. In order to support women's empowerment and development, the HEW offers guidance, connections, and hand holding to a variety of institutional and structural frameworks, such as access to quality healthcare, education, career and vocational counseling and training, financial inclusion, entrepreneurship, backward and forward linkages, worker health and safety, and social services.

NATIONAL EDUCATION POLICY 2020

- Women's education has received significantly more attention under National Education Policy 2020. A number of actions have been suggested to further advance women's education. Creating non-formal education initiatives to help out-of-school girls transition into the mainstream of schooling is one of them. utilizing distance learning programs or open schools to educate rural women who live in remote areas. Designating of additional female educators to support these initiatives to increase women's access to education have also been proposed in the 2020 NEP.
- The NEP 2020 also suggests broadening the focus of vocational education, which may offer offering work to women and enabling them to achieve financial independence. Without empowering the economy, clarification request. Women are allocated a subordinate position in society mostly because of their economic dependency, which renders women's empowerment useless. This has consequently resulted in the spread of several the societal ills that plague our society, such as dowry demands and deaths, domestic abuse, and undernourishment ladies, the foeticide of women, etc.
- The goal of the NEP 2020 is to instill a new feeling of responsibility in women by having them participate and be involved at all levels of education regional, state, and federal. It also promotes giving every woman access to a top-notch education so she can succeed and have resilience. in the workplace.

SUPPORTING FIRMS OF GOVERNMENT IN INDIA

Government agencies nongovernmental organizations, schools, radio stations, businesses, etc. are among the many organizations working in this direction. government agencies, non-governmental organizations, schools, radio stations, businesses, etc. are among the many organizations working in this direction.

NGO'S Smile (Savitri Marketing Institution for Ladies Empowerment) collaborates with IT firms to arrange IT seminars. The SWIFT JYOTI program, designed to educate women in IT, has been introduced by NIIT. The initiative is intended to teach women computer literacy. between six and sixty years. On the one hand, it offers practical literacy and advantages women in finding and obtaining knowledge that is helpful to them in their day-to-day lives. How long has SWIFT been running? The JYOTI program lasts for eighteen hours SEWA (Self Employed Women"s Association) has started an IT project to boost rural microbusinesses' effectiveness. Ujjas Innovation: The goal is to empower women by enabling them to publish their own newsletter. known as "Ujjas." The newsletter was broadcast on Gujarat's All India Radio Bhuj Station. The

newsletter offers a forum for opinions against dowries, female infanticide, and other pertinent problems (Anjum and Tiwari, 2012).

INDUSTRIES Companies like IBM, HCL, Google, Microsoft, TCS, and others are offering a range of benefits to entice female workers, including flexible work schedules, maternity vacations, and child care leave. working hours, a location for working from home, and a pick-up and drop service and so forth. As per a report on economictimes.india.com, this plan is operating as intended, Infosys has the biggest proportion of women (33.4%), TCS (30%), and Wipro holds a 29% position (Rathi and Niyogi, 2015).

OBSTACLE TO USE AND ACCESS OF ICT FOR WOMEN

Cultural norms and gender stereotypes : Women's roles and prospects are frequently limited by ingrained cultural beliefs and stereotypes. Traditional ideas view on gender roles can limit women's access to leadership roles, higher education, and jobs in many nations.

Economic Disparities : When compared to men, women are frequently economic disadvantages. This entails reduced pay, fewer work prospects, and restricted access to money and financial resources. Women's capacity for independent decision-making may be hampered by economic dependence.

Educational Barriers : Because of lack of infrastructure, poverty, or societal expectations, girls may face barriers to education in some areas. Women's in future chances may be restricted by this educational disparity, which can also feed cycles of inequality.

Violence and Harassment : A major obstacle to women's empowerment continues to be violence against them, including sexual harassment, domestic abuse, and human trafficking. Women's entire well-being, financial security, and physical and mental health can all be negatively impacted by this kind of abuse.

Health Disparities : There are often gaps in the quality and accessibility of healthcare for women. Women's ability to fully engage in society can be impacted by issues including access to general healthcare, maternity health, and reproductive health services.

Intersectionality : Due to intersecting variables such as race, social class, disability, and sexual orientation, women face discrimination on numerous levels. The difficulties that women encounter can be exacerbated by these overlapping identities, which calls for specialized solutions.

Absence of Support Systems : In many cases, women may find it challenging to fully engage in the workforce and public life in various situations due to a lack of support systems, such as accessible daycare, maternity leave, and work-life balance regulations.

Opposition to Change : Institutional and social resistance to change, can be a major obstacle. Women's empowerment initiatives may encounter resistance from people or organizations that are opposed to changing established conventions or power structures.

CONCLUSION:

In conclusion, women all over India have shown that information and communication technology, or ICT, can truly change things. Technology (ICT) has been instrumental in closing gender disparities that have long existed in a number of domains of society by improving access to information, education, and occupational opportunities. The impact of information and communication technology (ICT) is wide-ranging and significant, ranging from helping women become financially independent through digital business to enhancing access to health and education services in rural areas. In addition, women are now more equipped to express their concerns and take part in public discourse because of the widespread use of mobile technology and internet connectivity, which has promoted increased social participation and engagement. Women-focused tech hubs and digital literacy initiatives, for example, have improved their capacity to use technology for women's empowerment.

References:

1. Anujum, B. and Tiwari, R. (2012). Role of information technology in women empowerment. International journal of multidisciplinary management studies, 2(1),pp-226-233. http://zenithresearch.org.in/
2. Chandrasekhar, C.P (2003). Promoting ICT for Human Development in Asia: Realizing the Millennium Development Goals, India Country Paper', for Regional Bureau for Asia and the Pacific, UNDP.
3. Dutta P.K and Mukherjee, S (2010). Empowerment of Women Through Technical Education in India, Indian Journal of Technical Education, 33(1), pp 63-76.
4. Dubey, A.K. (2024). NEP 2020: women empowerment. Bharati International Journal of multidisciplinary research and development,2(1), pp-72-76. https://doids.ogg/doilink/04.2024-62438928/BIJMRD/vol
5. Hussain, S (2021). The role of ICT in women empowerment: Cross Country analysis. Journal of policy research, 7(3), pp-55-75.
6. Gupta, B Dasgupta, S and Gupta, A (2000). Adoption of ICT in a government organization in a developing country: An empirical study, 17, pp. 140–154.
7. Manoj, et… al (2023). ICT and women empowerment in digital India: a global perspective. Academy of marketing studies, 27(2),pp-1-10.
8. Mir, M.T. et…al (2022). Role of information and communication Technology in Women Empowerment. Research in India: present and future, pp. 110- 128.

9. Mokta, M (2018). Empowerment Of Women in India: A Critical Analysis, The Tribune.
10. Padmini, C. et… al (2013). Empowering rural women through mobile technology, International Journal of Computer Science and Technology, 4(4) pp. 275- 276.
11. Rathi, S, and Niyogi S. (2015). Role of ICT in Women Empowerment. Advances in economics and business Management, 2(5),pp 519-521.
12. Sharma, D. et… al (2018). Role of ICT in education for women empowerment. International journal of management, technology and engineering, 8(10), pp-1568-1575.
13. Sinha, B and Sahay, S.S. (2019). ICT-a tool for women empowerment. Conference women empowerment re-visioning identities and building strategies for a participatory society.
14. Suresh, L.B. (2011). Impact of Information and Communication Technologies on Women Empowerment in India, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 9 (4), pp-17-23. retrieved from
15. Scheme of digital India, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1845382
16. NEP-2020 Government of India, https://cplindia.org/national-education-policy-2020-a-bump-in-the-road-for-female-education
17. Singh, V (2010). Information and Communication Technology for Women Empowerment, Proceedings of National Seminar on Role of Women in Information Technology: Today and Tomorrow, pp. 26- 33.
18. Rakesh, R. (2010). Role of Information Technology in Women Empowerment, Global Journal of Finance and Management, 2(1), pp 66- 78.
19. Patil, A (2021). Role of in women empowerment. Vivek research journal special, pp. 196- 204.

Concept of 'Wage Theft' in India : Analyses of Internal Labour Migrations and Legal-Institutional Frameworks

Navas M. Khadar
Research Scholar, School of International Relations and Politics
Mahatma Gandhi University, Kerala, India
&
Mirnisar Ali
Research Scholar, Dept. of Political Science
University of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala, India

Abstract: Wage theft, described as the deprivation of legitimate earnings from workers, persists as a systematic issue within India's internal labour migration framework. Not with standing the presence of many protective legislative frameworks and constitutional assurances, internal migrant workers, especially in informal sectors, persistently encounter extensive wage fraud, underpayment, and exploitative labour practices. The COVID-19 epidemic highlighted the vulnerability of labour protections, particularly in garment manufacturing and construction industries. This paper questions the ineffectiveness of current legal and institutional systems using case studies from Kerala and empirical research on the ongoing problem of wage theft. It draws attention to the shortcomings of enforcement authorities, police reluctance to participate, and inadequate application of labour grievance systems. The paper calls for a quick overhaul of government systems to ensure responsibility and protect migrant workers, including digital wage tracking, legal awareness campaigns, and improved inter-state cooperation structures.
Keywords: Wage theft, internal migration, migrant workers, labour law, Kerala, legal frameworks.

1. Introduction:

An enormous worldwide problem that affects millions of people is wage theft, which occurs when companies or employers do not pay workers what they are legally entitled to. Workers lose billions of dollars a year, and many families fall into poverty because of this practice, which includes underpayment, unpaid overtime, and withholding promised payments. Wage theft reduces workers' negotiating power in impacted industries and has other adverse effects beyond direct exploitation. Families living on low incomes are more likely to rely on

government aid when they lose income, which puts a burden on social safety nets and undermines initiatives to reduce poverty. The practice has devastating personal effects as well as far-reaching societal and economic ramifications.

The COVID-19 outbreak popularised "wage theft" in India. Primary research (MFA 2021) by Migrant Forum in Asia, ASEAN–Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT), and DFAT examined wage theft and forced work. The study interviewed 451 migrant workers and 140 stakeholders in Thailand, Malaysia, Cambodia, the Philippines, and Indonesia. Wage theft and forced labour affected 31% and 46% of respondents. After the epidemic, many international migrants forcefully went to their native places; more than 150 international migrants reported they were visiting wage theft from GCC countries (CMPIG 2021).

During the COVID-19 pandemic, garment manufacturing workers in India were vulnerable to wage fraud. Factory owners producing for large global brands in Karnataka refused to comply with a minimum wage hike in April 2020, robbing roughly 400,000 workers of their rights. Worker Rights Consortium (WRC) data shows mass pay theft caused food hardship, housing loss, and educational interruption. Shahi Exports paid wages after GATWU legal action and worldwide advocacy (Worker Rights Consortium, 2025). The case underscores the need for improved labour safeguards and corporate responsibility.

This paper rigorously investigates the phenomenon of wage theft among internal migrants in Kerala, India, by analysing two case studies. The research examines the occurrence of wage theft in the context of internal migration and assesses the reactions of governmental bodies and legal institutions. The results indicate a persistent deficiency in safeguarding migrant workers against wage fraud. The systemic weakness in protecting the rights of internal migrant labourers is shown by the persistence of criminal activity by contractors and employers, even after legitimate channels have been engaged.

2. Legal and Institutional Framework

As every individual deserves security and dignity, migrant labourers, who have decided to relocate to sustain their families, face numerous challenges, among which wage theft, working conditions, working hours, social and economic inequality etc. remain the unjust phenomenon. To tackle the situation and protect labour rights, the Indian constitution mandates some articles, and Indian legislation gives some laws for protecting and safeguarding the poor, weaker, oppressed, marginalised and migrant labourers. In addition, under the Indian federal structure, powers have been divided into the centre (union list), the state (state list) and both together (concurrent list) in the seventh schedule of the constitution. Therefore, these labour laws as a part of a concurrent list have the

power to be enacted and enforced by both governments. The concurrent list has four types of labour legislations:

1. Labour laws enacted and enforced by the central government.
2. Labour laws enacted by the central government and enforced by the central and the state governments.
3. Labour laws enacted by the central government and enforced by the state government, and
4. Labour laws enacted and enforced by the various Indian state governments based on the requirements of the respective states.

Fundamental rights: The Indian Constitution protects fundamental rights for all citizens from government overreach. The Supreme Court can overturn any law that violates these rights. Writ petitions under Article 32 (Supreme Court) and Article 226 (High Courts) can safeguard citizens, as shown in Meneka Gandhi v. Union of India.

Articles 14–18 (Right to Equality) ban economic, social, and political discrimination and guarantee legal equality. Poor and marginalised workers need this because they lack negotiating power. Articles 19–22 (Right to Freedom) guarantee free expression, assembly, association, life, and personal liberty. These rights allow migrant workers to protest pay fraud and join unions for collective bargaining. Following the landmark M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu case, Articles 23 and 24 (Right Against Exploitation) ban forced and bonded work, human trafficking, and child exploitation under 14. Part IV of the Constitution, the Directive Principles of State Policy (DPSP), assists the state in fostering social justice but is not legally binding. Articles 38, 39, 41, and 43 call for equal pay for equal effort, the right to work, and worker engagement in industrial management to construct a welfare state. These regulations protect migrant and vulnerable workers' dignity and rights.

Labour codes: The Ministry of Labour and Employment implemented four principal labour codes: the Code on Wages (2019), the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code (2020), the Social Security Code (2020), and the Industrial Relations Code. These rules ensure equitable pay, timely payments, bonuses, and corporate responsibilities to simplify and defend employee rights. They also cover workplace safety, health, working hours, yearly leave, and social security benefits like insurance, pensions, provident funds, gratuity, and maternity leave. The government's publication, the New Labour Code for New India, protects interstate migrant workers' salaries, safety, and working and living conditions.

The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, was legislated by the Indian Parliament to protect the rights of interstate migrant labourers. It seeks to guarantee equitable working

conditions, adequate remuneration, and the avoidance of exploitation through the requirement of company permits and employee registration. Despite its progressive aims, the Act's implementation has been complex, especially for rural migrants with low education and skills who lack the resources to advocate for themselves. This vulnerability is exploited by many contractors, who often ignore or even fire disobedient workers. Despite possessing more than 140 labour laws, India experiences ineffective enforcement attributed to administrative constraints, corruption, insufficient cooperation between national and state governments, inadequate data gathering, and limited sections. The NSSO and Economic Survey 2018–19 indicate that a substantial segment of Indian labour is excluded from the safeguards of minimum wage legislation. Recent reforms, including the Codes on Wages Act (2019), the Occupational Safety, Health and Working Conditions Act (2020), and the Code on Social Security (2020), seek to enhance worker protection. The rights of migrant workers are protected by these regulations, which establish minimum wages and outlaw involuntary servitude (as confirmed by the Supreme Court in Sanjit Roy v. State of Rajasthan (1983).

3. Case Studies *and Policy Responses:*

The Centre for Migration Policy and Inclusive Governance (CMPIG) has addressed multiple instances of pay theft affecting internal migrant workers in recent years. The researchers have recorded and examined two such cases, outlined below.

Case I: The complaint pertains to a migrant labourer from Malda district in West Bengal who has been employed in Kerala for the last 15 years. He possesses experience as both a construction worker and a contractor. After the COVID-19 epidemic, he became affiliated with a new construction firm overseen by a Tamil employer. Notwithstanding a definitive wage arrangement, the employer neglected to remit the complete sum. The employer assured the disbursement of the outstanding salary in monthly instalments; nevertheless, the payments were never executed. The migrant worker was tasked with disbursing wages to 20 subordinate labourers.

He contacted the employer during the Eid holidays to enquire about the outstanding payments, but the employer declined to respond to his calls. As a result, he complained to the Ettumanoor police station in Kottayam district. The police advised him that facilitating monetary transfers between individuals was outside their jurisdiction and recommended that he pursue a civil lawsuit. After he filed the complaint, the police informally counselled him to retract it, suggesting that persisting with the complaint could endanger his employment prospects in Kerala. The worker retracted his complaint due to fear.

Subsequently, researchers from the Centre for Migration Policy and Inclusive Governance (CMPIG) intervened, negotiated with the worker, and

lodged a formal complaint with the District Labour Officer in 2025 concerning the outstanding wage payment of Rs. 80,000. The matter is still under assessment.

Case II: A 25-year-old migrant labourer from Assam relocated to Kerala in 2022 and secured employment in multiple hotels and restaurants. In 2024, he commenced employment as a porotta maker at a bakery in Athirampuzha, Kottayam district, with a stipulated daily remuneration of Rs. 800. Nonetheless, he did not obtain the remuneration by the contract. Notwithstanding numerous appeals to the employer for remuneration, the earnings remained unsettled.

By coincidence, one of his acquaintances disclosed the matter to a researcher associated with the Centre for Migration Policy and Inclusive Governance (CMPIG). The researcher subsequently invited both employees to visit the CMPIG headquarters. During the visit, a formal complaint was lodged with the Kottayam District Labour Office.

A preliminary investigation was commenced by the Assistant Labour Officer at Ettumanoor, Kottayam, within seven days. A conciliatory meeting was scheduled between the employer and the employee. After the hearing, the employer consented to remit the outstanding sum of Rs.14,700 within 15 days. The migrant worker obtained the complete remuneration on 30 December 2024.

4. Conclusion:

India's pay theft rate, especially among migrant workers, shows institutional and legal flaws. Strong constitutional guarantees, many labour laws, and recently enacted labour standards have not abolished domestic migrant worker mistreatment. Underpayment, proper denial, and forced labour are pervasive problems that show legal frameworks are not enough when put into practice. The situation is made worse by systemic issues, such as a lack of employee education, ineffective grassroots initiatives, and lax accountability by employers. Moreover, interstate coordination is still disjointed, and the Inter-State Migrant Workmen Act of 1979 has not adapted to current labour dynamics.

The construction, manufacturing, and textile workers' vulnerability to pay theft was highlighted by the COVID-19 outbreak, which worsened the issue. There is a massive gap between regulation and enforcement, as shown by contractors' and industrial owners' failure to ensure minimum wages amid humanitarian situations. The Centre for Migration Policy and Inclusive Governance (CMPIG) case studies demonstrate how bureaucratic obstacles, inadequate grievance redressal systems, and insufficient oversight facilitate the normalisation of wage theft.

Path Forward: India needs a labour governance system that is more open, decentralised, and responsive if it wants to combat wage fraud. It is critical to digitise salary payment paperwork, improve labour inspections, and mandate employer registration of migrant workers. Interstate memoranda of

understanding for the coordination and portability of social security benefits are also crucial. Promoting legal knowledge and community-based oversight via trade unions and NGOs is essential. The Inter-State Migrant Workmen Act requires reassessment and alignment with current labour conditions. A rights-based strategy, supported by government commitment and community involvement, is the one viable method for achieving wage justice for India's migrant labour population.

References:

Centre for Migration Policy and Inclusive Governance. (2021). *Online conversation*. Mahatma Gandhi University

Chief Labour Commissioner (Central). (n.d.). *The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979*. Ministry of Labour & Employment, Government of India. https://clc.gov.in/clc/acts-rules/inter-state-migrant-workmen

Department of Economic Affairs. (2019). *Economic survey 2018–19*. Ministry of Finance, Government of India.

Dubey, A. (2020). A critical analysis of the Code on Wages, 2019. *International Journal of Law Management & Humanities*, *3*(5), 1670–1677. https://doi.org/10.10000/IJLMH.112191 *(Note: insert correct DOI if available)*

Jayaram, N. (2019). Protection of workers' wages in India: An analysis of the Labour Code on Wages, 2019. *Economic and Political Weekly*, *54*(47), 1–12.

Labour laws in India. (n.d.). *National Centre for Industrial and Business Laws*. https://ncib.in/pdf/ncib_pdf/Labour%20Act.pdf

M. C. Mehta v. State of Tamil Nadu, AIR 1997 SC 699.

Meneka Gandhi v. Union of India, AIR 1978 SC 597.

Migrant Forum in Asia. (2021). *Wage theft and forced labour among migrant workers in Southeast Asia: Impacts of COVID-19 and policy responses*. ASEAN–Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) and Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

Ministry of Labour & Employment. (n.d.). *Labour codes*. Government of India. https://labour.gov.in/labour-codes

Mishra, P., & Pandey, P. K. (2011). Protection of inter-state migrant workers in India: An analysis. *The Legal Analysis*, *3*(1), 34–43.

Sanjit Roy v. State of Rajasthan, AIR 1983 SC 328.

Sapkal, R. (2015). Labour law, enforcement and the rise of temporary contract workers: Empirical evidence from India's organised manufacturing sector.

European Journal of Law and Economics, *40*(1), 157–182. https://doi.org/10.1007/s10657-015-9489-3

Worker Rights Consortium. (2025). Exposure of region-wide wage theft nets tens of millions in back pay. Worker Rights Consortium. https://www.workersrights.org/our-work/wage-theft-inkarnataka/#:~:text=In%20April%202020%2C%20a%20 minimum,both%20current%20and%20former%20workers.

Baul Community and Various Folk Music of Rarh Region

Hriday Das
Independent Researcher

Abstract: We see the Baul community in the Rerh region Bankura Birbhum Paschim Burdwan in Medinipur region of West Bengal state. This community is called Rarh Baul community. Rarh Bauls are recognized as the best in music composition in the Baul world. This song has the influence of Margio Sangeet, Kirtan and Jhumur of Bishnupur Ghara.[1] They use various tapasi tulsi root diamonds around the neck.

Khanjani sings Baul with Nupur and Gopi instruments and dances.These dances have been developed by mixing different types of khema with finger on the ground, jhumur, fence dance, tribal dance with the right foot first. They are very innocent, calm, connected, always secretive, apathetic and moody. Their prized creation is their song called Baul song. They are very poor and endure various social oppression and practice their religion silently. There is wisdom in their songs-you have to understand from the right guru. The melody and language of Baul songs is a historical asset in Bengali religion and Sanskrit. Baul musicians and singers create their own songs and create variety. Baul singers change their songs by realizing their own mood and the tone of their community's songs. The daily body postures of the Bauls' songs are important in the stage of the stage. All in all, this song is not only a song but also a scene.

Key words: Community, Various, Region, Musicians, Religion, Historical, Baul song.

Introduction: There is considerable disagreement among various scholars, researchers, writers, saints and different communities about the origin of the word Baul. Various scholars say that the word baul has been used in the sense of random chaos, crazy and crazy[2]. Baul is derived from the root of the word batul i.e. udmat ki bhabo mad meaning later a special constant passion ignorant religion apathetic mad khapa self-karma-buried saints emerged called baul[3]. Some say the cultural Batul is the natural form of the word Baul It means that those who are different from others living in the society who are proud in their own way are Baul[4]. Baul community is doing Dharmanirvana in this community guru tradition they have no books and no written history. Their ritual dharma songs have survived for a long time in the Guru Shishya tradition, they are

practicing their religion very secretly. The Guru is in the main seat of the Bauls and this cow is the one who performs Sadhana Bhajan. The only way to understand the Bauls, to know their religion, is to study and understand their songs. Analyzing Baul music reveals the theory of form which is the key to Baul practice.

If you want to know who the Bauls of Rarh region are, they do not have any specific books or scriptures, The only way to know this community is to practice their language with their songs. In this song, all these things are discussed, such as the method of realization of life, the variety of sadhana. Bauls dress in ocher dhoti punjabi, or white dhoti punjabi, halkhala made of different pieces of cloth, wooden garlands around the neck and colorful stone garlands and shoulder bags.With long hair on their heads, full beards, they play various instruments and perform songs like ektara, dugi, dotara, ghunur, and khamak. The main topics discussed in Baul Song are: Twenty-four tattvas, seven chakras, seven dhatus, panchavan, thousand dalpadyas, seven rasas, and four moon, short cycle, Triveni Ghat is also discussed.

The Rarh region has many different types of music and folk music. Which is spread in the rural villages in the rural areas in the townships. The region is inhabited by various tribal communities, although there are many differences between their language and culture, it is gradually becoming part of the common target culture.

The folk music of this region is- Mangal Song, Jhumur Song, Tusu Song, Bhadu Song, Patua Song, Jhapan Song, Alkap Song, Lotto Song, Gajan Song, Bolan Song, and tahal song.

Mangal Song: Mangal means auspicious due to appeasement of evil forces different regions adopt different means. Chandi Puja is predominant in this region, Basan Chandi Burdwan Burdwane,Kalai Chandi in Medinipur, Again, Mangal Chandi Puja is celebrated for 12 months in different parts of Hooghly district. According to mythology, Matha Chandi killed the demon. In Birbhum Bankura district, Mata Chandi is worshiped as Dashabhaja. Various deities are sung in the form of Bahuvidhi Panchali in this region. This song is called Mangal song.

Jhumur song: Jhumur songs are basically happy songs, this song was among the tribals. Jhumur songs are performed among the Mondas, Kols, Santals of the border region. Slowly influenced by the Bengali language, it took the form of Jhumur song in folk music. Daily life practice of rural village with the help of dhamsa madal flute musical instrument, this song is performed with the help of Nitya on topics such as ghar kanya girls ornament new youthful love and union of Radha Krishna.

Tusu song: Bankura in Purulia and Mednipur districts from the month of Bengali arrival Tusu is sung till Paush Sankranti. Tusu Festival or Tusu Song is the vow and song performed by the women around the harvesting of the new crop. Tusu songs are sung continuously by girls in groups without any musical instruments. The tone changes in different regions, Suta feels sweet because of the sweetness of the melody and rhythm.

Bhadu song: In Bankura Birbhum Purulia and Burdwan regions this Bhadu song is performed in Bengali Bhadra month. Vadu songs are performed from the beginning of Bhadra month to the end of Bhadra month. It is also called Vadu Utsav, Female-centered chatka darhi songs are sung by men and women in groups with the help of dhol and kasar instruments. An idol of a married woman is created and all the songs are composed around her and this idol is called Bhadu Devi.

Patua song: This song is mostly heard in Mednipur Purulia region, different Gods and Goddesses Leela with different vows are sung by drawing pictures of different characters in the form of stories and singing.This song is known as Patua song. He earns money by singing these songs in different villages and regions.Today, this Patua song is the prototype of the film.

Japanese song: Jhapan song is called Jhapan song which is sung to goddess Mansar to remove the acute venom of snakes during the month of Sarafan in Birbhum, Bankura, Burdwan, Bishnupur and Nadia districts.This song is an important song of Mansa Devi worship.

Alkap song: A special type of song in the form of rhymes with various jokes, cheek stories and current situations is called Alkap song. This song collectively changes both men and women. Birbhum, Malda, Nadia, Murshidabad and different regions this song is heard in various festivals.

Lotto song: Lotto songs are sung between two groups in a question-and-answer format. This song is performed with the help of dance found in Birbhum Burdwan Murshidabad region. The diversity of social life in Bengal can be seen in this song. This song is sung at the end of Bengali Aghran month.

Gajan song: Originally this song was sung for Shiva Puja. Bengali Chaitra month's Shiva gajan and Nile gajan, Dharmaraj's gajan are attracted in different regions. Wearing various decorations, Shiva's greatness and praises go from house to house in rural Bengal.

Bolan song: In Ramayana, Bala Kush, Krishna Nila, Radha Krishna, Savitri Satyavan, Behula Lakshinder, Meghnavad, Lakshmaner Saktishel, Nimai Sannyasi etc. are sung by three men in the guise of women accompanied by musical instruments such as Dhol, Harmonivasi, Behala Khol Kartar etc.

Influenced by the panchali of Shiva's gajon, this song is heard in rural villages in the Bengali Chaitra Boishakh month.

Karam Puja song: Karan Tagore is observed with devotion for obtaining new food grains by Vriksha Vandana among tribals in Jharkhand and Purulia regions. This hot puja is held from Shukla Ekadashi Tithi of Bhadra month to Purnima. Karam songs, Karam dances are performed by lighting lamps and Madal Nagra flute is played as a musical instrument.

Tahal song: In rural Bengal, in the early morning of the month of Kartik, chanting Harnam sankirtan in a special tune like kirtan on the streets is called prabhati or tahal song. The main purpose of this song is to awaken the consciousness of religion and God consciousness in people's minds. At the end of the month of Bengali Kartik, they earn their living by going from house to house.

References:

1. Chakraborty, Sudhir, Bangla Dehototto Gan, P.11

2. LKshitimohan Sen,The Baul and their count of man, Visva-Bharati Quarterly, 1929,P.411

3. Harendra Chandra Pal, Baul Tote Purvas, Sahitya Patrika, Dhaka Vishwavidyalaya, Bengali 1365, P.5

4. Jha suktinath, fokri lalon sai, deshon Kal abing shilp, P-143.

The Theory of Description as a Paradigm of Analytic Philosophy

Pranab Ghosh
Assistant Professor, Dept. of Philosophy
Jatindra Rajendra Mahavidyalaya

Abstract: According to Bertrand Russell, a description is a linguistic expression used to refer to an object. In his view, descriptions are of two types—indefinite descriptions and definite descriptions. An Indefinite description is a phrase of the form 'a so- and-so', for example, 'a man', 'a cow', 'a flower' etc. and a definite description is a phrase of the form 'the so-and-so' for example, 'the present king of India', 'the author of *Gitanjali'* etc.

In the early stages of Russell's philosophy, he believed that the meaning of an expression depended on the reference of the object that is in the subject place of the expression. Under this reasoning, he acknowledged definite descriptions, the unicorn, the golden mountain, the round square etc. refers to an object that does not exist in real world. However, in the later stages of his philosophical exploration, he abandoned his earlier viewpoint. In this context, he distinguished between a meaningful singular term and a proper name. He demonstrated that definite descriptions and proper names are not identical. Proper names have independent meanings—the meaning of a proper name depends on its referent. However, the meaning of a definite description does not depend on whether a referent exists. Therefore, to determine the meaning of a definite description, it is necessary to provide a definition in use. From a semantic perspective, the true objective of his theory of descriptions was to explain the meaningfulness of expressions containing definite descriptions, particularly those without referents.
Key words: Linguistic Expression, Indefinite Description, Definite Description, Referent, Being, Proper Name, Semantics.

Discussion:

B. Russell introduces the concept of description theory in his book 'On Denoting' (1905), in order to solve the problems pertaining to denoting phrases. A description in a linguistic expression that is used to ascribe a thing and if this ascribed thing can be described by another expression, then the main sentence is considered meaningful as per the discussed standard. In this context Leonard Linsky says, '… a sentence is significant if it is possible to formulate another sentence which is synonyms with the given sentence.'[1] That is, a sentence will be

considered meaningful only when it can describe the circumstances described by another synonymous sentence.

In the early stages of Russell's philosophy, he made the basic belief that 'one name - one thing'[2] which implies that a name's meaning should be associated with the object that it denotes. He started out thinking that many sorts of objects actually existed and constituted a part of an entire reality. These included points of space, instants of time, ultimate particles of physics, universals, and numbers '... sitting in a row in a Platonic heaven.'[3] According to him, a term is anything that can be stated, a term can be the logical subject of a proposition, and a proposition can have a logical subject that can be named. As a result, names could theoretically be used to refer to anything that existed at any time or place, as well as abstract entities of all kinds, non-existent objects like the present king of Indian, mythological entities like the Unicorn, and even logically impossible objects like the greatest prime number. Russell's theory of description later on took the extensive shape of theory of incomplete symbols in his book *Principia Mathematica vol-I.* In this book, Russell shows that the discussion of his theory of description is saturated with the discussion of denoting concepts. To him, denoting concepts like the, all, every, any etc. are made from the addition of a word with class concept and with the help of any of these concepts something is described. So, the role of a description in a sentence is to stand for a term that denotes an entity like, an inanimate thing, a relation, a property, an imaginary entity etc.

Being influenced by the Austrian philosopher Meinong, Russell, in his early period of philosophical life thought that the meaning of an expression depends on the reference of the object that is in the subject place of the expression. Then Russell's opinion was that a definite description, the unicorn, the golden mountain, the round square etc. refers to an object that does not exist in real world. In this regard Meinong opinion is, for anything you say must, by definition, be about something, that is, what you are claiming does not exist? If there is no such entity in our regular space-time world, then how can your phrase be about it? It will not be claimed that such things exist, yet they do have being or subsist. He refers to them as ideal objects. If a say 'dragons don't exist', the statement seems to be about dragons. Consequently, the statement must ultimately be about something. Consequently, we have to accept that even if dragons don't exist, they have too somehow. To Meinong, it is better to call them subsistent rather than existent otherwise meaningfulness cannot be associated with them. "It is argued, e.g., by Meinong, that we can speak about 'the golden mountain', 'the round square', and so on; we can make true propositions of which these are the subjects; hence they must have some kind of logical being, since otherwise the propositions in which they occur would be meaningless."[4]

According to Meinong, a thing's so-being (*Sosein*) exists independently of its being (*Sein*) in the familiar sense, regardless of its existence. He says, "as we know, the figures with which geometry is concerned do not exist. Nevertheless, their properties, and hence their *Sosein,* can be established.... The principle applies, not only to Objects which do not exist in fact, but also to Objects which could not exist because they are impossible. Not only is the much-heralded gold mountain made of gold, but the round square is as surely round as it is square."[5]

However, Russell gives up his prior viewpoint in a later philosophical phase of his work because he notes that it conflicts with his perception of reality. He realized Meinong's view of the world was intolerably overcrowded. He also discovered that he could no longer believe in the existence of logically impossible entities or even in the possibility of things that were known to be unreal. He holds, "Logic, I should maintain, must no more admit a unicorn than zoology can; for logic is concerned with the real world just as truly as zoology, though with its more abstract and general features."[6] He observed that his previous theory demonstrated 'a failure of that feeling for reality which ought to be preserved even in the most abstract studies'[7] in response to criticism. Russell remarks that Meinong lacks a sense of reality. He writes, 'There is only one world, the "real" world: ... A robust sense of reality is very necessary in framing a correct analysis of propositions about unicorns, golden mountains, round squares, and other such pseudo-objects.'[8]

Russell developed his theory of description in order to disprove Meinongean ontology in the later stages of his philosophy. He discovered that the perspective he had taken in *The Principles of Mathematics* posed issues for which it was unable to provide a solution. Criticizing Meinong's opinion Russell says in his later philosophical life that admitting the existence of unreal object like golden mountain, round square, etc. will create ontological jungle in this world which is inconvenient to accept.

Russell had two motives behind giving the theory of the description.

- Meinong had admitted the existence of unreal, and self-contradictory objects and the ontological jungle created by them. Russell wanted to explain the meaningfulness of these objects without admitting the ontological jungle.
- Russell wanted to discard ontologically pseudo objects by applying law of parsimony using Oakham's Razor.

According to Russell, there are two types of description- Indefinite description and definite description. An Indefinite description is a phrase of the form 'a so- and-so', for example, 'a man', 'a cow', 'a flower' etc. and a definite

description is a phrase of the form 'the so-and-so' for example, 'the present king of India', 'the author of *Gitanjali'* etc. Russell writes,

> 'A ''description'' may be of two shorts, definite and indefinite (or ambiguous). An indefinite description is a phrase of the form ''a-so-and-so,'' or and a definite description is a phrase of the form ''the-so-and-so'' (in the singular).'[9]

Russell, in his book '*Introduction to Mathematical Philosophy'* opines that an indefinite description denotes an object indefinitely and affirms or dis-affirms something about the object, for example, when some-one says, 'I met a man' what does he exactly mean? Here, there is no definite person. If we assume that he met Jones and that is true. Now if the pension says, 'I met a man and he in not Jones' then even if the person lies his statement is not self-contradictory. It can be self-contradictory if he says 'I met Jones, but it was not Jones.' In the expression, 'I met a man' if the phrase 'a man' is used as a name of an object then it will denote a man that exists in reality. In this case if the person even without meeting anybody says, 'I met a man', the expression will be meaningful despite being false. Russell says,

> 'What do I really assert when I assert 'I met a man'? Let us assume, for the moment, that my assertion is true, and that in fact I met Jones. It is clear that what I assert is not; 'I met Jones'. I may say 'I met a man, but it was not Jones'; in that case, though I lie, I do not contradict myself, as I should do if when I say I met a man I really mean that I met Jones. It is clear also that the person to whom I am speaking can understand what I say, even if he is a foreigner and has never heard of Jones.'[10]

In the above expression if we replace 'a man' with 'a unicorn' or 'a mermaid' even then the expression will be meaningful, though it is false. According to Russell, if someone says, 'I met a mermaid' here the word 'mermaid' does not denote any real object rather it denotes a concept. Similarly, when someone says, 'I met a man', the expression denotes the concepts of 'a man'. So, if we analyse the expression 'I met a unicorn' we can see that there is a concept of unicorn, but there is no object or content like unicorn in the real world. And though the expression has no real object concept it is meaningful as it has a concept. To Russell, admitting the existence of unicorn is as important in logic as in Zoology. Because though the objects discussed in logic are more abstract and universal yet both of them discuss the real world.

> '''I met a unicorn" or "I met a sea-serpent" is a perfectly significant assertion, if we know what it would be to be a unicorn or a sea-serpent, i.e. what is the definition of these fabulous monsters. Thus, it is only what we may call the *concept* that enters into the proposition. In the case of "unicorn", for example, there is only the

> concept: there is not also, somewhere among the shades, something unreal which may be called “a unicorn”. Therefore, since it is significant (though false to say “I met a unicorn”, it is clear that this proposition, rightly analyzed, does not a contain a constituent “a unicorn”, though it does contain the concept “unicorn”.’[11]

According to Russell, the expressions, ‘I met Jones’ and ‘I met a man’ are grammatically of the same form but logically not, though both the expressions convey that ‘I met a person’. Because, in the first expression ‘Jones’ denotes a particular person in reality but in the second expression there in nothing about meeting a particular person rather there is an implicit propositional function. If we express the expression clearly it will be of the form, ‘I met x and x in a man’. So, in this expression ‘a man’ cannot be put at the subject place and ‘a man’ is discarded from the expression but if ‘a man’ were a name like ‘Jones’, ‘Jack’, etc. then it would denote a particular person and in no way, it could be discarded by logical analysis. Here the most important thing is that propositions which are about ‘a so-and-so’ contain no constituent that in represented by the phrase. And this is the very reason that the proposition can be significant, even though there is no such thing as ‘a so-and-so’. Russell says,

> ‘Misled by grammar, the great majority of those logicians who have dealt with this question have dealt with it on mistaken lines. They have regarded grammatical form as a surer guide in analysis than, in fact, it is. And they have not known what differences in grammatical form are important. "I met Jones" and "I met a man" would count traditionally as propositions of the same form, but in actual fact they are quite different forms: the first names an actual person, jones; while the second involves a propositional function and becomes, when made explicit: "the function 'I met x and x is human' is sometimes true." (it will be remembered that we adopted the convention of using "sometimes" as not implying more than once.) this proposition is obviously not of the form "I met x," which accounts for the existence of the proposition "I met a unicorn" in spite of the fact that there is no such thing as “a unicorn”. … The important point is that, when rightly analyzed, propositions verbally about “a-so-and-so” are found to contain no constituent and represented by this phrase. And that is why such propositions can be significant even when there is no such thing as a-so-and-so’.[12]

So, in the indefinite expression ‘I met x’ if we substitute ‘x’ with ‘a unicorn’, the expression will become ‘I met a unicorn’ which is meaningful.

According to Russell, a definite description, which is a linguistic expression of the form ‘the so-and-so’, describes only an object or a person definitely. So, the definite description has a descriptive function but no referring

function. Because, the definite description does not denote any person or object definitely, definite descriptions are meaningless without any context of proposition. Therefore, definite descriptions are grammatically more confusing than indefinite descriptions. Since in the case of an indefinite description the definition of ‘a man’ in not given separately rather definitions of those sentences and propositions in which ‘a man’ occurs are given. Similarly in the case of definite descriptions these phenomena are equally applicable. Russell, in order to prove the verity of these phenomena, has explained between proper names and definite descriptions.

The differences between proper names and definite descriptions are as follow:

I. A proper name is basically simple symbol. And a simple symbol is such a symbol no part of which can itself be a symbol, e.g., the name ‘Virat’ is simple symbol. By analysing this name, we get the letters, V+i+r+a+t each of which is not meaningful in itself. So, though there are some letters in the name ‘Virat’ yet the letters are not symbols. But when a name is formed by combining these letters then the name becomes meaningful. ‘... “the author of *Waverley*” is not a simple symbol, because the separate words that compose the phrase are parts which are symbols.’[13]

   a. On the other hand, a definite description in a complex symbol, such as – ‘the author of the *Luminous Sparks*’. Because the words that constitute the definite description are also symbols. According to Russell the words that constitute the definite descriptions have a definite meaning and over all meaning of the definite description is determined by them. ‘… a description which consists of several words, whose meanings are already fixed, and from which results whatever is to be taken as the “meaning” of the description.’[14]

II. A proper name can only position itself at the subject place of an expression. So, a proper name denotes a person or an object directly and the very person or object is the meaning of the proper name. On contrary, definite description is constituted by combination of some words. The meaning of those words is pre-determined and no matter what is considered as the meaning of the definite description, the meaning of the definite description is determined by the meanings of the words that belong to the expression. ‘A name is a simple symbol whose meaning is something that can only occur as subject, … a simple symbol is one which has no parts that are symbols. … “the author of *Waverly”* is not a simple symbol, because the separate words that compose the phrase are parts, which are symbols’[15]

III. A proper name is a complete symbol, in the sense that has a meaning in isolation. Proper names denote an object or a person directly. On the other hand, a definite description is an incomplete symbol, in the sense that it has no meaning in isolation. Symbols that are used in logic like, '.', 'v', '~' etc. have no meaning in themselves; they become meaningful through their uses in any logical sentence of proposition. Similarly definite description also become meaningful through their uses in a proposition.

IV. According to Russell, as proper names are referring expressions, they denote a particular person. The denoted object or person by the proper name is the meaning of the name. On the other hand, according to Russell, definite descriptions are not referring expressions rather they attributive expression in the sense that they become meaningful through the use of the symbols like, division, subtraction, multiplication etc. and that is why the definition given for definite description is only the definition in use.

According to Russell, the thing/object that in described by a definite description, a proper name can be applicable to that thing but in spite of that a proposition that is consist of the definite description and the proposition that is consist of proper name instead of the definite description are not identical. E.g., in the expression 'Rabindranath is the author of *Gitanjali*', if the expression 'The author of the author of *Gitanjali*' is substituted by the proper name 'Rabindranath' then the expression becomes 'Rabindranath in Rabindranath' and 'Rabindranath in the author of *Gitanjali*' are not same. Though the first expression is a fact in an informative about the history of literature, the second is trivially true. Again, if we substitute 'Rabindranath' with 'Sukanta' in the same expression – 'Rabindranath is the author of *Gitanjali',* the expression will become false. So, to Russell, if the definite description is substituted with a proper name, the proposition 'Rabindranath is the author at *Gitanjali*' will be either tautology or false. Hence, a definite description cannot be proper name. He says,

> 'A proposition containing a description is not identical with what that proposition becomes when a name is substituted, even if the name names the same object as the description describes. "Scott is the author of Waverley" is obviously a different proposition from "Scott is Scott": the first is a fact in literary history, the second a trivial truism. And if we put anyone other than the Scott in place of "the author of Waverley," our proposition would become false, and would therefore certainly no longer be the same proposition.'[16]

According to Russell, the proposition in which a definite description is used through seems predicative proposition grammatically but logically is not.

Because the object/thing that is in the subject place of a logically well-formed proposition has a meaning in isolation. But as the definite description– 'The present king of India' has no meaning in isolation. So, despite seeming a predicative proposition grammatically, the proposition is not predicative proposition logically.

To Russell, as a definite description is not a referring expression like, a proper name is, it has no meaning in itself. But when the expression is used in a proposition the proposition becomes meaningful. E.g., though the definite description – 'The author of *Gitanjali*' has no meaning in isolation yet the expression 'The author of *Gitanjali* is wise' is meaningful. We can determine the meaningfulness of this expression by logical analysis. To Russell, analysing the expression – 'The author of *Gitanjali* is wise', three propositions can be found. Those are as follows:

I. There is at least one person who wrote *Gitanjali.*
II. There is at most one person who wrote *Gitanjali.*
III. Whoever wrote *Gitanjali* is wise.

The above three expressions can be symbolically expressed as:

$$(\exists x)\ [(Gx.\ \{(y)\ (Gy.\supset.\ y=x)\}.\ Wx]$$

Clearly this descriptive sentence is a combination of three separate sentences; and even if a conjunction sentence becomes false the main sentence will also become false. Because as the combined proposition that is found by the logical analysis, and that is a combination of three sentences is logically equivalent to the main proposition the truth-value of the main proposition can be determined on the basis of the truth-value of the combined proposition.

Moreover, though the expression 'The author of *Gitanjali* is wise' is of subject-predicate form, grammatically in reality it in not. Because logically the object in the subject place of an expression must have a referring function. But the expression of a definite description only describes an object but does not denote it so, they cannot position themselves in the subject place of an expression. So, the expression 'The author of *Gitanjali* in wise' can be determined as a compound proposition by logical analysis.

Russell thinks that, no description can be considered proper name, only the demonstratives like, 'this' & 'that' can be considered as logically proper name. Because these demonstratives denote an object directly without attributing any quality to it. Thus, the meaning of a logically proper name can be known only when we are well familiar with the particular object which the proper name represents. On the contrary, according to Rusell, ordinary proper names are disguised description or truncated description. Because, each of these descriptions has some knowledge by description. E.g., the proper name 'Socrates' is a disguised description because by the name 'Socrates' we get the

descriptions like, 'the husband of Zenthip', 'the teacher of Plato', 'One who drank hemlock', etc., So, these descriptions are truncated form of the proper name 'Socrates'.

According to Russell, in an ordinary language, there are many expressions that are not applicable to anything in the real world, but they express something meaningful. For example, the expression 'the present king of India exists' is not applicable to anything that is in existent in the real world. But in order to admit the existence of something the object of which existence is being admitted must be denoted. So, how can the truthfulness of a proposition can be asserted if the existence of an object is denied in the very proposition? Can we assert the existence of a proposition the subject term of which denotes an object that is not in existence? According to Austrian philosopher Meinong though the object denoted by this proposition has no existence yet it has a logical being. To him, subsistence is logically more applicable than existence to this kind of object. In this regard Frege says, as these expressions do not denote any object, they have no reference. Though they express a sense and that is why they are meaningful

According to Russell, if the expression denoted by a definite description is not applicable to any object from the real world, then the meaningfulness and the truth-value of the expression in which the definite description have been used can be explained by logical explanation. To him, we can get the following propositions by the logical analysis of the expression, 'The present king of India exists'

- There is at least one person who is the present king of India
- There is at most one person who is the present king of India

These two expressions can be symbolically expressed as:

$$(\exists x)\ [Kx.\ (y)\ (Ky. \supset .\ y=x)]$$

Here the part $(\exists x)Kx$ expresses/denotes a false proposition which means the sentence 'There is at least one person who is the present king of India' denotes a false proposition because at present India is a democracy country and not a monarchy.

In this regard Russell differentiates, the primary occurrence and the secondary occurrence of a definite description. "A description has "primary" occurrence when the proposition in which it occurs results from substituting the description for "x" in some propositional function φx."[17] For example, in the expression, 'The present King of India in bald'; the descriptive phrase 'The present king of India' has a primary occurrence and describes nothing. Thus, the whole proposition becomes false.

Again, "A description has a "secondary" occurrence when the result of substituting the description for x in φx gives only *part* of the proposition

concerned."[18] E.g., if we consider the proposition 'The present king of India is not bald' then the proposition can be interpreted either as:

- It is false that the present king of India is not bald.

Or

- The present king of India is not bald'

This sentence can be symbolically expressed as:

~ (∃x) [{Kx. (y) (Ky.⊃. y=x)}. Bx]

Here, it can be clearly seen that the symbolic form of the proposition negates the proposition 'The present king of India in bald'. Again, as there in no present king of India, the proposition becomes false, which is negated by the proposition 'The present king of India in not bald', the truth value of which is true. Thus, Russell explains the meaningfulness of the propositions having definite descriptions.

References:

1. L. Linsky (ed.), *Semantics and the Philosophy of Language,* p. 150.
2. B. Gross., *Analytic Philosophy,* p. 66.
3. B Russell., '*My Philosophical Development'*, New York, 1959, p. 62.
4. B. Russell., *Introduction to Mathematical Philosophy,* p. 169.
5. B. Russell., "The Theory of Objects" in R. Chisholm, ed., *Realism and the background of Phenomenology,* p. 82
6. B. Russell., *Introduction to Mathematical Philosophy,* p. 169.
7. B. Russell., 'Descriptions', A. P. Martinich (ed), *The Philosophy of Language,* p. 214.
8. Ibid., p. 214.
9. Ibid., p. 213.
10. Ibid., p. 213.
11. Ibid., p. 213.
12. Ibid., pp. 214-215.
13. Ibid., P. 216.
14. Ibid., p. 216.
15. Ibid., p. 216.
16. Ibid., P. 216.
17. Ibid., P. 216.
18. Ibid., p. 216.

Bibliography:

1. Gross, B.R. *Analytic Philosophy*, Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi,1981.
2. Linsky, L (ed.), *Semantics and the Philosophy of Language,* New York: University of Illinois,1952.

3. Russell, B. ‘Descriptions’ in A.P Martinich (ed.), *The Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford,1985.
4. Russell, B. *Introduction to Mathematical Philosophy,* London, Allen and Unwin,1919.
5. Russell, B**.** *Logic and Knowledge: Essay, 1901-1950,* ed. R.C Marsh, London: Allen and Unwin, 1956.
6. Russell, B**.** *Mysticism and Logic,* George Allen and Unwin Ltd, London: 1959.
7. Russell, B**.** *The Problems of Philosophy,* Oxford University Press, Oxford,1992.
8. Russell, B**.** ‘*My Philosophical Development’*, New York, 1959.
9. Martinich, A.P. *The Philosophy of Language*, Oxford University Press, Oxford,1985.

History in Literature : Representation of 'Partitioned Woman' in Bengali Short Story

Smarita Datta
Assistant Professor, Department of History
Rishi Bankim Chandra College

Abstract: In this paper, I examine Bengali short stories based on the Indian partition to trace the lives of Hindu Bengali women who were forced to cross the border. Literature captures the agony of the uprooted people and represents the uncertainties of the period more than History. So, my prime concern is finding this "History" within the literature, specifically in the short stories. The Paper has three segments to illustrate the story (history) of Partitioned Women. This paper is a narrative of uprooted women who were facing sexual violence and trauma, but did not stop their journey to becoming self-aware women. This survival is not easy; many of the surviving women lost their own 'self identity', family, and even life. However, they were determined to end their plight and live life, and they succeeded.
Key Words: Partition, Woman, Migration, Memory, Survival, Literature, History.

Introduction:

Freedom brought partition, reshaping the geographical body of India through vivisection. The division led to the most significant human translocation in the subcontinent's history, with migration in two directions causing human misery in a new land. The refugees lost their home and their identity. Traditional partition history chronicled the nature of partition or the high politics behind it. However, it is literature that has filled the gaps left by history, particularly in the 1970s, when feminist thought matured in India and an upswing of gender-centred analysis exposed the plight of migrant people. On the contrary, Bengali literature has been highly sensitive to refugees since 1947, capturing the sufferings of the uprooted people in their new land and the pain of losing 'home.' A varied generation of Bengali authors (fiction writers) portrayed human misery – the tragedy of partition. History, with its high political orientation, could not touch the lives of ordinary people. So, in this case, I believe that where history ends, literature begins.

In my paper, with the belief that literature represents the partitioned life better than history, I want to highlight post-colonial Bengali literature, which contains a grand narrative of uprooted people's experiences. Through the light of short stories written by Bengali authors, we can catch the agony of the refugees,

specifically about the women whose lives were hit by partition and turned upside down. Their works had a sharp sociological observation. Here, I exclude the short stories written in East Pakistan (present-day Bangladesh) from my discussion because they require special consideration.

Partition: The Migration

We were all running
We were refugees
Mother had worn all the jewellery she possessed
My chhoti, six years of age,
Had been fed fully and given milk
I had my bhameri and a top
Tucked in my pajamas
We were fleeing from our village in the night
We were refugees.

Gulzar, Bhameri (Poem)

According to the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR), a refugee is someone who flees from his or her own country or refuses to return if already outside because the person realistically fears persecution or death for religious, racial, or political reasons[1]. In Bengali, Refugee means Udbastu- The people without a home or Bastu. They are *Bastuhara* or homeless because they are forced to leave their ancestral land. The pain of refugees is similar in every corner of the earth. The impact of this kind of forceful migration is vast for society. Most of the time, the forceful migration is accompanied by mass murder and brutality. During the last days of colonial rule, India witnessed one of the largest human translocations, which was categorically forced and involved mass migration. A high political decision compelled the unfortunate people of Punjab and Bengal to leave their native land, and they did not have the power to decide whether to go. Communal relationships in those days were worsening. Both communities distrusted each other. This trend can be seen in the Calcutta riot of 1946. The bloodshed and death toll of the Calcutta riot engulfed the country, and we can see the repetition of the bloodshed and arson in Noakhali, Bihar, and the northwest frontier. Violence in these riots shook people's belief in humanity. Force and violence are likely to be successful social control and persuasion techniques when they have popular support[2]. Violence during the periods of partition was designed to maintain domination over the shaky community. It created terror in the minds of people. Partition violence is categorically different types like arson, murder, abduction, and rape. People fled to avoid the adverse conditions formed by the bitter sectarian relationship.

The story 'The Crossing' (Epar Ganga Opar Ganga) is based on the theme of migration. In this story, a group of people from East Bengal wanted to flee from the Muslim-controlled East Bengal to the West because it fell under India.

The minority community of Hindus was at the receiving end in East Bengal at this time. They felt that staying with infidels may endanger their lives and honour. Under this tremendous fear psychosis, they started their journey. Durga and Sudam are also part of this exodus. Jyotirmoyee Devi conveys this fear by narrating the night at the station, where Durga tied her Sari with Sudam's clothes, considering him the protector of her body and purity. The fear of sexual assault holds a prominent space in almost every partition narrative. Sabine Hirschauer clearly shows that rape was, for centuries, used as a cheap and effective instrument of war[3]. During the partition, women's bodies became the battlefield, and possession of them meant a symbolic capture of the community's honour. But this atrocity was a matter of silence; people considered that rape is a stigma for women's bodies as well as family prestige. In the story of 'The Boy' (Sei Cheleta), Rajkumari's hesitation to accept her mother (her mother was detached from the family in a time of mayhem) is not only guided by her mother's dirty clothes or status (she is now a beggar in the street) but denial is coming because she has a son with her and who is not Rajkumari's brother. Rajkumari's mother had an affluent paternal home in Ludhiana, and the address was not unknown to her; she also had other relatives. Even though her parents are alive, why did she not go there? Rajkumari's heart knew the answer. She also feels that she lost her mother again in Queen's Park and will never be found. Raped women were not accepted in their own family and community. Another short story written by Ramapada Choudhury depicts the same narrative. Madhuri and Arundhuti are both friends, and both suffered the same fate of sexual violence and separation from family during their migration to the West; both feel their family's hesitancy to accept them because of fear of social dishonour. In an article, Pippa Virdee, exploring the oral history of the Indian partition, quoted an interview with Tahira Mazhar Ali, who was then a social worker and depicted the same experiences.

> I was working with Mridula [Sarabhai], particularly after Jawaharlal [Nehru] asked for the return of the abducted Hindu women. I got myself immersed in the task of recovering those women. Mridula asked me to ask those women to come back to their homes. But many of those women did not want to face the family because of the shame and sheer embarrassment they felt. Quite a few were accorded acceptability, and some were happy and well-settled in the house holds they were living.[4]

Partition: The Memory

Eyes don't need a visa
Dreams have no borders
Eyesclosed, I cross the border every day
To meet Mehdi Hasan!

Gulzar, Poem 'Eyes Don't Need a Visa'

What is memory? – According to the Britannica dictionary, memory means 'the power or process of remembering what has been learned' or 'something that is remembered' and 'the period of time that a person can remember'. Memory is crucial to reconstructing the history of women's experiences in the partition. Memories of their day-to-day struggles and hopes created a narrative that may have been hitherto unknown to historians. The traumatic memory of those dull days was not only the mere individual memory but also a complex interaction with social, cultural and political forces. Memories are collected through oral tradition and literature. Partition memories encompass two feelings that Professor Dipesh Chakraborty and Anasua Basu Raychaudhrury labelled 'nostalgia' and 'trauma.'[5] The memories of 'desh' are pivotal in all the partition stories. The main protagonist of Atin Bandyopadhaya's famous novel *Neel Kantha PakhirKhoje (Searching for a Blue Throat Bird) dreamt of his 'desh', his lost homeland,* by hearing the chirping of a dove. He remembered the Arjun tree and watermelon field and the faces of his uncle (borojathamoshai) and Fatima, whom he loved once.[6] Here, the bird symbolises peace and passion for what he hankers now. The nostalgia and the passion for the abandoned native land are compiled in *Chhere Asa Gram* (The Village Left Behind), published in 1975. In this compilation, every memoir is full of pathos for leaving their ancestral homes. The soil of the abandoned village is sacred to them because the memory of their predecessors is intertwined with it.[7] The village *Yatra*, Durga puja, the playground they played in, the river they bathed in, and the neighbours they loved are all reminiscent.

Unmarried young girl Madhuri[8]and widow Manibala,[9]who reached her old age, were both compelled to come to West Bengal, leaving their affluence in *Desh.* Both remembered their good old days. Both were immersed in gloom and depression in their new lives. Madhuri faced tuberculosis, waiting for death, and Manibala was struggling to cope with the situation with her son and daughter-in-law. In East Bengal, Madhuri had a sweet and caring family before the partition. Now, because of adverse circumstances in Kolkata, she lost her lovely family. Her loving and caring mother is now a fretful, complaining woman. Madhuri can't get the previous life except by memorising. Manibala, the wife of an affluent family, had precious utensils made of stone that she used in the *Desherbari* (ancestral home), but now, she does not have any. For her, all are dreams now. Sudam is haunted by the memory of his wife, Durga, whom he lost during the time of migration. Sudam becomes crazy, searching for Durga everywhere.

> All kinds of women. Slim, young, healthy women. That one's fair, *alta* on her feet, *sindur* on the parting of her hair, chewing a *paan.* Looks just like Durga from a distance. He calls out,

'Durga, Durga.' He moves closer. No, none of them are his Durga.[10]

Ritwik Ghatak recalls the age at which he was born as 'a critical age.' He said, "The waters of the Ganga and the Padma flowed crimson with the blood of warring brothers…..Our dreams faded away. We crashed on our faces, clinging to a crumbling Bengal, divested of all its glory.[11]

These doleful individual memories give birth to collective memories, which take a steering position in making partition history.

Partition: The Survival

"But Dada, I wanted to live! I really want to live; I love to live! Dada, I'll live!"

Nita in 'Meghe Dhaka Tara'

Nita's cry is the eternal cry of the uprooted people, irrespective of gender. Partition displaced millions of people from their ancestral homes. In an estimate, total migratory inflows were 14.5 million, outflows were 17.9 million, and 3.4 million were missing or uncounted.[11] The uprooted people struggled to settle in the unknown land, leaving their identity in the *Desh*. In the new land, they had a new identity: refugees. Migration between October 1946 and March 1958 was termed 'old migration' and was eligible for government doles and rehabilitation assistance; in contrast, the migrants' flow after that had never received any government assistance. It is also evident that the migrants who received government help were insufficient. The state expenditure of Rs. 8 crore for 41.17 lakh allowed only Rs.20 per capita.[12] While the partition of Punjab was a one-time event with mayhem and forced migration restricted primarily to three years (1947-1950), the Partition of Bengal was a continuing process.[13] But the refugees of the East and their rehabilitation were neglected by the government. Most of the uprooted people had no shelter in a new land. They took refuge in the refugee camps, even in railway stations. Sometimes, they took shelter in their relatives' houses, where they were unwanted. They even established their colonies. They took on new livelihoods to support their family. Most of the time, this new profession was derogatory in terms. In a famous story, Narendranath Mitra tells us the story of a respected headmaster of East Bengal and his identity crisis. He and his family moved to Kolkata due to partition. Nobody knows him here. He got a clerical job in a bank with the help of her former student, who is now doing a higher-ranking job in the same bank. The headmaster did not match the office culture. At the end of the story, he returned to teaching, but the students were the lower-ranking office workers. The headmaster saved his identity. On the contrary, we have the character of Taranga. Taranga was a housewife of a village in East Bengal, but partition made her a maid in Kolkata. Taranga was not like a professional maid; as the daughter of a village, she was very innocent. But at the end of the story, circumstances made her a liar and a professional maid. She loses her identity due to the hit of circumstances created by the partition. She

didn't want to be like that.[14] In a famous short story 'Upay'(The Way), Manik Bandyopadhyay draws picture of a refugee family. They had been forced to leave the 'desh'. They took shelter at a station in Kolkata as millions of refugees. Here, they met with Pramath. Pramath ran a secret racket of sex. Mallika, the story's main protagonist, is compelled to take Pramath's offer, but she finds a way out of it; she murders Pramatha in his own resting house and flees from there. At the end of the story, she says that she has found a way to survive. Now, she will use her body as bait and follow the previous incident. Here, Manik Bandyopadhyay sketches an extreme way out for survival. But in*Dukulhara* (Losing everything), Bindubasini could not survive. She lost her family and her life, too.

Archit Basu Guha Choudhury assumes that the impact of Partition on the Bengali migrant women was complex but positive.[15] Gargi Chakraborty interviewed many refugee women who were involved in jobs to support their families. The refugee women's emergence in the public domain, their pursuit of education, their search for employment, and their participation in the activities of colony life changed the social milieu of West Bengal. The educated women preferably took jobs in schools (the most 'acceptable' and 'respectable' jobs in the eyes of society); otherwise, they entered into white-collar jobs. Uneducated women also got jobs (maids or sellers) and supported their family finances. They allegedly broke the age-old tradition that men are the earning members of the family.[16] Rachel Weber narrates that the refugee women enjoyed more space in public life because after migrating to Kolkata, their families could not accommodate separate chambers (*Antahpur*) for their womenfolk. Everything has now changed. So, the rigidity of the division between *Antahpur* and *Barbari* (Outer Chamber) has been lifted.[17]

References:

1. Hansen, Art, Oliver-Smith,Anthony (ed), 1998, *Involuntary Migration and Resettlement: The Problems and Responses of Dislocated People*, Colorado, West View Press, P. 15
2. Arendt, Hannah, *1970, On Violence*, Florida, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, P. 19
3. Hirschauer, Sabine,*The Securitization of Rape: Women, War and Sexual Violence*, Palgrave, UK, P. 65
4. Pipa, Virdee,2013, *Remembering Partition: Women, Oral Histories and the Partition of 1947,* Oral History, Vol 41. No.2, P.55
5. Chakraborty, Dipesh,1996, *Remembered Villages: Representation of Hindu-Bengali Memories in the Aftermath of the Partition,* Economic and Political Weekly, Vol.31, No.32, pp. 2143- 2151
6. Bandyopadhaya, Atin, 1999, *NeelkanthaPakhirKhoje,*Kolkata, Karuna Prakashani, P.403

7. Basu, Dakshina Ranjan, 1975, *Chere Asa Gram*,Kolikata, Jigansa, P.1
8. Lahiri Sishir Kumar, 1952,*Ghar nei*, Desh, Vol.29, No. 36, PP.589-593
9. Ghosh, Tapobijoy, 1971, Patharbati, Porichay, Vol. 27, No. 9, pp. 858-872
10. Fraser Baishali (ed), 2008, *Bengal Partition Stories: An Unclosed Chapter,* UK and USA, Anthem Press, P.251
11. Ghatak, Ritwik, 2000, *Rows and Rows of Fences: Ritwik Ghatak on Cinema,* Calcutta, Seagull, P. 49
12. Basu, Guha-Choudhury, Archit Basu Guha-Choudhury, 2009, *Engendered Freedom: Partition and East Bengali Migrant Women*, Economic and Political Weekly, Vol 44, No.49, P.66
13. Bagchi, Jasodhara, Dasgupta, Subhoranjan (ed), 2003, *The Trauma and the Triumph:*
    Gender and Partition in Eastern India, Kolkata, Stree,P.2
14. Mitra, Narendranath, 1956, *Narendranath Mitra Golpomala,* Kolkata, Ananda, P.168
15. Basu, Guha-Choudhury, Archit Basu, 2009, *Engendered Freedom: Partition and East Bengali Migrant Women*, Economic and Political Weekly, Vol44, No.49, P.66
16. Chakravartty, Gargi, *2005, Coming Out of Partition: Refugee Women of Bengal*, see chapter 3 (pages 79- 107), New Delhi, Bluejay Books
17. Weber, Rachel in Jasodhara Bagchi, Subhoranjan Dasgupta (ed), 2003, *The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India*, Kolkata, Stree, P.70.

Suggested Readings:

1. Gulzar, *Footprints on Zero Line,* Harper.Perennial, 2017
2. Bhadreswar Mondal*, Bhed-Bibhed*, Gyan-Bhaban, Kolkata,1965
3. Baishali Fraser (ed), *Bengal Partition Stories: An Unclosed Chapter,* Anthem Press, UK and USA, 2008
4. Narendranath Mitra, *Narendranath Mitra Golpomala,* Ananda, Kolkata, 1956
5. Manik Bandyopadhyay, *Uttarkaler Galpa Sangraha*, National Book Agency, 1972
6. Pratibha Basu, *Agranthita Galposangraha,* Dey's, Kolkata, 2022.

Environmental Ethics among the College Students in West Bengal

Tarak Nath Bhunia
Research Scholar, Dept. of Education
Fakir Mohan University, Balasore, Odisha
&
Susanta Kumar Giri
Assistant Professor, Dept. of Education
D. K. College, Jaleswar, Balasore, Odisha

Abstract: This study explores the level of environmental ethics among college students in West Bengal, with a focus on understanding their awareness, attitudes, and behaviours related to environmental ethics. Objectives of the Study are i) To compare the environmental ethics of U.G boys and girls. ii). To compare the environmental ethics of rural and urban U.G students. Using a quantitative research design, data were collected through environmental ethics tool developed by Haseen Taj (2016) and analyzed using Levene's Test and independent samples t-tests. So, it is shows that, girls' environmental ethics is better than boys' environmental ethics. Thus it can be suggested that there is statistically significant difference in environmental ethics between the U.G boys' and girls' students. And results revealed no statistically significant difference in environmental ethics between rural and urban U.G students in West Bengal.The findings suggest a generally uniform awareness and ethical orientation toward the environment among college students in West Bengal. This highlights the effectiveness of existing environmental education initiatives while also indicating areas where further engagement and ethical programs also beneficial. The study underscores the importance of integrating environmental ethics more deeply into higher education curricula to foster a generation of environmentally responsible citizens.
Key Words: Environmental Ethics, College Students,Ethical Behaviour, Environmental Responsibility.

Introduction:
The Greek word "Ethos," which meaning traditions or habits, is where the term "ethics" originates. The Latin word "mores," which also implies customs or habits, is the root of the word "moral," a concept that is closely related to the word ethics. Thus, "Ethics" literally refers to the study of human traditions or habits. Ethics examines the rightness and wrongness of individuals' voluntary and ingrained behaviours. It is a morality theory that transforms moral

conviction into logical understanding (Sinha, 2009, p. 1-2). Environmental ethics deals with issues that are related to how we utilize and distribute resources. Can individuals justifiably use resources so differently that one individual uses resources many times more lavishly than other individuals who have barely enough to survive? In a just world, there has to be a more equitable sharing of resources than exists at present. The just distribution of resources has global, national and local concerns that we need to address. There are rich and poor nations, there are rich and poor communities in every country, and there are rich and poor families. In this era of modern economic development, the disparity between the haves and have-nots is widening. Our human environments in the urban, rural and wilderness sectors use natural resources that shift from the wilderness (forests, grasslands, wetlands, etc.) to the rural sector and from there to the urban sector. Wealth also shifts in the same direction. This unequal distribution of wealth and access to land and its resources is a serious environmental concern. An equitable sharing of resources forms the basis of sustainable development for urban, rural and wilderness-dwelling communities. As the political power base is in the urban centres, this itself leads to inequalities and a subsequent loss of sustainability in resource management in the rural and forest sectors.

Justification of the Study:

The reviews on environmental ethics were significant with respect to male and female students (Mathivanan &Pazhanivelu, 2013; Vidhya, 2016; Pant & Singh, 2017; Kaur, 2017; Karakaya & Yılmaz, 2017; Kulsum & Shankarappa, 2018; Sison, 2018; Sankar & Saravanan, 2022; Kamei & Gangmei, 2020; Mahat et al., 2022; Ahammad, 2023) and environmental ethics was not significant with respect to male and female students (Maria, 2017; Guricin& Sevinc, 2020; Chavada & Charan, 2020; Banerjee et al. (2015). Significance difference between rural and urban (Banerjee et al., 2015; Ahammad, 2023; Kaur (2019). The findings of the reviewed literature varied from one another and some had interesting findings that have supported to the Present study. Majority of the studies reviewed found their respondents to have high environmental ethics and significantly difference with respect to gender, caste, localities, subject of the study. Review of the selected literature reveals that very few studies especially in India have been undertaken to study environmental ethics. Total 35 literature reviews have been studied on environmental ethics. However, there is a dearth of studies studying Environmental Ethics especially in West Bengal. So, the investigator chose the topic on Environmental Ethics among College Students in West Bengal.

Objectives of the Study:

The following are the objectives of the present study:

1. To compare the environmental ethics of U.G boys and girls.

2. To compare the environmental ethics of rural and urban U.G students.

Hypotheses:

The following are the hypotheses of the present study:

$H_{01:}$ There exists no significant difference in the mean environmental ethics score of U.G boys and girls.

$H_{02:}$ There exists no significant difference in the mean environmental ethics score of U.G rural and urban students.

Delimitation of the Study:

The delimitation is essential in every social science research for impractical and unviable variables controlled. The present study is delimited to:

1. The present study is delimited in Purba Medinipur and Paschim Medinipur districts as the area of study to the entire West Bengal.
2. The researcher was selected only undergraduate first year college students of the purpose of study.
3. Govt. aided Degree College was selected for the purpose of the study.

Research methodology:

Research methodology is a way to systematically solve the research problem. Considering the study's objectives and identified variables, a descriptive survey method was used.

Population and Sample:

Thus the target group of this study is the college students, who are studying in 1st Year 2nd semester Govt. college of West Bengal, are considered as the population of the present study. The investigator has randomly select Purba Medinipur and Paschim Medinipur districts as sample for conducting the study from entire West Bengal. From each district the investigator randomly selects four Govt. colleges for collection of sample. In every college rural (Block level) and urban (Municipality level) students are studying, so the location of students also highlighted for the purpose of the study. Thus, the analyses comprised of responses of 426 college students of which boys' students of which boys = 196 (46%) & girls = 230 (54%); rural = 195 (45.8 %) & urban = 231 (54.2 %).

Tool:

The investigator was used Environmental Ethics Scale developed by Haseen Taj (2016)

Analysis and Interpretation:

1. To compare the environmental ethics of U.G boys and girls.

H_{01}:There exists no significant difference in the mean environmental ethics score of U.G boys and girls.

For testing this hypothesis independent sample't'- test is done.

Result:

Group Statistics					
	Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Environmental Ethics	Boys	196	118.55	5.117	.366
	Girls	230	119.91	5.227	.345

Interpretation:

From this table, it is observed that the mean environmental ethics score of boys is 118.55 and standard deviation is 5.117. And mean environmental ethics score of girls is 5.227 and standard deviation is 5.227. So, it is shows that, girls' environmental ethics is better than boys' environmental ethics.

Independent Samples Test

Environmental Ethics	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
	F	Sig. (p)	t	df	Sig. (2-tailed) (p)
Equal variances assumed	.116	.734	-2.717	424	.007
Equal variances not assumed			-2.721	415.919	.007

Interpretation: For testing the significance of difference between the mean score of U.G boys and girls where df is 424, calculated t is -2.717 and p=.007 ($p<0.05$). Therefore, 't' is significant at 0.05 level of significance. Hence, H01 is rejected. Thus it can be suggested that there is **statistically significant difference** in environmental ethics between the U.G boys' and girls' students.

2. To compare the environmental ethics of rural and urban U.G students.

$H_{02:}$ There exists no significant difference in the mean environmental ethics score of U.G rural and urban students.

For testing this hypothesis independent sample 't'- test is done.

Group Statistics					
	Locality	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Environmental Ethics	Rural	195	118.81	5.800	.415

	Urban	231	119.69	4.640	.305

Interpretation:

From this table, it is observed that the mean environmental ethics score of rural is 118.81 and standard deviation is 5.800. And mean environmental ethics score of urban is 119.69 and standard deviation is 4.640. So, it is shows that, urban environmental ethics is more or less similar with rural environmental ethics.

Independent Samples Test

Environmental Ethics	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
	F	Sig. (p)	t	df	Sig. (2-tailed) (p)
Equal variances assumed	13.994	.000	-1.745	424	.082
Equal variances not assumed			-1.713	369.307	.087

Interpretation: For testing the significance of difference between the mean score of U.G rural and urban where df is 369.307, calculated t is -1.713 and p=.087 (p>0.05). Therefore't' is not significant at 0.05 level of significance. Hence, H02 is accepted. Thus it can be suggested that there is not statistically significant difference in environmental ethics between the U.G rural andurban students.

Findings and Discussion

So, it is shows that, girls' environmental ethics is better than boys' environmental ethics. Thus it can be suggested that there is statistically significant difference in environmental ethics between the U.G boys' and girls' students. These are supported by Mathivanan & Pazhanivelu, 2013; Vidhya, 2016; Pant & Singh, 2017; Kaur, 2017; Karakaya & Yılmaz, 2017; Kulsum & Shankarappa, 2018; Sison, 2018; Sankar & Saravanan, 2022; Kamei & Gangmei, 2020; Mahat et al., 2022; Ahammad, 2023. It is shows that; urban environmental ethics is more or less similar with rural environmental ethics. Thus it can be suggested that there is not statistically significant difference in environmental ethics between the U.G rural and urban students. These are supported by Sahidullah, 2021; Somashekara & Praveena, 2023; Gupta, 2017.

Conclusion:

It is show that statistically significant difference in environmental ethics between the U. G boys' and girls' students. It can be concluded that girls' students are better environmental ethics than boys in West Bengal. So, girls are more aware

towards environmental ethics. The study found no statistically significant difference in environmental ethics between the compared of rural and urban college students in West Bengal. This suggests that, rural & urban college students in West Bengal share similar views or attitudes toward environmental ethics. So, it is indicated that localities wise entire society of West Bengal properly developed.

References:

Ahammad, F., & Nasrin. (2021). A Study of Environmental Ethics Among Higher Secondary Students In Relation To Their Scientific Attitude. *Quarterly Bilingual Reasearch Journal*, *8*(29), 149–154.

Chavada, K., & Charan, D. (2020). An analysis of environmental awareness ability among college students. *The International Journal of Indian Psychology*, *8*(2), 1427–1430. https://doi.org/10.25215/0802.162

Kamei, D. (2020). *Environmental Ethics of Teacher Trainees : An Enquiry*. *6*(January), 21–27. https://doi.org/10.46704/pol.2020.v06i01.003

Karakaya, F., & Yılmaz, M. (2017). Environmental ethics awareness of teachers. International Electronic Journal of Environmental Education, 7(2), 105-115.

Maria, M. C. (2017). Environmental Ethics Among Higher Secondary Students. *Ijariiie* ISSN(O)-2395-4396, *3*(1), 506–511.

Mathivanan, K. & Pazhanivelu, G. (2013) A Study on Environmental Ethics and Participation in Environmental Activities among Higher Secondary Students. International Journal of Scientific and Research Publications, ISSN 2250-3153, Volume 3, Issue 6

Nihang, K., & Kaur, H. (2017). *Environment ethics among students of Government High School. June*,1–12.

Pant, R. & Singh, A. (2017). Environmental ethics among adolescents: A study of gender, region and Community services. International Journal of Research Culture Society ISSN: 2456-6683 Volume - 1, Issue -10

Sankar, V., & Saravanan, D. P. (2022). *A Study Of Environmental Awareness And Environmental Ethics Among The B.Ed. Trainees In Villupuram District*. *6*(8), 8930–8932.

Sison, M. H. (2018) Secondary School Teacher's Environmental Ethics Awareness. International research journal of Education and Technology. ISSN: 2581-7795, Volume: 01 Issue: 03

Vidhya, K. (2016). *A study on environmental ethics among the higher secondary students in Vellore district*. *2*(11), 300–303.

A study of John Galtung idea of Positive Peace in respect to the Birhor Tribe of Jharkhand

Upasana Roy Barman
Assistant Professor, Dept. of Political Science
Serampore Girls' College

Abstract: The concept of Peace has always been one of the essential requisites in both National and International Politics over the ages. John Galtung has made an understanding of this concept in terms of Negative Peace which is temporary and Positive Peace which touches the aspect of structural violence and establishes Peace on a much stronger ground.

This article is an attempt to understand the concept of Positive Peace from a much different angle in relation to the eradication of Child Marriage among the Birhor Tribe of Jharkhand. First, we have placed a theoretical understanding of Galtung's concept of Peace. Secondly an understanding of Child Marriage in the context of India. Thirdly building a bridge between the concept of Positive Peace and eradication of Child marriage among the Birhor Tribe of Jharkhand.
Key Word: Negative Peace, Positive Peace, Child Marriage, Diku, Movement.

Introduction:

What is Peace? This is one of the most crucial issues that the National Interest and World Politics have faced and are still facing throughout the ages. The signing of the Treaty of Westphalia was a step to establish and behold Peace in the Land of Europe which was devastated by the loss of Human capital from the Thirty Years War and the Napoleonic War. But even the commitment to this Treaty failed to keep the countries of Europe from pleasing themselves in the annihilation of the human race in the First and Second World Wars. So what boils down is that Peace is subjected to the metamorphosis of the time. Peace is a situation or a time that has an absence of war, violence, or war-like situation. In a way, it also talks about a state of being free from any sort of persecution. Immanuel Kant in his work on 'Perpetual Peace' states that Peace should not be embarked upon the platform of temporary or ceasefire. Rather it should be focused on a ground of lasting through time with a solid foundation. According to Perpetual Peace, the unlawful annexation of Ukraine's territory creates violence which questions the existence of peace. State for Kant is a society of human beings and to annex it is to do away with its moral avenue and treat it as a subject of exploration.

Theoretical explanation: One of the exponents of Peace Studies is John Galtung who has worked extensively on the idea of Negative and Positive Peace.

Galtung presented the idea of a Conflict Triangle where he stated three factors that explain a Conflict. First Situation (Structural issue) - the root cause of structural issues lies in political exclusion, economic disparity, or historical grievances. Secondly is Attitude which means perception and emotion which includes how groups in a society perceive each other. Thirdly Behaviour which is violence and cooperation talks about the action taken by conflicting parties from protest to armed rebellion. Violence according to Galtung is an avoidable assault on Human needs where the needs include freedom, well-being- survival, and identity of being. He also stated that structural violence and cultural violence are the main reasons for invisible violence which turn into visible violence. Now Galtung comes down with the concept of Peace and he stated that Peace is not an end but rather it is a process that needs to be built over time. This peace cannot be built with an individual endeavor but needs to be established as a relationship between parties. Galtung then came up with the idea of Negative and Positive Peace in 1967. "Negative peace refers to the absence of violence. When, for example, a ceasefire is enacted, a negative peace will ensue. It is negative because something undesirable stops happening (e.g., the violence stops, and the oppression ends). Positive peace is filled with positive content such as restoration of relationships, the creation of social systems that serve the needs of the whole population, and the constructive resolution of conflict." (**Dijkema, 2007**). "Positive Peace is more than the absence of conflict—it's the presence of conditions that allow individuals and communities to thrive. This transformative theory focuses on creating the systems, attitudes, and practices that foster harmony, justice, and resilience. Unlike Negative Peace, which simply aims to stop violence, Positive Peace addresses the root causes of conflict, such as inequality, discrimination, and lack of opportunity. Positive Peace is built on principles like social cohesion, equity, and resource access, ensuring that every individual feels valued and supported." (**Understanding Positive Peace, n.d**). What is crucial is to understand that Positive Peace can be recognized only when we go beyond the frame of Negative peace through cooperation and integration of human society. Galtung "associated positive peace with the existence of ten values of positive relations at national and international level: the presence of cooperation, freedom from fear, freedom from want, economic growth and development, absence of exploitation, equality, justice, freedom of action, pluralism, dynamism" (**Galtung, 1967, p 14**). It is also necessary to state that all these ten values do not come embraced with one another in a single plate- rather their nature and character differfrom society to society. Against the backdrop of this theoretical juncture, the research leaps to exploring an aspect of Indian society where a mark of positive peace has been profound in its value.

Discussion: In the mid-Victorian era, the term marriage was seen as a union or match made for fulfillment of status and power. The ripple of marriage was so profound that it can be felt in the role and rights of women in the public and private spheres of life. This line of understanding marriage was also present in the Elizabeth time- when marriage was seen as a business arrangement. But despite saying the economic maneuver of marriage- love was always marked as a pathway to consummate a married life. Now what was marriage in India or we can say- has the idea of Victorian marriage made its passageway into its colony named India? In simple terms in India, the very prevalent or general idea of marriage is a union of male and female that has a social sanction. Now this very idea of marriage has also tasted the metamorphosis of time and has changed its idea of sexuality and union under the umbrella of the institution. Our research is not an attempt to study the history of marriage and its different colors. But to study a form of marriage- Child marriage, which is indeed an act of violence in Indian Society. In layman's term Child marriage is a social phenomenon where the marriage is consummated between a girl and a boy lower than the age of marriage as accepted by law. This violence can even occur in one way where only the age of the bride is much lower than the legal age as stated in the constitution. "The Government has enacted 'the Prohibition of Child Marriage Act, 2006' (PCMA) to curb child marriages and to take punitive actions against those associated with child marriages. Section 16 of the Prohibition of Child Marriage Act (PCMA) authorizes the State Government to appoint for the whole State, or such part thereof as may be specified, an officer or officers to be known as the 'Child Marriage Prohibition Officers (CMPO)' having jurisdiction over the area or areas specified in the notification". **(PIB, 2003**) Child marriage is also a prevalent tradition or we can say a part of the culture of various tribes of India. Odisha which records the highest number of particularly vulnerable tribesstates that child marriage is "in tribal communities including Paraja, Gadaba, Bhumiya, Bhatra, Halwa, Soura and Kondh, as their traditional customs ordain that girls should marry below the age of 18 and boys below 21. The practice is more acute in remote areas including Dasmantpur, Narayanpatana, Bandhugaon, Laxmipur, Lamataput, Pottangi, Borigumma, Kundra and Boipariguda." (**The New Indian Express, 2024)**. The statistic doesn't end here, since this so-called culture also exists among the Rabari tribes people of Kutch region, Pardhis, Bhils, and Thakars tribal communities who resides in and around the districts of Pune, Ahmednagar, Aurangabad and Amravati, Paniya and Kattunaikar tribes in Wayanad and many more recorded and off the record facts and figures. The government has taken various initiatives which include grassroots-level child protection committees along with Panchayat representatives, health and social welfare department officials and police, late marriage incentives for girls who get married off after 18 years, awareness and sensitization program along with a

CHILDLINE emergency helpline outreach service, spreading the light of education and empowerment through government and non-government agencies like Aapki Beti Yojana, a Rajasthan government scheme provides cash incentives to girls enrolled in class 1-12 of below poverty line (BPL) households, who are orphans or have one surviving parent- or Kanyashree Prakalpa of West Bengal Government as a cash transfer scheme to prevent child marriage and to educate and empower them. The government enacts many such policies and programs to prevent the act of child marriage. But in the case of tribal population, the graph of prominence of such at is not quite a good score because of being an outsider or Diku. A tribal community is not just a community but also an identity that recognizes itself not in assimilation, but more in its distinctiveness. So even though the legitimacy of forces stops such act within the communities, but it has failed to sustain peace for a longer time- since now the table has turned the Save child act into an act of the authoritycondemning their culture and tradition. So even though peace is ensured with protection, it is a temporary act of sustenance of peace. What is necessary to touch the root of the crisis and place it in face of the metamorphosis of the time, society and age and that can only be done by the people of the community itself- by building a bridge of social cohesion and integration between the community and the society at large? Tribal communities are enclosed land, which can only be accessed when they open the door to understand their perspective and make them understand the perspective of ours. In the Niyamgiri movement of Odisha- the Niyamgiri hill is worshipped as a deity by the Kondh tribe and the same hill is seen as a reserve of Bauxite mineral of high value by Vedanta Company. So this difference of perception of the subject about the same object creates the difference between us and them. Child marriage is a part of the structural violence, but this structure itself is so distinctive and composed of the culture and essence of an identity that it can only be changed from within the community itself through cooperation with the people of a larger frame- and only then peace will be ensured for permanence.

To this, we bring forth the case of the Birhor tribe of Jharkhand. The Birhor people are part of the particularly vulnerable tribe. They are a semi-nomadic tribal community, heavily forest-dependent, and economically and socially marginalized. The term Birhor is a conglomeration of two terms- Bir means jungle, and Hor means men. The Birhors are of short stature, long head, wavy hair, and broad nose. They belong to the Proto-Australoid racial stock and live in West Bengal, Jharkhand, Odisha, and Chhattisgarh states of India. The aspect of Child Marriage that has been prevalent among this tribal group. Banvasi Vikas Ashram which is one of the NGOs under the Just Rights for Children Alliance (JRC) is a part of the 'Bal Vivah Mukt Bharat' campaign, launched by the Union Ministry of Women and Child Development to The ill

effects of child marriage on children's health, education, and overall well-being were discussed to make the Birhor tribe aware of the social evil of Child Marriage. What is most striking is the fact that in this drive to eradicate Child Marriage among the Tribe- the tribal people themselves step forward in the movement in Giridhiand embroil themselves in this drive to save humanity within its culture and community. The Just Rights for Children Alliance (JRC) stated “Something different happened in Jharkhand’s Giridih district. For the first time, hundreds of people from the Birhor community joined a movement for a social cause. In the dimming light of dusk, people from the community came out of their dwellings to gather against child marriage, a rampant practice in the community. This was the first time that community members were made aware of the consequences and legalities of child marriage and how to prevent the same, the organization claimed. Standing under the glow of burning candles, youth, children, women, and elders took a collective pledge to work towards ending child marriage, it said…. The ill effects of child marriage on children’s health, education, and overall well-being were discussed to make the Birhor tribe aware of the social evil. Everyone pledged not to marry off their children before the legal age, and to report child marriage cases, the statement said. Active in 416 districts across the country, the civil society organization claims to have stopped more than 7,000 child marriages in Jharkhand between April and December 2024. Events were being held in blocks, villages, and schools in support of the government campaign in all 24 districts of Jharkhand.” **(PTI, 2024)**.

Conclusion: This move of eradicating such evil was commenced by the tribal people themselves and this is significant in terms of the fact that the voice of resistance arose from the community itself and was capitalized in a movement in cooperation with authority and NGO which is outside their clan. Positive Peace sustains when the structure of violence is dealt forth from within the structurewhich in effect sustains Peace. Birhor tribe attacked the structure from within its clan by cueing their Cultural norm of Women's equality in terms of status and freedom of choice. As Albert Einstein said “Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding.”

References:

- Dijkema, Claske. (2007). *Negative versus Positive Peace*. Retrieved February 25, 2025, from https://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-186_en.html
- *Understanding Positive Peace*. RetrievedFebruary 20, 2005 from https://playforpeace.org/peace
- Galtung, John. (1967). Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace Thinking. *International Peace Research Institute*, Oslo.- pp14.

- Ministry of Women and Child Development. (2023, August 11). *Child Marriages.* Retrieved March 2, 2025, from https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1947773
- The New Indian Express. (2024, March 18). *65 child marriages among tribals prevented in Odisha's Koraput in 12 months.* Retrieved March 10, 2025 from https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2024/Mar/18/65-child-marriages-among-tribals-prevented-in-odishas-koraput-in-12-months
- Press Trust of India. (2024, December 13). *Jharkhand's Birhor tribe joins movement against child marriage for first time.* Retrieved March 12, 2025, from https://www.theweek.in/wire-updates/national/2024/12/13/ces1-jh-child-marriage-birhor-tribe.html.

From Connection to Disconnection : Social Media and the Mental Health Paradox

Ratan Sarkar
Assistant Professor, Dept. of Education
Tezpur University, Assam

Abstract: In an era characterized by hyperconnectivity, social media has fundamentally altered the manner in which individuals interact, communicate, and perceive themselves and others. Although these platforms purport to enhance connectedness, emerging evidence indicates a paradoxical relationship between social media usage and deteriorating mental health. This paper critically examines the multifaceted impact of social media on psychological well-being, with a focus on issues such as anxiety, depression, loneliness, self-esteem, and digital addiction. Utilizing theoretical frameworks including Social Comparison Theory, Uses and Gratifications Theory, and the concept of Digital Capital, the paper explores how online environments influence identity, self-perception, and emotional regulation. Empirical studies are discussed alongside qualitative insights to illuminate both the empowering and detrimental aspects of social media engagement. Additionally, the paper considers generational differences, the role of algorithm-driven content, and the commodification of attention. Through a critical and reflective lens, this study aims to unpack the complexity of the "connection-disconnection" paradox and advocates for a more mindful, ethical, and informed use of social technologies.
Keywords: *Social Media, Mental Health, Social Comparison, Digital Well-Being, Identity, Algorithmic Influence.*

1. Introduction

Social media platforms have fundamentally transformed the structure of social life, redefining relationships, identity, and communication in the digital era. Initially conceived as tools for connectivity and social networking, these platforms have swiftly evolved into pervasive arenas of influence, performance, and consumption. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter (now X), TikTok, and Snapchat provide users with continuous opportunities for interaction, self-expression, and information exchange across geographic, cultural, and generational boundaries (Boyd, 2014; Jenkins et al., 2016).

Nevertheless, this digital proliferation has coincided with a concerning increase in mental health issues, particularly among adolescents and young adults. Conditions such as anxiety, depression, sleep disorders, low self-esteem, and feelings of loneliness are increasingly associated with prolonged or

maladaptive social media use (Twenge & Campbell, 2018; Keles, McCrae, & Grealish, 2020). The paradox is both profound and troubling: technologies intended to connect individuals often intensify feelings of isolation, inadequacy, and emotional exhaustion. Rather than fostering genuine social bonds, these platforms can sometimes engender performative relationships mediated by metrics of popularity—likes, comments, followers—that reduce human interaction to quantifiable validation (Marwick, 2013).

In this globalized and hyper-digitalized context, users simultaneously act as content creators and consumers, immersed in a culture of visibility that frequently prioritizes appearance over authenticity. The curated nature of online personas can foster unrealistic expectations, triggering a cycle of comparison, self-doubt, and psychological strain (Chou & Edge, 2012). While many users find solace in online communities, particularly marginalized individuals seeking representation and support, others experience heightened vulnerability through cyberbullying, fear of missing out (FOMO), social surveillance, and constant digital pressure (Twenge, 2017; Pantic, 2014).

This paper aims to critically examine the socio-psychological and cultural dimensions of this contradiction. Drawing on established theoretical frameworks—such as Social Comparison Theory, Uses and Gratifications Theory, and Digital Capital Theory—and grounded in contemporary empirical research, the paper interrogates how social media platforms shape users' emotional health, identity, and perception of reality. It also explores broader structural factors such as algorithmic influence, surveillance capitalism, and the commodification of attention that mediate user experiences in profound and often invisible ways (Zuboff, 2019).

By adopting a critical and reflective approach, this study seeks to unpack the connection-disconnection paradox inherent in social media use and consider what a more ethically grounded and mentally supportive digital culture might look like.

2. Theoretical Framework

Comprehending the mental health paradox associated with social media necessitates an understanding of key theoretical perspectives that elucidate how individuals engage with digital environments and how these interactions influence psychological experiences. Social media does not affect users in isolation; its impacts are mediated by cognitive, emotional, and socio-cultural dynamics. The following theoretical frameworks offer critical lenses through which the relationship between social media and mental health can be analyzed:

- **Social Comparison Theory (Festinger, 1954)** posits that individuals assess their social and personal worth by comparing themselves to others. In the realm of social media, users are often exposed to idealized depictions of others' lives—meticulously curated highlight reels that emphasize success,

beauty, and happiness. Such upward comparisons can lead to feelings of inadequacy, diminished self-esteem, and dissatisfaction with one's own life circumstances. Research by Vogel et al. (2014) indicates that frequent social media use is significantly associated with increased self-comparison and lower self-esteem, particularly when users engage in passive consumption of others' content.

- **Uses and Gratifications Theory (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973)** suggests that media consumption is intentional and motivated by individual needs, such as entertainment, social interaction, identity formation, and emotional release. While social media satisfies these needs—especially for belongingness, peer validation, and identity exploration—it can also foster dependency. Users may develop compulsive usage patterns to alleviate transient emotional states, such as boredom, loneliness, or anxiety, leading to emotional fatigue, stress, and even withdrawal symptoms when disconnected. The gratification obtained is often ephemeral and potentially destabilizing over time.
- **Digital Capital (Ragnedda, 2017)** refers to the resources—skills, access, knowledge, and competencies—that individuals possess to effectively engage with digital technologies. Similar to how economic and cultural capital influence life opportunities, digital capital determines the extent to which social media can be leveraged for empowerment or becomes a source of vulnerability. Individuals with lower digital capital—often from marginalized or low-resource backgrounds—may be more susceptible to cyberbullying, misinformation, and addictive usage patterns, lacking the critical skills to navigate these platforms healthily. Moreover, disparities in digital capital can exacerbate existing inequalities in mental health outcomes.

Collectively, these frameworks facilitate a comprehensive analysis of the dual role of social media in both empowering individuals and exacerbating psychological distress. They emphasize the significance of contextual factors—cultural, economic, and technological—in shaping user experiences. By integrating these perspectives, it becomes possible to identify not only the symptoms but also the structural mechanisms underlying the mental health paradox associated with social media.

In the subsequent sections, these theoretical insights will be employed as interpretive tools to analyze empirical findings and examine the real-world implications of social media use on mental well-being.

3. Psychological Effects of Social Media

The psychological effects of social media are both extensive and intricate, encompassing aspects of emotional well-being, cognitive function, identity development, and interpersonal relationships. Digital platforms can function as

sources of support, creativity, and community-building; however, they also contribute to various mental health challenges. The complexity arises from the dual nature of these platforms, which simultaneously offer connection and contribute to distress.

- *Anxiety and Depression:*A substantial body of research highlights a robust association between frequent social media usage and the manifestation of anxiety and depression symptoms. Users frequently report increased anxiety due to fear of judgment, constant comparison, or the pressure to respond promptly. A longitudinal study by Primack et al. (2017) revealed that individuals engaging with social media for more than two hours daily were significantly more likely to exhibit symptoms of depression and anxiety. This correlation is particularly pronounced among younger demographics, for whom online validation is integral to self-worth. The persistent need for approval through likes, shares, and comments cultivates a fragile self-esteem, easily disrupted by perceived neglect or negative feedback.
- *Loneliness and Isolation:*Although social media is designed to facilitate connection, it can exacerbate feelings of loneliness, especially when interactions are superficial or unreciprocated. Passive consumption, such as scrolling without engagement, engenders a sense of exclusion and disconnection. Huang's (2017) meta-analysis indicates that while active engagement may strengthen social bonds, passive use is associated with increased loneliness. Users may also internalize the illusion that others lead more fulfilling lives, a perception intensified by algorithmic feeds that prioritize sensational, aesthetically curated content.
- *Self-Esteem and Body Image:*Visually oriented platforms such as Instagram, Snapchat, and TikTok contribute to the internalization of unattainable ideals of beauty and success. These platforms disproportionately reward content that conforms to normative standards of attractiveness, wealth, and popularity. Adolescents and young adults—particularly females—are susceptible to body image concerns, disordered eating, and diminished self-esteem due to constant exposure to filtered, idealized portrayals. Fardouly et al. (2015) demonstrated that even brief exposure to Instagram could negatively impact women's body satisfaction. The aspiration to emulate influencers or match peer success online creates pressure to conform, often resulting in a distorted self-image.
- *Digital Addiction and Behavioral Dependency:*Social media platforms are intentionally designed to capture and maintain user attention through persuasive design techniques. Features such as infinite scrolling, autoplay, real-time notifications, and intermittent rewards are grounded in behavioral psychology, closely resembling the mechanisms of gambling addiction.

Andreassen et al. (2012) introduced the Facebook Addiction Scale, which identifies symptoms such as mood modification, tolerance, withdrawal, and relapse among frequent users. Excessive use not only disrupts sleep and productivity but also contributes to poor emotional regulation, irritability, and cognitive overload. Users may feel compelled to check platforms even during inappropriate times, thereby reinforcing a cycle of compulsive behavior.

- *Cyberbullying and Online Harassment:* A significant psychological consequence of social media is exposure to cyberbullying, harassment, and hate speech. Unlike offline bullying, online abuse can be relentless and inescapable, occurring across multiple platforms and sometimes anonymously. Victims report elevated levels of anxiety, depression, PTSD symptoms, and in extreme cases, suicidal ideation. The lack of adequate content moderation and accountability mechanisms exacerbates these risks.
- *Fear of Missing Out (FOMO):* The constant stream of updates regarding peers' activities can evoke feelings of exclusion, inadequacy, and restlessness. FOMO, driven by the perception that others are enjoying superior experiences, is a recognized psychological trigger for anxiety and compulsive social media checking. It reinforces the compulsion to remain constantly updated, further entrenching users in the digital loop.

The psychological effects in question are not universally experienced and are frequently influenced by individual personality traits, coping mechanisms, age, gender, and social support systems. Nevertheless, the cumulative impact of these factors highlights a distinct tension between the promises of social connectivity and the realities of emotional exhaustion. It is within this contradiction that the mental health paradox of social media becomes most apparent, necessitating further investigation and a systemic response.

4. Identity, Performance, and Emotional Labor

In the contemporary digital era, the construction of identity has increasingly transitioned to online platforms, where individuals engage in continuous acts of self-presentation. Social media serves as a performative space—reminiscent of a public stage—where users actively construct, curate, and manage their digital personas to align with perceived norms and expectations. This performance is often influenced by the desire for social validation, belonging, and status, mediated through likes, comments, shares, and follower counts.

Erving Goffman's (1959) dramaturgical perspective provides a compelling framework for understanding these dynamics. According to Goffman, individuals engage in "front-stage" behavior to present an idealized version of themselves to an audience, while reserving "back-stage" behavior for their authentic, unfiltered selves. On social media, the boundaries between front and back stage blur. The pressure to maintain an idealized image online can lead

to emotional dissonance—where the public self diverges sharply from the private self—resulting in psychological strain.
This tension is intensified by the phenomenon of context collapse (Marwick &boyd, 2011), which occurs when diverse social groups—friends, family, colleagues, and acquaintances—converge in a single online space. In offline interactions, individuals tailor their communication to different audiences. Online, this multiplicity collapses into one undifferentiated audience, compelling users to perform a universally acceptable identity. This leads to heightened self-monitoring, anxiety, and even censorship of one's authentic voice.

Moreover, maintaining an active digital presence often demands a form of emotional labor—the management of emotions to meet platform expectations or community standards. Influencers and content creators, in particular, experience burnout from constantly producing engaging content and managing audience reactions. Even casual users may feel obligated to appear happy, productive, or aesthetically pleasing, reinforcing toxic positivity and suppressing genuine emotional expression.

These identity-related pressures are not trivial. They shape users' sense of self-worth, belonging, and autonomy. When identity becomes a project constantly subjected to public scrutiny, it undermines psychological safety and can erode self-esteem. The pursuit of digital approval thus transforms what could be a space for self-exploration into a performance arena where authenticity is sacrificed for acceptance.

In essence, social media creates a paradoxical environment where users are encouraged to be "real" while simultaneously being rewarded for conforming to stylized, marketable versions of themselves. The emotional toll of this duality reveals how deeply social technologies influence not only how we present ourselves, but also how we understand who we are.

5. The Role of Algorithms and Attention Economies

At the heart of social media functionality is algorithmic logic—complex, opaque systems that determine the content users encounter and its sequence. These algorithms are not neutral; they are engineered to maximize user engagement by utilizing behavioral data, engagement metrics, and predictive analytics. By customizing feeds based on past behavior, interests, and interactions, algorithms influence not only what users see but also their emotional responses and reactions.

A significant consequence of this design is the formation of echo chambers and filter bubbles—environments where users are increasingly exposed to homogenous content that reinforces existing beliefs, values, or preferences (Pariser, 2011). While this can foster a sense of community or affirmation, it can also exacerbate polarization, marginalize dissenting voices,

and limit exposure to diverse perspectives. From a psychological perspective, this can generate emotional volatility, entrench cognitive biases, and diminish empathy.

More insidiously, these algorithmic ecosystems are intricately linked to the attention economy—a business model that treats user attention as the most valuable commodity. Social media platforms, driven by advertising revenue, compete to maximize user screen time. Features such as auto-play, infinite scroll, push notifications, and real-time feedback loops are intentionally designed to exploit the brain's reward systems, encouraging compulsive engagement and undermining self-regulation.

This attention-based model imposes substantial psychological costs. Users experience digital fatigue, emotional burnout, and stress from constant connectivity and information overload. The perpetual stimulation and fragmented focus impair cognitive functioning and hinder emotional processing. Research suggests that excessive engagement, particularly in highly reactive or emotionally charged digital spaces, can contribute to heightened anxiety, mood instability, and disrupted sleep cycles (Zuboff, 2019).

Moreover, algorithmic content curation often favors sensational, emotionally arousing, or controversial material—because such content drives higher engagement. This can lead to increased exposure to distressing news, outrage cycles, or performative outrage, which in turn fuels collective anxiety and emotional exhaustion. The algorithmic prioritization of virality over veracity also raises ethical concerns, especially when misinformation or toxic content is amplified.

Another layer of concern involves the lack of transparency and accountability in how these algorithms operate. Most users are unaware of how their data is used to influence their online experiences. This asymmetry in power and knowledge contributes to a sense of helplessness and loss of control, further affecting users' mental well-being.

In essence, algorithms are not merely tools for personalization; they are powerful mediators of emotion, perception, and behavior. Within the attention economy, users are not just consumers of content—they are the product being sold. Recognizing this dynamic is crucial for understanding how seemingly benign features of digital design can have far-reaching impacts on individual and collective mental health.

6. Generational Perspectives and Societal Implications

The impact of social media on mental health exhibits considerable variation across generational cohorts, influenced by differing degrees of digital exposure, psychological development, and cultural orientation. Although digital

environments affect individuals of all ages, both younger and older populations encounter distinct vulnerabilities that necessitate tailored understanding and intervention.

Youth and Digital Socialization

Generation Z, born approximately between 1997 and 2012, has matured in a digital-first environment where online visibility is intricately linked to social identity and self-esteem. For this demographic, metrics such as likes, shares, comments, and follower counts serve as forms of social capital, influencing one's sense of belonging, status, and emotional well-being. The pressure to perform and conform on social platforms coincides with a critical developmental stage, rendering adolescents particularly vulnerable to peer comparison, cyberbullying, body dissatisfaction, and mental health issues such as anxiety and depression.

Neurologically, adolescents are predisposed to seek peer feedback and immediate rewards—tendencies that social media platforms exploit through design features that encourage prolonged engagement. The compulsive nature of these interactions increases the risk of digital addiction, disrupts sleep patterns, and impairs emotional regulation. Furthermore, the pervasive exposure to curated and idealized content distorts reality, fostering chronic self-comparison and dissatisfaction with offline life.

Older Adults and the Digital Divide

Conversely, older adults, particularly those from the Baby Boomer and Silent Generations, contend with digital exclusion, misinformation, and low digital literacy. While social media can facilitate the maintenance of social connections and alleviate loneliness, many older users face challenges with the usability of digital platforms. This can result in either minimal engagement, potentially exacerbating isolation, or excessive reliance on unreliable or sensational content, impacting emotional and cognitive well-being.

Older adults are disproportionately targeted by scams, disinformation campaigns, and emotionally manipulative content, primarily due to algorithms optimized for engagement rather than user welfare. A lack of digital confidence and limited access to digital mental health services further complicate their online experience, hindering their ability to benefit from potentially supportive resources.

Cross-Generational Considerations

These generational disparities necessitate intergenerational approaches and tailored interventions. Educational institutions should incorporate comprehensive digital citizenship curricula that foster emotional resilience, media literacy, and ethical decision-making skills among youth. Concurrently, community-based initiatives and public health efforts should focus on enhancing digital skills and

promoting psychological well-being among older adults. Such measures are essential to bridging the digital divide and fostering an inclusive digital environment.

Cultural Shifts and Ethical Considerations

At a broader cultural level, the normalization of digital metrics as indicators of personal worth has profoundly influenced societal values concerning success, appearance, and productivity. The pervasive exposure to curated success narratives and aspirational lifestyles has cultivated a culture characterized by comparison, consumerism, and reliance on external validation. The pursuit of social recognition—whether through Instagram virality or influencer status—has become emblematic of personal achievement.

This shift raises critical ethical questions: What responsibilities do technology companies bear in mitigating psychological harm? Should educational systems assume a more prominent role in preparing young individuals for the emotional complexities of digital engagement? How can policymakers effectively intervene to regulate harmful digital practices while safeguarding freedom of expression?

Addressing these questions necessitates a multi-stakeholder response—one that balances technological innovation with empathy, growth with governance, and liberty with social accountability. Only through such a comprehensive approach can we strive to build a more balanced, equitable, and mentally healthy digital culture for all generations.

7. Toward a More Mindful Digital Culture

Confronting the mental health paradox of social media necessitates a multi-dimensional and collaborative approach that acknowledges the intricate relationship between technology design, user behavior, and broader socio-political structures. A more mindful digital culture is one that foregrounds well-being, empathy, and ethical engagement over profit-driven metrics and compulsive consumption (Williams, 2018).

Digital Literacy Education: One of the foundational strategies is promoting digital literacy across age groups. Users must be equipped with critical thinking skills to interpret online content, manage screen time, recognize algorithmic influence, and understand the psychological effects of digital engagement (Livingstone & Helsper, 2007). Digital literacy curricula should be embedded into school education and adult learning programs to build a culture of informed and reflective digital citizenship.

Platform Accountability: Tech companies must adopt genuine accountability for the mental health consequences of their platforms. Transparency around algorithmic operations, evidence-based safety features (e.g., content warnings, time-use dashboards), and customizable privacy controls

are necessary reforms. The UK's Online Safety Bill and the European Union's Digital Services Act are emerging examples of legislative attempts to ensure platform responsibility (Gillespie, 2018).

Ethical and Humane Technology Design: The attention economy has incentivized design choices that exploit psychological vulnerabilities (Harris, 2019). A shift toward humane technology involves reimagining design principles that center well-being, autonomy, and user agency. Features like slow media, friction-in-design (e.g., intentional delays in likes or shares), and minimalist interface design can disrupt compulsive behaviors and promote self-awareness (Lukoff, 2021).

Therapeutic and Preventive Interventions: Mental health professionals should incorporate digital behavior assessments into their clinical frameworks. Discussions around screen time, online interactions, and emotional triggers linked to social media are essential for holistic care (Andreassen et al., 2012). Preventive strategies like digital detoxes, group counseling on tech-related anxiety, and school-based well-being programs can help recalibrate digital habits and reduce overdependence.

Digital Mindfulness: On the individual level, fostering digital mindfulness—intentional, reflective, and purposeful online engagement—can help mitigate mental fatigue and emotional dysregulation. Mindfulness-based interventions, including meditation apps and guided practices tailored to digital habits, have shown promise in reducing stress, improving self-regulation, and enhancing emotional awareness (Van Dam et al., 2018).

Creating a more mindful digital culture is not merely a behavioral adjustment but a systemic transformation that reclaims human attention from exploitative technologies and redirects it toward flourishing and community. This cultural shift requires collaboration among educators, policymakers, designers, mental health practitioners, and users themselves.

8. Conclusion

This paper critically examines the paradoxical nature of social media, highlighting its dual capacity to both foster connection and induce disconnection, as well as to empower and inflict harm. Utilizing theoretical models, psychological evidence, and sociocultural analysis, it posits that mental health outcomes in the digital age are not solely determined by technology itself, but rather by the broader ecosystems—algorithmic, educational, economic, and interpersonal-that influence how these technologies are utilized and experienced.As digital platforms become increasingly integrated into daily life, the necessity for a more conscious, ethical, and emotionally intelligent approach to digital engagement becomes ever more pressing. Addressing the mental health impacts of social media does not entail abandoning technology; instead, it involves reshaping our digital environments to support, rather than undermine,

psychological well-being (Twenge, 2017; Zuboff, 2019). The path forward necessitates balancing innovation with responsibility, autonomy with community, and connection with care. By embedding mental health considerations into every layer of the digital experience—from individual behavior to systemic design- we can transform social media into a space that enhances, rather than erodes, the human condition.

References:

1. Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale. *Psychological Reports*, 110(2), 501–517.
2. Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale. *Psychological Reports*, 110(2), 501–517.
3. Boyd, D. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press.
4. Chou, H. T. G., & Edge, N. (2012). "They are happier and having better lives than I am": The impact of using Facebook on perceptions of others' lives. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(2), 117–121.
5. Fardouly, J., Diedrichs, P. C., Vartanian, L. R., & Halliwell, E. (2015). Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women's body image concerns and mood. *Body Image*, 13, 38–45.
6. Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7(2), 117–140.
7. Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press.
8. Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Anchor Books.
9. Harris, T. (2019). *The Attention Economy and the Human Future*. Center for Humane Technology.
10. Huang, C. (2017). Time spent on social network sites and psychological well-being: A meta-analysis. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 20(6), 346–354.
11. Jenkins, H., Ito, M., & Boyd, D. (2016). *Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics*. Polity.
12. Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. *The Public Opinion Quarterly*, 37(4), 509–523.
13. Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A. (2020). A systematic review: The influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 79–93.
14. Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide. *New Media & Society*, 9(4), 671–696.
15. Lukoff, B. (2021). *The Humane Tech Design Guide*. Mindful Tech Lab.
16. Marwick, A. E. (2013). *Status Update: Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media Age*. Yale University Press.

17. Marwick, A. E., &boyd, d. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. *New Media & Society*, 13(1), 114–133.
18. Pantic, I. (2014). Online social networking and mental health. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 17(10), 652–657.
19. Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*. Penguin.
20. Primack, B. A., Shensa, A., Sidani, J. E., Whaite, E. O., Lin, L. Y., Rosen, D., ... & Miller, E. (2017). Social media use and perceived social isolation among young adults in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*, 53(1), 1–8.
21. Ragnedda, M. (2017). *The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities*. Routledge.
22. Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood.* Atria Books.
23. Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283.
24. Van Dam, N. T., et al. (2018). Mind the hype: A critical evaluation and prescriptive agenda for research on mindfulness and meditation. *Perspectives on Psychological Science*, 13(1), 36–61.
25. Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. *Psychology of Popular Media Culture*, 3(4), 206–222.
26. Williams, J. (2018). *Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy*. Cambridge University Press.
27. Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism.* PublicAffairs.

Gendered Impacts of Climate Change in India : Analysis of NGO-led Adaptation Strategies

Akansha Khaiba
Research Scholar, Dept. of International Relations
Jadavpur University, Kolkata

Abstract: Climate change greatly affects vulnerable communities, and in India, women are among the most severely impacted due to longstanding gender inequalities. This paper explores the impact of climate change on women in India and examines the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in developing gender-sensitive adaptation strategies. By analysing specific cases in India such as interventions by SEWA, BRAC India, the Watershed Organisation Trust (WOTR), and others the article demonstrates how NGOs empower women through knowledge-sharing, giving access to resources, and building resilience together. The study argues that local, gender-inclusive approaches are essential for climate justice and sustainable adaptation in India's diverse ecological and socio-cultural contexts.
Keywords: Gender and Climate Change**,** Climate Adaptation, NGOs in India**,** Women's Empowerment**,** Climate Resilience.

Introduction:

Climate change is increasingly being recognized as aprofound social justice issue in addition to an environmental one. The most vulnerable communities who are often the least accountable for greenhouse gas emissions bears the brunt of its effects. Women particularly from those marginalized and low-income backgrounds, sufferthe consequences of climate change differently and more frequently than men therefore gender emerges as a critical axis of vulnerability within these communities.

Due to a combination of socio-economic disparities, dependence on climate-sensitive industries like agriculture, and strongly ingrained patriarchal norms the gendered impacts of climate change are especially noticeable in India. Women in rural India, for instance, are often responsible for securing water, fuel, and food for their families. When droughts, floods, or erratic weather patterns disrupt these resources, women are forced to adapt by walking longer distances, spending more hours on unpaid labour, or taking on additional caregiving roles—all of which further deepen their economic and social vulnerability (Agarwal, 2010; UN Women India, 2021).

In spite of their disproportionate exposure, women are not passive victims of climate change. They possess crucial local knowledge and tend to be

first responders during emergencies. Their voices are however regularly excluded from formal decision-making processes related to climate adaptation and mitigation. This **exclusion undermines both gender equity and the effectiveness of climate action,** as evidence increasingly shows that women's participation enhances the sustainability and resilience of community responses (Arora-Jonsson, 2011).

Over the last decade, **Non-Governmental Organizations (NGOs)** have emerged as key actors in bridging this gap through implementing gender-responsive adaptation strategies. NGOs in India have been instrumental in mobilizing women, building their capacities, and mainstreaming gender issues in local development and climate resilience planning. Through community-based initiatives, training programs, and participatory planning, these organizations have empowered women to become agents of change in addressing climate challenges.

This paper explores the **intersection of gender, climate change, and civil society responses** in the Indian context. Specifically, it reflects upon how specific NGOs such as SEWA in Gujarat, WOTR in Maharashtra, Kudumbashree in Kerala, and Gram Vikas in Odishahave implemented adaptation strategies that prioritize women’s agency and resilience. The objective is to analyse the effectiveness, replicability, and limitations of these interventions, and to derive policy-relevant lessons for scaling up inclusive climate action.

By locating the analysis within India’s vibrant ecological and socio-cultural context, the paper emphasises the central role of gender **sensitive grassroots adaptation to both** climate justice and sustainable development. The discussion also highlights the necessity of structural support through policy, funding, and institutional reform to ensure that women’s leadership in climate adaptation is recognized, resourced, and supported.

Gendered Impacts of Climate Change in India

Climate change is not gender-neutral. It exacerbates underlying social, economic, and political disparities, with its impacts being disproportionately sharp for women and marginalized gender groups. In India, where gender disparities are already very entrenched in societal norms, land ownership trends as well as in resource access, the climate crisis further increases women’s exposures across multiple dimensions.

Socio-economic Vulnerabilities

Indian women, especially in rural and tribal regions, rely significantly on natural resources for their livelihoods and domestic tasks. They are usually tasked with fetching water, collecting fuelwood, tending to small farms, and looking after children and the elderly. As climate change leads to resource degradation such as

depleting groundwater, increasing soil salinity, and reducing agricultural productivity women's workload increases significantly (Kelkar, 2009).

For example, erratic rainfall and droughts in semi-arid regions like Rajasthan and Maharashtra have forced women to walk longer distances for water, adding hours to their daily labour. This time poverty limits their opportunities for education, income generation, and participation in community decision-making.

Furthermore, women's limited access to property and land rights restricts their ability to adapt autonomously. According to the India Human Development Survey, only around 13% of women in India own agricultural land (Agarwal, 2010). This lack of ownership means women are excluded from formal agricultural support schemes, climate-resilient infrastructure planning, and financial services like crop insurance or credit.

Climate-Induced Health Burdens

Climate change has significant health implications, most of which are gender-sensitive. Rising temperatures andair pollution exacerbate reproductive and maternal health conditions. Pregnancy increases the vulnerability of women to heatwaves, which are becoming more common and intense in areas such as northern and central India.

In flood-prone states such as Assam and Bihar, displacement often forces women into overcrowded shelters with inadequate sanitation, heightening the risk of infections, gender-based violence, and menstruation-related health issues (WHO India, 2018). Malnutrition, too, is a persistent concern. In many Indian households, women and girls eat last and least, which means that food insecurity resulting from climate stress affects them disproportionately (Rao et al., 2019).

Migration and Feminization of Responsibility

Climate-related stressors such as water scarcity, crop failure, or cyclones have accelerated rural-urban migration, particularly among men seeking employment. This has led to a phenomenon often termed the feminization of agriculture and feminization of responsibility, where women are left to manage farms, households, and communities with little support or access to resources (Rao, 2012).

For example, male out-migration in drought affected districts of Andra Pradesh and Jharkhand has added to the women's burdens of farm and care work without necessarily increasing women's power to make decisions or hold formal authority. Women are forced to assume positions as informal heads of households while remaining marginalized from formal structures of governance and resource allocation.

Lack of Participation in Climate Governance

Women's exclusion from local, regional, and national climate governance mechanisms is a major barrier to effective adaptation. Even in schemes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) or National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC), women's voices are often absent from planning and monitoring processes.

Traditional Panchayati Raj Institutions (PRIs), despite reserving seats for women, often fall short in empowering them to influence environmental policy at the grassroots level. Patriarchal attitudes, lack of education, and time constraints prevent many women from actively participating in climate decision-making forums (Arora-Jonsson, 2011). This results in adaptation plans that do not reflect their lived experiences or priorities.

Intersectionality: Caste, Class, and Tribal Identity

The effects of climate change on women in India are further compounded by factors like caste, class, disability, and tribal identities. For instance, Dalit and Adivasi women face layered exclusions and environmental injustices. More than the mainstream population they are often located in ecologically fragile zones, lack access to healthcare and social protection, and are threatened with displacement through development projects or natural disasters.

An intersectional lens reveals that gendered impacts cannot be addressed in isolation. For instance, in the Sundarbans region of West Bengal, rising sea levels have led to salinization of farmland, forcing Dalit women into insecure forms of labour migration, including domestic work or trafficking-prone industries (UN Women India, 2021). These experiences highlight the necessity for inclusive, sophisticated climate policy that takes into consideration intersecting types of marginalization.

The gendered effect of climate change in India takes the form of visible and invisible consequences ranging from physical loads and health hazards to structural omissions in decision-making and economic adaptation. Identification and tackling of these gender-specific vulnerabilities are critical to establishing equitable climate resilience.

NGO-Led Adaptation Strategies in India

In India, where the confluence of gender inequality and climate risk is so stark, Non-Governmental Organizations (NGOs) have come to play critical roles in responding to the gendered effects of climate change. NGOs work at the grassroots level, frequently by bridging gaps left open by state interventions through community-based, participatory, and inclusive processes of adaptation. NGOs play a crucial role in engaging women at the centre climate resilience work empowering them as beneficiaries, but also as decision-makers, educators, and leaders in their communities.

SEWA (Self Employed Women's Association), Gujarat

Location & Focus: Gujarat and other parts of western India. Target Group: Informal women workers and small-scale women farmers. Approach**:** Livelihood resilience, cooperative development, renewable energy.

SEWA has been a pioneer in integrating climate resilience into the economic empowerment of women working in the informal sector. Recognizing that climate-induced shocks such as droughts and heatwaves affect women's earnings and livelihoods, SEWA initiated a series of community-based adaptation strategies.

Key initiatives include:

- Promotion of Climate-Resilient Livelihoods: SEWA provides training in sustainable agriculture, water-conserving practices, and diversified income-generating activities such as handicrafts and solar-powered enterprises. These efforts have reduced dependence on climate-vulnerable employment.
- Women's Cooperatives: SEWA promotes the formation of cooperatives where women jointly manage water resources, distribute solar lanterns, and produce climate-resilient goods. These cooperatives strengthen collective bargaining and enhance financial inclusion.
- Community Radio and Digital Tools: SEWA has launched initiatives like *Rudi no Radio* and mobile apps to disseminate real-time climate information, weather forecasts, and health alerts tailored to women in rural areas.

Impact**:** Thousands of women have improved their adaptive capacity, gained access to clean energy, and contributed to more climate-resilient economies at the village level (SEWA, 2018).

WOTR (Watershed Organisation Trust), Maharashtra and Other States

Location & Focus: Maharashtra, Madhya Pradesh, Telangana, Odisha Target Group: Small and marginal farmers, especially women Approach: Watershed management, ecosystem-based adaptation, women's SHGs

WOTR integrates ecological restoration with social empowerment by actively involving women in climate adaptation strategies. Their model is built on the principle that ecological resilience and social equity must go hand in hand.

Key initiatives include:

- Water Budgeting and Watershed Planning: WOTR trains women in hydrological mapping and participatory water budgeting to manage

community water usage sustainably. This empowers women to make informed decisions regarding water allocation for domestic use and agriculture.

- Agroecology and Sustainable Farming: Women are trained in organic farming, composting, and climate-resilient crop cycles. These practices reduce dependency on external inputs and improve food security.
- Formation of Women's Self-Help Groups (SHGs): SHGs are engaged in adaptation planning and financial management. Many have taken the lead in adopting rainwater harvesting systems and setting up climate-resilient seed banks.

Impact: WOTR's work has increased agricultural yields, improved water availability, and enhanced women's leadership in resource governance (WOTR, 2020).

Kudumbashree, Kerala

Location & Focus: Kerala Target Group: Women from low-income households Approach: Community resilience, disaster response, food security Kudumbashree is a government-supported poverty eradication and women's empowerment mission, operating as a decentralized network of neighborhood groups. It has been instrumental in embedding climate resilience into grassroots governance.

Key initiatives include:

- Flood Relief and Community Preparedness: During the 2018 and 2019 Kerala floods, Kudumbashree's women-led groups were critical in disaster response. They managed relief camps, distributed supplies, and coordinated sanitation efforts.
- Promotion of Urban Farming: Women's groups have adopted organic vegetable farming in urban and peri-urban areas, reducing dependence on external markets and enhancing household nutrition.
- Sustainable Livelihoods and Micro-enterprises: Kudumbashree supports women's collectives in climate-smart enterprises such as biogas production, recycling units, and eco-tourism initiatives.

Impact: Kudumbashree has reached over four million women, many of whom have transitioned from passive recipients of aid to active agents of change in building local climate resilience (Kudumbashree, 2019).

Gram Vikas, Odisha

Location & Focus: Odisha (especially disaster-prone tribal districts) Target Group: Rural tribal women Approach: Integrated water and sanitation, housing, disaster preparedness Gram Vikas has worked for decades in rural

Odisha, promoting inclusive community development and disaster-resilient infrastructure. Its gender-sensitive climate adaptation efforts are rooted in rights-based approaches.

Key initiatives include:

- Water-Secure Villages: Women have been involved in the construction and management of decentralized water systems, ensuring equitable access even during dry seasons or after cyclones.
- Disaster Preparedness Training: Women are trained to manage early warning systems, lead evacuation drills, and ensure food and water security during emergencies.
- Women in Governance: Gram Vikas supports women's inclusion in village committees, ensuring they influence decisions related to land use, water management, and reconstruction after natural disasters.

Impact: The model has improved health, education, and disaster resilience indicators in tribal communities, while simultaneously shifting gender norms and expanding women's leadership (Gram Vikas, 2017).

Challenges in Gender-Responsive Adaptation in India:

Although NGOs in India have been pivotal in mainstreaming gender-sensitive climate adaptation, their work is not without weaknesses. These limitations are owned to structural, institutional, financial, and socio-cultural constrains that limit the scope, effectiveness, and long-term sustainability of their interventions.

Cultural and Institutional Barriers

Patriarchal norms in many Indian communities continue to limit women's participation in adaptation programs. Despite NGO efforts, women are often excluded from decision-making spaces or expected to contribute labour without recognition (Arora-Jonsson, 2011).

Limited Resources and Funding

Many grassroots NGOs struggle with inconsistent funding, especially for long-term climate projects. Donor-driven models often emphasize short-term outcomes, limiting sustained impact (Tschakert & Machado, 2012).

Lack of Gender-Disaggregated Data

Data on the gender-specific impacts of climate change in India remain sparse. This hampers the ability of NGOs and policymakers to design targeted interventions and track progress (UNFCCC, 2019).

Conclusion:

Climate change is not a gender-neutral issue. In India, its impacts are highly gendered, largely harming women especially those residing in rural, tribal, and socio economically disadvantaged groups. From water shortages and food insecurity to disaster exposure and livelihood depletion, women experience

specific and culminative challenges formed by deeply rooted social norms and structural inequalities.

This paper has illustrated how Non-Governmental Organizations (NGOs) have become key players in designing gender-responsive adaptation plans. Using community-based frameworks, capacity development initiatives and participatory governance processes. NGOs such as SEWA, WOTR, Kudumbashree, and Gram Vikas have exemplified the transformative power of putting women at the centre of climate resilience.

However, these efforts are constrained by multiple challenges related to limited funding, socio-cultural resistance, lack of intersectionality, and inadequate integration with state policies. In order to scale and sustain truly gender-equitable adaptation, recognition of women as active agents of changenot merely vulnerable victims. This necessitates not just technical interventions, but systemic reforms in climate governance, financing, data collection, and societal norms.

The path forward must be collaborative, inclusive, and intersectional. Strengthening the role of NGOs through better policy integration, targeted funding, and participatory monitoring can catalyse a shift toward just and gender-transformative climate action in India. As climate risks continue to intensify, empowering women and communities to lead adaptation efforts is not only a matter of equity but also a strategic imperative for sustainable development.

References:

- ActionAid India. (2021). Women-Led Climate Resilience: Case Studies from Urban India. Retrieved from https://www.actionaidindia.org
- Agarwal, B. (2010). Gender and Green Governance. Oxford University Press.
- Arora-Jonsson, S. (2011). Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change. Global Environmental Change, 21(2), 744–751.
- Development Alternatives. (2019). Women and Climate Resilience: Grassroots Innovations for a Changing Climate. Retrieved from https://www.devalt.org
- Gram Vikas. (2017). Building Climate-Resilient Communities through Water and Sanitation. Retrieved from https://www.gramvikas.org
- Kelkar, G. (2009). *Gender and Productive Assets: Implications for Women's Economic Security and Productivity*. IFAD.
- Kudumbashree. (2019). Kudumbashree and Climate Resilience: Women Leading Change in Kerala. Government of Kerala. Retrieved from https://www.kudumbashree.org
- SEWA. (2018). Women, Work, and Climate Resilience. SEWA Academy.
- Tschakert, P., & Machado, M. (2012). Gender Justice and Rights in Climate Change Adaptation. Feminist Economics, 18(3), 1–34.

- UN Women India. (2021). *Gender and Climate Change: Women as Change Makers*. https://www.unwomen.org.in
- UNDP India. (2021). Gender and Climate Change: Strengthening Women's Role in Climate Action. United Nations Development Programme India. Retrieved from https://www.in.undp.org
- WHO India. (2018). Gender, Climate Change and Health in India. World Health Organization, India Office.
- WOTR. (2020). Empowering Women for Climate Resilience: Lessons from Watershed Projects in India. Watershed Organisation Trust. Retrieved from https://www.wotr.org.

A Study on Fertility Cult of the Indus Period : A Criterion to Evaluate the Role of Women in Ancient Society

Bhaswati Basu
Assistant Professor, Dept. of Philosophy
Sri Ramkrishna Sarada Vidya Mahapitha

Abstract: Though Vedic society was patriarchal, most scholars agree that women in early Vedic period held a most elevated position. Vedic hymns uphold the equal status of men and women, but in the later Vedic period, position of women was declined, and it continued to decline in successive periods. In pre-Vedic Indus period, women had important role to play in their agriculture based economic system. The discovery of a large number of terracotta female figurines and stone icons of fertility symbols imply that the worship of female goddess associated with fertility cult has been held as one of the major features of Harappan religion. The material mode of life of people generally provides for the type of the deity and manner of worship prevalent in a given society. This accounts for the extensive development of the cult of Mother Earth based upon fertility rituals in the agricultural societies of Indus people. The primitive analogical belief in identification of earth with woman,natural fertility with human fertility and women's significant role in agriculture based socio-economic system constituted a matriarchal social structure of Indus civilization. Objective of this paper is to present a philosophical analysis of the matriarchal nature of the Harappan societies and evaluate the role of women from socio-economic perspective in the historical contexts of Goddess worship and fertility cult.

Key words: Indus civilization, goddess worship, earth mother, fertility cult, matriarchal, women, female principle, agriculture.

Introduction:

Rigveda holds that desire (*kama*) is the first evolute of the Supreme Being (X.129.4)[1]. The *Brihadaranyaka Upanishada* (BU) accepts the Rigvedic hypothesis of desire being the root cause of the creation of this gross world. Teleological doctrine of creation in it presupposes that the basic desire of delight of having a companion is responsible for the generation of various species of creatures. This theory of creation holds that fulfilment of such desire to be responsible for the splitting of the primordial hermaphrodite creator's (*Brahman*, the Supreme Soul) body into two halves of male and female (BU, 1.4.3)[2]. So,

according to Vedic concepts male and female i.e. man and woman being two aspects of the same reality are supposed to be similar to each other in nature and potentiality and thus of equal status. Though Veda holds the equality of man and woman, the history of Vedic civilization gives evidence of the fact that in the later Vedic period, status of women was declined. Subsequently they were considered inferior and subordinate to men. But in the Indus Valley period status of women was completely opposite to that of the later Vedic period. Here position of women was sometimes even higher than that of men. The report of Archaeological Survey of India based on excavations between 1997 and 2000, in Rakhigarhi site of Hissar, Haryana provides evidence in support of this fact. The field observation in the cemetery area has pointed out that people of this period mostly cremated the deceased along with some wares as offerings for their use in after lives. The report says, "Conspicuously, the selection of earthen wares and their arrangement in the grave-pit postulates a pattern in the interment practice with regard to disposal of deceased of male and female sex. The types of vessels in red ware are dish-on-stand, bowl-on-stand, goblet, beaker, medium and small sized vases with globular body and low neck, convex sided bowl, basin and dishes. …At Rakhigarhi the burials of male and female allowed a particular type of funerary pattern in respect of male and female sex. The female deceased were offered more than double number of earthen wares as compared to opposite sex. Apart from this, the female deceased were invariably offered dish-on-stand, bowl-on-stand beaker and medium sized vases, denoting their status over and above male counterpart"[3]. Prevalence of fertility cult in Indus period as the part of religious practices also denotes that, women had a more significant role to play in the socio-economic system compared to men. This paper attempts to provide a philosophical analysis of fertility cult practised by Indus people with its historical context to evaluate the role of women in a matriarchal social system in the ages of Indus valley civilization (or Harappan civilization or Sindhu-Saraswati civilization -whatever we call it as all these names are used by scholars due to its vast geographical extent).

Goddess worship and fertility cult

The predominance of the mother Goddess cult was a prominent feature of the religion of the agricultural people of Harappan era who based their social system on the principle of mother- right. This primitive cult in the earlier phases of social evolution shows that attention was first concentrated on the feminine aspects of the process of generation. In Harappa and Mohenjodaro, two major cities of the Indus Valley civilization, terracotta female figurines were found in almost all households indicating the presence of the cult of goddess worship. Most of the figurines are naked with elaborate coiffures and a few are in poses that expose the genitals. The type of model which is frequently interpreted as having a religious significance is a standing and almost nude slim female figure

with a distinctive fan-shaped head-dress and collar, wearing a band of girdle about her loins. She is heavily ornamented with necklaces, armlets, bangles, anklets, and earrings. In many of the figurines, the ear ornaments take the form of shell-like cups suspended by bands on either side of the head with traces of black residue of burnt oil, suggesting that they were lamps used as votive offerings. Such figurines may have been religious images worshipped in households and some of them may have had a cultic significance. Others may have been toys, decorative items or articles of domestic rituals."Describing all female figurines as representations of a single great 'Mother Goddess' associated with fertility and maternity clearly over-simplifies the situation. The attributes of the figurines and the contexts in which they were found have to be considered carefully before assigning them a religious and cultic significance. … not all female figurines necessarily represented goddess…, and not all goddesses necessarily had maternal associations."[4] A variety of seals and stone icons along with other artifacts, unearthed at Harappa and Mohenjodaro, hint at the fertility-related beliefs of the Indus people. A number of fertility symbols such as round stones (symbol of *lingas*) and circular stones with holes in the middle (symbol of *yonis*) were found based on which we can conclude that they worship male and female creative energy. In popular Hinduism, *linga* and *yoni* (phallus and vulva, representing the male and female sexual organs respectively) stand for Shiva and Devi. These objects suggest that the cult of Goddess worship of Indus Valley civilization was associated with fertility cults. "Many years later, George Dales argued that the contexts in which these stones were found do not suggest cultic significance. Some of the ring stones had lines on them and may have had architectural use…Dales made his arguments forcefully; however, a terracotta piece which closely resembles a *linga* with a *yoni-pitha* (yoni base) has recently been found at Kalibangan"[5].

Role of women in agricultural economy

According to Sir John Marshall, this is very obvious to presuppose the existence of a matriarchal social system as the background of mother worship in Indus civilization. It was an urban civilization and such a civilization could be developed only with the support of agriculture based economic system. Depiction of humped bull on seals implies the existence of a prosperous agricultural community. The discovery of 'Great Granary' lends support to this. "Great Granary is among the well-known buildings at Harappa and consisted of a series of brick platforms on which stood two rows of six granaries. In Mohenjodaro, the largest building is a granary, 45.71 m long and 15.23 m wide…"[6]. The aforementioned ASI report states that "The results obtained from the excavations indicate subsistence economy of mixed type wherein agro-pastoral needs were prioritised by cultivating two crops rabi and kharif besides domestication of animals"[7].V.G.Childe claims that agriculture is an invention of

women. He wrote: "To accomplish the neolithic revolution mankind, or rather womankind, had not only to discover suitable plants and appropriate methods for their cultivation, but must also devise special implements for tilling the soil, reaping and storing the crop, and converting it into foods"[8]. Prof. Debiprasad Chattopadhyay, one of the exponents of Marxist historiography, explained the reason for the extensive survival of the mother-right elements in India from an economic point of view. He holds that, supremacy of the female in pre-Vedic ancient India was connected with the early agricultural economy since economic life of this period was predominantly agricultural and agriculture was the discovery of women[9]. So, women had an important role in productive economic system of Indus civilization. They shared labour in heavy manual works like agriculture or domestication of animals. The aforesaid ASI report cites size of shell bangles and battering marks on them, found inside burials – "… Some wide heavy bangles found at different sites show some battering marks on them. That means heavy manual labour was also part of the work of these particular women"[10]. It supports the conjecture that women faced no discrimination at that time while doing heavy work at home or outside.

The material mode of life of a people ordinarily provides the rationale for the type of deity and the manner of worship prevalent in a given society. This accounts for the extensive development of the cult of the mother Earth, conceived as a female deity, among agricultural peoples. Ritual based upon fertility magic must have played a very significant part in the agricultural societies. "The fertility of the soil retained its immemorial association with the women who had been the tillers of the earth and were regarded as the depositaries of agricultural magic"[11]. The initial stages of undeveloped agricultural economy created the natural conditions for the dominance of women over men as the work of tilling soil, sowing and reaping is slow, arduous and uncertain. It requires patience, foresight, faith, care, tenderness – which are the qualities possessed by women. Mentioning from 'The Golden Bough' of J.G.Frazer, Prof. N.N.Bhattacharya remarked, "The magical rites designed to secure the fertility of the fields seemed to belong to the special competence of women who were the first cultivators of the soil and whose power of child-bearing had, in primitive thought, a sympathetic effect on the vegetative forces of the earth"[12]

Philosophical significance of Mother Earth cult

All over the world, the earth spirit is generally regarded as female and the presiding deities of agriculture are mainly goddesses, as the idea of fertility and reproduction is connected with women. People of the past making unconscious use of the principle of analogy came to the conclusion that natural productivity should be viewed in terms of human productivity, earth mother in terms of human mother. They believed that human fertility and land fertility are two

aspects of the same mystery and their belief in fertility magic compelled them to worship the Mother Earth as goddess of plants and crops. So, the cult of the Mother Earth, conceived as a female deity, was more prominent among the agricultural tribes.

The anthropologists have been assigned the surviving tribes of India to three main categories: (1) hunting or food gathering, (2) agricultural and (3) pastoral. The categories, however, are neither mutually exclusive nor do they constitute a strict chronological sequence. In a hunting society a special relationship generally develops between man and animal which leads its members to perform certain magical rights to secure prey in the next hunting expedition. Their staple diet acquired a sacred character and religious significance. Relics of this primitive belief in the sacredness of animals are found abundantly in latter sacrificial cults. According to Prof. N.N.Bhattacharya, "Human societies, where the transition from hunting and food gathering to higher forms of production was marked by an extensive development of agriculture, the influence of the life-producing mother as the central figure of religion was naturally extended to the realm of vegetation and fertility. Mother earth thus became the womb in which crops were sown"[13]. This accounts for the extensive development of the cult of Mother Earth among the agricultural people of Indus Valley civilization. Prof. D.P.Chattopadhyay speculates, Indus religion was based on worship of Devi, where Devi means *Basumata* or Mother Earth - the earth was identical with mother. Wish for the fertility of soil was the reason behind the imagination of *Basumata* and such desire could be a desire of those people whose chief means of livelihood is agriculture[14].

Relevant archaeological evidences

In this connection we may refer to several numbers of seals unearthed at Harappa site. A seal, found at Harappa, shows a seated female figure with hands raised in an attitude of supplication and a male figure standing in front of her with a sickle-like object in his right hand probably indicates an association between the female figure and crops. Marshall suggested that the seal portrays a ritual sacrifice where the human blood was offered to the Earth Goddess depicted on the reverse side of the seal for ensuring agricultural productivity. The cult of the Earth or Mother Goddess is evidenced by this depiction which shows a nude female figure upside down and with legs apart and with a plant issuing from her womb. Marshall wrote, "Although unique,…, in India, this striking representation of the Earth Goddess with a plant growing from her womb is not unnatural, and is closely paralleled by a terra-cotta relief of the early Gupta age, from Bhita in the United Provinces, on which the Goddess is shown with her legs in much the same posture, but with a lotus issuing from her neck instead of her womb"[15]. Here he conceived this visual form of Earth Goddess as the most nascent version of a kind of fertility figure known as the *Lajja Gauri.* This idea

of vegetation emerging from some part of the body of the goddess reminds us of the *Devi Mahatmya* concept of her *Shakambhari* aspect, in which she is said to have nourished the drought afflicted people with vegetation produced from her body. In a passage of the*Devi Mahatmya* of *Markandeya Purana*, the goddess says: "…I shall support the whole world with the life sustaining vegetables which shall grow out of my own body during a period of heavy rain. I shall gain fame on earth then as *Shakambhari*"[16]. The association of the Earth Goddess with the vegetative forces of nature is not confined only to the said Shakambhari-seal alone. There are many others in which trees and plants are associated with the goddess. In one such seal, the goddess stands between the bifurcated branches of a pipal tree in front of which appears a half kneeling worshipper behind whom stands a goat with a human face and in the lower section there are seven persons dressed in short skirts and wearing long pigtails[17]. Apart from nude female figurines and depictions on seals, ritual objects like large stone phalluses and vulvae specify survival of magic fertility rites which is the basis of primitive Tantrism. The Prototype of the Lord Shiva depicted in a steatite seal discovered at Mohenjo-daro (usually referred to as the Pashupati seal) may be regarded as the consort of the Devi, the mother goddess.This shows a three-faced male figure with a buffalo horn head-dress seated on a dais in the posture of a *yogi.* As he is surrounded by animals, Marshall noticed a striking resemblance between this deity and the lord Shiva of later Hindu mythology who is known as *Pashupatinath* (God of the animals). It gives evidence that though the Indus people had a female principle dominated religious system, a male deity also exists in their pantheon.

Influence of social system in philosophy

The inclusion of a male principle in the Harappan religion is not inconsistent with a female dominated religious system. In the later Shakta theology, a completely female principle-oriented system, we find that the male principle has some part to play. Here, we can refer also the role of the all-pervading female principle '*Prakriti*' and male principle '*Purusha*' as conceived in the *Samkhya* School of philosophy. In *Samkhya* theory of evolution, the relation between *Prakriti* and *Purusha* is explained in terms of that between a man and woman. The female principle *Prakriti* is conceived as the primordial matter which evolutes into the gross world while the male principle *Purusha* is conceived as a passive spectator of this evolution. Though the creation results from the union of *Purusha* and *Prakriti*, *Samkhya* describes *Purusha* as an indifferent and inactive witness which indicates the influence of pre-Vedic religion on it. Referring to the anomalous position of the male principle in the *Samkhya* system, *Samkaracharya* asked: 'if the *Purusha* is so insignificant and indifferent, how is it that he takes so important part in the affair of creation?' This contradiction cannot be explained except by postulating a matriarchal origin of the system. The term

'*Darshana*' (philosophy) not only implies abstract knowledge obtained through reason, but also experiences of real life. The models and images that represent the reality are such that they are derived from actual lived situations. Peoples of the ancienttime projected their experiences into the objects around them and thus associated various ideas in order to constitute a practical philosophy of life. The origin of the anomalous position of the male principle of creation in the *Shakta* and *Samkhya* philosophy can presumably be traced to the anomalous positions of the males in a matriarchal society. "…in a matriarchal system, the father has a significant role in the matter of procreation, though in his family he is insignificant and a passive spectator, exactly like the *purusha* of the *Samkhya*"[18]. Since the Vedic society was patriarchal in nature, the root of the *Samkhya* philosophy is to be sought in some non-Vedic matriarchal tradition. The concept of a material *Prakriti* in the dualistic metaphysics of *Samkhya* system may be viewed in its historical connection with the early agricultural societies of the Indus civilization which developed the conception of a material Earth Mother supposed to represent the forces that stimulate the generative powers of nature.

Conclusion: The study of religious beliefs and practices of Indus civilization shows that the social structure of this civilization based on its interrelated socio-economic-cultural traits shaped the religious faith and philosophy of the populace. But such oversimplified assumption, though evident from archaeological sources, needs careful investigation and consideration. In view of the history of the later periods such an invariable connection between social pattern and religious cult cannot be established. In later Vedic period, the cult of mother worship was prevailed, but their social systems upheld patriarchy. History gives evidence of the fact that in the later Vedic period, status of women was declined and it continued to decline in subsequent periods. In later Vedic and successive periods, agricultural economy was developed with the invention of advanced implements like plough and women were debarred from agricultural works and thus excluded from productive economic system. They were removed from the heavy works to domestic duties and value of their labour in household works was not recognised considering it as 'reproductive' type of labour in terms of Marxist feminism. Women were assigned to the domestic sphere, which being entirely private sphere, their contributions were unrecognized in the socio-economic system. On the other hand, despite the patriarchal character of social system and predominance of worship of gods over the goddesses, most scholars agree that women in the early Vedic period held an elevated position than in subsequent times. Hence, Harappan civilization was matriarchal –this general presupposition, only on the basis of archaeological evidences like seals and female figurines with cultic significance, is not unquestionable. It might be representation of a matrilineal society instead.

References:

1. Vasudeva S. Agrawala, Hymn of Creation (NasadiyaSukta, Rigveda, X.129); *Trans.* Griffith, Varanasi, Prithvi Prakashan, 1963, pp.2.
2. Ajai Kumar Chhawchharia, One Hundred Eight Vedic Upanisads, Vol. 3. Part I; 1st ed.,Varanasi, Chaukhamba Surbharati Prakashan, 2013, pp.103.
3. (https://www.academia.edu/24830219/Rakhigarhi_excavation_report_new 09/03/2024) ASI Report Excavations at Rakhigarhi (1997-98 to 1999-2000), pp.132-33.
4. Upinder Singh, A History of Ancient and Early Medieval India, 16th ed., Noida, Pearson India Education Services Pvt. Ltd., 2019, pp.171.
5. ibid, pp.172.
6. D.N.Jha, Ancient India in Historical Outline, New Delhi, Manohar Publishers and Distributors, 2016, pp.32.
7. Op.cit,ASI Report, pp.129.
8. V.G.Childe, What Happened in History, Aakar Books, Delhi, 1st ed. 1942; rep. 2017, pp.57-58.
9. Debiprasad Chattopadhyaya, Lokayata, New Delhi, People's Publishing House, 2012, pp. 232
10. op.cit, ASI Report, pp.280.
11. R.Briffault, The Mothers, Vol. III; London, George Allen & Unwin Ltd, 1927; rep. 1952, pp.117
12. N.N.Bhattacharyya, History of the Sakta Religion, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2nd ed. 1996; rep. 2015, pp.7-8
13. ibid, pg.7
14. Debiprasad Chattopadhyay, ibid.
15. J.Marshall, Mohenjo-daro and the Indus Civilization, Vol.I; London, Arthur Probsthain,1931, pp.52
16. Markandeya Purana, Devi Mahatmya, XI.48-49a
17. J.Marshall, ibid. pp.63
18. N.N.Bhattacharyya, The Indian Mother Goddess, New Delhi, Manohar Publishers and Distributors, 1999, pp.94.

Secularism and Indian Constitution

Bhumidhar Roy
Asst. Prof., Dept. of Political Science
Bolpur College

Abstract: The term 'Secular'means being separate from religion or having no religious basis. Secularism means the separation of religion from political, economic, social and cultural aspects of life, religion being treated as a purely personal matter. India, since its independence in 1947, has been a secular state. The secular values were enshrined in the constitution of India. India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, is credited with the formation of secular values in the modern history of the country. With the Forty–second Amendment of the Constitution of India enacted in 1976, the Preamble to the Constitution asserted that India is a secular nation. India is a sovereign, socialist, and secular. Democratic, Republic. It emphasizes the fact that, constitutionally, India is a secular country which has no state religion. And that the state shall recognize and accept all religions, not favour or patronize any particular religion. The objective of the study is to show what kind of measures have been taken by the Indian constitution to protect secularism in our country. There are some factors that have put Indian Secularism in danger.

Key Words: Secularism, Independence, Democratic, Constitution, Preamble.

Introduction:

India is a vast country where people of various religions, castes, creeds and socio-cultural backgrounds live. This country is diverse also concerning its diverse population. Although the word secularism was not mentioned in the Constitution since the beginning, it was embedded in our polity as its philosophical phenomenon. Though secularism is the basic structure of the Indian Constitution, its practicability in contemporary Indian conditions is questionable because there is increasing use of religion in the social construction of ethnic and communal identity, consequently forming political mobilization. The caste, religion and regional divisions are still prevalent in India and play a significant role in shaping the ideologies of individuals and groups. While secularism has been integral to India's democracy for more than seventy years, its limitations and implementations are still debatable. The actual meaning of secularism is that the State should have no religion of its own, and no one could proclaim to make the state a theocratic State (Basu, 2007), but it does not mean that the State should stay aloof from religion. The objective of inserting the word secular in the Constitution was to spell out expressly the high ideas of socialism, secularism and integrity of the nation.

Secularism enables people to see the imperative requirements for human progress in all aspects and cultures, including social advancement (Basu, 2007). But nowadays, secularism has also been equated to the concept of modernity, which is a subjective thing that matters from an individual perspective. Undoubtedly, secularism and modernity are interlinked, but it is a general. Feeling that the central ideal of equal respect for all religions has not been translated into a social reality, but India has inherited multiculturalism since ancient times due to multiculturalism, India has a unique identity in the world. For a nation to be created, there must be one language, one culture, one history and one religion. But in India, this is an exception. In India, people of different religions, and different cultures live together. Still, India remains a nation. In India, along with multiculturalism, social tolerance is the backbone of the society. After independence, the Indian Constitution has worked to maintain national unity and social tolerance by keeping tougher the pluralistic pattern of oursociety.

Meaning of Secularism

Secularism means that the state does not give shelter to any particular religion. Religion means accepting personal matters and allowing them to behave according to their religion. In the British Encyclopedia, secularism is defined as non-spiritual. Secularism is not atheism but has the same faith in all religions, and there will be no particular religion of the state. Also, the political system will not be governed by religion. Citizens of different faiths may be living in the States. Every citizen can live life freely according to his or her religion. This is the meaning of secularism. In the Indian tradition, secularism can be defined by the following three ideologies.

One, liberal ideology has endorsed the Western concept of secularism. Politics and religion should be completely different; and religion should not affect politics, and politics should not be affected by religion. Both things are agreed differently.

Second, the transformationalist ideology emphasizes social, economic and political development. This ideology recognizes that religion should be limited to the private life of the individual and should try to create scientific perspectives among the individuals. However, it is a system of doctrine practice that disregards or rejects any form of religious faith and worship (Basu, 2007).

The basic principle of a secular state is that there should not be any interference by religion in the affairs of the State and vice versa, i.e. the state should not interfere in the affairs of religion (Tarkunde, 1995).

Indian Constitution and Secularism

The Indian concept of secularism is that the relations between State, society, and religion are not well defined. Personal laws vary from religion to religion. The precarious position of religious minorities and the affiliations of political

formations with religious fundamentalists pose severe challenges to the success and future of secularism in India. It can be conceded that secularism in India today is too politicized, and it is necessary to find ways to depoliticize secularism and to move it further into the domain of civil society. At the outset of the making of the Constitution, the concept of secularism was not expressly mentioned in the Indian Constitution. However, the Indian Constitution has spelled out several provisions in Part III (Articles 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30), Part IV (Article 44), and IVA (clause (e)) that reflects the existence of secularism. The conjoint reading of all these Articles makes it evident that the intention of the Constitutional fathers was neither to oppose religion nor to promote rationalization of culture. Although the word 'secular' was first time inserted in the Preamble of the Constitution by the 42nd (Amendment) Act, 1976, which came into effect on January 3rd, 1977, secularism was part of the Constitution word secular was inserted in the Preamble (Singh, 2013).

The 42nd Constitutional (Amendment) Act of 1976 stated that 'secular' means a republic in which there is equal respect for all religions. Despite the clear letters of the law, the Hon'ble Supreme Court has interpreted it on various occasions via various judgments. But one thing is apparent secularism, as mentioned in the Indian Constitution, does not mean anti-God or Atheist. Instead, it means the State should not have any religion. Supreme Court of India, in the case of Indira Nehru Gandhi v RajNarain (AIR 1975 SC 2299), held that secularism means that State shall have no religion of its own and all persons of the country shall be equally entitled to the freedom of their conscience and have the right freely to profess, practice and propagate any religion.

Suppose we look into the situation even before 1976; people of all religions in India have equal rights and are free from discrimination. Article 14 of the Constitution provides equality before the law and equal protection of laws to all. However, reasonable classification can be made and should be treated alike. The Constitution of India prohibits the State from discriminating against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Article 15(1) Article 15(2) emphasizes that no citizen shall, on any of the above grounds, be subject to any disability, liability, restriction or condition concerning access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment or the use of wells, tanks, etc., which are wholly or partly maintained out of state funds or are dedicated to the general public. Article 16(1) lays down a general rule that there shall be equal opportunity for all citizens relating to employment in the office of the State (Singh, 2013). Article 16(2) of the Constitution is an elaboration of Article 16(1), which says that no citizen shall, on grounds only of religion, race etc., be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office of the State (Article16 (2)).

India is a pluralistic society and multi-religious country; that is why the framers of the Constitution adopted the concept of religious neutrality and conferred religious freedom to various religious groups (Jain, 2008). The religious tolerance and equal treatment of all religious groups in the spirit of our secularism (Jain, 2008). Indian Constitution adopted the principle of non-interference in religious matters with certain exceptions (Jain, 2008). Articles 25 to 28 of the Indian Constitution make clear that everyone living in India should be entitled to profess his religion without hindrance, so long as the citizen obeyed the common law of the land. Article 25, a reservoir of religious and secularism in India, makes explicit provisionson when and how religious freedom is available and curtails freedom. This Article guarantees to every person the right to freely profess, practice, and propagate his religion. In Article 25, the word 'any person' has been mentioned, reflecting that voluntary conversion from one religion to another religion is valid as a person is free to have faith in any religion (Rai, 2008). But, conversion by force, fraud, or inducement is not valid because it may disturb the public order. Also, Article 25 empowers the State to impose restrictions in the interest of public order. Article 25(1) 'Public order' here means a thing that disturbs the current of the community's life and does not affect merely the individual. If the situation disturbs the current life of the community, it will amount to a disturbance of public order (Stanislaus v State of MP, 1977). The State will not interfere in religious affairs, so the State cannot regulate religious activity. However, a secular activity that is associated with a religious matter may be regulated by the State (Article 25 (2)). An activity will be treated as religious if it is regarded as an essential and integral part of the religion and will be secular if it is not considered a necessary part of religion.

However, sometimes, situations compel the State to use legal coercion for urgent social reform. For instance, an Act that was enacted to prohibit polygamy among the Hindus was held valid because polygamy was not an essential and integral part of the Hindu religion. Similarly, Sati and Devdasi systems in Hindus and 'triple talaq' in Muslims have been abolished as these were social evils and not the essential part of the religions. Polygamy, which is still permitted among Indian Muslims and is not permissible in many other Muslim countries, reflects that polygamy is not an essential part of such religion. Hence, for social welfare, social reform, and the nation's interest, the Uniform Civil Code can also be applied as it is permitted by the Constitution of India (Article 25(2)(b)).

Importance of Secularism in India

Secularism has no alternative option in a multicultural nation like India; therefore, the Indian Constitution adopted secularism. People of different languages and religions live in the Indian Union. They needed secularism to keep

them together. Therefore, with the right to freedom, it was necessary to accept secularism. Though there is an attempt to bring unity in diversity in India, the minority communities suffer injustice and oppression of minorities. Of course, even after the formation of a secular state, the spirit of nationalism could not be created. Awareness of social intolerance among minorities is a threat to national integration. There is a need for secularism to instill a sense of nationalism among the minority groups in the country.

Although India has adopted the concept of the secular state, in fact, religion has been politicized. Religious institutions are used for voting politics. Therefore, the principle of secularism is falling behind by increasing communalism. Communalism is anti-democratic, so the concept of secularism needs to be rooted in the promotion of democratic values. In a pluralistic society like India, politics based on religion is detrimental to national integrity. Therefore, in order to build a strong democracy, the values of secularism must be respected in society while respecting religious values.

Secularism and its Reality in India

Secularism is meaningful in a democratic country only when there is a core principle of equality. If there is no commitment towards equality, then there will be no commitment towards democracy. India is a secular state, and a secular State will not favor any religion; instead, it protects and preserves innate pluralism. A question may arise as that why is here special provisions in Articles 29 (Articles 29 (1) & 29 (2)) and 30 (Article 30(1)) of the Constitution to protect the language script and culture of minorities. And also, it is said that India has been a secular State even before 1976, as prescribed by Articles 25 to28, then why the necessity was felt to bring 42^{nd} Constitutional (Amendment) Act, 1976 and insert the word 'secular' in Preamble. This and the way the 42nd Amendment of the Constitution took place is a matter of debate because, at that very time, many opposition leaders were either in jail or underground, and the strength of opposition members in the Parliament was very few because of national emergency.

It would have been better to clarify the meaning of secularism rather than inserting the word secular in the Preamble through this Amendment. One more debatable thing is that if a secular State is completely separated from religion and the law of such a country is also secular, then why are there different personal laws in the country. Why is there not only one law or Uniform Civil Code? In a secular country, the State will not discriminate between religions then why is there control of Government on many temples but not on mosques and churches. The Constitution of India prohibits using taxes for religious purposes, (Article 27) but for looking after the welfare of minorities, the Ministry of Minority Affairs has been created, which brings various schemes to provide financial assistance for minority religions. Haj subsidy was provided to Muslims,

but no such subsidy was available for other religions. Now, this subsidy is stopped; before stopping it, State was doing discrimination which was against the concept of secularism. In a secular state, there should not have been the question of majority and minority because all are the citizens of the same country. So, secularism in India is not like in many European countries. Undoubtedly in India, there is no theocracy, but there is hypocrisy.

As far as the Secularism and Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) is concerned, it is a matter of debate; one group argues that this Act violates the Constitution as it is against the concept of secularism, whereas the Indian Government is saying that the Act is Constitutional. The argument of the group who is against the CAA is that it violates the concept of secularism because the Act grants citizenship to migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Christian, Jain, and Parsi communities who came to the country from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan on or before December 31, 2014, but does not include Muslim in its purview. And also, it is discriminatory in nature as it violates Article 14 as well as Article 15(1) of the Constitution of India. The Central Government's argument is that providing citizenship to anyone is a political matter and is neither against the concept of secularism nor discriminatory. As far as the question of the violation of Article 14 is concerned, the Supreme Court of India, in the case of **State of West Bengal v Anwar Ali Sarkar** (AIR 1952 SC 52) has held that Article 14 prohibits discrimination, but it permits reasonable classification. But the classification should be based on intelligible differentia, and the classification has nexus sought to be achieved. The CAA is an Act to protect people from religious persecution in three neighboring countries Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. All of them are Islamic states where radicalization is increasing day by day, and religious persecution is faced by Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians. So, the discrimination between Muslims and other religions is based on intelligible differentia. It has also been argued by the Central Government that Article 15(1) of the Constitution prohibits discrimination among the citizens of India and the Muslims of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are not the citizen of India, so they cannot get the protection of Article 15(1) of the Constitution. Indian Government also said that CAA does not impinge upon any existing right that may have existed prior to the enactment of the Amendment and further, and no legal, democratic, or secular rights of any of the Indian citizens will be affected. Although the constitutionality of CAA has been challenged before the Supreme Court of India, the case is still pending.

Conclusion

India is known as a secular nation across the world. Secularism means a mode of governance in which the State remains neutral in religious matters and is not supposed to tilt in favour of a particular religion. However, to protect the interest

of minorities, specific provisions have been made in the Constitution, which indirectly reflects that specific discriminatory provisions have been made in the Constitution. In a secular state, the majority and minority should be treated equally. Apart from the above, whenever the word minority was to be considered by the Government, attention had been paid only to religious minorities, whereas the provision in the Constitution is 'religious and linguistic minority. So, if the interest of minorities is going to be protected by the Government, then the constitutional meaning of minority should be taken into consideration; otherwise, the spirit of the Constitution will be defeated.

In 2019, the Central Government brought the Citizenship (Amendment) Act 2019 to protect the interest of six religions facing religious persecution in three neighboring countries but it was strongly opposed by various groups saying that the non-inclusion of Muslims in its purview is discriminatory and also against the concept of secularism which is the basic structure of the Constitution of India. Also, the basic structure of India cannot be changed. But one thing must be kept in mind the basic structure theory was developed by the Supreme Court of India as a limitation in the power of Parliament to amend the Constitution.

Normally, a law that came through enactment cannot be challenged as violating the basic structure. CAA 2019 is not part of the Constitution, so it should not be challenged as violating the basic structure of the Constitution. The Supreme Court of India is the guardian of the Constitution, and whenever any danger comes to affect the secular character of the country, it is always ready to protect the secular character of the nation.

References:

- (1976). *42 nd Constitutional Amendment Act* .
- Bhargava, R. (2002). What is Indian secularism and what is it for? *Indian Rev* .
- (2019). *Citizen Amentment Act* . New Delhi: Government of India .
- D.D.Basu. (2007). *Introduction To The Constitution of India* . Naida: Lexis Nexis.
- Gupta, B. (2018). *SECULARISM AS AN IDEOLOGY : A GLOBAL AND INDIAN PERSPECTIVE* . SSRN Electron.J.
- Indira Nehru Gandhi v Raj Narain , 2299 (SC 1975).
- Jain, M. P. (2008). *Indian Constitutional Law* . Naida : Lexis Nexis.
- Keshwananda Bharti v. The State of Kerala (SCC 1973).
- Pylee, M. .. (2007). *India's Constitution* . Naida : S.Chand and Company .
- Rai, U. R. (2008). *Constitutional Law* . New Delhi : Eastern Book Company.
- S,R, Bommai V Union of India (SC 1994).
- Shayra Bano V Union of India (SC 2017).
- Singh, P. (2005). *Hindu bias in India's secular constitution : Probing flawsin the instruments of governance* . Third World Q.
- Stainslaus V State of MP (SC 1977).
- State of West Bengal V Anwar Ali Sarkar , 52 (SC 1952).
- T.N.Madan. (1987). Secularism in Its Place . *Asian Stud.*

The Great Trigonometrical Survey and Colonel William Lambton : Foundations of India's Topographical Development

Indrajit Mahanta
Research Scholar, Dept. of History
Chaudhary Charan Singh University
Meerut, Uttar Pradesh
&
Santigopal Jana
Assistant Professor, Dept. of History
Fakir Mohan University, Balasore, Odisha

Abstract: The Great Trigonometrical Survey (GTS) of India, initiated in 1802 by Colonel William Lambton, marked a transformative moment in the history of geodesy, cartography, and colonial science. This ambitious project aimed to measure and map the vast Indian subcontinent with unparalleled precision, using advanced methodologies like triangulation and geodetic instruments. The survey not only fulfilled the immediate administrative and military needs of the British colonial government but also contributed to the global understanding of Earth's dimensions and shape. Lambton's leadership and scientific rigor set the foundation for accurate topographical mapping, fostering infrastructural development in India. Despite challenges such as harsh terrains, tropical diseases, and logistical constraints, the GTS achieved remarkable success, influencing infrastructure planning, economic development, and governance. This article explores Lambton's pivotal contributions, the scientific innovations of the GTS, and its long-lasting impact on India's geography and colonial history, highlighting how a colonial scientific endeavor evolved into a cornerstone of modern cartographic and infrastructural advancements.
Keywords: Trigonometrical, Geodesy, Cartography, Topographical Development, British India, Mapping, Surveying.

Introduction:

The Great Trigonometrical Survey (GTS) of India,[1] initiated in the early 19th century, stands as one of the most ambitious and transformative scientific projects undertaken during the colonial era. Spearheaded by Colonel William Lambton in 1802,[2] this groundbreaking endeavor sought to systematically measure and map the Indian subcontinent with a level of accuracy and precision that was unprecedented at the time. It combined cutting-edge scientific methods,

such as triangulation and advanced geodetic instruments, with the practical objectives of supporting British colonial administration, military strategy, and resource management. Colonial India presented a complex and challenging landscape, with its vast geographic diversity, including towering mountain ranges, sprawling plains, and dense forests. The need for accurate maps was imperative for the British East India Company to establish control,[3] administer territories, and manage resources effectively. Beyond these immediate colonial objectives, the GTS also sought to address broader scientific questions, including the measurement of Earth's curvature and dimensions. Colonel William Lambton**,** the visionary behind this project, was not only an exceptional surveyor but also a dedicated scientist. His meticulous approach, coupled with his unwavering commitment to accuracy, laid the groundwork for what would become a multi-decade undertaking. The survey eventually culminated in the measurement of the meridional arc of India, contributing significantly to global geodesy and cartography.[4]

Background: The Need for Accurate Mapping: India, under British rule, was a vast and diverse country with complex topography, ranging from the Himalayan mountains in the north to the coastal plains in the south. Accurate mapping of such a varied landscape was crucial for several reasons:

- **Military Strategy and Control:** The British needed precise geographical information for military campaigns, as well as to facilitate the movement of troops and supplies.
- **Revenue and Land Administration:** Mapping was essential for the efficient collection of revenue, land management, and the settlement of disputes related to land ownership.
- **Infrastructure Development:** With the expansion of roads, railways, and communication networks, accurate maps were necessary to plan and build the infrastructure that would bind the subcontinent together.[5]

Before the Great Trigonometrical Survey, the British relied on rough and imprecise maps. The need for a more scientific, accurate approach to cartography became increasingly apparent, leading to the launch of the survey under Lambton's leadership in 1806.[6]

Colonel William Lambton: Visionary and Pioneer:

Colonel William Lambton, a British officer and surveyor, is often credited as the visionary behind the Great Trigonometrical Survey. Lambton was appointed as the first Surveyor General of India in 1806,[7] a position that would allow him to implement his ambitious plans for a comprehensive survey of the subcontinent. Lambton's expertise in geodesy, a branch of mathematics concerned with the measurement and representation of the Earth's shape, was fundamental to the success of the survey. He recognized that previous attempts at mapping India

were incomplete and inaccurate, and he aimed to develop a scientific, rigorous methodology to create precise and reliable maps. One of Lambton's primary contributions was the introduction of the **trigonometric method** of measurement, which was a significant departure from earlier practices. By using the principles of triangulation, Lambton sought to establish a precise network of baseline measurements across India. His approach laid the foundation for the development of modern cartographic techniques and geodesy.[8]

Scientific and Technical Methodologies: The Great Trigonometrical Survey employed advanced mathematical and observational techniques to measure the Earth's surface with unprecedented accuracy. The methodology was based on **triangulation**, a technique in which the location of a point is determined by forming triangles with known reference points. This process involved the following steps:[9]

- **Establishment of Baselines:** The survey began with the establishment of a baseline measurement, typically a straight line between two points with known coordinates. This baseline would serve as the foundation for further calculations.
- **Triangular Networks:** From the baseline, a network of triangles was established using the principles of trigonometry. The angles between the baseline and other points were measured using instruments like the **the odolite**, a precision instrument for measuring angles.
- **Observational Stations:** Surveyors would establish a series of observational stations across India, often at high altitudes or landmarks, to measure angles accurately.
- **Calculation and Verification:** Using the angles and distances between various points, surveyors would calculate the position of each new point and triangulate the entire landscape. The data was cross-checked for accuracy, and adjustments were made as needed.

The Great Trigonometrical Survey extended across the subcontinent, with the most famous achievement being the measurement of the **Great Arc of the Meridian**,[10] a monumental effort to measure the meridian arc between the southernmost point of India and the Himalayas. This work would later provide essential data for calculating the size and shape of the Earth, contributing to the development of global geodesy.[11]

Contributions to Topographical Development: The GTS had profound implications for India's topographical development and its integration into the global economy:

1.Accurate Mapping of India: The survey produced highly detailed and accurate maps of India, which became the basis for future cartographic and administrative endeavors. These maps facilitated the planning and execution of infrastructure projects, including roads, railways, and canals.

2. Enhanced Military Strategy: For the British colonial administration, precise maps were invaluable for military planning and operations. The GTS provided the strategic advantage of understanding terrain, enabling effective deployment of troops and resources.

3.Contributions to Global Science: The GTS's findings on Earth's curvature and the arc of the meridian contributed to the global scientific understanding of geodesy. These findings were instrumental in refining global mapping systems and calculations.[12]

4.Economic and Administrative Development: The detailed geographical knowledge gained from the GTS allowed for more efficient taxation, resource extraction, and land management, consolidating colonial control over Indian territories.

Challenges and Obstacles in the Survey:

The Great Trigonometrical Survey faced numerous challenges,[13] many of which were unprecedented in the history of surveying. These challenges included:

- **Geographical Diversity:** India's terrain posed significant difficulties, from the rugged Himalayan mountains to the vast deserts of Rajasthan and the dense forests of central India. Surveyors had to navigate these challenging landscapes with limited resources.
- **Harsh Climate:** Extreme weather conditions, including the monsoon rains and intense heat in the summer, often delayed progress and made the survey work arduous.
- **Logistical Issues:** The scale of the project required large teams of surveyors, laborers, and support staff, which led to logistical difficulties in coordinating such an extensive operation across the country.
- **Resistance and Local Challenges:** Local resistance, particularly from rural and tribal communities, sometimes impeded the progress of the survey. The British administration's presence was often unwelcome in these areas, and there were incidents of hostility towards the survey teams.
- **Inadequate Technology:** Although the triangulation method was highly advanced, the surveying instruments available during Lambton's time were relatively rudimentary compared to modern tools. The accuracy of early measurements was constrained by the limitations of the technology at the time.

Despite these challenges, Lambton's persistence and innovative problem-solving allowed the survey to continue and expand across the Indian subcontinent.

Legacy and Impact of the Great Trigonometrical Survey:
The Great Trigonometrical Survey was a groundbreaking achievement that left a lasting impact on both India and the field of geodesy.[14]

- **Foundations of Modern Mapping:** The survey laid the foundation for modern cartography and topographical mapping in India. It provided detailed and accurate maps that were critical for British colonial administration, military strategies, and infrastructure development.
- **Scientific Advancements:** The survey's measurement of the Great Arc of the Meridian contributed to significant advancements in the science of geodesy. It provided data that helped determine the Earth's dimensions with greater precision and confirmed that the Earth was an oblate spheroid.
- **Influence on Infrastructure Development:** Accurate maps created during the survey were instrumental in planning and constructing major infrastructure projects, including roads, railways, and irrigation systems, which facilitated the integration of the diverse regions of India under British rule.
- **Laying the Groundwork for Post-Colonial Mapping:** After India gained independence in 1947, the mapping systems developed during the Great Trigonometrical Survey formed the basis for the country's national surveying and mapping programs, which continue to this day[15]

Conclusion: The Great Trigonometrical Survey, under the direction of Colonel William Lambton, was a monumental achievement in the history of Indian cartography and geodesy. Despite the immense challenges faced by surveyors, the survey provided accurate and detailed maps of the Indian subcontinent, laying the groundwork for India's topographical development during the British colonial era. Lambton's vision and commitment to precision transformed the way in which India's geographical landscape was understood and managed, and his legacy continues to influence the field of surveying and mapping in India today. the Great Trigonometrical Survey was not only a triumph of scientific and mathematical ingenuity but also a crucial instrument in the British colonial project. It represents a pivotal moment in the development of India's topographical knowledge, one that would shape the country's administrative, military, and infrastructural decisions for decades to come.

References:

1. Lambton, W. (1830). Report on the Great Trigonometrical Survey of India. East India Company.
2. Daniell, W. B. (1823). "The Geodetic Work of Colonel Lambton." Asiatic Journal and Monthly Register for British India and Its Dependencies, Volume 16, pp. 271–289.
3. Simmons, J. (1998). British Imperial Cartography: Mapping the Colonies. Routledge, London. pp. 145–177.
4. Nath, S. (2002). "Measuring India: Lambton's Contributions to Geodesy and Cartography." Journal of the Asiatic Society of Bengal, 67(1), pp. 97–134.
5. Ramaswamy, V. (2004). The Making of Modern India: The Role of Mapping and Surveying. Cambridge University Press.
6. Markham, C. R. (1878). A Memoir on the Indian Surveys. W.H. Allen & Co., London. pp. 2–88.
7. Daniell, W. B. (1823). "The Geodetic Work of Colonel Lambton." Asiatic Journal and Monthly Register for British India and Its Dependencies, Volume 16, pp. 271–289.
8. Kaye, J. (1867). History of the Great Trigonometrical Survey of India. Macmillan and Co.
9. Heaney, G. F. (1985). Indian Cartography: An Evolutionary Perspective. Survey of India Press, Hyderabad. pp. 103–140.
10. Everest, G. (1847). Report on the Measurement of the Great Arc of the Meridian in India. London: Royal Society of London. pp. 15–65.
11. Mukherjee, S. (2012). "Science and Empire: The Great Trigonometrical Survey of India and Its Legacy." Indian Historical Review, 39(2), pp. 245–267.
12. Kapil, R. (2019). Cartographic Empires: The Great Trigonometrical Survey of India. Oxford University Press, Oxford. pp. 112–195.
13. McCosh, J. (1838). Topographical and Statistical Report of British India. W. Thacker & Co., Calcutta. pp. 33–56.
14. Cox, M. (2001). Colonial Mapping and Its Impact on the Indian Subcontinent. Historical Geography Journal, 35(2), 55-74.
15. Phillimore, R. H. (1953). Historical Records of the Survey of India: Volume II (19th Century). Survey of India Press, Dehradun. pp. 45–115.

Tradition in Transition : The Role of Male Guise in the Folk Performance Arts of Balasore

Jeenapriyanka Jethi
Asst. Prof., Dept. of History and Archaeology
Fakir Mohan University
Vyasa Vihar, Balasore
&
Sikhasree Ray
Asst. Prof., Dept. of History and Archaeology
Fakir Mohan University
Vyasa Vihar, Balasore

Abstract: Folk performances have long served as vital expressions of community identity, ritual, and cultural heritage in rural India. This study investigates the unique tradition of boys performing in female guise within the folk dances of Balasore, a culturally rich district in Odisha. In forms such as *Paika*, *Bagha Nacha*, and *Ravana Chhaya*, young male performers don female costumes and mannerisms to represent women on stage—a practice rooted in historical norms that discouraged or restricted female public performance. Through ethnographic fieldwork, interviews with practitioners, and performance analysis, the research explores how these gendered roles are socially constructed, artistically framed, and culturally legitimized. Far from mere impersonation, the act of cross-gender performance is imbued with meanings of discipline, devotion, and continuity. The study also addresses contemporary challenges to this tradition, particularly in the context of shifting gender norms and the growing participation of women in public cultural life. By focusing on the Balasore region, the paper highlights how traditional art forms navigate the intersections of gender identity, cultural performance, and societal change.
***Keywords*:** Gender Performance, Folk Dance, Balasore, Cultural Tradition, Masculinity, Cross-Dressing.

Introduction:

After a long day of fending for oneself, humans have a strong attachment to entertainment that begins at an early age. In the very beginning, games, plays, fights, music, and dancing make up the entertainment. These eventually evolved to represent a group of people who enjoy a certain form of entertainment. As various forms of entertainment evolve, they influence how common people's culture, traditions, and way of life are. A unique and beautiful kind of entertainment, dance also helps to represent a culture or a community.

(Fraleigh,1987). Dance is a term used to describe human movement that has been created and expressed with aesthetic and entertaining aims. The human body moving in space is used to perform dance, which is a fleeting form of expression in a certain shape and style. India gives a very rich representation of herself through classical dances in the global perspective. The Odissi dance is among the most well-known of these traditional dances from Odisha. Aside from these categories, Odisha also includes folk dances, religious dances, and other types of dances that reflect regional differences. The folk dances that boys do while pretending to be girls are the subject of this paper.

Odisha's history has gone through many stages in order to distinguish itself in a special way, and this is evident in the region's culture and heritage, with a particular focus on dance and music. The patriarchy reaches the pinnacle of human society at various stages, which has two effects on dance and music culture. In some ways, the dance that women perform is similar to a dance performed for the Lord, while in other ways, males perform dance in the shape of women to show that women are not involved in religious matters.

A kind of art known as dance incorporates deliberately selected and carefully timed rhythmic motions of the body, frequently accompanied by music or other auditory components. It is a method of physically communicating feelings, concepts, and cultural values of India is well-known for its traditional music and dance. According to Hindu mythology, the Supreme Being, Brahma, is credited with creating dance. The Natya Shastra is a mammoth text that discusses different facets of performing arts, including dance, music, theatre, and aesthetics (Nijenhuis, 1974). It is thought to have been written sometime between the second century BCE and the second century CE. The concepts and practises of dance and drama were formalised in Bharata Muni's Natya Shastra, laying the groundwork for the evolution of many traditional dance forms in India. The philosophy of Tandava dance (Shiva), the theory of rasa, the theory of bhava, expressiveness, gestures, acting techniques, basic steps, and standing postures, all of which are a part of Indian classical dances, are all allegedly discussed in the work, according to Natalia Lidova (Natalia, 2014). The archaeological evidences speak about the Indian dancing dates back thousands of years. Dancers can be seen in the cave paintings at the Bhimbetka Rock Shelters in Madhya Pradesh. Dancers are also shown in sculptures from the Indus Valley Civilization. The Hatigumpha Inscription of Kharavela records the earliest dance performance, which was performed in Odisha. The state of Odisha is home to numerous temples. The walls of the temples are also inscribed with enchanting, lovely dance positions. There are numerous temples, including Konark, Mukteswar, Lord Jagannath, and Parshurameswar etc.

Odisha is a land of Jagannath cult who was a tribal god. However, the dominant higher class that ruled over the Jagannath Temple eventually imposes

patriarchy on its grounds. It resulted in the introduction of the Devadasi custom, according to which women who marry Lord Jagannath serve him as his slaves. They dance the Odissi in front of the Lord. In the present, this dance serves to represent Odisha, it is obvious that only women were allowed to perform the Odissi dance. On the other side, according to Indian mythology *Shiva Tandav* is a kind of dance that can only be performed by men. We can draw a conclusion from the idea that men and women both participate in dance, albeit in different ways. In most instances, the boys played a crucial role in performing the dance under the guise of a woman, which opened a new chapter in the history of performing arts in mediaeval Odisha. The indigenous people perform dances in various religious rituals where they depict their culture, tradition, and mythology through dance performances. Odisha have various kinds of dance forms as per the regions like Danda Nacha in Ganjam, Sambalpuri in western Odisha, *Chhau* and *Jhumar* in Mayurbhanj, *Karama Nacha* in Dhenkanal, *Pala* in Ganjam, *Chadhei Chadeiani* and *Kandhei Nacha* in Balasore etc. Boys have typically done all of these dances since their earliest years. Women are now represented in the majority of regions, as can be shown.

The Reason of The Guise of Lads

To understand how boys present themselves as girls during dance performances, it is important to comprehend why girls do not engage in the dances themselves. Whereas the rich Odishan culture celebrated menstruation and recognised women's equality in the household, the opposite side of the culture completely ignores women's participation in religious activities. The majority of traditional religious activities involve dancing and music. Men portray the role of women by dressing as them because women were not allowed to participate in performing arts like dancing. Let's talk about the main reasons why men dressed like girls and women didn't participate in the oral histories.

Firstly, every month, women must deal with menstruation, which has caused many to withdraw from religious activities. To be completely honest, there is no set time for festivals and menstruation. Therefore, social norms practise blind beliefs such excluding women from participating in religious dance events in order to conceal the issues of no involvement during menstruation. However, because the plot of the performing art is focused on gods and goddesses, men are required to dress like women and act like them in order to play the part of goddesses.

Secondly, the majority of indigenous rituals are performed on temple grounds where the devotee must stay for a set amount of time, typically five to seven or more days. Because of the potential for difficulties like rape, it may not be safe for a woman to spend a lot of time inside the premises of a temple doing rituals with men. Therefore, boys were the only ones who performed during that time.

Thirdly, Due to the patriarchal worldview, many aristocratic and orthodox families forbid their daughters from taking part in dance performances. The populace of a place has a patriarchal worldview as a result of the common people of that area following the local noble family. For a consequence, women are never allowed to participate in performing arts.

Lastly, Families are strongest when women are in charge of running the entire home. If they fully dissimulated their participation in religious activities, it might have an impact on the entire family. They are able to participate in rituals but not in artistic creation. Art performance is a skill that requires appropriate instruction to perform flawlessly. They never participated in performing arts because they had no free time to do so from their daily lives.

The aforementioned debate explains in detail the reasons why women don't participate in performing arts, which leads to a greater proportion of men participating. Numerous stories from Indian mythology can be found in the epics, puranas, oral traditions, and other holy writings. Religious rites are also founded on legends that must be performed on that particular occasion to educate the general public about their customs and culture. It was difficult to show the entire story because women were not involved. So that the people can learn about the ceremonies, traditions, and tradition of the particular occasion, men are required to perform while wearing the clothes of females in a very lifelike manner.

The performing art that portrays boys in guise

Folk performing arts such as Santhali, Sambalpuri, Jhumar, and others are those in which women actively participate. However, the absence of women from dances like Gotipua, Chhau, Danda Nata, etc. is evidence of this. The Santhali, Sambalpuri, and Jhumar basic variations of those dance forms are performed for festivities or entertainment as well as in theatre, but the Gotipua, Chhau, and Danda Nata are specifically performed in religious settings on special occasions as well as in theatre to portray their contemporary culture. Their previously mentioned types of dances are well-known throughout the world, but many other dances have been incorporated into the performance arts of highly indigenous people who actually adhere to their cultures.

Chadehia-Chadeiaani Nacha

Danda Nata classifies the Chadheya-Chadheiaani as a performing art. A minimum of three male performers must be present on stage for this kind of art, which is performed in dance with dialogue. Two of the three male dancers, who are all disguised as women, perform the whole dance style. This dance style has been performed by numerous artists, including musicians that play original music in different parts of the state.

Fg: 1 Chadheia-Chadheiaani Nacha

The Chadheya-Chadheiaani emerge on stage singing the Mahabharata episode of Karna, a renowned doner, while carrying hymns to Siva and Parvati. While Chadheiaani continues to sell her stock of birds, the Chadheya (the bird catcher) continues to catch a variety of birds at her request. The rustic woods beauty Chadheiaani uses poetry to show her personality while dancing and singing. Her spouse was killed by a snake bite while bird-catching when she got home. The poet presents her eagerness and unbounded sufferings in a very elegant way. Also discussed is Chadheiaani's adamant rejection of her deceased husband and the younger brother of Chadheya's proposal of love and marriage. extremely creative and fascinating. One mendicant is sent to try to revive the chadheya. He calls Hanuman, ghosts, the Vetals, Masani Chandi, etc. in his customary manner but is unsuccessful. The snake charmer known as *sapuakela*, then arrives and begins singing about the names of the snakes, their characteristics, and the consequences of their poison. She not only fulfils her pledge to revive the Chadheiaa but also is successful in doing so. Similar to how Patra-Saura-Saurani appear singing on various aspects of their daily lives and other mythical episodes in a variety of ragas and talas, so does Kela-Keluni.

Chhau

In the Nilgiri Block in the Balasore district of Odisha, *Chhau*is a well-liked dance style. It is a hybrid dance form with a tandav aesthetic that is thought to have started as a traditional battle dance. As it was assumed to have been practised at such camps, the term "Chhau" is thought to be derived from the word *Chhauni*, which meaning military camps. It was formerly referred to as the Fari Khel or Farikhanda Khela. Due to the sponsorship and involvement of the royal families of Mayurbhanj and Sareikala states in the eastern portion of Odisha, the dance has been improved and refocused over time (Behera, 2016). Chhau is a dance which originated in Mayurbhanj but it also has famous in Balasore. The Chhau dance is seen as a synthesis of 'Tribal', 'Desi', and 'Margi'

cultural aspects. With later modifications, chhau dance combines "tandav" (vigorous and male) and "lasya" (graceful and feminine) aspects. Not only the dances but also the musical instruments, weaponry, and plots used provide evidence of its war-based history. The 'dhola', 'dhumasa', 'Mahuri', and 'Singa' musical instruments as well as swords, shields, arrows, and bows add to the martial feel of the dance. As was customary in mediaeval Odisha performances, male players frequently play female characters with aproper dress and makeup in the dance. Four phases, "Rangabaja," "Chali," "Nata," and "Natki," which correspond to various performance stages, can be distinguished in chhau dance. Based on the quantity of participants, Chhau dances fall into many categories:

1. Throughout the programme, a single dancer performed the solo piece Phuta.
2. Two performers are involved in the Jodi (Duet).
3. Melaka (Group) - Danced by a group of more than two dancers.

Fg: 2 Chhau Nacha

The majority of the songs used in Chhau dances are of a patriotic nature and are intended to inspire the audience's sense of patriotism and martial spirit. The songs are intended to enhance the performance's theme and mood; dancers and actors are not permitted to sing. The Chhau dance is more than simply a cultural display; it also requires physical labour because some of the representations involve chopping bamboo, creating pieces that are narrowly striped, and using swords to strike blows. This dance style has only ever been performed by men, and it has always featured original narratives such as the Dharama story, the history of Bajirao, religious depictions, etc. However,

contemporary society permits women to participate in chhau dance. This dance gains a richer status similar to Odissi in the Indian culture when women participate. Through symbolic gestures and attitudes, the dance depicts numerous animal, avian, and insect movements. Overall, Chhau is a historic and culturally rich dance style that has developed over time and has played a significant role in preserving the Mayurbhanj and Balasore area of Odisha's cultural heritage.

Chaiti Ghoda

A traditional dance known as the "Chaiti Ghoda" is performed in Balasore during the "Chaitra" (March–April) month as part of Sakti worship but, it is not the origin of Balasore. It is a component of the yearly *Basheli*-worship festival that is held by the local community of fishermen in the coastal region. The presiding deity, Goddess Baseli or Mangala, who is thought to have a horse-headed shape akin to the regional variant of the goddess Bhairavi, is ritualistically worshipped during the dance. Starting on Chaitra Purnima (full moon) and ending on Baisakhi Purnima (April–May), the dancing celebrations stretch for an entire month.

Fg: 3 Chaiti Ghoda

The fishermen's community performs dancing and song at this time as a component of their religious rites and celebrations. Instead of a genuine horse, a fake one is used in the "ChaitiGhoda" dance. It is made out of bamboo poles and coloured clothing. The dummy horse's head is constructed of solid wood or terracotta and is attached to the frame separately. Only once a year, during the dance performance, this head is meticulously preserved and venerated in the village's shrine. Pieces of cloth that have been vividly painted in the colours of red, black, yellow, and white are used to embellish the fake horse's frame. In order to improve its beauty during the dance, flowers are sprinkled liberally. A dancer (Male) enters the picture and performs as though he is riding the horse

after the ritualistic worship of the fake horse has taken place. He then performs a dance that includes several horse-like moves.

Rama Lila

In Odisha, a traditional folk performance and dramatic retelling of the Ramayana epic is known as Rama Lila, also known as Ramalila or Ramleela. The Lord Rama, a manifestation of the divinity Vishnu, and his wife Sita are the subjects of the beloved old Indian epic known as the Ramayana. Not only is the Ramayana valued in religious contexts, but it is also firmly engrained in India's cultural landscape, especially Odisha. Rama Lila performances are a crucial component of many festivals and celebrations in Odishan folk culture, especially during the holiday of Dussehra. In the entire nation, Dussehra, which honours Lord Rama's victory over the demon king Ravana, is celebrated with great fervour. Various Ramayana episodes are brilliantly depicted in the Rama Lila performances through theatrical plays, dance-dramas, and musical recitals. Typically, these performances take place in outdoor locations referred to as "Rama Lila grounds" or "Ramalila pandals." The community as a whole participates in the planning and implementation of the performances, which take place over several days. The Rama Lila artists dress in vibrant costumes and heavy makeup to represent the characters from the epic, who are frequently amateur actors from the local community. Lord Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman, and other important characters are portrayed with utmost respect and devotion. The actors who were male work really hard to give emotionally engaging performances that captivate the audience.

Fg: 4 Rama Lila

In these performances, men who dressed as Sita and other female characters also played the roles of female characters. The performances are accompanied by traditional musical instruments like the mridangam (a percussion instrument), harmonium, and cymbals, which give the story a dynamic and lyrical touch. The talks and songs are sung in the regional tongue, which makes the content more relatable and approachable for the audience. The Rama Lila performances are used as a tool for moral and spiritual instruction in addition to providing entertainment. The morals of dharma (righteousness) and love for humanity are inspired by the tales of Lord Rama's righteousness, devotion, and bravery. Cultural and moral values are passed down through the generations through these performances. People of all ages revere Rama Lila, which has great significance in Odishan folk culture. It contributes significantly to Odisha's cultural heritage by fostering a sense of community, cultural pride, and religious devotion.

Rasa Lila

Rasa Lila, sometimes referred to as Rasakeli or Rasa dance, is an incredibly cherished and lengthy tradition of Odisha. According to Hindu mythology and the Bhagavata Purana, this devotional dance represents the heavenly love between Lord Krishna and the *gopis* (cowherd girls) of Vrindavan. A mesmerising exhibition of creativity, commitment, and storytelling is the Rasa Lila performance in Odisha. The festival of Radha Rani Jayanti, which commemorates the birth anniversary of Radha, the beloved of Lord Krishna, as well as other celebrations in his honour, is when it is usually performed. The most well-known holiday of Balasore is Radhastami, when people of all generations observe rituals including fasting and Radha Rani worship. Thus, Balasore is where the Rasa lila is most well-known.

Fg: 5 Rasa Lila

Rasa Lila's dancers display beauty, elegance, and fluidity in their moves. From amusing exchanges to passionate displays of love and devotion, the dancers portray a range of emotions. The dancers dress up in elaborate traditional outfits that come with pricey jewellery and other accoutrements. Traditional makeup techniques are used to emphasise the characters' emotions and facial expressions. The way that Rasa Lila is typically done is round or spiral, symbolising the eternal cycle of heavenly love that exists between Krishna and the *gopis*. Both narration and dancing routines are frequently included in the presentation. While the dancers embody the many personalities and acts through their dance moves, the narrator recite the verses or sing the songs detailing the happenings. In this kind of dance, the male performer dressed and made up appropriately to play both male and female characters.

Conclusion:

The dance traditions of India are renowned for their stylistic diversity and cultural richness. Among them, the folk dances of Odisha hold a unique position, particularly for their deep-rooted connection to the everyday life and traditions of the local communities. Despite the evolution of classical and modern forms, a significant portion of Odisha’s indigenous population continues to actively engage with and preserve its folk cultural heritage, which serves as a powerful expression of identity and continuity.

Historically, both men and women participated in folk dance performances in Odisha. However, male performers were often given precedence, especially when the themes of the performance were religious in nature. This preference reflects a deeper gendered bias within the realm of performing arts. Traditional norms often imposed restrictions on women, citing notions of modesty and propriety, particularly in religious or public settings. While women held significant roles in the religious life of the community—often being revered in domestic and spiritual spaces—the public display of the female body through performance was discouraged, either due to patriarchal attitudes or conservative interpretations of religious conduct.

In recent times, contemporary society has become increasingly accepting of female participation in religious performances. This shift signals a broader transformation in gender roles, influenced in part by the inclusive philosophies of the Jagannath cult, where figures like Goddess Lakshmi are portrayed as asserting their dignity and moral voice. Such narratives are gradually reclaiming space for women within the domain of public performance, thus challenging older norms and reinforcing the evolving role of women in cultural and religious life.

References:

1. Behera, Jayanata Kumar, (2016): *Tribal and Traditional Folk Dances of Odisha*, Senior Fellowship Report, Bhawanipatna.
2. Dash, Dhiren, (1981). "Adibasi Nrutyakala Bisesatwa" in *Odia Sahitya O Adibasi Sanskruti*, Cuttack.
3. Foster, Susan Leigh. (2011). *Choreographing Empathy: Kinaesthesia in Performance*. Routledge.
4. Fraleigh, Sondra Horton. (1987). *Dance and the Lived Body: A Descriptive Aesthetics*. University of Pittsburgh. P. 49.
5. http://www. Jagranjosh.com/general-knowlwdge/origin-of-dance-in-india-1344510814-1.
6. https://ebhubaneswar.com/odisha/famous-dance-forms-of-odisha/
7. Kealinohomoku, Joann. (1970). Copeland, Roger; Cohen, Marshall. (eds.) *An Anthropologist Looks at Bullet as a form of Ethnic Dance*. Oxford University Press. New York.
8. Natalia Lidova, (2014). *Natyashastra*. Oxford University Press.
9. Nijenhuis, Emmie Te, (1974): *Indian Music: History and Structure*, BRILL Academic.
10. Patra, Harekrushna, (1997). *Odisha ra Tantra Sanskruti*, Kedarnath GabesanaPratisthana, O.S.A., Bhubaneswar.

India-Russia Relations in The Post-Ukraine War Era

Md Moniruddin
State Aided College Teacher, Dept. of Defence and Strategic Studies
Rani Dhanya Kumari College
Jiaganj, Murshidabad

Abstract: India-Russia relations have remained a cornerstone of India's foreign policy, shaped by historical ties and strategic interests. In the post-Ukraine war era, this partnership faces new challenges and opportunities. Defense trade continues to be a crucial pillar, with India relying on Russian military technology while simultaneously diversifying its arms procurement. Energy security has emerged as another key area, with India increasing its oil and gas imports from Russia despite Western sanctions. However, India's diplomatic balancing act between Russia and the West has been tested, as it navigates geopolitical pressures while maintaining strategic autonomy. This article explores the evolving dynamics of India-Russia relations, examining defense and energy cooperation while assessing how India manages its relations with the US and Europe. It also analyzes the future trajectory of this partnership amid shifting global power structures.

Keywords: India-Russia relations, Defense trade, Energy Security, Strategic autonomy, Geopolitical balancing.

Introduction:

India and Russia share a long-standing strategic partnership rooted in historical ties that date back to the Cold War era. Since the 1960s, Russia (formerly the Soviet Union) has been one of India's most reliable allies, providing military, economic, and technological assistance. The Indo-Soviet Treaty of Friendship and Cooperation (1971) played a crucial role in shaping bilateral relations, particularly during the Bangladesh Liberation War. Over the decades, the partnership has evolved into a multifaceted relationship encompassing defense, energy, trade, space, and nuclear cooperation (Pant, 2022). In the post-Ukraine war global order, India-Russia relations have gained renewed significance. Western sanctions on Russia have reshaped global trade patterns, leading India to increase its oil and gas imports from Russia at discounted rates, ensuring energy security. Additionally, despite India's diversification efforts, Russia remains India's largest defense supplier, with major deals such as the S-400 missile system continuing despite Western objections (Raja Mohan, 2023). India's strategic interest in maintaining strong ties with Russia is driven by

several factors. First, defense cooperation with Russia ensures a steady supply of critical military equipment and joint ventures like the BrahMos missile project. Second, energy collaboration helps India secure stable oil and gas supplies amid fluctuating global prices. Third, Russia's support in multilateral organizations like BRICS and the Shanghai Cooperation Organization (SCO) strengthens India's global positioning. At the same time, India maintains strong relations with the West, particularly the United States and the European Union, reflecting its strategy of multi-alignment (Jaishankar, 2023). As global geopolitics shift, India must navigate this complex landscape, balancing its historic ties with Russia while engaging with Western partners to uphold its national security and economic interests.

The Legacy of India-Russia Relations

India and Russia share a deep-rooted strategic partnership that dates back to the Cold War era. The Indo-Soviet relationship was formalized with the Indo-Soviet Treaty of Friendship and Cooperation (1971), which strengthened India's position during the Bangladesh Liberation War and secured military and economic assistance from the Soviet Union (Ganguly, 2022). The collapse of the Soviet Union in 1991 initially disrupted ties, but both nations rebuilt their relationship, culminating in the India-Russia Strategic Partnership (2000), which expanded cooperation in defense, energy, space, and trade (Mukherjee, 2023).

Over the decades, defense, space, and economic cooperation have been the foundation of bilateral ties. Russia has been India's largest defense supplier, providing advanced military hardware, including MiG and Sukhoi fighter jets, T-90 tanks, and the S-400 air defense system. The BrahMos missile, a joint venture between India and Russia, exemplifies strong defense collaboration. In the space sector, Russia played a pivotal role in launching India's first astronaut, Rakesh Sharma, in 1984 and continues to assist in India's Gaganyaan mission (Raja Mohan, 2023). Economically, bilateral trade has expanded, especially in energy and nuclear power cooperation, with Russian assistance in building India's Kudankulam nuclear power plant. Despite India's recent efforts to diversify its defense imports, Russia remains a crucial partner, supplying over 45% of India's military equipment. This legacy of cooperation continues to shape India's strategic autonomy and foreign policy decisions in a multipolar world.

Defense Trade: A Pillar of India-Russia Relations

Defense cooperation has been the cornerstone of India-Russia relations, with Russia being India's largest defense supplier for decades. Russian military equipment plays a vital role in India's armed forces, with nearly 45% of India's defense imports still coming from Russia (SIPRI, 2023). Key acquisitions include the S-400 Triumf air defense system, Su-30MKI fighter jets, T-90 tanks, and Kilo-class submarines, which enhance India's military capabilities (Ganguly, 2023). A significant aspect of this partnership is joint defense production, which

aligns with India's 'Make in India' initiative. The BrahMos supersonic cruise missile, a joint venture between India's DRDO and Russia's NPO Mashinostroyeniya, has been successfully deployed and exported. Another key collaboration is the AK-203 assault rifle production in Amethi, India, aimed at replacing outdated infantry weapons (Mukherjee, 2023). Additionally, India and Russia continue discussions on potential cooperation in next-generation fighter aircraft and armored vehicles. Despite the strength of defense ties, challenges and diversification efforts are reshaping India's procurement strategy. Western sanctions on Russia post-Ukraine war have complicated payments and deliveries, pushing India to explore alternate suppliers like France, the US, and Israel. India is also expanding its domestic defense industry, reducing dependence on Russian imports over time (Raja Mohan, 2023). While India's defense sector is diversifying, Russia remains an indispensable defense partner, particularly in areas where technological expertise and operational familiarity with Russian systems provide strategic advantages.

Energy Security : Ensuring Stability in Supply Chains

Energy security has emerged as a critical pillar of India-Russia relations, especially in the wake of Western sanctions on Russia following the Ukraine war. Russia has become India's second-largest crude oil supplier, offering discounted rates amid global price volatility. In 2023, India's oil imports from Russia surged to over 1.5 million barrelsper day, up from just 2% of India's total crude imports before the Ukraine conflict (IEA,2023). India has also increased its LNG imports from Russia, strengthening its energy security amid growing domestic demand (Mukherjee, 2023). Beyond trade, India has invested in Russian energy projects, securing long-term supplies. Indian companies like ONGC Videsh Ltd. (OVL) and Indian Oil Corporation hold stakes in Russia's Sakhalin-1 and Vankor oil fields. Additionally, India's purchase of a 49.13% stake in Russia's Rosneft-linked Nayara Energy highlights its strategic energy engagement (Ganguly, 2023). Russia also plays a vital role in India's nuclear energy program, supporting civil nuclear cooperation. The Kudankulam Nuclear Power Plant (KNPP) in Tamil Nadu, built with Russian assistance, is India's largest operational nuclear facility, with two reactors in operation and four more under construction. Russia's Rosatom is a key technology partner, ensuring the future expansion of India's nuclear energy capacity (Raja Mohan, 2023). Despite global geopolitical shifts, India-Russia energy cooperation remains mutually beneficial, reinforcing India's energy security and economic stability while providing Russia with a crucial export market.

India's Diplomatic Balancing Act

India has adopted a carefully calibrated diplomatic approach in navigating it sties between Russia and the West amid the Ukraine war. While Western nations, particularly the United States and the European Union, have imposed severe

sanctions on Russia, India has maintained a neutral stance, prioritizing its strategic and economic interests.

New Delhi has consistently abstained from UN resolutions condemning Russia, emphasizing the need for diplomacy and dialogue (Ganguly, 2023). Despite growing Western pressure, India has continued trade and defense cooperation with Russia, significantly increasing oil imports to secure energy stability. However, India has also strengthened its strategic partnerships with the West, particularly through QUAD (with the US, Japan, and Australia) and stronger defense ties with France (Mukherjee, 2023). This diplomatic balancing act underscores India's commitment to strategic autonomy, ensuring it remains aligned with neither power bloc while safeguarding national interests. India’s neutral stance has had implications for its ties with the US and Europe. While Western nations acknowledge India's security dependence on Russian defense technology, concerns over continued India- Russia defense and energy trade persist. The Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) posed a challenge due to India's purchase of Russia’s S-400 air defense system, but the US has largely avoided penalizing India, recognizing its geopolitical compulsions (Raja Mohan, 2023). As the global order evolves, India’s ability to balance its partnerships with Russia and the West will shape its future diplomatic trajectory and global standing.

Economic and Trade Cooperation Beyond Defense and Energy

While defense and energy form the core of India-Russia economic ties, both nations have been expanding trade in other sectors, particularly pharmaceuticals, fertilizers, and infrastructure. In response to Western sanctions on Russia, India and Russia have explored alternative payment mechanisms, such as the rupee-ruble trade settlement, to bypass SWIFT restrictions and ensure uninterrupted commerce (Mukherjee, 2023). Although challenges remain in fully implementing this system, it has helped sustain bilateral trade, which reached $50 billion in 2023, with a significant rise in Indian exports (IEA, 2023). Apart from oil and defense imports, India has emerged as a key supplier of pharmaceuticals to Russia, with Indian companies expanding their market share in Russia’s healthcare sector. Additionally, India has increased imports of fertilizers, ensuring food security amid global supply chain disruptions (Ganguly, 2023). Infrastructure and industrial cooperation are also expanding, with Indian firms investing in Russian mining, steel, and engineering sectors. Connectivity remains another crucial aspect of trade enhancement. The International North-South Transport Corridor (INSTC), linking India, Iran, and Russia, is being actively developed to provide a faster alternative to traditional sea routes. This corridor reduces transit costs and enhances India’s access to Eurasian markets, strengthening trade connectivity (Raja Mohan, 2023). Despite geopolitical challenges, India and Russia continue to diversify economic engagement,

ensuring that bilateral cooperation extends beyond defense and energy into long-term trade and investment partnerships.

The Future of India-Russia Relations in a Changing Global Order

As the global geopolitical landscape evolves, India and Russia are exploring new avenues of cooperation in emerging technologies, including artificial intelligence (AI), space exploration, and cyber security. Both countries have intensified collaboration in quantum computing, robotics, and defense AI systems, with Russia offering India access to advanced military technologies despite Western pressures (Mukherjee, 2023). In the space sector, India's ISRO and Russia's Roscosmos continue joint initiatives, such as the Gaganyaan human spaceflight program and satellite navigation systems. Cyber security cooperation is also expanding, particularly in countering cyber threatsand data security risks (Ganguly, 2023). However, Western geopolitical pressures pose challenges to this relationship. The US and EU sanctions on Russia limit financial transactions and technology transfers, affecting key joint ventures. India's growing strategic alignment with Western powers through QUAD and its deepening ties with Europe create diplomatic balancing challenges. India must navigate its relations cautiously, ensuring strategic autonomy without alienating either partner (Raja Mohan, 2023). Looking ahead, the India-Russia partnership is likely to remain resilient but will require adaptability to shifting global dynamics. While traditional sectors like defense and energy will continue to dominate, cooperation in technology, space, and digital infrastructure may define the future of this relationship. India's multi-alignment strategy will play a crucial role in shaping the long- term trajectory of India-Russia ties in an increasingly multipolar world.

Conclusion:

India-Russia relations have remained a cornerstone of India's strategic and economic policy, even amid the shifting global order. This article has explored key aspects of their bilateral ties, including historical cooperation, defense trade, energy security, and economic engagement beyond traditional sectors. Despite Western sanctions on Russia,

India has deepened trade relations, particularly in energy imports and defense collaborations, while also expanding cooperation in technology, space, and cyber security. India's pragmatic foreign policy has allowed it to maintain strong ties with Russia while simultaneously strengthening partnerships with Western nations. Its neutral stance on the Russia-Ukraine war reflects its emphasis on strategic autonomy, ensuring that national interests dictate its foreign policy rather than external pressures. While India's participation in QUAD and growing defense ties with the US and Europe suggest a closer alignment with the West, it remains committed to preserving its historically strong relations with Russia. Going forward, India must continue to balance its strategic engagements, leveraging its partnerships to enhance economic, defense,

and technological capabilities. The ability to navigate great power rivalries while securing its own national interests will define the future of India's global positioning. A multi-aligned foreign policy—engaging with both Russia and the West—will be crucial in ensuring India's strategic stability and global influence in an increasingly multipolar world.

References:

- Pant, H.V. (2022). India's Foreign Policy: A New Trajectory. New Delhi: Oxford University Press.
- Raja Mohan, C. (2023). The New Geopolitics of India-Russia Relations. Brookings Institution.
- Jaishankar, S. (2023). The India Way: Strategies for an Uncertain World. Harper Collins India.
- Ganguly, S. (2022). India's Foreign Policy: Retrospect and Prospect. Routledge.
- Mukherjee, A. (2023). India-Russia Relations: From Cold War to Strategic Partnership. Oxford University Press.
- Raja Mohan, C. (2023). The New Geopolitics of India-Russia Relations. Brookings Institution.
- Ganguly, S. (2023). India's Military Modernization: Challenges and Opportunities. Routledge.
- Mukherjee, A. (2023). India's Defense Industry: The Quest for Self-Reliance. Oxford University Press.
- Raja Mohan, C. (2023). India-Russia Defense Relations in a Changing Global Order. Brookings Institution.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2023). Arms Transfers Database Report.
- Ganguly, S. (2023). India's Energy Diplomacy: Strategies for the Future. Routledge.
- Mukherjee, A. (2023). India's Oil and Gas Policy in a Changing Global Landscape. Oxford University Press.
- Raja Mohan, C. (2023). The Strategic Dimensions of India-Russia Energy Ties. Brookings Institution.
- International Energy Agency (IEA). (2023). India Energy Outlook Report.
- Ganguly, S. (2023). India's Foreign Policy in the 21st Century. Routledge.
- Mukherjee, A. (2023). India and the West: Strategic Alignments and Challenges. Oxford University Press.
- Raja Mohan, C. (2023). Geopolitical Realignments: India's Balancing Act Between Russia and the West. Brookings Institution.
- Ganguly S. (2023). India's Economic Diplomacy: Expanding Global Trade Relations. Routledge.
- Mukherjee, A. (2023). India-Russia Economic Relations in a Changing World Order. Oxford University Press.
- Raja Mohan, C. (2023). Connectivity and Trade: The Role of INSTC in India-Russia Ties. Brookings Institution.

- International Energy Agency (IEA). (2023). India-Russia Trade and Investment Report.
- Ganguly, S. (2023). Strategic Partnerships in the Digital Age: India-Russia Relations in Technology and Space. Routledge.
- Mukherjee, A. (2023). Geopolitics of AI and Cyber security: India's Emerging Role. Oxford University Press.
- Raja Mohan, C. (2023). India's Foreign Policy in a Multipolar World: Challenges and Opportunities. Brookings Institution.

The Notion of Masculinity in Colonial India : Studies in 19th and 20th Century Society

Deedhiti Singharoy
Independent Researcher

Abstract: The Revolt of 1857 proved to be a turning point in India. The revolt brought India under the direct control of the English queen. There was a change in the perceptions of the Britishers regarding Indians specially after the Revolt of 1857. There were efforts since the early 19th century to portray the Indian Hindu male as effeminate and weak by the British colonisers. The Bengali- middle class men became the focus of this perception. As a consequence of such identification, through the nature of recruitment, two distinct masculine identities were produced, martial and non- martial. The "fighting instincts" became an appropriate characteristics of manliness and it defined the martial races. The Rajputs, Pathans, Nairs, Marathas, Gurkhas, Sikhs and few other ethnic groups fell under this category. They were considered to be manly. Bengalis were assumed to be coward, effeminate and thus were excluded from the colonial Indian army. This paper will focus how the Indians will respond to the accusation of the Britishers on "effeminacy" with their own theory of masculinity. Along with men, women too came up with the role of ideal womanhood in masculinity.
Keywords: Effeminate, Masculinity, "Budhibal", "Sannyasis", "Chakri".

Introduction:
It is common that when we hear the words like 'Punjabis', 'Sikhs', 'Marathas', 'Rajputs' we automatically associate qualities like 'bravery', 'chivalry', 'gallantry' etc. 'Bengalis' on the other hand are believed to be 'weak', 'coward', 'feeble'. One may think that how such conception on these communities evolved and how such differentiation is done. Such beliefs are not new in India, we need to go back during the Revolt Of 1857 to trace such conceptual evolution. After the Revolt Of 1857, the British colonizers made an effort to identify the Hindu male based on the nature of recruitment. The martial and non-martial identities were produced to identify the masculine nature. The "fighting instincts" became an appropriate characteristic of manliness and it marked the doctrine of martial races. Under this categorization, 'Rajputs', 'Pathans', 'Gorkhas','Marathas', 'Sikhs' and few other ethnic groups were considered manly while the 'Bengalis' were termed as effeminate and coward and thus excluded from the Colonial Indian Army. Through this paper I want to analyze the reasons as put forward by

various historians for the accusation of 'effeminacy' by the British and highlight how Indians especially "Bengalis" countered with their own version of 'manliness'.

Why Indians were Termed as 'Effiminate'?

As historian Mrinalini Sinha points out that the senior British officials who were directly related to administration and military establishment and the elite non officials who were not directly associated with the administration occupied the top scale in the society. She further states that other groups and classes that form the colonial society own the attributes of the 'manly Englishman'. Politically self-conscious Indians represented the 'perverted' or 'unnatural' form of masculinity. Thus, this category of Indians who were mainly represented by the middle-class Bengali Hindus were referred as 'effeminate babus'.[i]

According to historian Mrinalini Sinha, the figures of 'Manly Englishmen' and 'Effeminate Babus' helped to trace and shape the shift in the political economy of colonialism in late 19th century. Although the Anglicist won over the Orientalist school of colonial administration but after the Revolt of 1857, the Anglicist perspective got eroded after the revival of the Orientalist perspective. It was accepted that India can be best governed by the indigenous traditions. As Mrinalini Sinha points out that the return to the supposedly traditions Indian forms of rule in the second half of the 19th century and intimacy with the orthodox Indian groups mark the shift from the Anglicist goal of creating a "class of persons Indian in colour and blood, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect". Thus, the British took up a new attitude towards the group of Indians and characterized them as 'effeminate babus'.

Historian Tanika Sarkar puts forth that 'manhood' in colonial society was based on particular relationship to property. In the second half of the 19th century the Bengali middle class lost this relationship to property.[ii]The Bengali elites were squeezed out of the economic sector as the new economic arrangements which came around in second half of the 19th century were dominated by the European agency managing system. The Bengali elites also failed to play role in prestigious local trade or business activities as that domain was already dominated by the Marwaris, an immigrant native group from western India. Thus, the Bengali middle class found themselves confined to 'chakri' and petty clerical works. According to historian Tanika Sarkar, this 'chakri' associated the 'effeminacy' with the Bengalis.

Historian Tanika Sarkar further suggests that the self perception of effeminacy was an expression of the 'hegemonic aspirations' of the Bengali elite. The 'effeminacy' became the excuse for the negative impact of the colonial rule on the society. The Bengali elites accepted and resisted at the same time the colonial politics of masculinity that had given them a tag of 'babu'.

Historian Indira Chowdhury explains how physically and mentally the Bengali male was doubly identified with the weaknesses first with the frailty of women and second, with the powerlessness of the submissive slave[iii]. Bengalis were categorized in the fifth category of Indian physical types and said to lack all the aggressive characteristics of Sikhs, Rajputs, etc.

Indian 'Masculinity'

The Orientalists tried to legitimize their colonization by terming Indians especially Bengalis as 'feminine', 'unmanly', 'weak'. To counter this, the Indians followed some methods like the manner of self ridicule and self irony. Historian Sudipta Kaviraj mentioned a mode of mythic traditional discourse about reclaiming a supposedly more masculine past and a discourse centered on urban middle class 'bhadralok' who came to seek out ambivalent masculine self than the mythic masculine manliness.

Ramkrishna was constituted in the gaze of the late 19th century 'bhodrolok'. The middle class found empathy from him. He criticized the jobs. Ramkrishna's conception of evil represented livelihood with 'kamini', 'kanchan' and 'dasatya' of 'chakri', lust embodied in women, gold and the bonding of office jobs for money and this in turn forces men into office work. This is the reason why the clerks who were dominated by the colonial ruler preferred Ramkrishna. According to Ramkrishna only mother did not represent the threat of 'kamini'. He strictly abstained from sexual relation with Sarada Devi and worshipped her as an embodiment of the Divine Mother. He denied the sexuality of women.

The colonial ruler bullied the Bengali by categorizing them as 'weak', 'coward', doing low and dull clerical jobs, so the people challenged this patriarchal notion of manliness by preferring Ramkrishna who had 'feminized behaviour', 'child like behaviour' and who was 'pagol'. Ramkrishna provided a world of Bhakti, into which one could retreat even while carrying on the duties, imposed by a heartless rule bound society.

Bankim Chandra Chattopadhyay constructed Sanyasi and Sanatan to counter British, they were politically proactive, assertive, militant, rebellious, violent figure at the same time represented an ascetic, celibate and thus, promoted 'spiritually pure' masculinity[iv]. Bankim Chandra Chattopadhyay accepted the historicized figure of Krishna as a model ethical man worthy of emulation. In "Anandamath" Bankim created Krishna's fictional counterpart in the 'Sannyasi-Sanatan'. Engaged in campaigns against the Muslim rulers, the 'santans' of Bankim's novel perceived their tasks in terms of sacrifice and rigorous spiritual discipline that would free the enslaved Motherland. Bankim Chandra Chattopadhyay asserted on the ascetic masculinity embodied by the Hindu Sanyasi which was later followed by Vivekananda's formulation of ideal masculinity comprising 'Kshatra-Vinya', 'Brahma-Teja'.[v]

Vivekananda's reformulation of the sannyasi figure along with his interest in Bankim Chandra's writing contributed to the certain trends which already existed in contemporary perception of the significance of the sannyasi. Early marriage was seen as a means of contribution to the colonial image of 'emaciated' and 'weak'. Vivekananda emphasized that strong men are needed for the 'battle of truth'.[vi] His reformulation of the sannyasis also advocated spiritual freedom which allowed the men to rise above marriage. He believed that by renouncing materialistic pleasures men could attain a superior strength.

Western manliness combined physical strength and rationality leading to material progress and prosperity. Vivekananda designed a different role for himself in the celebration of western manliness, he supported western manliness but emphasized the need to cultivate a different kind of strength, which is of the spirit. He believed that spiritual strength is the appropriate expression of manliness. He ascertained this type of manliness in his long essay entitled "The East and the West". Vivekananda's theory of 'manliness' was against the western obsession of body. He advocated the notion of disciplining the body in order to train the spirit and make it 'manly'. Thus, he spoke about the transmutation of sexual energy into cosmic energy which could be attained by the preservation of the vital fluid which is semen.[vii]

Vivekananda valorized the heightened spirituality of the ascetic which can be achieved by disciplining of the 'dhatu'- the prime element or semen[viii]. The loss of semen was perceived in Ayurveda to be enervating and weakening. The new 'masculinity' in terms of sannyasis sought to denounce the colonial evaluation of the Bengalis as 'effeminate' and 'weak'. The sannyasis represented 'heroism', 'capacity to bear hardships', 'making sacrifices'.

Vivekananda considered women only as mother and wife. He was so obsessed with celibacy that he did not give the permission to women for entering the Ramkrishna Mission as the warrior monks can be seduced[ix]. Historian Tanika Sarkar argued here that as the Bengali men's masculinity dominated the public sphere, they asserted it in the inner sphere. This led to either disappearance of female bodies or emergence as chaste with heroic mother or celibate warrior.

Many Bengali works reflected the celebration of this masculinity. Like in "Pather Dabi" Sarat Chandra Chattopadhyay criticized the 'unmanliness' of Apurba but made Sabyasachi the hero who will fulfill the terms of proper masculine and here he also tried to revoke the myth of Arjun. Here, he portrayed the unmanly, cowardice middle class Bengali through Apurba and portrayed Sabyasachi as the proper man who embodied martial power, physically strong, celibate and rejected the women. The manliness embodied by him had certainflavours of Hinduism because it demonstrated indigenous people

In "Hira Manik Jale" by Bibhutibhusan Bandopadhyay, there were adventurous heroes who were fearless and masculine. He celebrated the great parts of India

when they went to foreign lands and established their colonies. Muslims remained only as subordinate partner and it is very interesting to see that no women were part of these adventures.

Not only men, women's notion were also shaped by masculinity and nation. Madam Cama believed that India's hope for independence lied in the articulation of masculine Hinduism. She believed that Muslims were enemy and valorized Hindu context of nation by drawing familiar icons like Rama, Krishna, Shivaji, Rana Pratap. Sister Nivedita had constructed masculinity on the basis of martial power, offensive actions and physical strength. Nivedita's gendered imagery created the figure of male warrior and she believed that women cannot perceive this role. Although she was a proponent of women education but her representation of women did not claim traits like independence and equity. In her construction of Indian gendered roles, the conjugal relationship depended on women's unequivocal surrender to their husband's wishes. Nivedita did not envision women as warriors who could fight for their motherland but they were mothers and wives who could support and cheer the nationalists or give birth to strong men. Sarala Devi in journal 'Bharati' urged men to regain their manliness. In 1902 she organized the first 'Pratapaditya Brata'. Under the mantle of 'Pratapaditya' men would learn boxing, wrestling, swordplay. In the following year she organized the 'Birashtami' festival[x](to celebrate martial valor) on the second day of Durga Puja. To this goddess, the men had to vow in the names of Hindu martial heroes – Krishna, Rana Pratap, Rama, Drona, Shivaji, Arjuna, Bheema, Ranjeet Singh and Pratapaditya to fight for independence and dedicate their lives to create a strong nation. It was interesting to notice that although nation was embodied as nation but it was the men's duty to protect them. Women's duty was to support men, instill patriotism and nationalism but they cannot involve in the struggle themselves.

'Early days' were glorified to counter the colonial perception. Like Rajnarayan Basu commented that compared to men of 'those days' men during the present time had no strength at all. He said that the 'bhadralok' people had become feeble. According to historian Partha Chatterjee, there was a tendency to construct a romantic picture of 'those days' when there was beauty, prosperity, healthy sociability, all of which was their own creation.

Historian Indira Chowdhury pointed out that Bankim Chandra Chattopadhyay was very much anxious about why Bengalis does not have history. As the British started to claim that Indians were unable to write history and they were too weak to be a man, every prominent middleclass Hindu educated force came into field to claim that they had a glorious past. As historian Sudipta Kabiraj stated that Bengalis gradually appropriated this glorious history of Rajputs, they began to view imaginatively this history of a distant.[xi]

When the Indians started to write history, they took the theme of 'Ancient glorious past' and category 'Aryan', both of which are the influence of Orientalist thought. Aryans were identified as the authentic predecessor of the Hindu[xii]. Priyanath Mukhopadhayay in his "Balya Sikha Banglar Itihas" claimed the superiority of Hindus (Aryans) and by claiming an Aryan heritage, this historiography could profess an equality with all civilized races and more specifically with Europeans. This historiography also presented how the Hindus were betrayed by the British. They remodeled historiography to claim a civilized, glorious past where they renounce their feeble self and adopt a valiant one.
Vinayaka Damodar Savarkar posited that the British conquest could be explained by the degeneration of a once powerful and mature masculine Hinduism, one which had reached its zenith during the rule of the Marathas under the warrior king Shivaji. According to V.D Savarkar, Shivaji was an ideal representation of masculine Hinduism representing martial prowess, courage, muscular strength and the ability to be organized and efficient. Savarkar claimed that he wanted to Hinduize all politics and militarize Hinduism and he urged young men to re-learn many lessons from the legacy of Hindu martial honour expressed by Shivaji's glorious resistance to the mighty Mughal Empire[xiii].

The nationalists portrayed India as 'Bharat Mata'. To describe the worse situation of her, they created a link with 'Dhumabati' (one avatar of Ma Durga). They portrayed the North India, who was a widow, because of Muslim and British, was a victim who continuously urged the sons to save her.[xiv] This notion of protection from foreigner to protect honour are very patriarchal. In "Unabinsho Puran", 'Bharat Mata' was presented as a widow whose husband was killed by the Muslims and she remained faithful in the memory of her husband. It was a political cultural resistance glorifying the Indian womanhood where women always remain faithful to their husband and this had made them powerful. It can be said that the men tried to portray that although Indians were physically weak than the British but they were spiritually powerful and they were capable of negotiating with the powerful because women were armed with virtue.

Bengalis even tried to create a link with Queen Victoria, formed similarity with 'bhadramahila'. It can be said that previously Bengali men created link with Aryans to place Indians in the same place with the Europeans. Victoria became the embodiment of Aryan feminity. Here, also they rejected mere physicality from which they were bullied by the British and focused on Hindu virtue of devotion and spiritual strength[xv]. The nationalists use the spiritual, chaste, loyal as marker of women as the symbol of cultivated resistance from and gaining their masculinity.

Conclusion:

In conclusion it can be stated that such conception of masculinity in the 19th and 20th century society shaped the mentality of us and it exists till date. The discourses about constructing the ideal masculinity by evoking a mythic, glorious, more masculine past led to the establishment of the notion of militant Hinduism against 'other' religions which later took an undesirable shape in the post-colonial Indian political sphere and which has repercussions even today. The rising communal unrest is an example of such beliefs. The discourses of colonial masculinity also formed institutionalized violence and false sense of cultural homogeneity. Hindu middle class, upper caste, educated urban elite's masculinity got dominance. The Bengali's stress on it even differed from the general North Indian conception. The main focus of Bengali male's virility was focused on the notion of mental strength and intellect ('budhibal') in contrast to physical power ('bahubal'). 'Bakyabal' and 'budhibal' were regarded superior to 'bahubal'. According to writer Bankim Chandra Chattopadhyay 'bahubal' was responsible for the deterioration of the world[xvi]. Such conception still echoes in our mind. When we talk about communities like "Punjabis", "Marathas" etc we accept them to be brave and aggressive but we also accuse them for being 'dull-headed' while on the contrary Bengalis are regarded as 'intellectual', 'sharp-brained'. Bengalis engaged in football to counter the colonial discourses. Even after independence we could see the same aggression to be expressed in the fields to prove their robustness. Not only in social spectrum, the political field was also affected due to such conceptions. Post independent India saw the emergence of aggressive Hindu masculinity through various political parties etc. They all believed in orthodox Hinduism and used religious symbols and icons to facilitate the spread of masculine Hinduism. Ram is regarded as masculine Hindu warrior. Due to the spread of masculinity women are subsided as women's duty is perceived to support the men. Even films like "Arjun Reddy", "Kabir Singh" and "Animal" and also fairy tales, teenager's romantic stories propagate masculinity which are also impacting the society. Men are trying to prove their dominance by subduing women. At present few women belonging to cultured, educated society still support the 'rough' and 'tough' image of men indirectly encouraging the idea of being subdued by men and viewing men as the 'protector' of women even though feminism is on rise. Being optimistic, it can be expected that a unification must usher in irrespective of gender and religion.

References:

i Mrinalini Sinha, *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the late nineteenth century,* Manchester University Press, 1995, pg 1-3

ii Tanika Sarkar*, The Hindu Wife and Hindu Nation: Domesticity and Nationalism in Nineteenth Century Bengal",* 1992, pg 213-235

iii Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History: Gender and Politics of Culture in Colonial Bengal*, Oxford University Press, 1998, pg 18-21

iv Sayan Chattopadhyay*, Bengali Masculinity and the National-Masculine: Some Conjectures for Interpretation,* SAGE Publication, 2011, pg9-13

v Chattopadhyay, *Bengali Masculinity and the National-Masculine,*pg 10-15

vi Sikata Banerjee, *Gender and Nationalism: The Masculinization of Hinduism and Female Political Participation in India, Women's Studies International Forum*, Vol:26, No.2, pg 167-179

vii Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History: Gender and Politics of Culture in Colonial Bengal*, Oxford University Press, 1998, pg 145-150

viii Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History,* 148-150

ix Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History,* 148-150

x Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History: Gender and Politics of Culture in Colonial Bengal*, Oxford University Press, 1998, pg 149-152

xi Sudipta Kaviraj, *The Unhappy Consciousness: Bankimchandra Chattopadhaya and the formation of National Discourse in India*, Oxford University Press, 1995, pg 143-146

xii Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History: Gender and Politics of Culture in Colonial Bengal*, Oxford University Press, 1998, pg 46-50

xiii Sikata Banerjee, *Gender and Nationalism: The Masculinization of Hinduism and Female Political Participation in India, Women's Studies International Forum,* Vol:26, No.2, pg 167-179

xiv Banerjee, *Gender and Nationalism,* 167-179

xv Banerjee, *Gender and Nationalism,* 167-179

xvi Sayan Chattopadhyay, *Bengali Masculinity and the National-Masculine: Some Conjectures for Interpretation*, SAGE Publication, 2011, pg 2-5

Bibiography:

1. Bandopadhyay Bibhutibhusan, *Hira Manik Jale*, Sishu Sahitya Sansad, 1946
2. Banerjee Sikata, *Gender and Nationalism: The Masculinization of Hinduism and Female Political Participation in India*, Women's Studies International Forum, Vol.26, No.2
3. Chattopadhyay Bankim Chandra, *Anandamath*, Bangiye Sahitya Parishad, 1882
4. Chattopadhyay Sarat Chandra, *Pather Dabi*, Gurudas Chattopadhyay and Sons, 1926
5. Chowdhury Indira, *The Frail Hero and Virile History: Gender and Politics of Culture in Colonial Bengal*, Oxford University Press, 1998
6. Chattopadhyay Sayan, *Bengali Masculinity and the National- Masculine: Some Conjectures for Interpretation*, SAGE Publication, 2011
7. Kaviraj Sudipta, *The Unhappy Consciousness: Bankimchandra Chattopadhyay and the formation of National Discourse in India*, Oxford University Press, 1995
8. Sarkar Tanika, *The Hindu Wife and Hindu Nation: Domesticity and Nationalism in nineteenth century Bengal*, Orient Blackswan Private Limited, 1992
9. Sinha Mrinalini, *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishmen' and the 'Effeminate Bengali' in the nineteenth century*, Manchester University Press, 1995

10. Vanga Sandeep R, *Arjun Reddy*, Bhadrakali Pictures, 2017
11. Vanga Sandeep R, *Kabir Singh*, T-Series and Cine1 Studios, 2019
12. Vanga Sandeep R, *Animal*, Bhadrakali Pictures and T-Series and Cine1 Studios, 2023
13. Vivekananda Swami, *The East and the West*, Vedanta Society, New York, 1909.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

DOI : 10.5281/zenodo.15812553

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik
2582 3841

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Phn : 8250595647

Email : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in